বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

চন্দননগর

১৩৪৩

প্রকাশক—
শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে,
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি,
চন্দননগর।

৫২।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রী ফণীভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সাহিত্য-শাখার প্রবন্ধ—

বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইনি বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন উদ্বোধন করিয়াছিলেন

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

বিংশ অধিবেশন

চন্দননগর

চন্দননগরে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ জাহ্নবী নিবাসে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হয় এবং তিনদিন ধরিয়া উহার কার্য্য চলিয়া থাকে। সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন ভবানীপুরে ১৩৩৬ সালে হইয়াছিল। প্রতি বৎসর যাহাতে নিয়মিতভাবে সম্মিলন হয়, সেই উদ্দেশ্যে ঐ অধিবেশনে সম্মিলন পরিচালন সমিতি গঠিত হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও দীর্ঘ সাত বৎসর কোথাও সম্মিলন আহূত হইল না। ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে উনবিংশ সাহিত্য সম্মিলনের সহকারী সম্পাদক মহাশয়, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের মারফৎ চন্দননগর পুস্তকাগারের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাকে সাহিত্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্যোগী হইবার অনুরোধ করেন। হরিহর বাবুর বাণীর বরপুত্র ও সাহিত্যসেবীদের সমবেত করাইয়া, চন্দননগরের গৌরব বৃদ্ধি করিবার আকুল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া পুস্তকাগারের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার উৎসাহ ও ভরসায় চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন আহ্বান করিতে উদ্যোগী হইলেন। আশ্বিন মাসে চন্দননগরের সাহিত্যানুরাগিগণের এক সভার আয়োজন করা হইল এবং ঐ সভায় চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিবার সঙ্কল্প পরিচালন সমিতিকে জানান স্থির হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একশত জন সভ্য লইয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সম্মিলনের কার্য্য সুপরিচালনার জন্য এই অভ্যর্থনা সমিতির এক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। চন্দননগর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই সম্মিলনে সহযোগিতা করিবার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। পৃষ্টপোষক ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। বাঙ্গালার বিভিন্ন সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি পাঠাইয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। ষাট জন প্রতিনিধি অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ও সভানেত্রীগণের মধ্যে শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্মিলনের তিন দিন চন্দননগরে থাকিয়া আমাদিগকে বহু বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতি এই সম্মিলনের সহিত এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন ; তাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নিদর্শনের সঙ্গে চন্দননগরের ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শন রক্ষা করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালার সুধী ও মনীষীদের নিকট আমরা উপদেশ প্রার্থী হইয়া গিয়াছি। তাঁহাদের আশিস্, তাঁহাদের উৎসাহ বাণী আমাদের সত্যই কার্য্যে প্রেরণা দিয়াছিল। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র রোগশয্যায় থাকিয়াও আমাদের আয়োজন তাঁহার জেলার বলিয়া উহার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইয়া উহাকে সার্থক করিবার যে আকুল আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সত্যই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম।

সম্মিলনের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ঊনবিংশ বঙ্গীয় সম্মিলনের অধিবেশনে বিংশ অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখার জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাথ সাহা মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্মিলনের দিন স্থির হইলে তাঁহাকে যখন জানান হইল, তিনি সে সময় অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন বলিয়া সভাপতির কার্য্য করিতে অসমর্থ, ইহা জানাইলেন। অভ্যর্থনা সমিতি বিলম্বে এই সংবাদ পাইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুখের বিষয় ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করিলে তিনি সম্মতি জানাইয়া অভ্যর্থনা সমিতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন।

জাহ্নবী-নিবাস-সংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশনের জন্য এক বিরাট সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং উহা বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রাতপে ও পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। পশ্চিমদিকে নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড মঞ্চের উপর সভাপতি ও শাখা সভাপতিগণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মঞ্চের উত্তরদিকে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও সম্মুখে বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য, দর্শক ও ছাত্রদের লইয়া তিন সহস্রাধিক আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সভা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে দলে দলে নরনারী সভামণ্ডপে সমবেত হইতে থাকেন এবং সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মণ্ডপের সকল স্থানই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যের সংখ্যা অন্যূন এক সহস্র হইবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনের উদ্বোধন করিবাব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বজরাযোগে চন্দননগরে আসিতে তাঁহার বিলম্ব ঘটে। সভাস্থ সকলে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত থাকেন। তাঁহার আগমন সংবাদ ঘোষিত হইবামাত্র সভায় আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায় এবং বহু সুধী সাহিত্যিক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হ'ন। রবীন্দ্রনাথ সভামণ্ডপে আসিলে সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাস্থলে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা থাকায় রবীন্দ্রনাথ ও সভাপতিদের বক্তৃতা মণ্ডপের সর্ব্বত্রই শ্রুত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। অবিশ্রান্ত দুই ঘণ্টা ধরিয়া বৃষ্টি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড় হইতে থাকায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় অধিবেশনের

সুবৃহৎ মণ্ডপটী একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। মূল্যবান্ আস্বাব পত্রও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, সম্মিলনের কার্য্য বুঝি স্থগিত হইয়া যাইবে। উদ্যোক্তৃগণের অদম্য উৎসাহ ও স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রাণপণ পরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যেই জাহ্নবী নিবাসের প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠগুলিতে অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং সম্মিলনের কার্য্য সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রথম দিবস

সাধারণ অধিবেশন

স্থান—জাহ্নবী নিবাস, চন্দননগর

৯ই ফাল্গুন ১৩৪৩ (২১এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭), রবিবার বেলা ১২টা।

এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য, প্রতিনিধি, বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও দর্শক যোগদান করিয়াছিলেন। বহু মহিলাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমল হোম, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেবরায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত,

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন দাস, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন।

১। শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার সুললিত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গাহিলেন।

২। শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ স্বামী ঋগ্‌বেদের "সরস্বতীং" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ পাঠ করিলেন।

৩। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে মাল্যদান করিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া এই সম্মিলনের এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপকারিতা বিষয়ে সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কবি-জীবনের সঙ্গে চন্দননগরের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের বিষয় উল্লেখ করিলেন। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অগ্রগতিতে আনন্দপ্রকাশ করিয়া সাহিতের শুচিতা রক্ষার জন্য সাহিত্যিকগণকে অনুরোধ জানাইলেন।

৫। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (অভিভাষণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে)

৬। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়া স্বরচিত 'সরস্বতী বন্দনা' নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস মহাশয় শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের রচিত "বঙ্গভারতী" বিষয়ক গান গাহিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

৯। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহাকে মাল্যদান করিলেন।

১০। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় নিম্নলিখিত শাখাগুলির সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়া সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ক) সাহিত্য শাখা—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

(খ) ইতিহাস শাখা—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

(গ) দর্শন শাখা—ডক্টর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার

(ঘ) বিজ্ঞান শাখা—ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

(ঙ) কথা-সাহিত্য—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

(চ) কাব্য-সাহিত্য—শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু
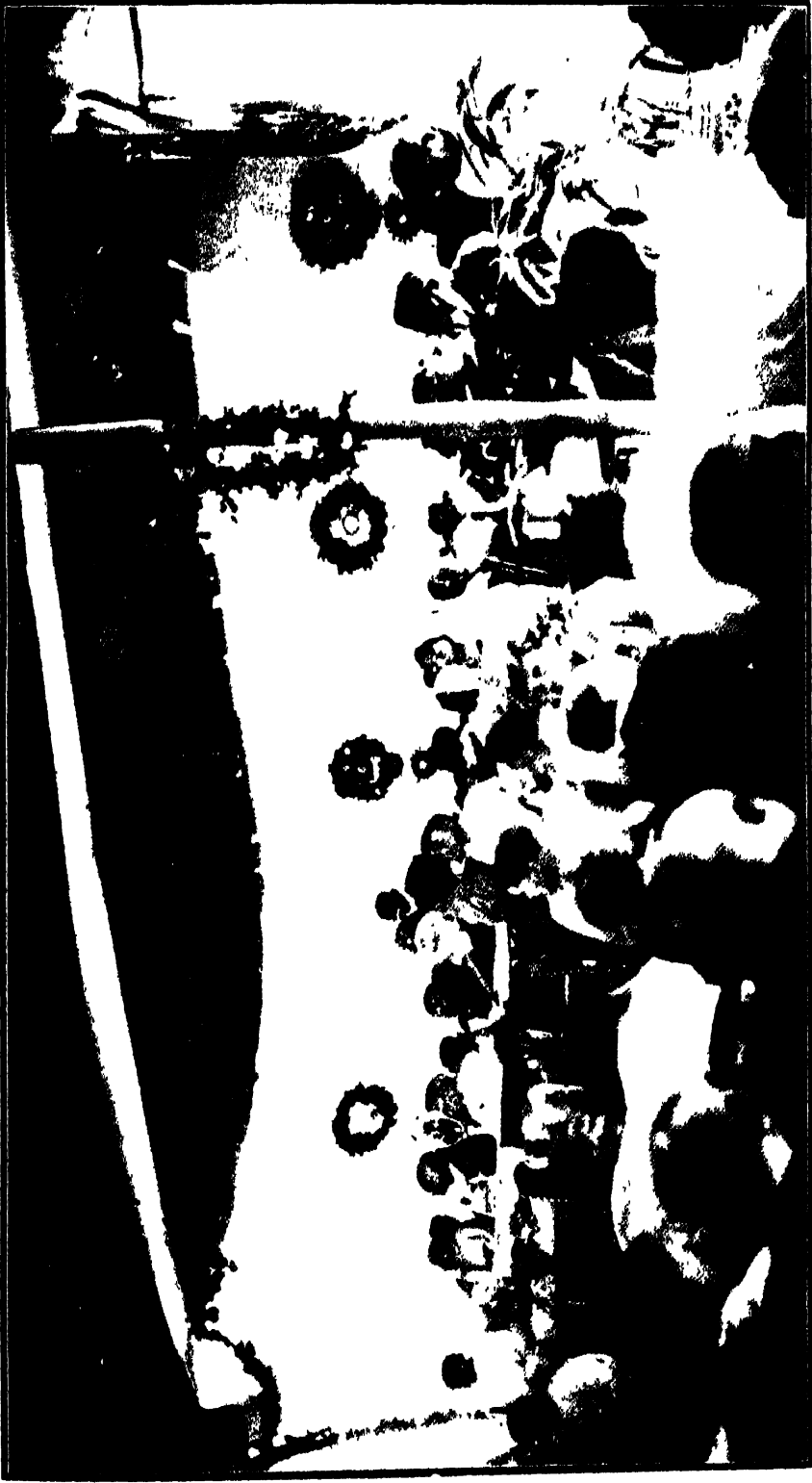
জাহ্নবী-নিবাসস্থিত মণ্ডপে প্রথম দিনের সাধারণ অধিবেশন।

(ছ) সংবাদ-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(জ) সুকুমার-কলা-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(ঝ) শিশু-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(ঞ) বানান-সমস্যা— ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(ট) অর্থনীতি-শাখা—ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

(ঠ) চিকিৎসা-বিদ্যা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস

ডক্টর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় অসুস্থতা বশতঃ অধিবেশনে উপস্থিত হইবার অক্ষমতা জানাইয়া পত্র লেখায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর দর্শন-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। পরে শাখা-সভাপতিদের মাল্যদান করা হয়।

১১। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (অভিভাষণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে)

১২। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ও মহিলাগণ সম্মিলনে যোগদান করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া পত্র বা টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু	কলিকাত
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব	,,
,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার	,,
,, সুরেশচন্দ্র সেন	,,
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা	,,
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা	,,
,, সুধাংশুমোহন বসু, বার-এট্-ল	,,
,, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	,,
,, নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ	,,
,, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কোন্নগর
,, গোপালদাস চৌধুরী	দিল্লী
শ্রীযুক্তা বীণা সেন	যাদবপুর
,, সরলা দেবী	কলিকাতা
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	কলিকাতা
,, নলিনীমোহন সান্ন্যাল,	শান্তিপুর
,, রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর	বাঁকুড়া
,, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	কলিকাতা
,, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,

১৩। গত উনবিংশ অধিবেশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া জানাইলেন যে, এই উনবিংশ অধিবেশনের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহান্তে প্রায় ১২০৲ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল; অভ্যর্থনা-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর বঙ্গভাষায় যে সকল প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে এবং যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ঐ উদ্বৃত্ত টাকা অর্পণ করা হইবে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও কিছু অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সভাপতি মহাশয় এই কার্য্যবিবরণ এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদবাবুর প্রস্তাব গৃহীত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

১৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত যে-সকল সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার নিম্নোক্ত তালিকা পাঠ করিলেন।

১৩৩৭—রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ সেন, মহেশচন্দ্র ঘোষ, হরিশচন্দ্র নিয়োগী।

১৩৩৮—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়, সতীশচন্দ্র রায়, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মিত্র, হরিহর শাস্ত্রী, বরদাপ্রসাদ বসু, শিবচন্দ্র শীল।

১৩৩৯—স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, হরিদাস সাহা, নিখিলনাথ রায়, দুর্গাদাস লাহিড়ী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, কবিরাজ সত্যচরণ সেন।

১৩৪০—কামিনী রায়, প্রমথনাথ বসু, ডক্টর অভয়কুমার গুহ, মোজাম্মেল হক্, জগদানন্দ রায়, প্রবোধচন্দ্র দে, কুমুদনাথ লাহিড়ী, অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৩৪১—প্রিয়ম্বদা দেবী, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, রায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, অতুলপ্রসাদ সেন, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কুমুদনাথ চৌধুরী, পুলিনবিহারী দত্ত, ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, হরিদাস হালদার, দ্বিজদাস দত্ত, ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মিত্র, অমূল্যকুমার বসু, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

১৩৪২—স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সন্তদাস ব্রজবিদেহী, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রলাল রায়, কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রামেশ্বর সেন, সত্যচরণ শাস্ত্রী।

১৩৪৩—স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ভাগবত কুমার শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, ওয়াহেদ হোসেন, স্যর কেদারনাথ দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর, পূরণচাঁদ নাহার, ডক্টর পঞ্চানন মিত্র, অবিনাশচন্দ্র দাস, কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, সত্যেন্দ্রকুমার বসু, ভূপেন্দ্রলাল দত্ত, বিমলকান্তি ঘোষ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, হরলাল মজুমদার, গুরুদাস রায়, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, লুৎফর রহমান্।

সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ এবং দর্শকগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃতব্যক্তির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

১৫। অতঃপর সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (অভিভাষণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল)

১৬। ইতিহাস-শাখার সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "ভারতে ফরাসী প্রভাব" শীর্ষক তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (অভিভাষণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল)

১৭। কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের রচিত "আজি গো মা তোর চরণে জননী......" গানটি গীত হইল।

১৮। স্যর শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল মহাশয় প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পূর্ব্বে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি "জাহ্নবী নিবাসে"র নিম্নতলে সজ্জিত প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন।

অতঃপর সাধারণ সভার প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হইল।

প্রীতি-সম্মিলনী

সম্মিলনের প্রতিনিধিগণ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ের সুবিধার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি জাহ্নবী নিবাসের প্রাঙ্গনে ও উপরের গৃহে অপরাহ্ণ ৫টার সময় এক প্রীতি-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় আট শত ব্যক্তি এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি

এই দিন সন্ধ্যা ৬টার সময় সভামণ্ডপে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও পরিচালন সমিতির সভ্যেরা এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় সম্মিলন পরিচালন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ও সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবার জন্য অনেকগুলি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

সান্ধ্য সম্মিলনী

সময় ৭॥০টা য় সময় নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত কৌতুকাভিনয় নৃত্য প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস

১০ই ফাল্গুন ১৩৪৩, (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭) সোমবার

প্রাতঃকাল হইতেই প্রবলবেগে বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঝড় আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত সভামণ্ডপ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়, অন্যান্য ছোট ছোট মণ্ডপ-গুলিও পড়িয়া যায়। সেই কারণে অধিবেশনের বিলম্ব হইয়া যায়। এই দিবস প্রাতঃকালে ৯॥০ সময় সাহিত্য ও ইতিহাস শাখার অধিবেশন জাহ্নবী নিবাসের দুইটি প্রকাণ্ড ঘরে হয়।

সাহিত্য-শাখা

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইলে পর সভাপতি প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

১।	সাহিত্য	শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ।
২।	বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য কি দীনদশাগ্রস্ত ?	শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার।
৩।	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীজহরলাল বসু।
৪।	বাঙ্গালার নাটক ও নাট্যশালা	শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন।
৫।	বাঙ্গলা অনুবাদ সাহিত্য	শ্রীদুর্গামোহন মুখোপধ্যোয়।
৬।	লীলাকীর্ত্তন	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৭।	নামরহস্য	শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য।

ইতিহাস শাখা

এই শাখায় স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন এবং নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইলে পর, তিনি প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

১।	ভারতযুদ্ধের সময়	শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন
২।	প্রাচীন ভারতের ক্রীড়া-কৌতুক	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
৩।	শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-পথ	শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
৪।	ক্ষৌণীনায়ক ভীম	শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ
৫।	টীপুসুলতানের লাইব্রেরী	শ্রীনক্ষত্রলাল সেন

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সময়াভাবে ও লেখকগণ উপস্থিত না থাকায় পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১।	ইতিহাসের ধারা	ডাঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২।	আদিশূর	শ্রীপ্রমোদাচরণ পাল
৩।	কৌটিল্যের দুর্গ	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪।	বঙ্গীয় ছত্রীসমাজ	শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ
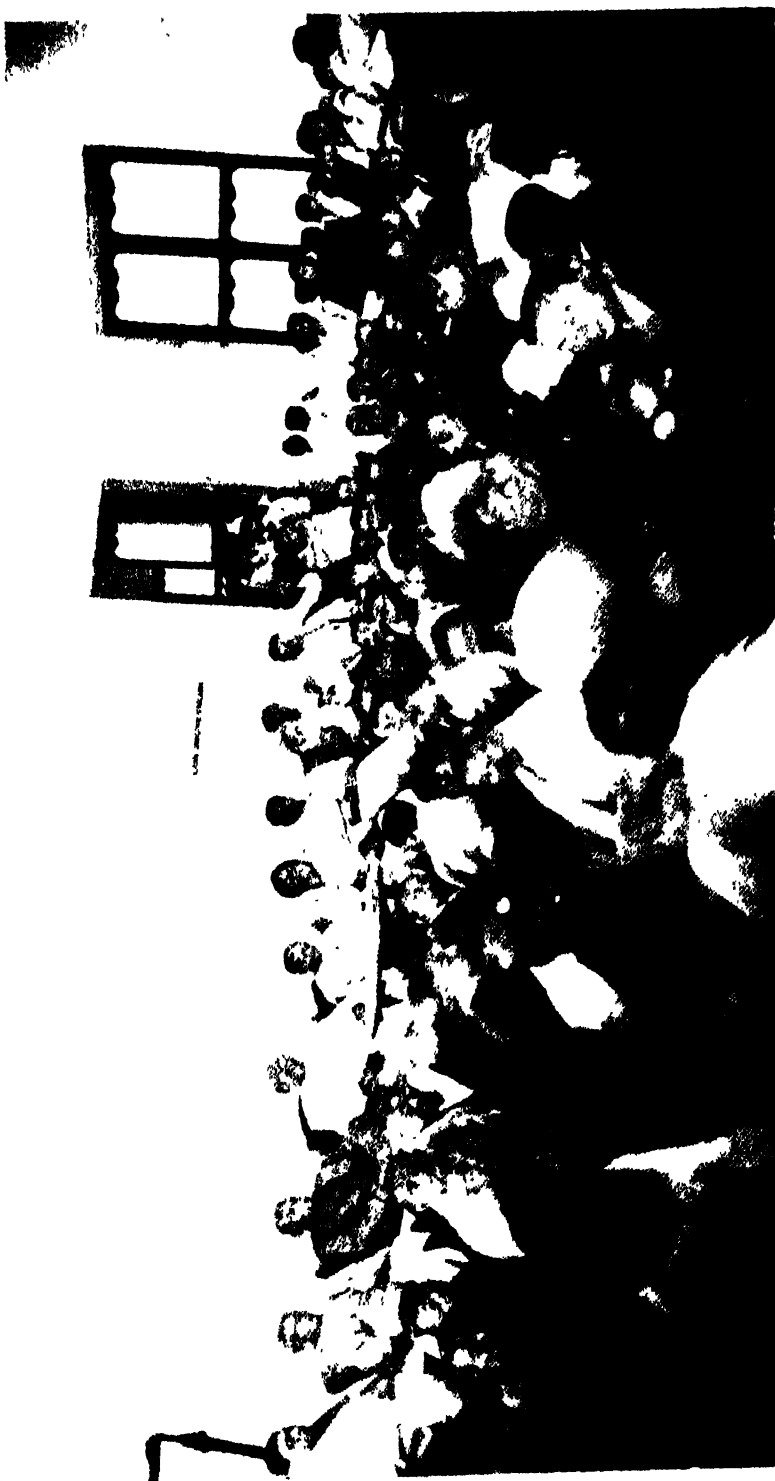
জাহ্নবী নিবাসের প্রকোষ্ঠে দ্বিতীয় দিনের সাধারণ অধিবেশন।

সাধারণ অধিবেশন

স্থান—'জাহ্নবী নিবাস', চন্দননগর

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সভাস্থলে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য, প্রতিনিধি ও দর্শক লইয়া চার শতের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

সভারম্ভ হইলে নিম্নলিখিত শাখার সভাপতিগণ তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

(ক) **বিজ্ঞান-শাখা**—ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ—"বর্ত্তমান সভ্যতায় জৈব রসায়নের স্থান"।

(খ) **কথা-সাহিত্য-শাখা**—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মহাশয়ের অভিভাষণ।

(গ) **কাব্য-সাহিত্য-শাখা**—শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়ের অভিভাষণ—"কবি ও কাব্য"।

(ঘ) **চিকিৎসা-শাখা**—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের অভিভাষণ।

(ঙ) **সুকুমার কলা-শাখা**—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ।

(চ) **অর্থনীতি-শাখা**—ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিবেশন "বাংলার অধোগতি ও অব্যবস্থা"।

(ছ) **শিশুসাহিত্য-শাখা**—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের অভিভাষণ—"শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।"

(জ) **সাংবাদিক-সাহিত্য-শাখা**—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ—"সাংবাদিকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য"।

কথা, চিকিৎসা ও বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হয়। কাব্যশাখা সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহোদয়ার সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

১। পাঠীর মামলা—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বঙ্গ জননী—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

৩। মানুষ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

৪। রাজহংস—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

৫। প্রাচীন বংলা কাব্যে বাদ্যযন্ত্র—শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

৬। কবি প্রতিভা—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য

৭। বাউল গানের ছোরানী—মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন

৮। জীবন ও কবিতা—শ্রীবিভূতিভূষণ বাগ্‌চী

৯। সাহিত্যের মাপকাটি—শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। দুই দিক—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

১১। সোমড়ার বাউল কবি—শ্রীব্রজমাধব রায়

১২। কাব্য বিচারের নিকষ পাথর—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

১৩। কবিতা—শ্রীসজনীকান্ত দাস

১৪। প্রার্থনা—শ্রীযুক্তা উমা দেবী

কথা-সাহিত্য শাখা

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

১। বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যে ত্রি-শঙ্কট—শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

২। অতি আধুনিকতম গল্প—'বনফুল'

৩। অতি আধুনিক উপন্যাস—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। সাহিত্য ও প্রগতি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

বিজ্ঞান শাখা

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই শাখার অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়।

১। বাঙ্গালা মাসের দিন সংখ্যা স্থিরীকরণ—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী

২। বাঙ্গালায় নূতন সমাজ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৩। ফলিত জ্যোতিষের সত্যতার প্রমাণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। হিন্দু জ্যোতিষের বর্ত্তমান অবস্থা—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র

৫। ভারতযুদ্ধকাল সম্বন্ধে মহাভারতীয় প্রমাণ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সময়াভাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

১। বৈজ্ঞানিকের চশমা—ডাঃ ক্ষেত্রমোহন বসু

২। জড়বিজ্ঞান ও নিসর্গ—ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

৩। সংখ্যা বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীশুভেন্দুশেখর বসু

৪। ফলিত জ্যোতিষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী

চিকিৎসা শাখা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়।

১। স্বাস্থ্য বা জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন—ডাক্তার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২। পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা—ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩। যক্ষ্মা ও তাহার আশু নিবারণ—ডাঃ রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়

৪। জ্বর নির্ব্বিশেষে প্রাথমিক চিকিৎসার ইঙ্গিত—ডাঃ মণিমোহন মুখোপাধ্যায়

৫। আয়ুর্ব্বেদে খাদ্যবিজ্ঞান—কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায়

৬। দুষ্ট ব্রণ—হরেন্দ্রচন্দ্র সেন শর্ম্মা

আমোদ-প্রমোদ

রাত্রি ৭॥০ টার সময় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে গোন্দলপাড়ায় সঙ্গীত সম্মিলনের সভ্যেরা 'নকল পাঞ্জাবীর' অভিনয় করিয়া প্রতিনিধিগণকে আনন্দ দিয়াছিলেন।

ইহার পর জাহ্নবী নিবাসের প্রাঙ্গণে সমবেত প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের লইয়া একটি আলোকচিত্র তোলা হয়। এই প্রতিলিপি স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

তৃতীয় দিবস

১১ই ফাল্গুন ১৩৪৩, (২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭), সোমবার।

এই দিবস প্রাতঃকালে সাহিত্য, শিশু-সাহিত্য ও অর্থনীতি শাখার অধিবেশন জাহ্নবী নিবাসে হইয়াছিল। অপরাহ্নে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে দর্শন ও সুকুমারকলা শাখার অধিবেশন হয়। এই সকল সভার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

সাহিত্য শাখা

প্রাতে ৮॥০ টার সময় এই শাখার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মহোদয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

১। প্রাচীনতম বঙ্গীয় মুস্‌লিম সাহিত্য—ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক্

২। গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ

৩। বাংলা শব্দাভিধানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

৪। বাংলা বুলির আপন পুঁজি—ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৫। সাহিত্য শব্দের অর্থ—শ্রীঅন্নদাচরণ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ

সময়াভাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১। সাহিত্যের প্রেরণা—শ্রীমণিলাল ভট্টাচার্য্য

২। প্রচীন ভারতীয় নাট্যকলা—ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৩। নিবেদন—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৪। বাংলাসাহিত্যে গ্রন্থসম্পাদনা—শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

৫। সাহিত্যে রসো বৈ সঃ—শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ

৬। মেঘদূতের জন্মকথা—শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

৭। বঙ্গীয় গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব—শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ

৮। বাঙ্গালা ভাষার লিখন ও পঠন—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

৯। বানান সমস্যা—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

শিশুসাহিত্য শাখা

বেলা ১০টার সময় এই শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়।

১। শিশুসাহিত্য ও প্রাথমিক শিক্ষা—শ্রীরামেন্দ্রকুমার সান্ন্যাল

২। ঘুমপাড়ানি গান—শ্রীঅখিল নিয়োগী

৩। বাঙ্গালার প্রথম শিশুসাহিত্য—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

৪। তরুণের বীরপূজা—শ্রীপ্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১। শিশুসাহিত্যের স্বরূপ—শ্রীহরিপদ মাইতি

২। স্নেহের জয়—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

ত্র্যম্বকলাল এম শুকলা এবং কাঞ্জিলাল এম শুকলা দুইজন গুজরাটি ভদ্রলোক গুজরাটের শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিশু-সাহিত্য প্রসঙ্গে পূর্ব্বে শিশু ও বৃদ্ধ সকলেরই উপযোগী রামায়ণ ও মহাভারতের কথা, পরবর্ত্তীযুগে রামমোহন রায়ের লেখা, বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত শিশুদের উপযোগী লেখা ও বর্ত্তমান যুগের শিশুদের জন্য লেখা মাসিকপত্র ও পুস্তকের উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক অনেক স্থলেই অপাঠ্য ও সেজন্য টেক্সট বুক কমিটির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

অর্থনীতি শাখা

বেলা ১ টার সময় এই শাখার সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়।

১। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং—শ্রীঅনাথগোপাল সেন

২। অর্থশাস্ত্রে যুগান্তর—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সময়াভাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়

১। বাঙ্গালা সাহিত্যে অর্থশাস্ত্র—শ্রীপ্রমথরঞ্জন দত্ত

২। বৃহত্তর বাংলা ও বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের স্বরূপ—ডাক্তার গুরুদাস রায়

দর্শন শাখা

অপরাহ্ণ ২॥০ টার সময় নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে দর্শন শাখার কার্য্যারম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত এই শাখার নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করেন। (অভিভাষণ স্থানান্তরে মুদ্রিত হইয়াছে) তৎপরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়।

১। প্রাচীন বেদান্ত — শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

২। বুদ্ধদেব, খৃষ্ট ও শ্রীগৌরাঙ্গ — শ্রীঅমৃতলাল বিদ্যারত্ন

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১।	কঃ পন্থাঃ	শ্রীহরিসত্য ভট্টাচায্য
২।	আশাবাদ	শ্রীনলিনীমোহন সন্ন্যাল
৩।	সুখদুঃখ	শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র
৪।	হিন্দু জাতির অধঃপতনের কারণ	ডাঃ যদুনাথ সিংহ

সুকুমার কলা

দর্শন শাখার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুকুমার কলা শাখার কার্য্যারম্ভ হয়। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়।

১।	রূপসৃষ্টি ও আত্মবিকাশ	শ্রীবসন্তকুমার আঢ্য
২।	সিন্ধু সভ্যতা যুগের একটি দগ্ধ মৃন্মূর্ত্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দাসগুপ্ত
৩।	একটি দগ্ধ মৃন্ময় পট্টে অঙ্কিত রামায়ণের একটি ঘটনা	ঐ
৪।	প্রাচীন ভারতে চিত্রকলা	শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ
৫।	অজন্তার কথা	শ্রীমৃণালকুমার ঘোষ

বানান বিতর্ক সভা

এই শাখার কায্য শেষ হইলে ডাক্তার মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বানান বিতর্ক সভার কার্য্যারম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ শেষ করিয়া একপক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ও অন্যপক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়কে প্রচলিত বানান পদ্ধতির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করিতে আহ্বান করিলেন। এই সভায় তর্ক বিতর্কের ফলে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় যে বানান পদ্ধতির পরিবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছিল তাহা কি এবং তাহাদের সুবিধা অসুবিধা কি হইতে পারে তাহা সহজেই সকলের বোধগম্য হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান শাখা সমিতির পক্ষ হইতে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন নাই সুতরাং যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করা হইল, সেগুলি সম্বন্ধে আগামী অধিবেশনে আলোচনা করা হইবে। তিনি সভাপতি মহাশয়কেও অন্যান্য বক্তাদের সেই সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন।

সভাপতি ও বক্তাদের ধন্যবাদ দেওয়া হইলে এই সভায় কায্য শেষ হইয়া সাধারণ অধিবেশনের কায্য আরম্ভ হয়—

সাধারণ অধিবেশন

স্থান—নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির, চন্দননগর।

সময়—১১ই ফাল্গুন, ১৩৪৩, ২৩এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪৷৷০ টা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১। সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে ডক্‌টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিলেন,—

প্রথম প্রস্তাব—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন 'রমেশ ভবন' সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সাহায্য করিতে সমগ্র ভারতবাসী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী ও স্বর্গীয় মহাত্মার গুণমুগ্ধ ব্যক্তি মাত্রকেই এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও প্রচারণ-(circulating) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসি-পালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং ইংরেজী স্কুল ও কলেজ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারের উপযুক্তসংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি উচ্চ, কি নিম্ন সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বঙ্গভাষায় অধ্যাপনা করিতে, ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(খ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী, পার্শী ও ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঙ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার-সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বঙ্গভাষায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন এবং আশা করিতেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও অচিরে এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট্ ও সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশন এর নিকট প্রেরিত হউক।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব—

বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষিকথা, ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার প্রাদেশিক শব্দ এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসর প্রথম বঙ্গভাষায় লিখিত প্রবন্ধের জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয়কে 'ডক্টর' উপাধি দিয়া এবং বিশ্বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে, বঙ্গভাষায় বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়া বঙ্গভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য এই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

সপ্তম প্রস্তাব—

এই সম্মিলন স্থির করিতেছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য সুষ্টুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

অষ্টম প্রস্তাব—

আলোচনাকারীদিগের আলোচনা ও গবেষণা করিবার সুবিধার জন্য প্রতিবর্ষে বাঙ্গালার সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, ভাষাতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ও প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা প্রতি বৎসর মুদ্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সম্মিলন এই সকল বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন একটি সমিতি গঠন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

নবম প্রস্তাব—

এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ব্রিটিশ শাসন যুগের প্রথম শত বৎসরের সরকারী ঐতিহাসিক উপাদান যাহা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ আকারে একমাত্র Proceedings of the Council of Fort William (Political and for Secret) নামক হস্তলিখিত গ্রন্থমালায় গ্রথিত আছে, ঐগুলি কলিকাতা হইতে দিল্লী লইয়া যাওয়ায় বঙ্গবাসীদের পক্ষে নিজ প্রদেশের ইতিহাস, সমাজ ও নব্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করা অতি কঠিন ও ব্যয়-সাধ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রীষ্মাবকাশকালে দিল্লীতে গবেষণা বা কঠিন পরিশ্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর। এইজন্য এই সম্মিলন ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করিতেছেন যে, জ্ঞান-চর্চ্চার সহায়তার উদ্দেশ্যে তাঁহারা ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত (নিতান্ত পক্ষে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত) ঐ গ্রন্থমালা দিল্লীর স্থলে কলিকাতায় রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করুন এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দপ্তরের অঙ্গীভূত করুন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

সমর্থক— „ অনাথবন্ধু দত্ত

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

দশম প্রস্তাব—

এই সম্মিলনের মতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের সংস্কার সম্পর্কে ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া সমীচীন কার্য্য করিয়াছেন। সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন যেন তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত অনুসারে পুনর্ব্বিচার করেন।
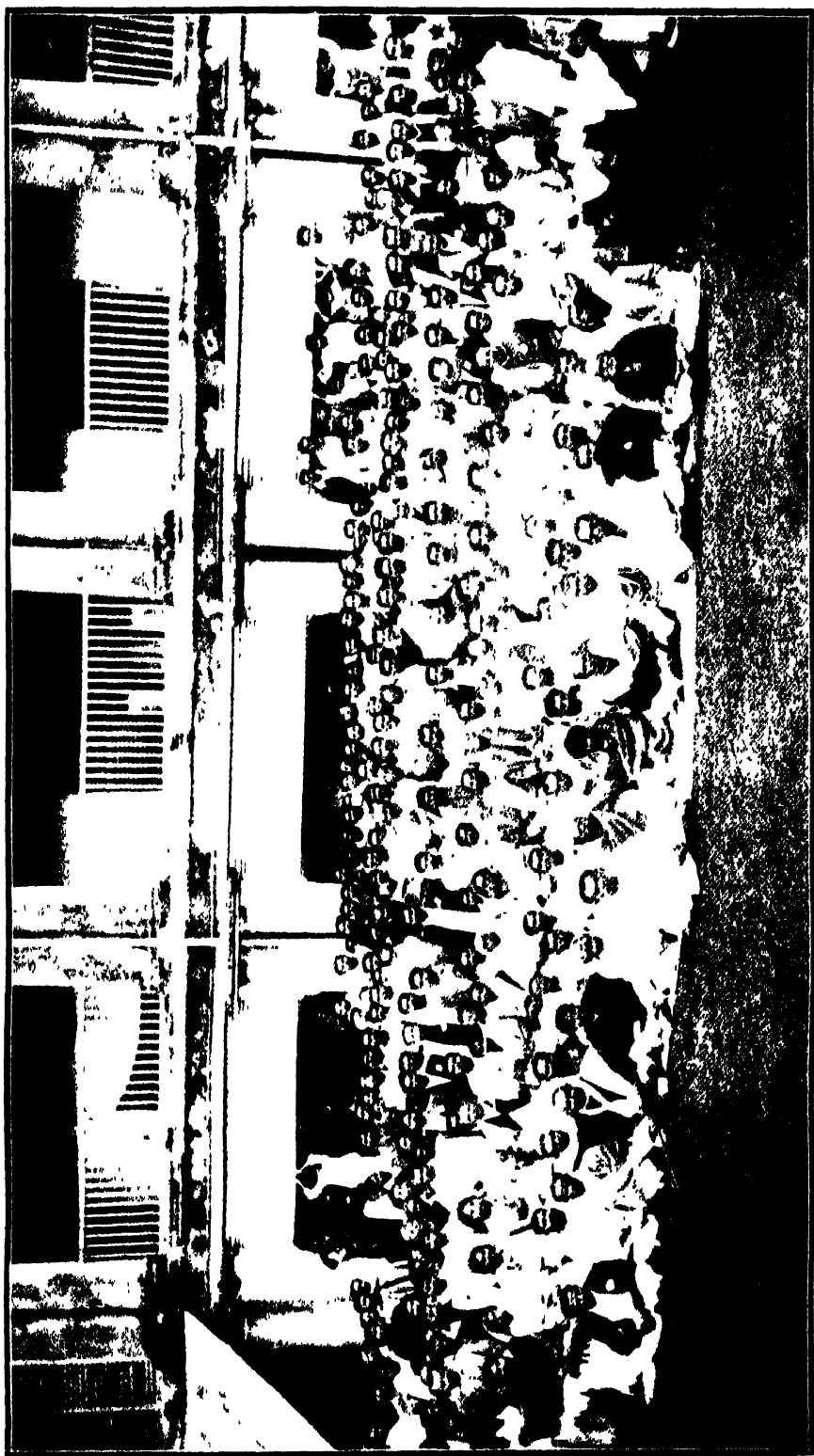
সাহিত   ম্মলনের সভ   তি, প্রতিনিধি ও অভ   র্থনা সমিতি   সভ্যগণ

প্রস্তাবক—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

একাদশ প্রস্তাব—

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একজন বিখ্যাত সংস্কারক এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। এই সম্মিলন কলিকাতা করপোরেশনকে অনুরোধ করিতেছেন যে কলিকাতা সহরের কোনও একটি রাস্তা ও পার্ক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামে পরিচিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব—

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব। ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় জানাইলেন যে, সম্মিলনের যে নিয়মাবলী রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হওয়ায় সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি, কি ভাবে এই নিয়মাবলীর সংস্কার করা যাইতে পারে তাহার খসড়া করিবার ভার একটি শাখা-সমিতির উপর অর্পণ করেন। শাখা সমিতি এই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্ব দিনে তাঁহাদের মন্তব্য দিয়াছেন এবং তাহা সেই রাত্রেই মুদ্রিত করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর খসড়া উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে আলোচনার পর নিম্নোক্ত নিয়মাবলী গৃহীত হইল,—

১। এই সম্মিলন 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন' নামে অভিহিত হইবে এবং ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোডস্থিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে ইহার রেজিষ্টারীকৃত কার্য্যালয় থাকিবে। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি আবশ্যক হইলে কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন।

২। বিভিন্ন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এবং অন্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ ইহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

৩। নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর সদস্য লইয়া এই সম্মিলন গঠিত হইবে—

(ক) সাধারণ-সদস্য—যাঁহারা বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা চাঁদা দিবেন।

(খ) সাময়িক-সদস্য—৯ম নিয়মাধীনে অনুষ্ঠিত সম্মিলনে প্রতিনিধিরূপে অথবা সাহিত্যানুরাগিরূপে যাঁহারা বার্ষিক ২৲ দুই টাকা চাঁদা দিবেন।

(গ) ছাত্র-সদস্য—যাঁহারা ছাত্র এবং বার্ষিক ১৲ এক টাকা চাঁদা দিবেন।

ইহাদের মধ্যে সাধারণ ও সাময়িক-সদস্যগণ সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠ করিবার ও প্রস্তাবাদিতে ভোট দিবার অধিকার পাইবেন। তাঁহারা সম্মিলনের মুদ্রিত বিবরণ ও অন্যান্য পুস্তকাদি বিনামূল্যে পাইবেন। ছাত্র সদস্যগণ সম্মিলনে পাঠার্থ প্রবন্ধাদি কোন সাধারণ

বা সাময়িক-সদস্যের দ্বারা পাঠাইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহারা মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণ প্রভৃতি বিনামূল্যে পাইবেন না।

৪। যাঁহারা এককালে ১০০৲ এক শত টাকা দান করিবেন, তাঁহারা আজীবন সাধারণ-সদস্যরূপে পরিগণিত হইবেন।

৫। ৩য় ও ৪র্থ নিয়মানুসারে প্রাপ্ত সমস্ত চাঁদা সম্মিলন-সাধারণ-সমিতির প্রাপ্য।

৬। সম্মিলনের যাবতীয় কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য "সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি" নামে একটী সমিতি থাকিবে। সাধারণ-সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা আষাঢ় মাসের মধ্যে ৩৲ তিন টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহারাই এই সম্মিলন-সাধারণ-সমিতির সদস্য হইবেন। সম্মিলনের সভাপতি পরবর্ত্তী অধিবেশন পর্য্যন্ত এই সমিতির সভাপতি থাকিবেন এবং সম্মিলনের শেষ বৈঠকে নির্ব্বাচিত একজন সম্পাদক ও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক - এই দুইজন সম্পাদক হইবেন এবং ঐ বৈঠকে একজন কোষাধ্যক্ষও নির্ব্বাচিত হইবেন।

৭। এই সম্মিলন-সাধারণ-সমিতির সদস্যগণ ২০ জন সাধারণ সদস্য লইয়া সম্মিলনের কার্য্যপরিচালন করিবার জন্য "সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি" নামে এক সমিতি গঠন করিবেন। ঐ সমিতি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইবে।

(ক) সভাপতি—গত সম্মিলনে নির্ব্বাচিত।

(খ) সহকারী সভাপতি—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি।

(গ) সম্পাদকদ্বয়—সাধারণ-সমিতির সম্পাদকদ্বয়।

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ—গত সম্মিলনে নির্ব্বাচিত।

(ঙ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৫ জন সদস্য।

(চ) ১০ জন নির্ব্বাচিত সদস্য। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন মফঃস্বলের সদস্য।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের মধ্যে সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির এক অধিবেশনে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির ঐ ১০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনকাল পর্য্যন্ত ইঁহারা কার্য্য করিবেন।

৮। উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে কেহ সাধারণ-সমিতির সদস্য না থাকিলে তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকিতে পারিবেন না এবং মৃত্যু, পদত্যাগ প্রভৃতি কারণে কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে তাঁহার স্থলে পরিচালন-সমিতি অন্য কাহাকেও নির্ব্বাচিত করিবেন।

৯। এই সম্মিলনের অধিবেশন প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। সাধারণতঃ অধিবেশন কোন্ স্থানে কোন্ বৎসর হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে স্থির করিতে হইবে। কোন বৎসর কোন স্থান স্থিরীকৃত না হইলে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি সম্মিলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন।

১০। যে বৎসর যে স্থানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই স্থানের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ পূর্ব্বসম্মিলনের অধিবেশনের পর সম্মিলন সম্বন্ধীয় স্থানীয় সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা

সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ একটী অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবেন। তদর্থে যাবতীয় ব্যয় ঐ সমিতি নির্ব্বাহ করিবেন এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের দেয় চাঁদা গ্রহণ করিবেন। সম্মিলনের সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, অভ্যর্থনা-সমিতি ইচ্ছা করিলে তজ্জন্য পৃথক্ দেয় চাঁদা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাধারণ-সদস্য নহেন. তাঁহারা ৩ (খ) নিয়মাধীনে পৃথক্ ২৲ চাঁদা না দিলেও সাময়িক-সদস্যরূপে পরিগণিত হইবেন।

১১। অন্যূন দুই দিন সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি প্রয়োজন হয় এবং সময়ের সুবিধা থাকে, তাহা হইলে দুই দিনের অধিক দিনও অধিবেশন হইতে পারিবে . কিন্তু তাহা প্রথম হইতেই বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

১২। এই সম্মিলনের কার্য্য আলোচ্য বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত ৬ ভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে।

(ক) সাহিত্য-শাখা।
(খ) দর্শন-শাখা।
(গ) ইতিহাস-শাখা।
(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা।
(ঙ) চারুকলা-শাখা।
(চ) অর্থ ও সমাজনীতি-শাখা।

১৩। অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া অধিবেশনের মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিগণের নির্ব্বাচন করিবেন।

১৪। আবশ্যক হইলে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির প্রস্তাবক্রমে অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি এই সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে পারিবেন ; কিন্তু সে সমস্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী সম্মিলনের অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

১৫। এই সম্মিলনে বর্ত্তমান কোন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে না।

ধন্যবাদ প্রদান—

(১) প্রদর্শনীতে পুঁথি, পুস্তক, ঐতিহাসিক নিদর্শন, ছবি, শিল্পদ্রব্য, সুচীশিল্প প্রভৃতি যাঁহারা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে, বিশেষ করিয়া সাহিত্য পরিষৎ, শ্রীরামপুর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ, অ্যাড্মিনিষ্ট্রেটার মঁসিয়ে সাম্ব্ঁ মহাশয়কে,

(২) প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের অভিনয় দ্বারা আপ্যায়িত করিবার জন্য গোন্দলপাড়া সঙ্গীত সম্মিলনীর সভ্যদিগকে,

(৩) সঙ্গীতাদির জন্য শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, নারী শিক্ষা-মন্দিরের ছাত্রীগণ ও শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ স্বামীকে,

(৪) নানাভাবে সাহায্যের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ

চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফটিকলাল দাস, শ্রীযুক্ত তারাপদ দাস, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত এককড়ি সোম মহাশয়কে,

(৫) সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বিশেষ করিয়া আনন্দবাজারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে,

(৬) স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকা ও তাহাদের অধিনায়ক ও অধিনেত্রীকে,

(৭) প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মণ্ডল, শ্রীযুক্তভোলানাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে,

(৮) কাব্য শাখার সভানেত্রী ও মহিলা প্রতিনিধিদের পরিচর্য্যা-ভার গ্রহণ করার জন্য কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগকে, এবং শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতির পরিচর্য্যার ভার গ্রহণের জন্য শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক মহাশয়কে,

(৯) প্রতিনিধিগণের পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সন্তোষ চরণ শেঠ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শেঠ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়কে,

(১০) পৃষ্ঠপোষক জনৈক বন্ধু ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু, বার-এট-ল মহাশয়কে, ধন্যবাদ প্রদান—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, সম্মিলনের নিয়মানুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক এই সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক হইবেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের সম্পাদক আছেন, অতএব তিনি এই সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক হইলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, ডকটর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় সম্মিলনের কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নদীয়া-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। আনন্দের সহিত এই নিমন্ত্রণ গৃহীত হইল এবং নিমন্ত্রণের জন্য নদীয়াবাসিগণের পক্ষে নদীয়া-শাখা-পরিষৎকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে বিংশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় গভীর আন্তরিকতার সহিত এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সম্মিলনে সমুপস্থিত প্রতিনিধিগণকে, সভাপতিগণকে এবং সম্মিলনের সাফল্য সম্পাদনের জন্য যাঁহারা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে চন্দননগর অভ্যর্থনা-সমিতিকে এবং বিশেষভাবে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় সাত বৎসর পরে এই সম্মিলনের অধিবেশন সম্ভবপর হইয়াছিল।

অতঃপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

প্রতিনিধিদের বাসস্থান

কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানা স্থান হইতে যে সকল প্রতিনিধি সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়া অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য চন্দননগরের বড়বাজারের চারিটি বাড়ীতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরে স্থান করা হইয়াছিল। কিঞ্চিদধিক ৬০ জন প্রতিনিধি দিবসত্রয় অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়াদির ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে করা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইবার ও অভিনয়, গান, নৃত্য ও কৌতুকাভিনয়ের দ্বারা তৃপ্তি দিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট (ক)

অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যবিবরণ

অভ্যার্থনা-সমিতির সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী অধিবেশন হইয়াছিল। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সালের প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়। ১৩ই ডিসেম্বর তৃতীয় অধিবেশনে কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয় এবং সমিতির একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। ঐ সভাতেই ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে তিন দিন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হইবে স্থির হয়। ঐ সম্মিলনের সহিত চন্দননগরের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও সুকুমার কলা প্রভৃতির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে এবং তৎসহ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নিদর্শনও রক্ষা করা হইবে ইহাও স্থির হয়। ২০শে ডিসেম্বর চতুর্থ অধিবেশনে মূল সভার ও শাখা সভার সভাপতিদের নাম স্থির করিয়া দেওয়া হয় এবং কাব্য, কথাসাহিত্য ও শিশু-সাহিত্যের স্বতন্ত্র শাখা করা হইবে স্থির হয়। ১৭ই জানুয়ারী পঞ্চম অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হয় যে সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, ইতিহাসে স্যার যদুনাথ সরকার, দর্শনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, কাব্যে শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু, কথাসাহিত্যে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শিশুসাহিত্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চিকিৎসাবিদ্যায় শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, অর্থ-নীতিতে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও সুকুমার কলায় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিজ্ঞান সভার জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাথ সাহা উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কার্য্যানুরোধে ঐ পদ গ্রহণে অক্ষমতা জানাইয়াছেন। তাঁহার স্থলে অন্য যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিবার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর ন্যস্ত করা হইল। ঐ সভায় সভাপতি জানাইলেন যে বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মিলনের উদ্বোধন করিবেন এরূপ আশা দিয়াছেন; কিন্তু মূল সভাপতি এখনও স্থির হয় নাই। প্রতিনিধি ও দর্শকদের দেয় অর্থ এই সভায় স্থির হয়। ইহাও স্থির হয় যে যাঁহারা ২৫০৲ টাকা সম্মিলনীর অর্থ ভাণ্ডারে দান করিবেন তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

অভ্যর্থনাসমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ছয়টি অধিবেশন হয়। ৩রা জানুয়ারী প্রথম অধিবেশনে সম্মিলনে পাঠের জন্য যে সকল প্রবন্ধ আসিবে তাহাদের মধ্যে নির্ব্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে সাতটি শাখাসমিতি (সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, অর্থনীতি, সুকুমার কলা) গঠিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন ভড়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর শ্রীমানী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস ও শ্রীযুক্ত মৃণাল-কুমার ঘোষ যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, চিকিৎসা, অর্থনীতি ও সুকুমার কলা শাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাস সম্মিলনীর উনবিংশ

অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখাতে সম্মিলনীর বিংশ অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কার্য্যানুরোধে সম্পাদকের কার্য্য করিতে অক্ষমতা জানাইলে শ্রীযুক্ত নীহারকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার স্থানে সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। সম্মিলনের কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রদর্শনী, সভামণ্ডপ, আমোদ প্রমোদ, স্বেচ্ছাসেবক, অর্থসংগ্রহ, প্রচার, মহিলা এই সকল প্রত্যেক বিভাগের একটি করিয়া শাখাসমিতি গঠিত হয়। ২৪শে জানুয়ারী দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের সম্মিলনের কার্য্যধারা সম্বন্ধীয় পত্রের আলোচনা হয় এবং সভায় স্থির হয় যে বাংলা বানান সমস্যা সম্বন্ধে একটি বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করা হইবে এবং কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই বিতর্কে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। ঐ সভায় সাংবাদিকসাহিত্য বলিয়া একটি শাখারও ব্যবস্থা করা হইবে স্থির হয়। তৃতীয় অধিবেশনে (৩১শে জানুয়ারী) সম্মিলনের কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ করা হয় ও কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি আনুমানিক আয়-ব্যয়ের তালিকা গৃহীত হয়। সভাপতি সভায় জানাইয়া দেন যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল সভাপতির কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিজ্ঞান শাখার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক সাহিত্য শাখার ও ডাক্তার মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিতর্ক সভার সভাপতি স্থিরীকৃত হইয়াছেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী ৪র্থ অধিবেশনে স্থির হয় সম্মিলনে মহিলাদের কোন প্রবেশ মূল্য লওয়া হইবে না। সম্মিলনের তিন দিনের কার্য্যের ভার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত হয়। পঞ্চম অধিবেশনে মোটামুটি যাহা আয় ও ব্যয় হইয়াছে তাহা ধরিয়া আরও যে টাকার আবশ্যক তাহা সংগ্রহের ব্যবস্থা ও কার্য্য বিবরণী মুদ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সম্মিলনে পঠিত সকল প্রবন্ধই অর্থাভাবে মুদ্রিত করা সম্ভব হইবে না বলিয়া, কোন্‌গুলি বিবরণীতে স্থান পাইবে তাহা প্রত্যেক বিভাগের সভাপতিদের দ্বারা বাছিয়া লওয়া হইবে স্থির হইল।

পরিশিষ্ট (খ)

বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের

অভ্যর্থনা সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

সহঃ সভাপতি— „ মতিলাল রায়

„ যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ „ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

ডাঃ „ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দে

„ কৃষ্ণলাল দাস

কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর শ্রীমানী

সহঃ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

„ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ „ হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ „ আশুতোষ দাস

„ মৃণালকুমার ঘোষ

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

„ গুরুদাস ভড়

রায় „ দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর

„ অরুণচন্দ্র দত্ত

„ প্রমোদরঞ্জন ভড়

„ মণীন্দ্রনাথ নায়েক

„ সুবোধচন্দ্র রায়

„ যোগেন্দ্রনাথ সুর

„ বেণীমাধব দে

„ মণিলাল ভট্টাচার্য্য

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যবৃন্দ

বামদিক হইতে

দণ্ডায়মান—হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ দাস, নরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ দে, শরদিন্দু পালিত
নরেন্দ্রনাথ কড়ার, বেণীমাধব দে, নগেন্দ্রনাথ শেঠ, নীহারকুমার চট্টোপাধ্যায়।

উপবিষ্ট (চেয়ারে)—সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সন্তোষনাথ শেঠ, কৃষ্ণলাল দাস (সম্পাদক,) হরিহর শেঠ (সভাপতি,)
নারায়ণচন্দ্র দে (সম্পাদক,) যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি,) বলাইচাঁদ আঢ্য।

উপবিষ্ট—মৃণালকুমার ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ সুর, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, সুবোধচন্দ্র রায়, প্রমোদরঞ্জন ভড়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত নীহারকুমার চট্টোপাধ্যায়
" বলাইচাঁদ আঢ্য
" সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
" শিবরাম চক্রবর্ত্তী
" শরদিন্দু পালিত
" যোগেন্দ্রনাথ শেঠ
" বলাইচাঁদ দে
" সন্তোষনাথ শেঠ
ডাঃ " নরেন্দ্রনাথ কোঙার

পরিশিষ্ট (গ)

সাহিত্য শাখাসমিতি—শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় (সম্পাদক)
" যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
" বসন্তরঞ্জন রায়, বিদ্বদ্বল্লভ
" নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (কলিকাতা)
" সরোজনাথ ঘোষ "
" বিধুভূষণ সেন "
" সুবোধচন্দ্র রায় (চুঁচুড়া)

দর্শন শাখাসমিতি—শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন ভড় (সম্পাদক)
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া)
" চারুচন্দ্র বসু "
" যোগেশ্বর ঘোষ "

ইতিহাস শাখাসমিতি—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র (সম্পাদক)
ডাঃ " বিনয়চন্দ্র সেন (কলিকাতা)
" অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "
" মণিলাল ভট্টাচার্য্য চন্দননগর

বিজ্ঞান শাখাসমিতি—শ্রীযুক্ত নীহারকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক)
" যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া
" আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় চন্দননগর
ডাঃ " হৃষীকেশ রক্ষিত "
" গুরুদাস ভড় "

চিকিৎসা শাখাসমিতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় কলিঃ
শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর শ্রীমানী (সম্পাদক)
" হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
" বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
কবিরাজ " মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" " ব্রজবল্লভ রায় (চুঁচুড়া)

অর্থনীতি শাখাসমিতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস (সম্পাদক)
" প্রমথনাথ সরকার কলিকাতা
" নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র
ডাঃ " হরিশ্চন্দ্র সিংহ (কলিকাতা)

সুকুমার কলা শাখা— শ্রীযুক্ত মৃণালকুমার ঘোষ

পরিশিষ্ট (ঘ)

প্রদর্শনী শাখাসমিতি— শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
" মণীন্দ্রনাথ নায়েক
" যোগেন্দ্রনাথ সুর
" ফটিকলাল দাস

সভামণ্ডপ শাখাসমিতি—শ্রীযুক্ত তারাপদ দাস
" ফটিকলাল দাস
" বেণীমাধব দে
" যোগেন্দ্রনাথ শেঠ
" অনঙ্গকুমার সেন

আমোদ প্রমোদ শাখাসমিতি—
ডাঃ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
" সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
" হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

স্বেচ্ছাসেবক শাখাসমিতি—শ্রীযুক্ত মৃণালকুমার ঘোষ
" প্রমোদরঞ্জন ভড়
" রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" নলিনচন্দ্র দত্ত
শ্রীযুক্তা সুনীতি পাকড়াশী

অর্থ সংগ্রহ শাখাসমিতি—শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর শ্রীমানী
" সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
" সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
" সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বলাইচাঁদ দে

প্রচার শাখা বিভাগ—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য
" সুবোধচন্দ্র রায়
" অরুণচন্দ্র দত্ত
" নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহিলা বিভাগ—শ্রীযুক্তা নীহারিকা মল্লিক
" প্রতিমা দেবী

পরিশিষ্ট (ঙ)

পৃষ্ঠপোষকগণ।

১।	শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু বার-অ্যাট-ল,	কলিকাতা	২০০৲
২।	জনৈক বন্ধু	চন্দননগর	১০৫০০৲

এককালীন দান।

১।	শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৲
২।	ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া)	২৫৲
৩।	মঃ সাম্বর্ঁ এড্‌মিনষ্ট্রেটর (চন্দননগর)	৪৲
৪।	শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মণ্ডল (চন্দননগর)	২৫৲
৫।	„ ভূজঙ্গেশ্বর শ্রীমানী (চন্দননগর)	১০৲
৬।	„ নবদ্বীপচন্দ্র মণ্ডল (চুঁচড়া)	১০৲
৭।	„ সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর)	৫০৲
৮।	„ যতীন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা)	১০৲
৯।	„ জ্যোতিষচন্দ্র শেঠ (কলিকাতা)	৩৲
১০।	„ বেণীমাধব দে (চন্দননগর)	৩৲
১১।	" কানাইলাল গোস্বামী (শ্রীরামপুর)	২০৲
১২।	„ বলাইচাঁদ গোস্বামী „	১০৲
১৩।	" নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র (চন্দননগর)	৫০৲
১৪।	„ সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া)	৫০৲
১৫।	" পূর্ণচন্দ্র দাস	২৫৲
১৬।	" যোগেশ্বর শ্রীমানী	২৫৲
১৭।	" শিবরাম শেঠ	১০৲
১৮।	ডাঃ বিমলাচরণ লাহা (কলিকাতা)	১০০
১৯।	„ সত্যচরণ লাহা „	৫০
২০।	„ বারীদবরণ মুখোপাধ্যায় –	১০

পরিশিষ্ট (চ)

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ — চন্দননগর
২। ,, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ,,
৩। ,, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ,,
৪। ,, ভোলানাথ নন্দী — ,,
৫। ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ — ,,
৬। ,, হরিদাস মোদক — ,,
৭। ,, শরদিন্দু পালিত — ,,
৮। ,, ফটিকলাল দাস — ,,
৯। ডাঃ ভাগিরথী ঘোষ — ,,
১০। শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দে — ,,
১১। ,, কৃষ্ণচন্দ্র পাল — ,,
১২। ,, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ — ,,
১৩। ,, ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় — ,,
১৪। ,, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় — ,,
১৫। ,, লালমোহন পাল — ,,
১৬। ,, নারায়ণচন্দ্র দে — ,,
১৭। ,, জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — ,,
১৮। ,, সন্তোষকুমার ভড় — ,,
১৯। ,, সুশীলকুমার পালিত — ,,
২০। ডাঃ হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় — ,,
২১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস — ,,
২২। ,, যোগেশ্বর শ্রীমাণী — ,,
২৩। ,, ভূষণচন্দ্র পাল — ,,
২৪। ,, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য — ,,
২৫। ,, কালীপ্রসন্ন বসু — ,,
২৬। ,, সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় — তেলিনীপাড়া
২৭। ,, মণীন্দ্রনাথ নায়েক — চন্দননগর
২৮। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় — চন্দননগর
২৯। ,, কৃষ্ণলাল দাস — ,,
৩০। ,, যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায় — ,,
৩১। ,, নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — ,,
৩২। ,, সন্তোষনাথ শেঠ — ,,
৩৩। ,, মৃণালকুমার ঘোষ — ,,
৩৪। ,, বগলাচরণ চট্টোপাধ্যায় — ,,
৩৫। ,, যতীন্দ্রনাথ বসু — ,,
৩৬। ,, প্রমোদরঞ্জন ভড় — ,,
৩৭। , সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় — ,,
৩৮। ,, সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় — ,,
৩৯। ,, ভুজঙ্গেশ্বর শ্রীমাণী — ,,
৪০। ,, নীহারকুমার সেন — ,,
৪১। ,, শিবরাম চক্রবর্ত্তী — ,,
৪২। ,, বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় — ,,
৪৩। ,, বেণীমাধব দে — ,,
৪৪। ,, গুরুদাস ভড় — ,,
৪৫। ,, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় — ,,
৪৬। ,, ননীলাল দে — শ্রীরামপুর
৪৭। ,, নৃত্যপ্রসন্ন বিশ্বাস — ভদ্রেশ্বর
৪৮। ,, হরিসাধন পাল — তেলিনীপাড়া
৪৯। ডাঃ হীরালাল ভড় — চন্দননগর
৫০। শ্রীযুক্তা নীহারিকা মল্লিক — ,,
৫১। ,, সুনীতি পাকড়াশী — ,,
৫২। গ্রন্থাধ্যক্ষ, প্রবর্ত্তক-সংঘ গ্রন্থাগার — ,,
৫৩। শ্রীযুক্ত শিবরাম দে — ,,
৫৪। ডাঃ বীজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ,,
৫৫। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র খাঁ — মানকুণ্ডু

৫৬। শ্রীযুক্ত বনবিহারী মণ্ডল চন্দননগর
৫৭। ,, নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া
৫৮। ,, হৈমীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গড়বাটী
৫৯। ,, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক চন্দননগর
৬০। ,, মণিলাল ভট্টাচার্য্য ,,
৬১। ,, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ,,
৬২। ,, রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় ,,
৬৩। ,, মুণীন্দ্র দেবরায় কলিকাতা
৬৪। ,, বৃন্দাবন বসু চন্দননগর
৬৫। ,, যোগেন্দ্রনাথ শেঠ ,,
৬৬। ডাঃ অচিন্ত্যপ্রসাদ বসু ,,
৬৭। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় ,,
৬৮। ,, হরিহর চন্দ্র কলিকাতা
৬৯। ,, প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় গড়বাটী
৭০। ,, সুকুমার দত্ত শ্রীরামপুর
৭১। ,, রমেশচন্দ্র মিত্র চন্দননগর
৭২। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোঙার ,,
৭৩। ,, বলাইচাঁদ আঢ্য চুঁচুড়া
৭৪। ,, পাঁচুগোপাল নিয়োগী গড়বাটী
৭৫। ,, তারাপদ দাস চন্দননগর
৭৬। ,, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ,,
৭৭। ডাঃ বীরেশ্বর দে ,,
৭৮। ,, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
৭৯। ,, চণ্ডীচরণ সুর চন্দননগর
৮০। ,, কুমারেন্দ্র দেবরায় ,,
৮১। ,, মাণিকলাল বড়াল ,,
৮২। ,, শিবরাম শেঠ ,,
৮৩। ,, ভগবতীচরণ কুণ্ডু খামারপাড়া
৮৪। ,, সাতকড়ি সুর চন্দননগর
৮৫। ,, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
৮৬। ,, পূর্ণচন্দ্র দাস চন্দননগর
৮৭। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী চন্দননগর
৮৮। ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
৮৯। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পালিত চন্দননগর
৯০। ,, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ,,
৯১। ,, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় চন্দননগর
৯২। ,, শরদিন্দুনারায়ণ রায় ত্রিবেণী
৯৩। ,, ললিতমোহন কর গোরক্ষপুর
৯৪। ,, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
৯৫। ডাঃ বলাইচাঁদ শীল চন্দননগর
৯৬। শ্রীযুক্ত যুগোলকিশোর দে চন্দননগর
৯৭। ডাঃ এম্ গাঙ্গুলী তেলিনীপাড়া
৯৮। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় চন্দননগর
৯৯। ,, সুধীরচন্দ্র রায় চুঁচুড়া
১০০। ,, সুবোধচন্দ্র রায় ,,
১০১। ,, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চন্দননগর
১০২। ডাঃ মহেন্দ্রলাল রক্ষিত ,,
১০৩। ,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
১০৪। ,, অমূল্যচরণ মৈত্র ,,
১০৫। ,, সুধাংশুমোহন দাস ,,
১০৬। ডাঃ মণিমোহন মুখোপাধ্যায় ,,
১০৭। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ নন্দী সাহাগঞ্জ
১০৮। ,, নলিনচন্দ্র দত্ত চন্দননগর
১০৯। ,, অরুণচন্দ্র দত্ত ,,
১১০। ,, মতিলাল রায় ,,
১১১। ,, নীহারকুমার চট্টোপাধ্যায় গড়বাটী
১১২। ,, কমলপ্রসাদ ঘোষ চন্দননগর
১১৩। ,, শৈলেন্দ্র নাথ পাল ,,
১১৪। ,, বেনোয়ারী লাল সাহা ,,
১১৫। ডাক্তার সূর্য্যকান্ত বসু ,,
১১৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভড় ,,

১১৭। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া
১১৮। " পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় চন্দননগর
১১৯। " যতীশচন্দ্র পাল "
১২০। " সুরেন্দ্রনাথ বসু "
১২১। " বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়া
১২২। " দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিল্লী
১২৩। ডাঃ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
১২৪। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "
১২৫। " মনোরঞ্জন দত্ত চন্দননগর
১২৬। " রামচন্দ্র কুমার "
১২৭। " ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা
১২৮। " যোগেন্দ্রনাথ সুর চন্দননগর
১২৯। " বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় "
১৩০। " অমূল্যচরণ দত্ত চুঁচুড়া
১৩১। " মনোরঞ্জন শেঠ চন্দননগর
১৩২। " প্রফুল্লধন ভড় "
১৩৩। ধ্যানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া
১৩৪। হরিহর চট্টোপাধ্যায় গোন্দলপাড়া
১৩৫। " খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া
১৩৬। " তিনকড়ি সুর চন্দননগর
১৩৭। " গৌরচন্দ্র সুর "
১৩৮। " মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "
১৩৯। " অক্ষয়কুমার মণ্ডল "
১৪০। " নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু "
১৪১। " মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত "
১৪২। " চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "
১৪৩। " প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় "
১৪৪। " সত্যেন্দ্রনাথ পালিত রামপুরহাট
১৪৫। " সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চন্দননগর
১৪৬। " পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "
১৪৭। " কামদাচরণ চক্রবর্ত্তী শিবপুর
১৪৮। " নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া
১৪৯। ডাঃ অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভদ্রেশ্বর
১৫০ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চন্দননগর
১৫১ " শশিপদ সাহা "
১৫২ " জিতেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "
১৫৩ " দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "
১৫৪ " জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "
১৫৫ " ভূষণচন্দ্র মণ্ডল ভদ্রেশ্বর
১৫৬ " পাঁচুগোপাল রক্ষিত চন্দননগর
১৫৭ " দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া
১৫৮ " ভোলানাথ শেঠ চন্দননগর
১৫৯ " দেবেন্দ্রনাথ দাস "
১৬০ " হরিদাস মুখোপাধ্যায় বেনারস
১৬১ " ভূপেন্দ্রনাথ সেন খলিসানী
১৬২ ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত চন্দননগর
১৬৩ শ্রীযুক্ত শ্যামানাথ চট্টোপাধ্যায় "
১৬৪ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী "
১৬৫ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত চুঁচুড়া
১৬৬ " রাধাবিনোদ শেঠ চন্দননগর
১৬৭ " জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চুঁচড়া
১৬৮। " নির্ম্মলচন্দ্র ধর হুগলী
১৬৯। " সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "
১৭০। " যুগলকিশোর দে "
১৭১। " পাঁচুগোপাল কুণ্ডু "
১৭২। " কিশোরীমোহন ঘোষ "
১৭৩। " পঞ্চানন সরকার ব্রিটিশ-চন্দননগর
১৭৪। " নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা
১৭৫। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী চন্দননগর
১৭৬। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার শেঠ চন্দননগর
১৭৭। " পঙ্কজমোহন সুর "
১৭৮। " অরুণচন্দ্র সোম চন্দননগর
১৭৯। " বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় "
১৮০। " সতীশচন্দ্র কুণ্ডু "
১৮১। " সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "
১৮২। " রেবতীরমণ ঘোষ "

১৮৩।	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	কলিকাতা
১৮৪।	" সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	তেলেনীপাড়া
১৮৫।	" কুমার পঞ্চানন শর্ম্মা	চন্দননগর
১৮৬।	" তারকচন্দ্র দাস	"
১৮৭।	" সুধাংশুমোহন দত্ত	"
১৮৮।	" নবদ্বীপচন্দ্র মণ্ডল	চুঁচুড়া
১৮৯।	" কৃষ্ণকুমার সেন	"
১৯০।	" ভুবনেশ্বর মল্লিক	"
১৯১।	" দ্বিজেন্দ্রনাথ শেঠ	চন্দননগর
১৯২।	" যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	"
১৯৩।	" কানাইলাল পাল	"
১৯৪।	" বসন্তকুমার আঢ্য	চুঁচুড়া
১৯৫।	" বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯৬।	" অনঙ্গকুমার সেন	চন্দননগর
১৯৭।	" শিশিরকুমার মৈত্র	বেনারস
১৯৮।	" শান্তিচরণ ভড়	চন্দননগর
১৯৯।	" নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র	"
২০০।	" সন্তোষকুমার নন্দী	"
২০১।	" জ্যোতিষচন্দ্র শেঠ	"
২০২।	" শ্রীশচন্দ্র সরকার	কলিকাতা
২০৩।	" যোগেন্দ্র নাথ পালিত	চন্দননগর
২০৪।	" ধীরেন্দ্রনাথ পাল	চুঁচুড়া
২০৫।	" সতীশচন্দ্র ভড়	চন্দননগর
২০৬।	" কানাইলাল বিশ্বাস	"
২০৭।	" ধীরেন্দ্রনাথ লাহা	চন্দননগর
২০৮।	" নারায়ণচন্দ্র দে	কলিকাতা
২০৯।	" সুধীরচন্দ্র ঘোষ	চন্দননগর
২১০।	" এককড়ি সোম	"
২১১।	" নগেন্দ্রনাথ পাল	"
২১২।	" শ্রীচরণ পাল	চুঁচুড়া
২১৩।	" মহাদেব মণ্ডল	"
২১৪।	শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপদ সরকার	ব্রিটিশচন্দননগর
২১৫।	" যোগেন্দ্র নাথ আঢ্য	চন্দননগর
২১৬।	" ললিতমোহন ঘোষ	"
২১৭।	" দেবেন্দ্রনাথ দাস	"
২১৮।	" কালবরণ শীল	চুঁচড়া
২১৯।	" শিশিরকুমার ঘোষ	চন্দননগর
২২০।	" প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	"
২২১।	" বিজয়কৃষ্ণ দাস	"
২২২।	" সিদ্ধেশ্বর দাস	"
২২৩।	" উপেন্দ্রনাথ দাস	"
২২৪।	" সেবকদাস শীল	"
২২৫।	" অজয়চন্দ্র সরকার	চুঁচুড়া
২২৬।	" মণীন্দ্রগোপাল মিত্র	চন্দননগর
২২৭।	" সত্যচরণ বড়াল	"
২২৮।	" বটকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	গড়বাটী
২২৯।	" হেমচন্দ্র দে	"
২৩০।	" নিতাইচরণ দাস	চন্দননগর
২৩১।	" জিতেন্দ্রনাথ অধিকারী	"
২৩২।	" ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"
২৩৩।	" জ্যোতিষচন্দ্র ভড়	"
২৩৪।	" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ পালিত	"
২৩৫।	" যোগেন্দ্রনাথ দাস	"
২৩৬।	শ্রীযুক্ত মোহনলাল বড়াল	হুগলী
২৩৭।	" বিজয়কৃষ্ণ দাস	চন্দননগর
২৩৮।	" রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	চুঁচুড়া
২৩৯।	শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু	চন্দননগর
২৪০।	" পঞ্চানন কুণ্ডু	"
২৪১।	" সুকুমার দত্ত	"
২৪২।	" দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল	"
২৪৩।	" সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	"
২৪৪।	" চন্দ্রমাধব দে	"
২৪৫।	" যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	"
২৪৬।	" বীরেন্দ্রনাথ বসাক	"

বিংশ বঙ্গীয় সাহি   সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবকগ

২৪৭। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বড়াল চন্দননগর
২৪৮। " হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "
২৪৯। „ উদয়প্রসাদ সিং "
২৫০। " পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় „
২৫১। „ ভাগবত শেঠ „
২৫২। " নিতাইচাঁদ দে „
২৫৩। „ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় „
২৫৪। " সত্যমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় „
২৫৫। " ধনকুবের নাগ কলিকাতা
২৫৬। " গঙ্গাচরণ ধর চুঁচুড়া
২৫৭। " শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ চন্দননগর
২৫৮। " সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বেনারস
২৫৯। " কালীচরণ দাস চন্দননগর
২৬০। " সত্যশরণ বন্দ্যোপাধ্যায় „
২৬১। " লক্ষ্মীনারায়ণ দাস „
২৬২। " করুণাময় মল্লিক „
২৬৩। শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী কলিকাতা
২৬৪। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ ঘোষ চন্দননগর
২৬৫। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুর কলিকাতা
২৬৬। " সত্যচরণ দে সরকার চন্দননগর
২৬৭। " সন্তোষচরণ শেঠ „
২৬৮। " সত্যব্রত ঘোষ „
২৬৯। " কৃষ্ণচন্দ্র পাল চন্দননগর
২৭০। " রমেশচন্দ্র রক্ষিত চুঁচুড়া
২৭১। " অনিলচন্দ্র দত্ত „
২৭২। " শ্রীশচন্দ্র ঘোষ চন্দননগর
২৭৩। শেখ আফতাপ্ উদ্দীন „
২৭৪। শ্রীযুক্ত পান্নালাল শেঠ „
২৭৫। " ফণীভূষণ মিত্র „
২৭৬। " পুলিনবিহারী শেঠ „
২৭৭। " পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় „
২৭৮। " রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তেলিনীপাড়া
২৭৯। „ সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮০। „ যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল চুঁচুড়া
২৮১। শ্রীযুক্ত ফলকৃষ্ণ পাল চন্দননগর
২৮২। „ ভজকৃষ্ণ পাল „
২৮৩। " সত্যশ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় „
২৮৪। শ্রীযুক্তা রেবা পালিত „
২৮৫। শ্রীযুক্ত সত্য গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় „
২৮৬। „ সত্যসুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮৭। „ সত্যসুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮৮। „ গৌরগোপাল ঘোষ „
২৮৯। „ শশিভূষণ দাস „
২৯০। „ দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল চুঁচুড়া
২৯১। „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চন্দননগর
২৯২। „ সুধাময় পাল „
২৯৩। „ শ্রীশচন্দ্র বসু কলিকাতা
২৯৪। „ সুশীলচন্দ্র রায় চুঁচুড়া
২৯৫। শ্রীযুক্তা সুমনা মল্লিক চন্দননগর
২৯৬। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সাধু চুঁচুড়া
২৯৭। „ চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী চন্দননগর
২৯৮। „ গৌরগোপাল গাঙ্গুলী „
২৯৯। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র শেঠ কলিকাতা
৩০০। „ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতা
৩০১। „ গৌরহরি শেঠ চন্দননগর
৩০২। মিঃ এস, এম, মুখার্জ্জী „
৩০৩। মঃ লেহুরো „
৩০৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল কলিকাতা
৩০৫। „ বটকৃষ্ণ ঘোষ „
৩০৬। „ শৈলজা মুখোপাধ্যায় চন্দননগর
৩০৭। „ সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় „
৩০৮। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দে কলিকাতা
৩০৯। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
৩১০। „ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়া
৩১১। „ বলদেব কুণ্ডু চন্দননগর
৩১২। „ রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী চন্দননগর
৩১৩। „ মহেন্দ্রনাথ নন্দী গড়বাটী

পরিশিষ্ট (ছ)

প্রতিনিধিগণ

১।	শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র সিংহ	কলিকাতা।
২।	„ ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	'পাঠচক্র', কোন্নগর।
৩।	„ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য	সমাজপতি স্মৃতিসমিতি, কলিকাতা।
৪।	„ অন্নদাচরণ ব্যাকরণতীর্থ	সারস্বত-টোল, পাবনা।
৫।	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী	সিঁথি বনমালী, বিপিন পাঠাগার।
৬।	„ দ্বিজেন্দ্রমোহন কর	সারস্বত-পাঠাগার, সাউলী চন্দননগর।
৭।	মিঃ বি, এম, চট্টোপাধ্যায়	এলাহাবাদ।
৮।	„ সি, ভি, আপতে	বিশ্বভারতী, শান্তি নিকেতন।
৯।	„ এস, সি, মজুমদার	বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
১০।	শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	ভাটপাড়া।
১১।	„ তরুণচন্দ্র নাগ	খুলনা।
১২।	„ হরেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা	সেওড়াফুলী।
১৩।	„ অমৃতলাল বিদ্যারত্ন	মাজু লাইব্রেরী, মাজু, হাওড়া।
১৪।	„ সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	মাজু, হাওড়া।
১৫।	„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্যোতিষ-পরিষৎ, কলিকাতা।
১৬।	„ প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	„ „
১৭।	„ নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী	„ „
১৮।	„ রাধাগোবিন্দ চন্দ	„ „
১৯।	শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ নন্দী	জ্যোতিষ পরিষৎ, কলিকাতা।
২০।	” নরেশচন্দ্র মিত্র	”
২১।	” দিগিন্দ্রনাথ জ্যোতিস্তীর্থ	বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।
২২।	” উপেন্দ্রনাথ সেন	” ”
২৩।	” অশোক চট্টোপাধ্যায়	” ”
২৪।	” অজিত ঘোষ	” ”
২৫।	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন	” ”
২৬।	ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী	” ”
২৭।	শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরী	” ”
২৮।	” দেবপ্রসাদ ঘোষ	” ”
২৯।	” নিত্যধন ভট্টাচার্য্য	” ”

৩০।	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ,	কলিকাতা।
৩১।	" রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	"	"
৩২।	" যোগেশ্বর শ্রীমাণী	"	"
৩৩।	" চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত	"	"
৩৪।	রেভাঃ এ ডাণ্টাইন্	"	"
৩৫।	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	"	"
৩৬।	" হরিসত্য ভট্টাচার্য্য	"	"
৩৭।	" শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত	"	"
৩৮।	" অজিতকুমার দত্ত	"	"
৩৯।	" সারথি চট্টোপাধ্যায়	"	"
৪০।	" কানাইলাল সান্যাল	"	"
৪১।	" অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	"	"
৪২।	" জিতেন্দ্রনাথ বসু	"	"
৪৩।	স্যার যদুনাথ সরকার	"	"
৪৪।	শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু	".	"
৪৫।	" বীরেশচন্দ্র দাস	"	"
৪৬।	" অরুণচন্দ্র সিংহ	"	"
৪৭।	রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায়	"	"
৪৮।	শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত	"	"
৪৯।	" অনাথনাথ ঘোষ	"	"
৫০।	ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র	"	"
৫১।	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু	"	"
৫২।	" সতীশচন্দ্র বসু	"	"
৫৩।	ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক্	"	"
৫৪।	শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	"	"
৫৫।	" রামশঙ্কর দত্ত	"	"
৫৬।	" অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	"
৫৭।	" চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	"	"
৫৮।	" ত্রিদিবনাথ রায়	"	"
৫৯।	" কিশোরীমোহন ঘোষাল	"	"
৬০।	" বিনোদরঞ্জন বিশ্বাস	"	"
৬১।	ডাঃ উপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"	"
৬২।	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার	"	"

৬৩।	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত	বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।
৬৪।	” ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	” ”
৬৫।	” অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	” ”
৬৬।	” প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	” ”
৬৭।	” ব্রজমাধব রায়	সাহিত্য-পরিষৎ শাখা, মেদিনীপুর
৬৮।	” যতীন্দ্রকৃষ্ণ মাইতি	” ”
৬৯।	” কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল	” ”
৭০।	” সত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল	সাহিত্য-পরিষদ্' উত্তরপাড়া
৭১।	” হরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	” ”
৭২।	” সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৭৩।	ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।
৭৪।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
৭৫।	” কমলাকান্ত পাত্র	মাহিষ্য ছাত্র সমিতি, হরিশপুর, হাওড়া।
৭৬।	” নিতাইলাল ভাণ্ডারী	” ”
৭৭।	” অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ	বিদ্যাসমিতি সমিতি, কলিকাতা।
৭৮।	” বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	কলিকাতা
৭৯।	” গণেশচন্দ্র গুহ	”
৮০।	” বিধুশেখর শাস্ত্রী	”
৮১।	” ত্র্যম্বকলাল সুকুল	”
৮২।	” যতীন্দ্রনাথ দত্ত	রামমোহন লাইব্রেরী কলিকাতা।
৮৩।	ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা।
৮৪।	শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন রায়	”
৮৫।	” খগেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮৬।	” বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	যুবসমিতি কলিকাতা।
৮৭।	” ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামপুর লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর।
৮৮।	” বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	গরিফা।
৮৯।	” ললিতমোহন রায় চৌধুরী	সারস্বত সম্মিলন, উত্তরপাড়া।
৯০।	” ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	” ”
৯১।	” নীহাররঞ্জন রায়	ইউনিভারসিটী লাইব্রেরী, কলিকাতা
৯২।	” অমল হোম	কলিকাতা।
৯৩।	” নিখিলচন্দ্র রায়	কলিকাতা।
৯৪।	” শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী	যতীন্দ্র পাঠাগার ”
৯৫।	” জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	”

৯৬।	” নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বীরভূম।
৯৭।	” আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	আসানসোল।
৯৮।	” রমেশচন্দ্র ঘোষ	অমৃতসমাজ, কলিকাতা।
৯৯।	” মহেন্দ্রনাথ দত্ত	” ”
১০০।	” চন্দেসী-ভি উকলেসী	কলিকাতা।
১০১।	” শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ	”
১০২।	” অশ্বিনীকুমার সেন	পীতাম্বর লাইব্রেরী খুলনা।
১০৩।	” রমাপ্রসাদ চন্দ (রায় বাহাদুর)	কলিকাতা।
১০৪।	শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ	কলিকাতা।
১০৫।	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	চন্দননগর পুস্তকাগার, চন্দননগর।
১০৬।	” আশুতোষ দত্ত	” ”
১০৭।	” ব্রজমোহন দাস	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ, হাওড়া
১০৮।	” তারাপদ সিংহ	পারিজাত সমাজ, বাঁটরা।
১০৯।	” অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়	” ”
১১০।	ডাঃ পল কোসাক্	নিউ-ইয়র্ক, আমেরিকা
১১১।	শ্রীযুক্ত বিধুচরণ মুখোপাধ্যায়	ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি, ত্রিবেণী।
১১২।	শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী	কলিকাতা।
১১৩।	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ	যুবক সমিতি, বৈদ্যবাটী।
১১৪।	” কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়	অমৃত সমাজ, কলিকাতা।
১১৫।	শ্রীযুক্ত জহরলাল মুখোপাধ্যায়	হাটখোলা।
১১৬।	” রামদাস মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া।
১১৭।	” রামরত্ন সরকার	ঘুটিয়াবাজার, হুগলী।
১১৮।	” দেবকীনন্দন মুখোপাধ্যায়	দশভুজাসাহিত্যমন্দির বারাসত চন্দননগর।
১১৯।	” রামেন্দ্রসুন্দর সান্যাল	সাহিত্য পরিষৎ শাখা মেদিনীপুর।
১২০।	” দিবাকর শেঠ	সন্তানসংঘ চন্দননগর।
১২১।	” হেমশশী সোম	চুঁচুড়া।
১২২।	” তিনকড়ি দত্ত	লিলুয়া।
১২৩।	” রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	নাড়ুয়া, চন্দননগর।
১২৪।	” রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	কালিদাস চতুষ্পাঠী, চন্দননগর।
১২৫।	যুবক পত্রিকা প্রতিনিধি	শান্তিপুর।
১২৬।	” ” ”	”
১২৭।	শ্রীযুক্ত বনমালী লাহিড়ী	কলিকাতা।
১২৮।	” চিত্তরঞ্জন রায়	সাহিত্য পরিষৎ শাখা, মেদিনীপুর।

১২৯।	” ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	সাহিত্য পরিষৎ শাখা, মেদিনীপুর
১৩০।	” বিমলাশঙ্কর দাস	
১৩১।	” রাধামোহন ভট্টাচার্য্য	
১৩২।	” বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ	কলিকাতা।
১৩৩।	” প্রমথরঞ্জন দত্ত	দম্‌দম্‌।
১৩৪।	” বিজন মিত্র	(শ্রীহর্ষ পত্রিকা) কলিকাতা
১৩৫।	” মুরারী দে	” ”
১৩৬।	” প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	কলিকাতা
১৩৭।	” ললিতমোহন সিংহ	”
১৩৮।	ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর।
১৩৯।	” ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	কলিকাতা।
১৪০।	শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্ক নাথ রায়	”
১৪১।	” ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র	সাহিত্য বাসর কলিকাতা।
১৪২।	” কিরণকুমার মৈত্র	সাহিত্য বাসর ”
১৪৩।	” চন্দ্রশেখর দাস	সাহিত্য বাসর ”

প্রদর্শনী

জাহ্নবী নিবাসের নিম্নতলের বৃহৎ কক্ষগুলিতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যের ও চন্দননগরের ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনের বস্তুসম্ভার লইয়া এই প্রদর্শনীর আয়োজন। কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র স্যর শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল ইহার উদ্বোধন করেন। সম্মিলনের অধিবেশনের তিন দিন উহা খোলা থাকিবার কথা ছিল—কিন্তু দর্শকদিগের আগ্রহাতিশয্যে আরও তিন দিন খোলা রাখা হয়। শেষদিন পর্য্যন্ত বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, শ্রীরামপুর কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ, কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান ও ভদ্রমহোদয়গণ প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়াণের নিকট হইতে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোনরূপ সাহায্য পাই নাই।

একটি কক্ষে চন্দননগরের অতীতের ঐতিহাসিক নিদর্শন, সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিদের সহিত চন্দননগরের সম্পর্কের নিদর্শন, প্রাচীন মন্দির, প্রতিষ্ঠান, বঙ্গগৌরব সাধক, দাতা, কর্ম্মবীর ইত্যাদির প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছিল। অপর একটি কক্ষে একদিকে বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুঁথি, অন্যদিকে চন্দননগরের গ্রন্থকারদের প্রকাশিত পুস্তক ও অপ্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, তাঁহাদের প্রতিকৃতি ইত্যাদি রাখা হইয়াছিল। অপর তিনটি বড় কক্ষে চন্দননগরের মহিলা শিল্পের নিদর্শন, চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্র, ও সকল প্রকার শিল্পের নিদর্শনে পূর্ণ ছিল। প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা পরে প্রদত্ত হইল।

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে

স্যার শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল মহাশয়ের অভিভাষণ

মহাভাগ রবীন্দ্রনাথ, শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ! আজ আমাকে যে আপনারা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিতে আহ্বান করিয়াছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনাদের সমবেত সাধনায় সুদীর্ঘ সাত বৎসরের পর পুনরায় আজ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের শুভ আয়োজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই প্রখ্যাত নগরে সম্ভবপর হইয়াছে। নানা অনুল্লেখ্য কারণে ভাষা-মাতৃকার সন্তানগণের শুভ সম্মিলন ইতোমধ্যে সংঘটিত হইয়া উঠে নাই। যাহা হোক,

এই সুদীর্ঘ বিরামের পর আমরা সকলে ভাষাজননীর রাতুলচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্যদানে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি এবং সকলকে সেই সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রদ্ধেয় হরিহর শেঠ মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় উৎসাহী সাহিত্যানুরাগী অধিবাসিগণের প্রতি আমরা সকলে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষ এই মহাসম্মিলনের সহিত সংশ্লিষ্ট একটী প্রদর্শনীরও আয়োজন করিয়াছেন। সেই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া শুভ উদ্বোধন করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া তাঁহারা আমার প্রতি আজ যে সম্মান ও অনুরাগ দেখাইয়াছেন তাহাতে আমি যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেছি এবং সেই নির্দ্দেশ আনন্দ সহকারে পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রীতিভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

হে বঙ্গ ভারতীর সুসন্তানগণ, আপনাদের মধ্যে বহুজনের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে আমি আমার কর্ম্মবহুল জীবনে সাহিত্য-সাধনার সুযোগ এবং যথোচিত যোগ্যতা লাভ না করিলেও আমি সাহিত্যের অন্যতম অনুরাগী। সাহিত্য-স্রষ্টা না হইলেও আমি আবাল্য সাহিত্য-রসপিপাসু। মাতৃ-আরাধনায় সকলেরই জন্মগত ন্যায্য অধিকার আছে। সেজন্য আমিও আজ এই মহাযজ্ঞে আপনাদের সহিত সমস্বরে মাতৃ-আহ্বানে যোগদান করিতে আসিয়াছি। হে সাহিত্যিকবৃন্দ, আপনারা যাঁহারা এই সম্মিলনে সমবেত হইয়াছেন চির আচরিত প্রথানুসারে আমি আপনাদিগকে এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া বহু আয়াসে সংগৃহীত ও সুসংবদ্ধভাবে সংরক্ষিত এই নগরীর অতীত ও আধুনিক সংস্কৃতিলক্ষণাক্রান্ত তথ্য, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও পরিণতির পরিচায়ক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ দ্রব্যসম্ভার পরিদর্শন করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আমার বিশ্বাস, ইহাতে আপনারা বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিবেন।

চন্দননগরের বৈশিষ্ট্য

এই চন্দননগর বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াও, তাহার অধিবাসিগণের সহিত একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও, রাজনৈতিক ঘটনা-বৈচিত্র্যে আজ কয়েক শতক ধরিয়া ইহা একটী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার অধিবাসীরা আমাদের সহিত এক মাতৃস্তন্যে লালিত-পালিত ও পরিপুষ্ট হইলেও, তাঁহারা আমাদের একান্ত অন্তরঙ্গ হইলেও রাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্রের ও নাগরিক জীবনধারার বিভিন্নতার জন্য যেন আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা বিরাট অন্তরালের সৃষ্টির উপক্রম হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে আমাদের উভয়ের মধ্যে বাহিরের ব্যবধান ঘটিলেও মূলতঃ আমরা সম্পূর্ণরূপে এক, আমরা সকলেই এক ভাষাজননীর সন্তান। ব্যবহারিক জীবনের শত স্বাতন্ত্র্য কখনও আমাদের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন করিতে পারিবে না।

আপনারা সকলেই জানেন যে, ভারতে ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে যখন পরস্পর ভারতে একাধিপত্য স্থাপনের জন্য বিপুল

প্রচেষ্টা ও প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হইতেছিল, ভারতলক্ষ্মীকে অঙ্কস্থ করিবার জন্য জগতের তৎকালিক দুই প্রবল শক্তির মধ্যে সবিশেষ তৎপরতা ও প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, যবে ভারতের ম্লানদীপ্তি ভাগ্যভানু পশ্চিমাচলবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল, সেই সন্ধিক্ষণে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ তারিখে অর্লেয়াঁ দুর্গের প্রাচীর পার্শ্বে ভারতে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার শেষ আহ্বান চির দিনের জন্য নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। ইহারই অতি স্বল্পকাল মধ্যে পলাশি প্রাঙ্গণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রণ ভারতে ইংরাজশাসনের দৃঢ়ভিত্তি প্রোথিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। তাহা হইলেও ফরাসীশাসিত এই চন্দননগরে সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতির পথে যে কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই, তাহার বহু নিদর্শন ইতিহাসে আমরা পাই। এই চন্দননগরের অধিবাসিগণ ফরাসী সাহিত্য, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াও জাতীয় কল্যাণের জন্য ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহুদিনাবধি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় মোগল শাসনের অন্তিম কাল হইতে ইংরাজ প্রভাবের প্রাদুর্ভাবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য নির্ণয়ের দিগ্‌দর্শন স্বরূপ অনেক মূল্যবান দলিলাদি উপকরণ এই স্থানের ফরাসী দপ্তরখানায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাহাদের সাহায্যে ঐতিহাসিকগণ এদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্প বাণিজ্যের পরিস্থিতি ও নানা সামাজিক সমস্যার সামাধান সম্বন্ধীয় মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে পারেন।

শিল্প ও শিল্পিগৌরব

ফরাসডাঙার কাপড়ের আভিজাত্য আজিও সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। এখানকার বহুবিধ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের এমন কি মসলিনেরও এককালে বহুল প্রচার ছিল। পণ্যদ্রব্য হিসাবে এখান হইতে রেশম, রেশম বস্ত্র, গালা, সোরা, মোম প্রভৃতি যথেষ্ট রপ্তানি হইত। শিল্প ও শিল্পি-গৌরবেও এস্থল কোনদিন হীন ছিল না। এখানকার মাদুর, দড়ি, শাঁখ, মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসবাবপত্রাদি এককালে সবিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বস্ত্র-বয়ন কৌশলে ও কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদির সুনিপুণ পরিকল্পনা ও চাতুর্য্যে এখানকার শিল্পিগণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বর্ত্তমান যন্ত্রযুগেও বাঙ্গলার অন্যতম স্থানে বাঙ্গালীর চেষ্টায় ও অর্থবলে কোন শিল্প-যন্ত্রাদির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই চন্দননগরেই কাপড়ের কল ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। যদিও নানাকারণে তাহাদের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত, তবুও এ বিষয়েও চন্দন-নগরের অগ্রবর্ত্তিতা অবশ্য স্বীকার্য্য।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের পরিকল্পনা

বাঙ্গলায় নবজাগরণের সন্ধানে উদ্দীপিত হইয়া এই চন্দননগরের একান্ত আত্মীয় একজন স্বনামধন্য কর্ম্মবীরই জাতি-গঠনের দৃঢ়ভিত্তিস্বরূপ 'প্রবর্ত্তক' মহাসঙ্ঘের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই সঙ্ঘ আজিও সেই মহাপ্রাণ মতিলাল রায়ের সাধু অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত

হইয়া অক্ষুণ্ণভাবে বহুমুখী কর্ম্মধারায় দেশের ও দশের হিতার্থ আত্মনিয়োগ করিয়া চলিয়াছে। কি সাহিত্যসাধনায়, কি শিল্পোন্নতিতে, কি শিক্ষাপ্রচারে, কি অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে এই সঙ্ঘের কার্য্যাবলী অব্যাহত হইয়া উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রিকা 'প্রবর্ত্তক' আজ একাদিক্রমে বিংশ বর্ষকাল আপনাদের সকলের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সঙ্ঘের অন্যতম পাক্ষিক মুখপত্র 'নবসঙ্ঘ'ই একমাত্র স্থানীয় পত্রিকা। প্রবর্ত্তক হাফটোন ওয়ার্কস ও প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের উন্নতির কথা ও সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত পাট কলের বিষয়েও আমরা যথেষ্ট শুনিয়াছি। এই সঙ্ঘকর্ত্তৃক পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা-মন্দির এবং মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত আমরা বিশেষরূপে পরিচিত। সুতরাং আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই চন্দননগরের স্থান, প্রতিষ্ঠা ও অবদান অতি উচ্চ এবং বহু বিস্তৃত। আমি সেই চন্দননগরের সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প ও সুকুমারকলা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য আপনাদের অনুমতি লইয়া সম্পন্ন করিতেছি।

উপসংহার

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন প্রবল বাধা বিপত্তির মধ্যেও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে এবং যে সকল ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ অর্থ ও নানারূপ সাহায্য করিয়া এই সম্মিলনের অধিবেশনকে সফল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ, অর্থ, সামর্থ্য ও নানাবিধ সাহায্যদানে দীর্ঘ সাত বৎসর পরে সাহিত্য সম্মিলনের পুনরুদ্দীপনের সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি শুধু অভ্যর্থনাসমিতি নহে সমগ্র সাহিত্যসমাজ কৃতজ্ঞ থাকিবে। আনন্দের কথা এই যে আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে এবং ভরসা হইতেছে যে পুনরায় বাংলার সুধী ও সাহিত্যিক মণ্ডলী প্রতি বৎসর মিলিত হইয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত করিতে বিলম্ব হইয়া গেল, ইহার জন্য সুধীজনের নিকট আমাদের ত্রুটী জ্ঞাপন করিতেছি। যেরূপভাবে বিবরণী মুদ্রিত করিবার কল্পনা ছিল, অর্থাভাবে তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমরা সত্যই সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি। অনবধানতাবশতঃ বহু ত্রুটী বিচ্যুতিও ঘটিয়া থাকিতে পারে, ভরসা আছে যে সকলে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে,
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক।

বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়	
পৃষ্ঠপোষকগণের দান	১২৫০৲
এককালীন দান ...	৫১০৲
প্রতিনিধিগণের চাঁদা ...	২৮৬৲
অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের চাঁদা ...	৬৭০৲
দর্শকদিগের প্রবেশিকা ...	২২৫॥০
প্রদর্শনীর পুস্তিকা বিক্রয় ...	৭।০
অন্যান্য জিনিস বিক্রয় ...	২১৵১০
দেনা (আনুমানিক) ...	৩২৭৵১৫
	৩৪০৬৸৶৫

ব্যয়	
ডাক টিকিট ও টেলিগ্রাম ...	১৫২॥৴১৫
কর্ম্মচারি ও দারোয়ানের বেতন	৫৫৲
দপ্তর সরঞ্জামী ...	১০৬৵১০
পাথেয় ...	৭৯॥৵১০
অভিভাষণাদি মুদ্রণ ...	৪৮১৸১৫
মণ্ডপ, আলো ইত্যাদি ...	৫৩৩৸৴১০
প্রদর্শনীর ব্যয় ...	১৩১৶১০
প্রতিনিধিদের আহার ইত্যাদি ...	৭০৬৷৵১০
আমোদ প্রমোদের ব্যয় ...	৭১৸১০
প্রীতিসম্মিলন ও অন্যান্য ব্যয় ...	২৮১৸৶১০
গাড়ি ভাড়া, ট্রেণ ভাড়া ইত্যাদি ...	৮৩৵১৫
আলোকচিত্র গ্রহণ, ব্যাজ ইত্যাদি ...	১৪৮॥৴১০
কার্য্য বিবরণী মুদ্রণ (আনুমানিক) ...	৬৭০৲
	৩৪০৬৸৶৫

চন্দননগর,
২১এ মাঘ ১৩৪৪

শ্রীযোগেশ্বর শ্রীমানী,
কোষাধ্যক্ষ, অভ্যর্থনা-সমিতি।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে,
সম্পাদক, অভ্যর্থনা-সমিতি।

প্রচেষ্টা ও প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হইতেছিল, ভারতলক্ষ্মীকে অঙ্কস্থ করিবার জন্য জগতের তৎকালিক দুই প্রবল শক্তির মধ্যে সবিশেষ তৎপরতা ও প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, যবে ভারতের ম্লানদীপ্তি ভাগ্যভানু পশ্চিমাচলবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল, সেই সন্ধিক্ষণে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ তারিখে অর্লেয়াঁ দুর্গের প্রাচীর পার্শ্বে ভারতে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার শেষ আহ্বান চির দিনের জন্য নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। ইহারই অতি স্বল্পকাল মধ্যে পলাশি প্রাঙ্গণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রণ ভারতে ইংরাজশাসনের দৃঢ়ভিত্তি প্রোথিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। তাহা হইলেও ফরাসীশাসিত এই চন্দননগরে সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতির পথে যে কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই, তাহার বহু নিদর্শন ইতিহাসে আমরা পাই। এই চন্দননগরের অধিবাসিগণ ফরাসী সাহিত্য, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াও জাতীয় কল্যাণের জন্য ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহুদিনাবধি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় মোগল শাসনের অন্তিম কাল হইতে ইংরাজ প্রভাবের প্রাদুর্ভাবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য নির্ণয়ের দিগ্‌দর্শন স্বরূপ অনেক মূল্যবান দলিলাদি উপকরণ এই স্থানের ফরাসী দপ্তরখানায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাহাদের সাহায্যে ঐতিহাসিকগণ এদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্প বাণিজ্যের পরিস্থিতি ও নানা সামাজিক সমস্যার সামাধান সম্বন্ধীয় মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে পারেন।

শিল্প ও শিল্পিগৌরব

ফরাসডাঙার কাপড়ের আভিজাত্য আজিও সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। এখানকার বহুবিধ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের এমন কি মসলিনেরও এককালে বহুল প্রচার ছিল। পণ্যদ্রব্য হিসাবে এখান হইতে রেশম, রেশম বস্ত্র, গালা, সোরা, মোম প্রভৃতি যথেষ্ট রপ্তানি হইত। শিল্প ও শিল্পি-গৌরবেও এস্থল কোনদিন হীন ছিল না। এখানকার মাদুর, দড়ি, শাঁখ, মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসবাবপত্রাদি এককালে সবিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বস্ত্র-বয়ন কৌশলে ও কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদির সুনিপুণ পরিকল্পনা ও চাতুর্য্যে এখানকার শিল্পিগণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বর্ত্তমান যন্ত্রযুগেও বাঙ্গলার অন্যতম স্থানে বাঙ্গালীর চেষ্টায় ও অর্থবলে কোন শিল্প-যন্ত্রাদির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই চন্দননগরেই কাপড়ের কল ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। যদিও নানাকারণে তাহাদের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত, তবুও এ বিষয়েও চন্দন-নগরের অগ্রবর্ত্তিতা অবশ্য স্বীকার্য্য।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের পরিকল্পনা

বাঙ্গলায় নবজাগরণের সন্ধানে উদ্দীপিত হইয়া এই চন্দননগরের একান্ত আত্মীয় একজন স্বনামধন্য কর্ম্মবীরই জাতি-গঠনের দৃঢ়ভিত্তিস্বরূপ 'প্রবর্ত্তক' মহাসঙ্ঘের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই সঙ্ঘ আজিও সেই মহাপ্রাণ মতিলাল রায়ের সাধু অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত

হইয়া অক্ষুণ্ণভাবে বহুমুখী কর্ম্মধারায় দেশের ও দশের হিতার্থ আত্মনিয়োগ করিয়া চলিয়াছে। কি সাহিত্যসাধনায়, কি শিল্পোন্নতিতে, কি শিক্ষাপ্রচারে, কি অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে এই সঙ্ঘের কার্য্যাবলী অব্যাহত হইয়া উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রিকা 'প্রবর্ত্তক' আজ একাদিক্রমে বিংশ বর্ষকাল আপনাদের সকলের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সঙ্ঘের অন্যতম পাক্ষিক মুখপত্র 'নবসঙ্ঘ'ই একমাত্র স্থানীয় পত্রিকা। প্রবর্ত্তক হাফটোন ওয়ার্কস ও প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের উন্নতির কথা ও সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত পাট কলের বিষয়েও আমরা যথেষ্ট শুনিয়াছি। এই সঙ্ঘকর্ত্তৃক পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা-মন্দির এবং মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষামন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত আমরা বিশেষরূপে পরিচিত। সুতরাং আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই চন্দননগরের স্থান, প্রতিষ্ঠা ও অবদান অতি উচ্চ এবং বহু বিস্তৃত। আমি সেই চন্দননগরের সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প ও সুকুমারকলা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য আপনাদের অনুমতি লইয়া সম্পন্ন করিতেছি।

উপসংহার

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন প্রবল বাধা বিপত্তির মধ্যেও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে এবং যে সকল ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ অর্থ ও নানারূপ সাহায্য করিয়া এই সম্মিলনের অধিবেশনকে সফল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ, অর্থ, সামর্থ্য ও নানাবিধ সাহায্যদানে দীর্ঘ সাত বৎসর পরে সাহিত্য সম্মিলনের পুনরুদ্দীপনের সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি শুধু অভ্যর্থনাসমিতি নহে সমগ্র সাহিত্যসমাজ কৃতজ্ঞ থাকিবে। আনন্দের কথা এই যে আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে এবং ভরসা হইতেছে যে পুনরায় বাংলার সুধী ও সাহিত্যিক মণ্ডলী প্রতি বৎসর মিলিত হইয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত করিতে বিলম্ব হইয়া গেল, ইহার জন্য সুধীজনের নিকট আমাদের ত্রুটী জ্ঞাপন করিতেছি। যেরূপভাবে বিবরণী মুদ্রিত করিবার কল্পনা ছিল, অর্থাভাবে তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমরা সত্যই সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি। অনবধানতাবশতঃ বহু ত্রুটী বিচ্যুতিও ঘটিয়া থাকিতে পারে, ভরসা আছে যে সকলে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে,
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক।

বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের [illegible] ব্যয়ের হিসাব

আয়		ব্যয়	
পৃষ্ঠপোষকগণের দান	১২৫০৲	ডাক টিকিট ও টেলিগ্রাম ...	১৫২৸/১৫
এককালীন দান ...	৫১০৲	কর্ম্মচারি ও দারোয়ানের বেতন	৫৫৲
প্রতিনিধিগণের চাঁদা	২৮৬৲	দপ্তর সরঞ্জামী ...	১০৬৶/১০
অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের চাঁদা ...	৬৪০৲	পাথেয় ...	৭৯৸৶/১০
দর্শকদিগের প্রবেশিকা ...	২৯৫৷০	অভিভাষণাদি মুদ্রণ ...	৪৮১৷১৫
প্রদর্শনীর পুস্তিকা বিক্রয় ...	৭৷০	মণ্ডপ, আলো ইত্যাদি ...	৫৩৩৶/১০
অন্যান্য জিনিস বিক্রয় ...	২১৫৷০	প্রদর্শনীর ব্যয় ...	১৩১৶/১০
দেনা (আনুমানিক) ...	৩৯৭৶/১৫	প্রতিনিধিদের আহার ইত্যাদি ...	৭০৬৸/১০
		আমোদ প্রমোদের ব্যয় ...	৭১৷১০
		প্রীতিসম্মিলন ও অন্যান্য বায় ...	২৮১৷৶/১০
		গাড়ি ভাড়া, ট্রেণ ভাড়া ইত্যাদি ...	৮৩৶/১৫
		আলোকচিত্র গ্রহণ, ব্যাজ ইত্যাদি ...	১৪৮৸/১০
		কার্য্য বিবরণী মুদ্রণ (আনুমানিক) ...	৬৭০৲
	৩৪০৬৸৶/৫		৩৪০৬৸৶/৫

চন্দননগর,
২১এ মাঘ ১৩৪৪

শ্রীযোগেশ্বর শ্রীমানী,
কোষাধ্যক্ষ, অভ্যর্থনা-সমিতি।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে,
সম্পাদক, অভ্যর্থনা-সমিতি।

প্রদর্শনীর প্রাচীন সাহিত্য বিভাগে প্রদর্শিত রাস পঞ্চাধ্যায়ের পুঁথির একখানি চিত্র।

রাস পঞ্চাধ্যায়ের পুঁথির অপর একখানি চিত্র।

প্রদর্শনীর ইতিহাস বিভাগের একাংশ।

প্রদর্শনীয় ইতিহাস বিভাগের চিত্র সংগ্রহ

প্রদর্শনীর দারুশিল্প কক্ষের একাংশ

প্রদর্শনীর মৃৎশিল্প ও চিত্রকলা গৃহের একাংশ।

বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন
প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা

১ম

আলোকচিত্র

(ক) মন্দির, মস্‌জিদ্, গীর্জ্জা

১। দশভূজা মন্দির—মানকুণ্ডু
২। শ্রীশ্রীনন্দদুলালের মন্দির
৩। নাড়ুয়ার দ্বাদশ মন্দির
৪। খলিসানীর শিবমন্দির
৫। ঐ মন্দিরের ইষ্টক লিপির ভগ্নাংশ
৬। খলিসানীর বিশালাক্ষীর মন্দির
৭। পালেদের দোলমঞ্চ—পালপাড়া
৮। হেলাপুকুরের শিবমন্দির
৯। শিশুবাবুর মন্দির—গোন্দলপাড়া
১০। পালপাড়ার হরিসভার ভগ্নাবশেষ
১১। গোন্দলপাড়ার কালী-মন্দির
১২। বিনোদ রায়ের মন্দিব
১৩। গোস্বামীঘাটের মন্দির
১৪। খলিসানী নন্দের নন্দনজীউর মন্দির
১৫। সুখসনাতনতলার শিবমন্দির
১৬। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির
১৭। ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দির
১৮। দিনেমারডাঙ্গার একটি মন্দির (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে চিত্রিত)
১৯। শ্রীশ্রীনন্দদুলাল
২০। শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী-মাতা
২১। প্রাচীন ফরাসী গ্রন্থ হইতে চিত্রিত গঙ্গাতীরের একটি শিবমন্দির
২২। পুরাতন গীর্জ্জা
২৩। পুরাতন গীর্জ্জার প্রবেশদ্বার
২৪। পুরাতন গীর্জ্জার দরজা (১৭২০)
২৫। রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম মন্দির
২৬। রোম্যান্ ক্যাথলিক্ গীর্জ্জার পেন্সিল্ স্কেচ্
২৭। মোল্লাহাদির বাগানের মস্‌জিদ্
২৮। নামাজী পীরের আস্তানা
২৯। কনে বউয়ের মন্দির সংস্কারের পূর্ব্বে ঐ (চিত্রে)
৩০। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দিনেমারডাঙ্গা
৩১। পঞ্চাননতলার মন্দির
৩২। কালীতলার প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
৩৩। প্রেমনারায়ণ বসুর রাসমঞ্চ
৩৪। কাশীনাথ কুণ্ডুর শিবমন্দির
৩৫। সরকারদিগের মন্দির
৩৬। পালদিগের শিবমন্দির—পালপাড়া
৩৭। শ্রীমানীদিগের শিবমন্দির—বারাসত
৩৮। মন্মথনাথ ঠাকুরের মন্দির—হাটখোলা
৩৯। প্রটেষ্ট্যাণ্ট গীর্জ্জা

(খ) দুর্গ, প্রাসাদ, ইত্যাদি

১। অর্লেয়াঁ দুর্গ
২। অর্লেয়া দুর্গধ্বংসকারী ইংরাজদিগের টাইগার, কেণ্ট, সেলিস্‌বারি জাহাজ
৩। ঐ বর্ণচিত্র
৪। ডাচেদের উপাসনা-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ
৫। ঐ অপর একটি চিত্র
৬। গৌরহাটী
৭। গৌরহাটীর নিকট মাঠ

৮। গৌরহাটী প্রাসাদের একটি থাম
৯। ঐ আর একটী
১০। গৌরহাটী প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ
১১। গৌরহাটী রাস্তা
১২। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বর্গী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত একটি অট্টালিকা
১৩। দ্বিতীয় সেণ্ট লুই গীর্জ্জার ভগ্নাবশেষ
১৪। দিনেমারদিগের কুটীরধ্বংসাবশেষ
১৫। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীর ধ্বংসাবশেষ
১৬। এ্যাঙ্গাস্ কোম্পানীর কুঠি (গৌরহাটী) (এইস্থানে কবি এণ্টনী বাস করিতেন)
১৭ দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীর ভগ্নাবশেষ – গোন্দলপাড়া (এই বাটীতে ভারতচন্দ্র বাস করিতেন)
১৮। গায়ক মধুবাবুর বাটীর ভগ্নাবশেষ
১৯। বৌ-মাষ্টারের বাটী
২০। বেণীমাধব পালের চিত্রশালা
২১। যে বাটীতে ম্যাডাম্ রস্ বাস করিতেন
২২। কুরজন্ সাহেবের বাটী
২৩। সরকারদের বাটী—বাগবাজার
২৪। দেবী সরকারদের বাটী
২৫। গালার প্রাচীন কারখানা
২৬। পুরাতন নীলকুঠী
২৭। বটকৃষ্ণ ঘোষের কাপড়ের কল
২৮। মোরান্ সাহেবের বাগানবাটী (এইখানে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরের কিছুকাল অতিবাহিত করেন)
২৯। ক্লাইবের গোলার দাগ অঙ্কিত নন্দ-দুলালের মন্দির

(খ)
খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের বসবাসের আবাস

(১) যে বাটীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাস করিয়াছিলেন।
(২) যে বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বাস করিয়াছিলেন।
(৩) যাদবেন্দু ঘোষের বাটী।
(৪) ভূপালবাবুর বাটী—ইহাতে ডাচেরা বাস করিত।
(৫) যে বাটীতে প্রাদেশিক সভা বসিত
(৬) দেবী সরকারের বাটী—এই স্থানে বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী বাস করিয়াছিলেন।
(৭) বেণী-মাধব পালের চিত্রশালা
(৮) গায়ক মধুবাবুর বাটীর ধ্বংসাবশেষ
(৯) ক্যাপ্টেন্ ব্রিসটোর বাসভবন।
৩১। বন্দী চন্দননগর ও মুক্ত কলিকাতা (ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি হইতে)
৩২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শৈশবে যে বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। (বসনচন্দ্র পরামাণিকের বাটী)
৩৩। গৌরহাটী প্রাসাদের শেষ চিহ্ন।
৩৪। পুরাতন লাট ভবন (১৮৭১)
৩৫। ১৮৭৪ সালের গভর্ণমেণ্ট ভবনে একটী মজলিস

(গ) আশ্রম, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি
(ফোটো)

১। হনুমান দাস বাবাজীর আশ্রম
২। প্রবর্ত্তক আশ্রম
৩। প্রবর্ত্তক মন্দিরের ওঁকার ঘট

৪। বর্ত্তমান ডুপ্লেক্স কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে
৫। তারকদাসী নারী কল্যাণ সদন
৬। বারাসতের টোল
৭। কালিদাস চতুষ্পাঠী
৮। চন্দননগর পুস্তকাগারের পুরাতন বাটী
৯। চন্দননগর বঙ্গবিদ্যালয়—বারাসত
১০। দুর্গাচরণ রক্ষিতের অবৈতনিক বিদ্যালয়—লালবাগান
১১। কাশীশ্বরী পাঠশালা
১২। নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির
১৩। অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়।
১৪। মারগাঁ সাহেবকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতাল।
১৫। গড়বাটী স্কুলের পুরাতন চিত্র
১৬। লালবাগান বালিকা বিদ্যালয়
১৭। নৃত্যগোপাল প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয়
১৮। প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবন
১৯। চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাব্
২০। অম্বিকাচরণ স্মৃতি-মন্দির
২১। দশভূজা সাহিত্য মন্দির (অঙ্কিত চিত্র)
২২। কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা-মন্দির
২৩। ,, বর্ণচিত্র
২৪। নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির
২৫। ,, বর্ণ চিত্র
২৬। মেরী অফিস্
২৭। আদালত
২৮। শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম (অতিথি ভবন)
২৯। মেঘনাদ পান্থ-শালা

(ঘ) দৃশ্য

১। কে ডুপ্লেক্স
২। প্রাচীন লক্ষ্মীগঞ্জ
৩।
৪। তালডাঙ্গার ফটক
৫। তোলাফটক
৬। চন্দননগরের পরপারের দৃশ্য
৭। ঐ আর একটা দৃশ্য
৮। ন পাড়ার পুল
৯। সরস্বতী নদীর পুল
১০। সদর থানা (পূর্ব্বে এইখানে কাছারী ছিল)
১১। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের চন্দননগরের একটী দৃশ্য।
১২। চন্দননগরের কতিপয় উল্লেখযোগ্য স্থান:—(ক) ঘড়িঘর, (খ) বড় সাহেবের বাটী, (গ) ডুপ্লেক্স পার্ক, (ঘ) তালডাঙ্গা ফটক, (ঙ) কুঠীর মাঠ, (চ) জলের কল, (ছ) আদালত, (জ) গোরস্থান, (ঝ) ষ্টেশন।
১৩ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের চন্দননগরের একটী দৃশ্য
পুরাতন কে ডুপ্লেক্স
১৫। কে ডুপ্লেক্স
১৬। বর্ত্তমান কে ডুপ্লেক্স
১৭। বারদোয়ারী, চন্দননগর
১৮। ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, চন্দননগর
১৯। চন্দননগরের গঙ্গাতীরের দৃশ্য (বর্ণ চিত্র।
২০। ঐ আর একটি ,,
২১। ঐ আর একটি। ,,
২২। ঐ আর একটি ,,
২৩। গঙ্গাতীরের একটি পল্লী ,,
২৪। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের চন্দননগর ,,

(ঙ) ঘাট

১। শ্মশানঘাট, বোড়াইচণ্ডীতলা
২। শিশুবাবুর ঘাট

৩। কানাই সরকারের ঘাট
৪। কাশীকুণ্ডুর ঘাট
৫। দত্তের ঘাট
৬। চৌধুরী-ঘাটের চাঁদনী
৭। কুঠীর ঘাট

(চ) উৎসব

১। যাদু ঘোষের রথ
২। স্নানযাত্রা
৩। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী প্রতিমা
৪। ভুবনেশ্বরী প্রতিমা
৫। রথযাত্রা
৬। অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব
৭। ফরাসী জাতীয় উৎসব
৮। ঐ
৯। ১৯১৫ সালের চন্দননগর প্রদর্শনীতে ফরাসী গভর্ণর Martineau ও বাংলার লাট Carmichaelএর সহিত একটি ফোটো।

(ছ) বিবিধ অভিযানে ও ক্রীড়া কৌতুকে চন্দননগর।

১। চন্দননগরের ভলান্টীয়ার বিদায় কালে
২। চন্দননগরের ভলান্টীয়ার পণ্ডীচারীতে
৩। ঐ
৪। চন্দননগরের স্বেচ্ছাসৈনিকগণ
৫। মনোরঞ্জন দাস—বিগত মহাযুদ্ধে
৬। ফ্রান্সে চন্দননগরের স্বেচ্ছাসৈনিক (তুলঁ হইতে ভারদুন যাত্রার পূর্ব্বে)
৭। লর্ড কিচনারের নামাঙ্কিত যোগেন্দ্রনাথ সেনের ফটো
৮। চন্দননগরের প্রথম সত্যাগ্রহী সেনাদল
৯। ঐ দ্বিতীয় „
১০। ঐ
১১। চন্দননগরের চতুর্থ সত্যাগ্রহী দল
১২। ট্রেডস্ কাপ্ বিজয়ী ফুটবল খেলোয়াড় দল
১৩। সাইকেল টুরিষ্ট
১৪। চন্দননগরের পূর্ব্বেকার সেপাই (একদল)
১৫। চন্দননগরের পূর্ব্বেকার সেপাই
১৬। কুচকাওয়াজের একটি দৃশ্য
১৭। নিখিল বঙ্গ হা-ডু-ডু-ডু প্রতিযোগিতার চিত্র (চারুচন্দ্র স্মৃতিফলকের খেলায় চন্দননগর ত্রিশক্তি বনাম বহুবাজার ব্যায়াম সমিতি)
১৮। ঐ বালক-সঙ্ঘ বনাম প্রেসিডেন্সি কলেজ
১৯। চন্দননগর হইতে আহিরীটোলা সন্তরণের প্রতিযোগিগণ

(জ) কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দ্রব্যের চিত্র

১। ডুপ্লেক্সের প্রতিমূর্ত্তি
২। ডুপ্লেক্স কর্ত্তৃক যে পালঙ্ক ব্যবহৃত হইত বলিয়া কথিত আছে।
৩। জাল প্রতাপচাঁদ ব্যবহৃত সোফার চিত্র
৪। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতীক
৫। ঐ আর একটি

(ঝ) বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি

১। নবগোপাল ঘোষ—চেয়ারের কারখানার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
২। সতীশ চন্দ্র পলসাঁই—প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড়।
৩। দুর্গাচরণ রক্ষিত—প্রথম শেভালিয়ে দেলা লেজিঅঁ দ'ন্যার।

৪। রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ গায়ক
৫। প্রফুল্ল অধিকারী ঐ
৬। যোগেন্দ্রনাথ সেন, ইংলণ্ডে বাসকালে
৭। কানাইলাল দত্ত
৮। বনবিহারী দত্ত—মৃৎ-শিল্পী
৯। বনমালী পাল—চন্দননগর আদালতের প্রথম বাঙ্গালী বিচারপতি
১০। জাল প্রতাপচাঁদ
১১। কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দিরে প্রথম উত্তীর্ণা ছাত্রীদ্বয়
১২। রাসবিহারী বসু জাপানে প্রতিষ্ঠালব্ধ বাঙ্গালী
১৩। দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রৌঢ়াবস্থায়
১৪। দীননাথ চন্দ্র
১৫। বটকৃষ্ণ ঘোষ
১৬। ফাদার আলফঁস্
১৭। দক্ত্যার লেঅঁ মার্গ্যা
১৮। আলফ্রে কুরজঁ
১৯। চন্দননগরে গঙ্গাবক্ষে বজরায় রবীন্দ্রনাথ
২০। চন্দননগরে রচনানিরত রবীন্দ্রনাথ
২১। দীননাথ দাস
২২। নন্দলাল ভড়

(ঞ) চন্দননগরের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পিগণ

১। সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
২। বেণীমাধব পাল
৩। বসন্তলাল মিত্র
৪। আশুতোষ মিত্র
৫। অনুকূলচন্দ্র সরকার
৬। পরেশচন্দ্র সেন
৭। শরৎচন্দ্র ঘোষ

(ট) চন্দননগরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রগণ

১। জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী
২। সুধাকর চক্রবর্ত্তী
৩। গুরুদাস ভড়
৪। শ্রীশচন্দ্র বসু
৫। ধর্ম্মদাস বসু
৬। অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। প্রাণধন ভড়
৮। যোগীন্দ্রনাথ সেন
৯। বসন্তলাল মিত্র
১০। সন্তোষকুমার ভড়
১১। হৃষীকেশ রক্ষিত
১২। হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩। শ্রীমতী সুশীলা ঘোষ (১ম মহিলা গ্র্যাজুয়েট)

(ঠ) কতিপয় খ্যাতনামা চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি

১। চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
২। হরলাল দত্ত
৩। ক্ষীরোদচন্দ্র পালিত
৪। যদুনাথ পালিত
৫। গোপালচন্দ্র বসু
৬। ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
৭। তারকনাথ সুর
৮। মতিলাল শেঠ
৯। বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

(ড) কতিপয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা

১। প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী
২। এলফ্রেড কুরজঁ
৩। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৪। মারগঁ্যা
৫। যদুনাথ পালিত
৬। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। বসন্তলাল মিত্র
৮। ফাদার বার্থে
৯। দুর্গাচরণ রক্ষিত
১০। হরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১১। মতিলাল রায়
১২। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৩। কালীচরণ দাস
১৪। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৫। হরিহর শেঠ
১৬। আশুতোষ নিয়োগী
১৭। স্যার ক্লেমাতমা
১৮। এম, লেপিন

(ঢ) কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দ্রব্য

১। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্বুবর্ণ পদক
২। চন্দননগরে প্রথম বাঙ্গালী মেয়র দীননাথ দাসের গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত তলোয়ার
৩। কলিকাতার ফরাসী কঁন্সুল নন্দলাল ভড় মহাশয়ের গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত তলোয়ার
৪। উঁহার ব্যবহৃত কঁন্সুলের পোষাক
৫। মেয়র দীননাথ দাসের ব্যবহৃত শীলমোহর
৬। ধরণীধর পালের আরদালীর চাপরাস
৭। চন্দননগরের স্বেচ্ছাসৈনিকদিগের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত বুলেট ও অন্যান্য দ্রব্য
৮। স্বেচ্ছাসৈনিকের "লিভ্রে মাতৃকুল"
৯। স্বেচ্ছাসৈনিকদিগের প্রাপ্ত মেডেল্
১০। কয়েকটী আসবাবপত্র যাহা কথিত আছে অর্লেয়ঁা দুর্গের ধ্বংসের পর তাহার কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।
১১। যোগেন্দ্র নাথ সেনের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকালীন তাঁহার ব্যবহৃত কতগুলি জিনিষ :— ঘড়ি, Tobacco Pouch, Tobacco pipe, Cigarette case, চশমা ও চশমার খাপ, তাঁহার তিনখানি পদক ও কয়েকখানি চিঠি।

(ণ) মানচিত্র ও নক্সা

১। চন্দননগরের নক্সা (টিফেণ্ডার কৃত)
২। ঐ মানচিত্র ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বের
৩। ঐ ঐ গড় কাটাইবার পর, ১৭৬৯
৪। ঐ নক্সা (Mouchet কৃত), ১৭৪৯
৫। অর্লেয়ঁা দুর্গ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের নক্সা
৬। অর্লেয়ঁা দুর্গ ও দুর্গসীমার নক্সা
৭। প্রাচীন গোন্দলপাড়া
৮। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত কয়েক খণ্ড জমি অদলবদল সংক্রান্ত চন্দননগরের নক্সা ১৮৫১—৫২
৯। ঐ ঐ বাঙ্গালায়
১০। কতিপয় প্রাচীন স্থানের নিদর্শন সহ চন্দননগর
১১। রেভিনিউ সার্ভে মানচিত্র, ১৮৭০—৭১
১২। চন্দননগরের মানচিত্র, ১৮৭১—৭২

১৩। ভিল ব্রাঁশের নক্সা, ১৮৬১

১৪। চন্দননগর ও গৌহাটীর প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান মন্দিরাদি সম্বলিত মানচিত্র, ১৯৩০

(ত) পুরাতন দলিলপত্র ইত্যাদি

১। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যখন চন্দননগর ইংরাজ হস্তগত ছিল সেই সময়ের একখানি দলিল

২। ১২০৮ সালের একখানি দলিল

৩। ১২০৬ (ইংরাজী ১৭৯৯) সালের একখানি দলিল

৪। নিমাইতীর্থের ঘাট সংক্রান্ত একখানি প্রাচীন দলিল

৫। কাশীনাথ কুণ্ডুদিগের ফ্রেড্রিক নগর (শ্রীরামপুর) সংক্রান্ত একখানি দিনেমার কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত দলিল

৬। ১৮৮২ সালের একখানি খাজনার রসিদ

৭। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের একখানি দাসখত

৮। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের একখানি প্রতিলিপি দলিল

৯। ১১৯৪ ও ১২০২ সালের দুইখানি দলিলের প্রতিলিপি

১০। স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র বসুর মহম্মদ মহসীনের কলেজের ১৮৪৯ সালে একখানি মাহিনার বিল

১১। উঁহার ১৮৫৪ সালের একখানি জুনিয়ার স্কলারশিপ সার্টিফিকেট

১২। ১৮৮২ সালের খাজনার একখানি রসিদ

১৩। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের যুবরাজ আগমন উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহের একখানি রসিদ

১৪। ডুপ্লেক্সের পিতাকে তাঁহার লিখিত স্বাক্ষরিত ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের একখানি পত্রের প্রতিলিপি

১৫। চন্দননগর পুনঃ প্রাপ্তির পর সম্রাট ১৮শ লুই কর্ত্তৃক এডমিনিসট্রেটার M. D. Dayozএর নিয়োগ পত্রের অবিকল প্রতিলিপি

১৬। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের একটী পুরাতন দলিল।

(থ) চার্ট

১। শ্রীকৃষ্ণলাল দাস ও ফটিকলাল দাস কর্ত্তৃক প্রস্তুত চার্ট।

বাঙ্গলার সম্পদ্ ঃ—

(১) বাঙ্গলার শ্রমিক সংখ্যা
(২) শিক্ষিত-অশিক্ষিতের সংখ্যা
(৩) বড় বড় কারখানায় নিযুক্ত দৈনিক শ্রমিক সংখ্যা (১৯৩৫)
(৪) প্রধান ফসলের মূল্য (১৯২৯ ও ১৯৩৫)
(৫) জীব জন্তু
(৬) কৃষি—শ্রেণীবিভাগ
(৭) আবাদি ভূমি
(৮) বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (১৯২১ হইতে ১৯৩৫)
(৯) চন্দননগরের লোকসংখ্যা
(১০) চন্দননগরের জন্ম-মৃত্যু
(১১) চন্দননগরের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়
(১২) চন্দননগরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্র

২। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ—Economic chart of Prabartak Samgha.

৩। চন্দননগরের আদমিনিস্ত্রাতারদিগের তালিকা

৪। ঐ মারের তালিকা

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত চন্দননগরের ভিতরে প্রথম ও গভর্ণমেণ্টের উপাধি প্রাপ্ত বা কোন উচ্চ পদপ্রাপ্ত চন্দননগরে প্রথম।

৬। বাহিরের তুলনায় চন্দননগরের প্রথম

(দ) চন্দননগরের উল্লেখযোগ্য কতিপয় অনুষ্ঠানের কাগজপত্র

১। সৎপথালম্বী সম্প্রদায় স্থাপিত কালে সম্প্রদায়ের গৃহীত প্রস্তাবগুলির মুদ্রিত পত্র।

২। ১৯০৫ সালের সরিষাপাড়ার চিত্ত-বিশ্রামের সেবকগণের এক আবেদন পত্র।

৩। ঐ আর একখানি।

৪। ১৯১৫ সালে চন্দননগর প্রদর্শনী উপলক্ষে ছাপান চিঠির কাগজ।

৫। ঐ প্রদর্শনীতে প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের নিদর্শন।

৬। ১৯১৯ সালে চন্দননগর ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত হইবে এই আশঙ্কায় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরিত আবেদন পত্রের নিদর্শন। (ফরাসী ভাষা)

৭। ঐ বাঙ্গলায়।

৮। ১৩২৬ সালে চন্দননগর চাউল সরবরাহ সমিতি কর্ত্তৃক মুদ্রিত চাউল লইবার কুপন।

৯। চন্দননগর পুস্তকাগারের ১৮৭৪ সালের মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা।

১০। চন্দননগর পুস্তকাগারের ২রা অক্টোবর ১৮৭৯ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৮০ পর্য্যন্ত বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী।

১১। আশুতোষ বক্তৃতামালা প্রথম বক্তৃতা সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন।

১২। নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের জন্য আনুমানিক হিসাবের মুদ্রিত কাগজ।

১৩। নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির উদ্বোধন উৎসবের কার্য্যসূচী।

১৪। ঐ উৎসব উপলক্ষে রচিত গান।

১৫। বিজয়া সম্মিলনের চতুর্থ বর্ষের জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাধারণ ভাবে প্রেরিত নিমন্ত্রণ পত্র।

১৬। ১৩১৪ সালে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বর্দ্ধনা পত্র।

১৭। মহাযুদ্ধে প্রেরিত চন্দননগরের স্বেচ্ছা-সৈনিক সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লিখিত বিবরণ সমূহ।

১৮। চন্দননগরে বিবিধ নির্ব্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত কাগজ পত্র।

১৯। ১৮৮১ সালের censusএর কাগজ

(ধ) মৃত্তিকা ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত

১। বুদ্ধ মূর্ত্তি

২। চন্দননগর ধ্বংশের জন্য ব্যবহৃত ক্লাইভের গোলা ৩টী।

৩। কোন লৌহ নির্ম্মিত বৃহৎ পদার্থের অংশ ৩টা।

৪। ধাতু মিশ্রিত প্রস্তর ও মৃত্তিকা।

৫। ৫" ব্যাসের একখানি আঁইস।

৬। কোন জন্তুর একটি ৩" নখ।

৭। একটী ছোট মৃৎ ঘট।

৮। একখানি সরা।

৯। একটী পাত্রের ভগ্ন অংশ।

১০। গৌরহাটী প্রাসাদের ইষ্টক।

১১। ডাচ উপাসনা মন্দিরের ইষ্টক।

১২। দ্বিতীয় সেণ্ট লুই গীর্জ্জার ইষ্টক।

১৩। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লালদীঘির ঘাটের ইষ্টক।

১৪। অতি পুরাতন ক্ষুদ্রাকৃতি ইষ্টক।

১৫। প্রস্তরীভূত শামুখ।

১৬। কূয়ার জল হইতে প্রাপ্ত ধাতুময় দুর্গা মূর্ত্তি।

১৭। কয়েক খণ্ড অভ্র।

১৮। নন্দদুলালের মন্দিরের কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টক।

১৯। কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টক।

(ন) চন্দননগরের কোন কোন লোককে লিখিত কতকগুলি বিখ্যাত মৃত মহাপুরুষের পত্র

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। কালী প্রসন্ন ঘোষ, রায় বাহাদুর বিদ্যাসাগর সি, আই, ই।

৩। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি।

৫। রায় রসময় মিত্র বাহাদুর।

৬। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

৮। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

৯। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১০। ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

১১। মতিলাল ঘোষ।

১২। পিয়ারসন।

১৩। এলমহার্ষ্ট।

(প) বিবিধ

১। গুলির আড্ডার চিত্র।

২। তুরুঙ্গের চিত্র।

৩। প্রথম বিমানপোত যাহা চন্দননগরে অবতীর্ণ হয়।

৫। পেশী সঞ্চালন।

৬। চন্দননগরে প্রাপ্ত একটী প্রকাণ্ড ফাঁপা গোলা।

স

(ক) সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

১। প্রবর্ত্তক—১ম বর্ষ—১৩২২-২৩ হইতে ৯ম বর্ষ ১৩৩০-৩১ পর্য্যন্ত

২। ঐ নবःপর্য্যায় ১ম বর্ষ (১০ম বর্ষ)—১৩৩২ হইতে ১১শ (২০শ বর্ষ) ১৩৪২ পর্য্যন্ত

৩। The Prabartak—Vol. I 1931-32 Vol. II & IV 1932, 33, 35, 36.

৪। Standard Bearer—Vol. I 1920-21 to Vol. IV 1924 (New Serises) Vol. I 1927-28

৫। নবসঙ্ঘ—১ম বর্ষ—১৯২০-২১ হইতে ৪র্থ বর্ষ ১৯২৩-২৪

ঐ (নব পর্য্যায়)—১ম বর্ষ—১৯২৪-২৫

ঐ নব পর্য্যায় (পাক্ষিক পত্র) ১ম বর্ষ ১৩৩২ হইতে (৯ম বর্ষ) ১৩৪২ পর্য্যন্ত

৬। Nava Samgha—1924-25 (English)

৭। প্রবর্ত্তক অতিরিক্ত পত্র—১৩২৩—১৩২৫

৮। স্বাস্থ্য—৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষ—১৩৩২-৩৫ ; ৭ম ৮ম ও ৯ম বর্ষ—১৩৩৫-৩৮

৯। নাগরিক—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যা—২৫শে মাঘ ১৩৩৫—৪ঠা বৈশাখ ১৩৪০

১০। সেবক—১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ ২১শে মার্চ্চ ১৯৩২—২৮শে মার্চ্চ ১৯৩৫

১১। স্বদেশী বাজার—১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ভাদ্র-ফাল্গুন ১৩৩৫
১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—ফাল্গুন-শ্রাবণ ১৩৩৫-৩৬
২য় বর্ষ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৬

১২। তরুণ ভারত—১ম বর্ষ ১৯২৮-৩১

১৩। স্ফুলিঙ্গ ১ম বর্ষ ১৯৩১ ২ খানি

১৪। মাতৃভূমি—১ম, ২য় বর্ষ—১৯২৭—২৮ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বর্ষ—৪ঠা চৈত্র ১৩৩৫—২৯শে পৌষ ১৩৪১

১৫। প্রজাবন্ধু—১ম ভাগ, ৫ম—৩২ সংখ্যা ১৮৮৯-৯০

১৬। নিবন্ধ

১৭। বঙ্গপ্রভা—১ম খণ্ড, ১২৯৮

১৮। শারদীয়া মাতৃভূমি—১৩৩৭

১৯। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

২০। যুগধর্ম্ম—১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, চৈঃ বঃ ৪০৪

২১। বেদান্ত দর্পণ—১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩১৪

২২। Telegraph Review

২৩। ধূমকেতু

২৪। বঙ্গবন্ধু

২৫। চন্দননগর প্রকাশ

২৬। স্বাস্থ্য সখা

২৭। চন্দননগর পত্রিকা

২৮। Le Petit Bengali.

২৯। The Beaver.

৩০। Amateur Workshop.

৩১। Tit for Tat

৩২। তরুণ ভারত

৩৩। হিতসাধিনী

৩৪। অবকাশ বন্ধু

৩৫। বাহক

৩৬। পল্লীপ্রদীপ

(খ) চন্দননগর হইতে বা চন্দননগরের লোকের দ্বারা প্রকাশিত পুস্তক।

১। চন্দননগর ব্যাসযন্ত্রে মুদ্রিত—প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা ১৮৮৩
উৎপাথ—১২৮৯

২ বি, প্র, ভাণ্ডার—২ খানি

৩ গ্রন্থপ্রচার সমিতি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

৪। শ্রীমনোরঞ্জন নন্দীর দ্বারা প্রকাশিত ২ খানি

৫। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস—
(১) শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত ২৮ খানি
(২) শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রণীত ৭ খানি
(৩) ৺বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত ১ খানি
(৪) শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত ২ খানি

(৫) শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ১ খানি
(৬) ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, ডি এল প্রণীত ১ খানি
(৭) শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস প্রণীত ১ খানি
(৮) প্রফেসর পি, সি, সরকার প্রণীত ১ খানি
(৯) শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ১ খানি
(১০) শ্রীসুধাংশুকুমার রায় প্রণীত ১ খানি
(১১) শ্রীরাধারমণ চৌধুরী প্রণীত ১ খানি
(১২) শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ৩ খানি
(১৩) Sri Aurobindo Ghose প্রণীত ১৭ খানি
(১৪) শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত ১ খানি
(১৫) শ্রীহৃষীকেশ সেন প্রণীত ২ খানি
(১৬) ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রণীত ১ খানি
(১৭) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ৩ খানি
(১৮) শ্রীসাগরকালী ঘোষ প্রণীত ১ খানি
(১৯) শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রণীত ১ খানি

৬। পার্ল প্রেস—
(১) শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত গৃহদাহ
(২) প্রফেসার পি, মিত্র প্রণীত "Physics"

৭। বাণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্—
(১) শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রণীত কালনিদ্রা

(গ) চন্দননগরের গ্রন্থকারগণ ও তাঁহাদের রচিত পুস্তকের সংখ্যা

	গ্রন্থকারদিগের নাম	পুস্তকের সংখ্যা
১।	৺অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১১
২।	শ্রীঅভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
৩।	শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত	৭
৪।	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত	১
৫।	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১
৬।	শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	৩
৭।	স্বামী অঘোরানন্দ	১
৮।	শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাঁড়ুই	১
৯।	৺উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী	৪
১০।	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
১১।	৺কৃষ্ণমোহন মল্লিক	২
১২।	৺কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২
১৩।	৺কৃষ্ণদাস সুর	১
১৪।	শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১
১৫।	শ্রীকচেন্দ্রকুমার দত্ত	১
১৬।	৺কালীনাথ ঘোষ	৮
১৭।	৺কেশবচন্দ্র সাধু	২
১৮।	শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু	২
১৯।	শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১
২০।	ইউ, এন ভট্টাচার্য্য ও কে, সি, দেবধাড়া	১
২১।	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী	১
২২।	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী	১
২৩।	খোদাবক্স	১
২৪।	৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২
২৫।	৺গোবিন্দরাম দাস	১
২৬।	৺জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী (কাব্যানন্দ)	৮
২৭।	শ্রীগুরুদাস ভড়	২
২৮।	গুরুদাস ভড় ও এস, মুখোপাধ্যায়	১
২৯।	৺গিরীন্দ্রনাথ দত্ত	৫
৩০।	৺গৌরকিশোর কর	৩
৩১।	শ্রীগৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১
৩২।	৺মারিয়া গের্ঁ্যা	১
৩৩।	শ্রীচারুচন্দ্র রায়	৩
৩৪।	৺তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
৩৫।	৺ধর্ম্মদাস বসু	৩

৩৬।	৺নন্দলাল বসু	১
৩৭।	৺নীলমণি দত্ত	১
৩৮।	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৪
৩৯।	শ্রীননী লাল দে	১
৪০।	শ্রীনগেন্দ্র নাথ চন্দ্র	১
৪১।	প্রজাবন্ধু অফিস	২
৪২।	৺প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী	২
৪৩।	৺প্রমথ নাথ মিত্র	১
৪৪।	৺ প্রাণকৃষ্ণ সরকার	২
৪৫।	শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা	৫
৪৬।	৺ফরচুন ডেকস্তা	১
৪৭।	শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী	৩
৪৮।	৺বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী	৭
৪৯।	৺বি, সি মুখার্জ্জী	১
৫০।	৺বিজয় বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১
৫১।	৺বসন্ত লাল মিত্র	৪
৫২।	৺বীরেশ্বর ভাগবতাচার্য্য	১
৫৩।	৺বামা চরণ বসু	৪
৫৪।	শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১১
৫৫।	মঃ বুফার	১
৫৬।	শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	২
৫৭।	শ্রীমতি লাল লাহা ও বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১
৫৮।	শ্রীমতি লাল লাহা	১
৫৯।	৺ভূত নাথ সুর	১
৬০।	শ্রীভোলানাথ দাস	১
৬১।	শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী	৬
৬২।	শ্রীমহেন্দ্র নাথ নন্দী	১
৬৩।	৺মধু মাধব চট্টোপাধ্যায়	৪
৬৪।	শ্রীমতি লাল রায়	২৮
৬৫।	মিউনিসিপ্যালিটি চন্দননগর	১
৬৬।	শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত	১
৬৭।	৺মন্মথ নাথ কারক	১
৬৮।	৺যদু নাথ মুখোপাধ্যায়	১
৬৯।	৺যোগেন্দ্র লাল বসু	১
৭০।	শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দে	১
৭১।	শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়	৫
৭২।	৺যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য	১
৭৩।	৺রামচন্দ্র বসু	১
৭৪।	৺রামরত্ন দাস সরকার	৪
৭৫।	৺রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	১
৭৬।	৺রাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১
৭৭।	শ্রীরাধারাণী দেবী	১
৭৮।	শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
৭৯।	শ্রীরাজকুমারী দে	২
৮০।	শ্রীরাধারমণ চৌধুরী	১
৮১।	শ্রীললিত মোহন কর ও চারু চন্দ্র বসু	১
৮২।	৺শ্রীশ চন্দ্র বসু	১
৮৩।	শ্রীশ্রীশ চন্দ্র বসু	৫
৮৪।	৺শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী	৫
৮৫।	৺শিবকৃষ্ণ মিত্র	১
৮৬।	শ্রীশরৎ কুমারী দেবী	১
৮৭।	শ্রীশ্রীশ চন্দ্র সুর	২
৮৮।	শ্রীশ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	২
৮৯।	৺শ্যামাপ্রসাদ দত্ত ও রাখাল দাস চক্রবর্ত্তী	১
৯০।	শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১
৯১।	৺সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	২
৯২।	৺সাগর চন্দ্র কুণ্ডু	৬
৯৩।	শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ	১
৯৪।	শ্রীসন্তোষকুমার ভড়	২
৯৫।	৺সতীশচন্দ্র মিত্র	১
৯৬।	শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ	১০
৯৭।	শ্রীহরিহর শেঠ	৮
৯৮।	শ্রীহারাধন বক্সী	২

৯৯। ৺হরিদাস ঘোষ 8
১০০। ৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১
১০১। শ্রীহৃষিকেশ রক্ষিত ১
১০২। সুলেখা ৩
১০৩। ৺সদানন্দ ঠাকুর ২
১০৪। শ্রীসাগরকালী ঘোষ ১
১০৫। চন্দননগর সারস্বত সম্মিলনী ২
১০৬। প্রবর্ত্তক আশ্রম ২
১০৭। কমিতে রেপুব্লিক্যা রাদিকাল ১
১০৮। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১

(ঘ) চন্দননগরের গ্রন্থকারগণের মধ্যে কয়েকজনের চিত্র

১। কালীনাথ ঘোষ।
২। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। প্রমথনাথ মিত্র
৪। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ধীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী
৬। শ্রীশচন্দ্র বসু
৭। সাগরচন্দ্র কুণ্ডু
৮। মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়
৯। বসন্তলাল মিত্র
১০। শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী
১১। গৌরকিশোর কর।
১২। শ্রীশচন্দ্র সুর
১৩। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
১৪। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। চারুচন্দ্র রায়।
১৬। জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী।
১৭। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
১৯। হরিহর শেঠ।
২০। কালীপ্রসন্ন বসু।
২১। নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।
২২। বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়।
২৩। গিরীন্দ্রনাথ দত্ত।
২৪। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৫। রাধারাণী দেবী।
২৬। রাজকুমারী দে।
২৭। অরুণচন্দ্র দত্ত।

(ঙ) গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রদর্শনীতে প্রেরিত প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি

১। শ্রীরামপুর-কলেজ লাইব্রেরী

(১) সমাচার দর্পণ।
(২) কেরী সাহেবের লিখিত ব্যাকরণ।
(৩) ঐ Colloquies.
(৪) দিগ্‌দর্শন প্রথম সংখ্যা (হস্তলিখিত)।
(৫) Friend of India, Vol. I
(৬) কেরীর রামায়ণ।
(৭) কেরীর বাঙ্গলা অভিধান।
(৮) Pilgrims Progress—১৮২৮
(৯) কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ।
(১০) ব্রহ্মপুরাণ (হস্তলিখিত)।
(১১) অগ্নিপুরাণ ঐ
(১২) Carey—Polyglot Vocabulary.
(১৩) Rasa Ragheem.
(১৪) Geeta Govinda.
(১৫) Narottam Thakur's Prayer.
(১৬) Goure Mongal.

২। বালি সাধারণ গ্রন্থাগার

(১) সতী নাটক ১৮০৪
(২) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী •
(রাজীব চরণ মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক লিখিত)

(৩) পঞ্চদশী (শ্রীমদ্ভারতীর্থ বিদ্যারণ্য গুণিস্কৃতা) ১৭০৫
(৪) অভিধান (ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটী) ১৮৫১
(৫) অন্ধের চক্ষুদান ১২৮৬

৩। উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার

(১) ইতিহাস সার সংগ্রহ রবিন্‌সন ১৮৩২
(২) ঐ (২য়) ,,
(৩) গ্রীসদেশের ইতিহাস (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ) ১২৬৪ বাং
(৪) অর্জ্জুনের গৌরব ভঞ্জন ১২৬৩
(৫) ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রথম অঃ) মিষ্টার মার্শম্যান ১৮৩১
(৬) ঐ (২য়) ,,
(৭) রাজাবলী (মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা) ১৮৩৮
(৮) শিশু সেবধি (যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়) ১২৪৭
(৯) গঙ্গার খালের সংক্ষেপ বিবরণী—রবিন্‌সন্
(১০) বিদ্যাকল্পদ্রুম ৪র্থ বাঃ ১৮৪৮ ১৮৫৮
(১১) ঐ নবম ১৭৮০
(১২) ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে (কালীদাস মৈত্র) ১৮৫৫
(১৩) গোলে বকা অলি (উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র) ১৭৮০ শকাব্দ
(১৪) মনোদীক্ষা সুধাতরঙ্গিনী (রসিক চন্দ্র রায়) ১৭৩০ শকাব্দ
(১৫) সঙ্গীত রসার্ণব (জনমেজয় মিত্র) ১৭৮২ শকাব্দ
(১৬) প্রাচীন ইতিহাস ১৮৩০
(১৭) ইতিহাস সার ১ম খণ্ড (নীলমণি বসাক) ১৮৫৯
(১৮) বিধবা বঙ্গাঙ্গনা (হরিশ্চন্দ্র মিত্র) ১৮৬৩
(১৯) সব্বার্থ পূর্ণ চন্দ্র (সাময়িক পত্রিকা) ১২৬২
(২০) সত্যার্ণব ১৮৫১
(২১) জ্ঞানারুণোদয় ১৮৫২
(২২) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ১২৫৮

৪। চন্দননগর পুস্তকাগার

(১) হরিহর মঙ্গল
(২) ইতিহাস মালা কেরীর ১৮১২
(৩) গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ১৭২২ (হস্তলিখিত পুঁথি)
(৪) দায়ভাগ ব্যবস্থা
(৫) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (পুঁথি)
(৬) কুসুমাবলী—মহেন্দ্রনাথ রায় ১২৫৮
(৭) কনেকষ্ট্রকসন (আইন পুস্তক) রাধারমণ বসু ১৮৪২
(৮) ভারতবর্ষের ইতিহাস মার্শমান ১৮৩১

প্রাচীন সাহিত্য

চন্দননগর পুস্তকাগার—

কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নীলঞ্জন ইতিহাস—১২৬৬ বাঃ

নারায়ণ চট্টরাজের কলিকুতূহল নামক গ্রন্থ—১২৬০

শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস—১৮২৯ ইং

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের
প্রবোধ চন্দ্রিকা—১৮৪৫ ইং
গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক
গৌড়ীয় ভাষায় প্রণীত
প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক—১৭৭৪ ইং
কাশীনাথ বসু কর্ত্তৃক
সংগৃহীত
বিজ্ঞান কুসুমাকার আদিখণ্ড—১৭৬৯ শকাব্দ
রামনিধি গুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত
গীত-রত্ন গ্রন্থ—১২৫৯
কালিকা পুরাণ পুঁথি—১৩৬২ শকাব্দ
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে
নারায়ণ নারদ সংবাদ—ঐ
মাহভারত দুইখণ্ড—ঐ ১১৯৬ বাং
ভারত সেন কর্ত্তৃক
ভট্টিকাব্য টীকা– ৪র্থ সর্গ
ঐ —৪ম „
মেঘদূত পুঁথি—১৬৩২
রোগবিনিশ্চয় নাম গ্রন্থ— ঐ
পঞ্চপক্ষী গ্রন্থ— ঐ
একাদশী তত্ত্ব—ঐ (১৭৩১ শকাব্দ)
অমর সিংহের নামা-লিঙ্গানুশাসন—ঐ
সূর্য্য শতকং—ঐ
রত্নাবলী সাহিত্য—ঐ
মনুসংহিতা
কুল্লুকভট্ট বিরচিত টীকা—ঐ

৫। দশভূজা সাহিত্য মন্দির—

Education Gazette
সং ১২৮—১৩৩, ১৩৫—৬৫
১৬১—১৭৫
লীলা—শ্রীশচন্দ্র বসু

শ্রীদ্বৈতভঞ্জন ভট্টাচার্য্য
রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা
কাব্যের প্রথম সংস্করণ
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রেরিত
মূষা লিখিত আদি গ্রন্থ—১৮৫৯

প্রাচীন সাহিত্য

৮। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত

(ক) প্রথম মুদ্রিত ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক

১। হালহেড ব্যাকরণ ১৭৭৮
২। বত্রিশ সিংহাসন ১৮১২
৩। মহাভারত ১৮০২
৪। ভদ্রার্জ্জুন ১৭৭৪
৫। জ্যোতিষ গোলাধ্যায় ১৮১৯
৬। তোতা ইতিহাস ১৮১২

(খ) সাহিত্যিকগণের লিখিত পত্রাদি

(১) ভারতচন্দ্র ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র
(২) রাণী ভবানী
(৩) হেমচন্দ্র
(৪) দীনবন্ধু
(৫) রমেশচন্দ্র
(৬) নবীনচন্দ্র

(গ) পুরাতন দলিল ও তাম্রশাসন

(১) প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দদেবের
দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল
(২) লক্ষণসেনের তাম্রশাসন

চন্দননগরের গ্রন্থকারদের লিখিত কতিপয় অপ্রকাশিত গ্রন্থ ইত্যাদি

সারস্বত আশ্রম কর্ত্তৃক প্রেরিত—

১। রাধাবিনোদ কর
- ভক্ত প্রহ্লাদ
- ভক্ত ধ্রুব
- রামদেব মিশ্র
- কাশীধাম
- ৺বৈদ্যনাথ দর্শন
- গয়াধাম
- জীবনারত্ন

২। গৌরকিশোর কর
- রত্নাকর (নাটক)
- ভাগবতপ্রতিষ্ঠা (নাটক)
- সরলা (কাব্য)
- রহস্যমালা
- সঙ্গীত-দশক
- কঠোপনিষদ্ অনুবাদ

৩ ফটিকলাল দাস
- সংস্কৃত সুভাষিতমুক্তাবলী
- ধাতুরূপ-প্রদর্শিকা

৪ বলাইচাঁদ দে
- নজরবন্দীর খাতা

৫। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- What is Hinduism

বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
- কতকগুলি প্রবন্ধ

নীলিমা দেবী
- একটি গল্প

৮। শরচ্চন্দ্র দত্ত
- বৃটীশ চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৯। নন্দোৎসব

১০। ৺সূর্য্যকুমার মোদক
- রাধাগোবিন্দ গীতা বা বৃন্দাবনের আদি কথা।

১১। ৺সুরেন্দ্রনাথ পাল—
- হস্ত লিখিত বই।

(ক) পুতুল মূর্ত্তির আলোক চিত্র

(১) কুম্ভকারের প্রস্তুত মাটীর পুতুল।

(২) গ্লাসগো প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত বসন্তলাল মিত্রের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

(৩) মৃৎশিল্পী, বনবিহারী দত্তের নির্ম্মিত মাতৃমূর্ত্তির প্রতিলিপি।

(৪) মৃৎশিল্পী, গোষ্ঠবিহারী দাসের নির্ম্মিত সরস্বতী-মূর্ত্তির প্রতিলিপি।

(৫) ঐ

(৬) মৃৎশিল্পী, বনবিহারী দত্তের নির্ম্মিত স্যার আশুতোষ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মূর্ত্তির প্রতিলিপি।

(৭) সারস্বত উৎসবে রক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের মূর্ত্তির প্রতিলিপি।

(খ) পেটেন্ট ইত্যাদির আলোক-চিত্র

(১) কুণ্ডুপাল কোম্পানীর পেটেন্ট

(২) তারের রাস্তার চিত্র

(৩) ঐ আর একটী

গ প্যাটেণ্ট ইত্যাদির নমুনা

(১) মেঃ গোপাল চন্দ্র দাস প্রস্তুত—

(ক) এ্যাণ্টিফ্রিক্সান হোয়াইট বেয়ারিং মেটাল

(খ) ব্লকটিন (গ) সোল্ডার

(ঘ) স্যানিটারী ফিটিং

(ঙ) জলকলের মুখ

(চ) ফিউসিজিবিন এ্যায়র

(ছ) তামা

ঘ—শিল্প সম্বন্ধে কয়েকখানি

আলোক চিত্র

(১) মৃণালিনী বস্ত্রালয়

(২) আধুনিক তাঁত

(৩) শণের দড়ি কাটা

(৪) নারকেল গুড়ান

(৫) দুই জন বিখ্যাত তন্তু শিল্পী

(১) বঙ্কনাকান্ত ভড়

(২) স্বর্ণ স্ব চরণ সাহা

(৬) গোন্দলপাড়া জুট মিল

ঙ—চিত্র-শিল্প

আশুতোষ মিত্র

(১) আনারস (কাটা) তৈল চিত্র

(২) আনারস (water colour)

(৩) তালডাঙ্গা তাউতখানা বাগানের বাংলায় প্রথম ফরাসী পত্তনীর স্থান

(৪) নন্দদুলালের মন্দির

(৫) কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির

(৬) কে ডুপ্লেক্স, চন্দননগর ১৮৯০

(৭) চন্দননগর, ১৭৫৬

(৮) প্রাকৃতিক দৃশ্য

(৯) চন্দননগর ১৮৭০

(১০) চন্দননগর ১৮০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে

(১১) অর্লেয়া দুর্গ

(১২) নাড়ুয়ার দ্বাদশ মন্দির

(১৩) গরুটির প্রাসাদ

(১৪) চন্দননগর ১৭৫৬ খৃ পূর্বে

(১৫) কে ডুপ্লেক্স, চন্দননগর

(১৬) চন্দননগর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে

(১৭) প্রাকৃতিক দৃশ্য

(১৮) ঐ আর একখানি

(১৯) ঐ „ „

(২০) গঙ্গার দৃশ্য

অনুকূল সরকার

(২১) প্রাকৃতিক দৃশ্য (তৈল চিত্র)

(২২) „ „

(২৩) „ „

(২৪) স্ট্রেণ্ডের দৃশ্য „

রাসবিহারী মিত্র

(২৫) প্রাকৃতিক দৃশ্য (water colour)

বিনয় কুমার দত্ত

(২৬) প্রাকৃতিক দৃশ্য

শরৎচন্দ্র ঘোষ

(২৭) প্রাকৃতিক দৃশ্য

(২৮) স্বামী কেশবানন্দ

(২৯) ঐ

R. Bertand

(৩০ চন্দননগর ১৮২০ শতাব্দীর চিত্রের প্রতিলিপি

অবিনাশচন্দ্র ধর

(৩১) চন্দননগর গঙ্গার ধারের চিত্র

বনবিহারী দত্ত

(৩২) বংশরী শিক্ষা

আশুতোষ মিত্র

(৩৩) কাশীনাথ ঘোষের প্রতিকৃতি (তুলির কায)
(৩৪) অপরচারিজম ব্যক্তির প্রতিকৃতি ''
(৩৫) পাচটি প্রতিকৃতি ও একটি দৃশ্য (pen & ink sketch)

অনুকূল সরকার

(৩৬) প্রসাধন (তৈল চিত্র)
(৩৭) ঐ (water colour)
(৩৮) গ্রিসীয় পৌরাণিক চিত্র (তৈল চিত্র)

বেণীমাধব পাল

(৩৯) সুবল বেশে রাধিকা
(৪০) শ্রীরাধাকৃষ্ণের মালা দান

বসন্তলাল মিত্র

(৪১) শিল্পীর নিজের হাতে আঁকা নিজের প্রতিকৃতি
(৪২) কলিকাতার যোগেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের প্রতিকৃতি
(৪৩) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিকৃতি

এককড়িলাল সোম

(৪৪) পার্বত্য নির্ঝরিনী বর্ণ চিত্র
(৪৫) চন্দ্রমা নিশী (পেন্সিল)
(৪৬) হ্রদের তীরে (মসী চিত্র)

সুধীরচন্দ্র ঘোষ

(৪৭) মাকড়সার জাল
(৪৮) পুষ্প র্ম

মৃণালকুমার ঘোষ

(৪৯) Charwel studies
(৫০) Calenders
(৫১) X' Mas Cards
(৫২) Menco ends
(৫৩) Miniature product of some of the famous pictures of the World
(৫৪) Coloured facsimile of models awarded to famous soldiers of great battles of the World

গোষ্ঠবিহারী দাস

(৫৫-৫৬) Still life (water colour) ২ খানা
(৫৭-৫৮) Life study (oil colour) ২ খানা
(৫৯) Landscape "Sun set" ১ খানা

চিত্র-শিল্প

সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায়—
(৬০) পাখীর ছাব (water colour)
(৬১) পল্লী চিত্র তৈল চিত্র

অদ্বৈত দাস বরাজী—
(৬২) ক্রেমে বাঁধান ছবি রাধাকৃষ্ণ
(৬৩) ঐ পঞ্চতত্ত্ব

রাসবিহারী মিত্র—
(৬৪) দেওয়ালের চিত্র বিক্রাপনী

গোপাল চন্দ্র কুণ্ডু—
(৬৫-৬৭) গাছের পাতা ও ফুলের রসে আঁকা চিত্র ৩ খানি

চ আলোক-চিত্র ও Enlargement

১। ভূপেন্দ্রনাথ কুমার—
১। সরস্বতী মূর্ত্তি ১৭"×১৩"
২। নিদ্রিত শিশু

২। জি, কুণ্ডু—
৩। উদিত ভাস্কর
৪। হামাগুড়ি দেওয়া শিশু
৫। গিরীশ চন্দ্র ঘোষ
৬। দ্বিজেন্দ্র লাল রায়
৭। সিংহ

৩। গদাধর দত্ত—
৮। বারেদোয়ারীর ঘড়ীঘর

৯। পাণ্ডুয়ার মিনার
১০। হরিপালের ভোলার গীর্জ্জা
১১। ঘোষপাড়া হিমসাগর পুকুর
১২। চন্দননগরের গঙ্গার দৃশ্য
১৩। শ্মশানের দৃশ্য

মৃৎ-শিল্প

বনবিহারী দত্ত— রামকৃষ্ণ পরমহংস
গোষ্ঠ বিহারী দাস—
মহাত্মা গান্ধি
কবি রবিন্দ্র নাথ
গৌর কিশোর কর
আশুতোষ মিত্র
কৃষ্ণ ভাবিনী
ঐ আর একটি
করমী প্রজা তন্ত্রের প্রতীক
ঐ আর একটি
হরিহর শেঠ
জয়দেব পাল— লক্ষ্মী সরস্বতী
গোপাল চন্দ্র পাল—
রাধাকৃষ্ণ
কুকুর বাহিনী পুতুল

জ—সূচিশিল্প

মনোরঞ্জন ভড়— একটি ফুল
ফুলের সাজী
মন্মথ নাথ দাস— ওঁ কার

ঝ—মহিলা শিল্প

১। গোস্বামীপাড়ার শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বাবুর জনৈক মহিলার শ্রীকৃষ্ণের ছবি হাতে আঁকা
সূচী শিল্পের কাজ
২। লালবাগান বালিকা বিদ্যালয়
কয়েকটী সূচী শিল্পের নিদর্শন
৩। সুহাসিনি বসু—
কেশ ও বেশভূষা ফ্রেমে বাঁধা ছবি
৪। বীণা দে—
ভেলভেটের টগর
সূচে বোনা ময়ূরের ছবি
৫। শোভা ভড়—
উলের বোনা সরস্বতীমূর্ত্তি
কাপড়ের উপর সূচের বোনা কৃষ্ণরাধিকা মূর্ত্তি
সূচের কারুকার্য্য Table cloth.
৬। নির্ম্মলা দেবী—
পুঁথির সজী ও পশমের ফুল
৭। উমা দেবী—
ফ্রেমে বাঁধান ছবিতে কেশ ও বেশভূষা
৮। শিবানী দেবী—
সূতার আসন— মৃগ
ঐ অশ্ব
৯। শোভা দেবী—
পশমের জবা ও জবির ফুল
খদ্দরের Table cloth এ ফুল তোলা
১০। ৭৪ বৎসরের মহিলার দ্বারা প্রস্তুত উলের ছবি (ফ্রেমে রাধিকা)
১১। যুথিকা দেবী ও নিলীমা দেবী—
দুইখানি Table cloth ও একটি chinese shed.
১২। সুহাসিনি ঘোষ—
ফ্রেমে বাঁধান ছবিতে কেশ ও বেশভূষা
১৩। আভারাণী শেঠ—
এম্‌ব্রয়ডারি—ফল ও ফুল
সূতা শিল্প – রাজার হাঁস
১৪। বাসন্তি বালা কুণ্ডু
গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়া
কৃষ্ণ

১৫। নিরুপমা কুণ্ডু—
আদম

১৬। নির্ম্মলা পাল—
সোণার পাখী রুপার পাখী (সূচী-শিল্প)
সরস্বতী (জরীর কাজ)

১৭ সাবিত্রিবালা শেঠ—
(সূচী শিল্প)

১৮। কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির

জরির কাজ

১। সরস্বতী (ছবি) ... ... ১টী
২। বক (ছবি) ... ... ১টী
৩। প্যাড .. .. টী
৪। জররি সূতার কাজ-নমুনা ... ১টী
৫। বাক্স .. .. ১টী
৬। হাঁস (ছবি) .. ... ১টী
৭। পিন কুশান ... .. ১টী

পুঁথির কাজ

৮। ব্যাগ ... ... ১টী

আঁশের কাজ

৯। শৃগাল ও দ্রাক্ষালতা (ছবি) ... ১টী
১০। হাঁস—(ছবি) ... ... ১টী

নেটের কাজ

১১। ডয়লী ... ... ২খানি
১২। আয়না ঢাকনী ... ... ২খানি
১৩। কুশান কভার ... ... ১টী

রিবনের কাজ

১৪। বাক্স ... ... ২টী
১৫। ব্যাগ ... . ১টী

এরোসিনের কাজ

১৬। পাখী (ছবি) ... ... ১টী
১৭। কুশান ... ... ১টী

তুলার কাজ

১৮। ময়ূর (ছবি) ... ... ১টী

পিক্টোগ্রাফ

১৯। মুরগী ... ... টী
২০। দৃশ্য .. .. ১টী

ক্রস্‌ষ্টিচের কাজ

২১। ফুলের তোড়া (ছবি) ... ১টী

ইণ্ডিয়ান এমব্রয়ডারী

২২। ব্লু উস্ পিস্ ... ... টী

স্যাণ্ডো ওয়ার্ক

২৩ ডয়লী ... ... টী
২৪। কুশান কভার ... ... ১টী

ড্রনথ্রেডের কাজ

২৫। টেবিল ক্লথ .. ... ১টী
২৬। ট্রে কভার ... ... ১টী
২৭। নমুনা ... ... ১টী

সূচী-কার্য্য

২৮। ট্রে ক্লথ ... ... ১টী
২৯। পিন কুশান ... ... ১টী
৩০। ফ্রেম ... ... ২টী

পশমের কাজ

৩১। পাখী (ছবি ... ... ১টী
৩২। আরতি (ছবি) ... ... ১টি

চিকনের কাজ

৩৩। ট্রে ক্লথ ... ... ১টী
৩৪। নমুনা ... ... ২টী

সূচী-কার্য্য

ছবি—

৩৫। বিবেকানন্দ ২
৩৬। গান্ধী ২

৩৭। রাজা রামমোহন রায় ... ২
৩৮। কমলাদেবী ১
৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪
৪০। পরমহংস ১
৪১। চন্দ্রমল্লিকা ১
৪২। শিশু ও কুকুর ১
৪৩। পাখী ১
৪৪। ময়ূর ১
৪৫। পাঠ ১
৪৬। পুরীর মন্দির ১
৪৭। মন্দির ও মসজিদ ... ১
৪৮। কৃষ্ণ ১
৪৯। তাজমহল ৩
৫০। মন্ট্রো ১
৫১। ভারতমাতা ১
৫২। ফুলের তোড়া ৬
৫৩। ফুলের সাজি ১
৫৪। হাঁস ১

চিত্রাঙ্কণ

৫৫। সূর্য্যমুখী (ছবি) ... ১টা
৫৬। টিউলিপ (ছবি) ... ১টা
৫৭। লিপি (ছবি) ... ১টা
৫৮। লিলি (ছবি) ... ১টা

শিল্প আর্ট

৫৯। ট্রে ... ... ২খানি
৬০। ডয়লী ... ... ১টা

মাটীর কাজ

৬১। গোলাপ ফুল ১
৬২। হংস ১
৬৩। ডালিয়া ফুল ১
৬৪। রজনীগন্ধা ১
৬৫। কস্‌মস্‌ ১
৬৬। কাঁকড়া ১
৬৭। পদ্মফুল ১
৬৮। মাগুর মাছ ১
৬৯। চিংড়ি মাছ ১
৭০। লিলি ফুল ১
৭১। কাঞ্চন ফুল ১
৭২। ব্যাঙ ১
৭৩। পোনা মাছ ১
৭৪। কমরাঙ্গা ১
৭৫। কলা .. .. ১টা
৭৬। শিম ৪
৭৭। মটরশুটি ২
৭৮। পানফল ২

বেতের কাজ

৭৯। দোলনা ১
৮০। সুটকেস ১
৮১। ট্রে ৩
৮২। চেয়ার ১
৮৩। লাঠি ১
৮৪। সোডাওয়াটারের কেরিয়ার ১
৮৫। এটাচীকেস ১
৮৬। সেলাইএর বাক্স ... ১
৮৭। সাজি ২
৮৮। ফলের সাজি ১

চামড়ার কাজ

৮৯। পোর্ট ফোলিও ৩
৯০। ব্যাগ ৩
৯১। বইয়ের ঢাকনী ১
৯২। ছোট ব্যাগ ৩

শ্রীমতী শোভারাণী শেঠ

সূচীশিল্প—

৯৩। হাতী

২৪। ময়ূর ১
২৫। ফুল ১
২৬। পিক্টোগ্রাফ ১

ঞ—ধাতুর মাটীর, গালার ও কাঠের মূর্ত্তি, পুতুল ইত্যাদি

(১) অদ্বৈত দাস বাবাজীর প্রস্তুত—
মাটির— সখী
ময়ূর
গরু
কাঠের— চতুর্দ্দোলা
বানর
হরিণ
হাঁস
টিয়া পাখী
দাঁড় বসা পাখী

(২) সুধীর চন্দ্র ঘোষের প্রেরিত—
দেবদারু কাঠের পাখী

(৩) নীলমণি পালের প্রেরিত—
কাঠের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি

(৪) প্রবোধ চন্দ্র দত্ত প্রেরিত—
গালার ময়না পাখী

(৫) একটী প্রবাল গালার দল ৬ পাখী

ট—কাঠের খেলনা

যতীশ চন্দ্র দত্তের তৈয়ারী—

(১) স্নানের সময়ের খেলনা
(২) ছবির ধাঁধা
(৩) বিভিন্ন গতিযুক্ত দুই প্রকার খরগোস
(৪) ঘোড়া
(৫) উট
(৬) হাঁস দুই প্রকার
(৭) উড়ো জাহাজ
(৮) কাঠের ধাঁধা
(৯) গতিশীল বালক

ঠ—কেশ তৈল, আলতা প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য

(১) অক্ষয় কেমিক্যাল ওয়ার্কস—
তরল আলতা, Blue Black কালী, লাল কালী, টুথ পাউডার, কেশ তৈল।

(২) চন্দ্র কেমিক্যাল ওয়ার্কস—
তরল আলতা ৩ প্রকার, স্নো ২ প্রকার, Cream ২ প্রকার, কেশ তৈল ৫ প্রকার, Tooth Powder, গন্ধ দ্রব্য ৬ প্রকার, গোলাপ জল, Eau-de-cologne.

(৩) সুবোধ কুমার চৌধুরীর প্রস্তুত—
সুবাসিত নারিকেল তৈল ও তিল তৈল, Eau-de-cologne, Hari Cream ২ প্রকার, গন্ধ দ্রব্য।

(৪) ফ্রেঞ্চ কেমিক্যাল ওয়ার্কস, নডুয়া—
কুন্তল পুষ্প কেশ তৈল, ফ্রেঞ্চ ক্যাষ্টর অয়েল।

(৫) দি ফ্রেঞ্চ কেমিক্যাল ওয়ার্কস, কং দে বেনারস—
সুবাসিত নারিকেল তৈল ও তিল তৈল, কাপড় কাচা সাবান ৬ প্রকার, টার্কিশ বাথ সোপ।

ড—দিয়াশলাই

Manufacture Francaise des Allumettes Clumiques

দিয়াশলাই ... ... ২ ডজন
দিয়াশলাইএর খালি বাক্স ... ২৬টা।

কাঠী ... ... ৵১ সের
ডিনিযারা ... ... ৵১ সের

চ—কাঠের তৈয়ারী আসবাবপত্র

১। Tarak Chandra Dass—
Fancy chair
Whatnot
Lag suite
Carel settie Victoria legs
Bed-stead.

২। K. K. Dassı—
মেহগনীকাঠের অফিস বুনাস
ঐ গদা আঁটা
সেগুন কাঠের বেহাতা
ঐ আর একটী
পিয়ানো টুল (ভিক্টোরিয়া পায়া)
ঐ (প্লেন পায়া)
মিরার ডোর আলমারি।

৩। প্রবর্ত্তক— ব্রাকেট .. ২টি
স্ত্রী মূর্ত্তি ... ১টি
টি পয় ... ১টি
জাপানী চেয়ার ১টি
অন্যান্য আসবাব ৩টি

৪ Dass & Co.— টেবিল ১টি, চেয়ার ২ খানি, ছোট আলমারি ১টি, পেগ টেবিল ১টি।

৫। Jamini Kanta Dass & Co.—
Secreteriat writing table, Writing lefts, Fancy chair 2, Hardington chair, Peg table, Revolving chair.

৬। B. N. Nandy & Co.—
Cubic art hat book stand.

ণ—"ফ্রেট ওয়ার্ক" কাঠের কাজ

শিল্পী শ্রীফটিক লাল দাস

১। ঘড়ি রাখিবার বিচিত্র আধার
২। ঐ (ছোট ঘড়ি রাখিবার)
৩। "জাহাজ" আয়না ফ্রেম
৪ "সামুদ্রিক পক্ষী" আয়না ফ্রেম
৫। আয়না সহিত পয়সা জমাইবার গুপ্ত কল বাক্স
৬। "যোড়স লুই" ফটো ফ্রেম
৭। "বন-হরিণ" ফটো ফ্রেম
৮। দ্রাক্ষালতাবৃত ফটো ফ্রেম
৯। ড্রয়ার সহ ফটো ফ্রেম
১০। ইংরাজী মাস তারিখ সহ ঘড়ি ক্যালেণ্ডার
১১। খেলনা—পাগলা ঘোড়া
১২। হরিণ
১৩। "যুগল পক্ষী"—ক্যালেণ্ডার ফ্রেম
১৪। দেওয়াল ব্র্যাকেট
১৫। কাঠের ছুরি, চারি রকমের কাঠ জুড়িয়া

ত - গ্রামোফোনের রেকর্ডের গান

শ্রীমতী প্রফুল্ল কুমারী দেবী ও শ্রীহীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের
Duet song—১ খানি রেকর্ড

শ্রীহীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান - ৩ খানি রেকর্ড

থ—বস্ত্র-শিল্প

(১) বটকৃষ্ণ ঘোষের কাপড়ের কলের প্রস্তুত—
১। জরি পাড় শাটী
২। Table Cloth
৩। তোয়ালে
৪ অন্যান্য নমুনা
(২) কতকগুলি কাপড়ের নমুনা
(৩) বিবিধ প্রকার ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের পাড়ের নমুনা—৪৪ প্রকার
(৪) ৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত ফরাসডাঙ্গার কাপড়
(৫) মিহির লাল দত্তের প্রেরিত—
ফরাসডাঙ্গার ধোয়া ও কোরা কাপড়
(৬) প্রবর্ত্তক আশ্রমের প্রেরিত খদ্দর

দ—ছাটকাট

Paul Brothers, Hand Embroiders & Tailors এর প্রেরিত—

Dressing Jacket, Vest, Chemise, Table cloth, Bed sheets, Pillow-cases.

ধ—Grind stones Sharpening stones etc.

P. C. Mukherjee—Grind stone
Emery wheel
Sharpening stone
Gange slips
Oil stone
Pumice stone
Pumice Block

B. K. Paul & Bros.—
Grind stone— 1 piece
At stones — 2 pieces
Carbirudums— 2 pieces
Taper seythe stone—1 piece
Scythe stones— 4 pieces

ন—বিবিধ সংগ্রহ

(১) দড়ির নমুনা ৫ প্রকার
(২) পূর্ব্বেকার অ রসী প্রস্তুতের নমুনা
(৩) শাঁখার নমুনা—২ জোড়া
ঐ আংটী ২ টা
(৪) জাঁতি, কাটারী
(৫) পূর্ব্বেকার প্রস্তুত চন্দননগরের কাগজের নমুনা
(৬) ঠাকুরের মাটীর সাজের নমুনা— ১৪ প্রকার
(৭) কাঠের নমুনা ২১ প্রকার
(৮) কাগজের নেগেটীভ ও উহা হইতে ছবি
(৯) বিবিধ প্রকার মুদ্রা
(১০) বৃটিশ চন্দননগরে প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্ত্তি
(১১) প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্ত্তি
(১২) সন্তোষ নাথ শেঠের প্রেরিত— পকেট ছুরী
(১৩) হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি ও কৌটার নমুনা বিভিন্ন প্রকার
(১৪) নাম লেখা কতকগুলি সেফটিপিন
(১৫) পিতলের ও লোহার তালা
(১৬) ডাক্তারী অস্ত্র—২টী
(১৭) কাঁচের চুড়ী
(১৮) ঘোড়া বুট পলিশ
(১৯) বিজলী সাবান
(২০) কুমার পঞ্চানন শর্ম্মা প্রেরিত —
১৭২৪-২৬এর প্রস্তুত একটি পুরাতন একনলা ছোট বন্দুক
(২১) ১৮০৩-০৪এর প্রস্তুত একটি দোতলা প্রদীপ
(২২) ১৮২৪-২৬এর প্রস্তুত একটি তিলাধার
(২৩) তিনটি পুরাতন মুদ্রা
(২৪) শ্রীবিভূতি চরণ শেঠের দ্বারা প্রেরিত — ফরাসী কোম্পানীর বারুদ প্রস্তুতের পুরাতন যাঁতা
(২৫) শ্রীহরিহর শেঠ —
প্রকৃতির খেয়াল
(২৬) Administrator M. Chambon—নিকট হইতে প্রাপ্ত—অংশ পোঁটা
(যাহা ডুপ্লেক্সের সহিত ব্যবহৃত হইত)
Madam Grant এর প্রতিকৃতি
(২৭) Angus & Co. দ্বারা প্রেরিত—
গৌরহাটি প্রাসাদের প্রতিকৃতি
(২৮) লণ্ডন মেডিক্যাল এজেন্সী—
টিঞ্চার ব্রায়োনিয়া
" আরগট
" বেচু ইত্যাদি
১০ বোতল
(২৯) সোনার মুকুট (অদ্বৈত দাস বাবাজী প্রেরিত)

প—দ্বিজেন্দ্র নাথ পালের প্রস্তুত সিগারেট—৪ কৌটা

সিগারেট প্রস্তুতের উপকরণ

ফ সেট ব্রাদার্সের প্রস্তুত—
লোহার কাটারী, কুড়ুল, কম্পাস

বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ

আমি আমার নিজের শরীরের অপটুতার জন্য লজ্জিত। বারংবার আমাকে এই নিবেদন করিতে হয় যে, আমি অক্ষম। অক্ষমতার ঘোষণা কোন কালেই সুখকর নয়, গৌরবজনকও নয়; কিন্তু আমার সে বয়স হয়েছে, যখন আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। গৃহস্থ যখন বৈভবসম্পন্ন থাকে, তখন চারিদিকের নানা দাবী সহজে এবং আনন্দের সঙ্গে সে স্বীকার ক'রে নেয়। এমন দিন পরে আসে যখন তার তহবিল ক্ষয় হয়ে যায়; কিন্তু বাহিরের দাবী বন্ধ হয় না, সেই সময় সেই দাবী যদি ফিরিয়ে দিতে হয়, তবে তাঁরা দয়া করেন না—কৃপণতার অভিযোগ করেন। সেই জন্য বারংবার আমার শারীরিক দীনতা নিবেদন করা সত্বেও নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি নি, তাই স্বীকার করে নিয়েছি; আর এই পরিচিত পথ বহন করে চলেছি ক্ষীণ জীর্ণ দেহ নিয়ে; ভগবান আর কিছু দিন আর নেই দিন কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আর একখানি কণ্ঠ দিয়েছেন; কিন্তু আর আমার বেশী দিন নেই; হয় ত বা এই শেষ।

আজকে আমার প্রতি ভার অর্পণ করেছেন এই সম্মেলনের উদ্বোধনের। উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর এক দিনের কথা এল। সেই সময় এই শহরের এক প্রান্তে একটা জীর্ণ-প্রায় বাড়ী ছিল; সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম। তারপর মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘ কাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে, এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন। সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করেছিলেম যে, বাঙালা দেশের নদীই বাঙালা দেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে। শহরের ইট কাঠের আধুনিক যুগের দানবীয় দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেম বাল্যবয়সে, তারই মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। অনেককে দেখি, শহরের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন, এই অবরোধ তাঁদের দুঃখ দেয়নি কিন্তু আমাকে প্রথম থেকে তা একান্তভাবে দুঃখ দিয়েছিল—অবরুদ্ধ করেছিল আমার চিত্ত। যে চিত্ত উন্মুক্ত আকাশে পাখীর মত উড়ে যেতে চাইত—তা ছিল অবরুদ্ধ। কিন্তু তার ভিতরে ডানা ছিল সে সহজে স্বীকার করেনি এই অবরোধ। দৃষ্টি প্রসারিত করেছে দূর আকাশের দিকে, অজানা মুক্তির সন্ধানের আশায়। তারপর কলিকাতায় ডেঙ্গু-জ্বরের আবির্ভাব হয় এবং আমাকে পেনিটির বাগানে আনা হয়। তখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আমার সঞ্চরণ ও স্বাধীন বিহার আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই বাঙালার নদী আহ্বান করেছিল বিশ্বপথে। আমার চিত্তের যথার্থ উদ্বোধন হ'ল সেই সময়—বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে। বিশ্বের সুরে সুর বাঁধবার উপলক্ষ পেলাম আমি তখন। যেমন

কারাগারে যখন রাজবন্দিগণ বন্দী-জীবন যাপন করে তখন তাদের সমস্ত চিত্ত থাকে অবরুদ্ধ, বেরুতে পারে না—তেমনই আমারও সেতার-যন্ত্র ছিল, কিন্তু বিশ্বের সুরে তার সুর বাঁধার উপলক্ষ পাই নি; সেতার পড়ে ছিল, তার বাঁধা হয়নি, সুর ধরা হয় নি। সেই মুক্তি পেয়েছিলাম আমি গঙ্গার তীরে, তাই নিজেকে আমি গাঙ্গেয় বলে মনে করি। জীবনে বারংবার আমি তার পরিচয় পেয়েছি।

সেটা হ'ল প্রথম বয়স। তখন বাণী ফোটে নি, সুর বেরোয় নি। তার কিছুকাল পরে আমি মোরান সাহেবের বাগানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেম। গঙ্গার তীরের উপর সেই হর্ম্ম্যের অলিন্দে ও সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমি অনেক রাত্রি কাটিয়েছিলেম এবং আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেলা। মনে করেছিলাম, যেন বিশ্ব কত কাছে নেমে এসেছে। তখনই আমার কবি-জীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।

এটা ব্যক্তিগত কথা নয়। আমাদের দেশে সাহিত্যের সমাগম হয়েছে বসন্ত ঋতুর মত। কখন, কি ভাবে, কেমন করে বসন্ত-দূতের মত এল তা জানিনে; তবে তা বিকশিত করেছে সমস্ত মাধুর্য্যকে—রসকে পূর্ণ করেছে। যে উদ্বোধন সেদিন হয়েছিল, তার ইতিহাস ভাল করে লেখা হয় নি। যখন ইংরেজী ভাষার অত্যন্ত গৌরব ছিল, তখন কেমন করে কোন আহ্বানে তা এল—সেই বসন্তের আহ্বানের মত—যাতে করে কবি-হৃদয়ে গান মুখরিত হয়ে উঠল, বাণী জাগরিত হয়ে উঠল—তার পরিচয় আজও হয় নি। যে বসন্ত সমাগম—তা চির-বসন্ত হয়ে রইল। আমার জন্মের পূর্ব্বেই তার সূচনা হয়েছিল।

যখন প্রথম সাহিত্য পরিষদের কল্পনা হয় (হয় ত আমিও ইহার ভেতর ছিলাম) তখন হয়ত এর মধ্যে কতকটা অনুকরণস্পৃহা ছিল। কিন্তু তা কত তুচ্ছ, তা কোথায় রইল। এরই ভিতর যে সত্য ছিল তা অনুকরণকে ছাড়িয়ে কত দূরে চ'লে গেল। এটা দেখতে দেখতে হয়েছে—তাই এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আমাদের আর কিছু নেই। আমি আশা করি, এই যে আয়োজন হয়েছে, তার সম্পূর্ণতা হোক—কৃতার্থতা হোক, যেন বিকৃতি এসে একে নষ্ট না করে। সকল দেশের সাহিত্য মানুষকে তৈরী করেছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আশা আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, রসের দ্বারা পুষ্ট হবে—তার আয়োজন হয়েছে। আমাদের দেশেও তার ভূমিকা হয়েছে। এর মধ্যে যেন বিকৃতি না আসে। সমস্ত পৃথিবী কলুষিত হয়েছে, সমস্ত পৃথিবীর হাওয়াতে লেগেছে পাপ; তা সে যুদ্ধের জন্য বা যে জন্যই হোক। সে কত বড় আঘাত তা জানি না। তার আজ বিশ্বাস হারিয়েছে, পরম দুঃখ পেয়ে মানুষের যা-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের নষ্ট হয়েছে। কিন্তু যাদের সেই ঘটনা ঘটেনি, যারা তার থেকে দূরে ছিল তাদের যদি সেই বিকৃতির ছোঁয়াচ লাগে সংক্রামকের মত, তবে তার থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে। এই যুদ্ধের সঙ্গে যে চিত্তবিকৃতি হয়েছে তাতে সমস্ত বিশ্বের সাহিত্যকে ভূমিতলে নামাবার চেষ্টা হয়েছে—যাকে তারা মনে করে বাস্তবতা। যা কীটের বাস্তবতা, পশুর বাস্তবতা, মানুষের বাস্তবতাও কি তাই? সেটা দূর দেশ থেকে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হতে চলেছে।

সাহিত্যকে নির্ম্মল করার আশা আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদের থাকে। আমি নির্ম্মলতাকে সঙ্কীর্ণতা বল্‌ছি না; নীরসের কথাও বল্‌ছি না। কবি হয়ে আমি তা পারি নে। পৃথিবীতে এমন সম্প্রদায়ও আছেন যাঁরা ছবি, রঙ প্রভৃতিকে ধর্ম্মবিরোধী ব'লে মনে করেন। আমি এই মনোভাবের নিন্দা করি। বিধাতা আমাদের যে কত সৌন্দর্য্য ও রসের অধিকারী করেছেন, সেটা যদি আমরা স্বীকার না করি, তবে তাঁকেই অস্বীকার করা হয়। স্বীকার যদি আমরা করি, সৌন্দর্য্য ও রসের বিধাতা আনন্দিত হন। যেমন বাড়ীর কর্ত্রী যখন রান্না করেন, সেই রান্না খেয়ে বাড়ীর লোকেরা যখন আনন্দ করেন, সেই আনন্দটা কর্ত্রীই ফিরে পান—এও তেমনি। বিধাতার এই আনন্দ রস ভোগ করা অন্যায় যাঁরা বলেন,—তাঁদের আমি ধিক্কার দিই। তবে সেই আনন্দ-রসে যেন বিষ না মেশান হয়, যেন তা কলুষিত না হয়।

এই উপলক্ষে আমি আর একটি কথা বলে রাখি। একটা সময় ছিল মাঝখানে, যখন বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলন চলছিল, সেই সময়কার কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়েছে। তখন বাহিরে সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল, সেই সময় যখন আমি বক্তৃতা করতাম তখন বাঁধা সভাপতি আমাদের দেশে অনেক ছিল। যদি কোন সুযোগে হীরেন্দ্রবাবুকে আমি সভাপতি করিতে পারিতাম, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। সেই দিনকার কথা স্মরণ করে আমি ওঁকে আমার অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

চন্দননগর—গঙ্গাতীর

ফটো শ্রু সরক
নগ

বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির

অভিভাষণ

শ্রদ্ধাভাজন সমাগত সুধীবৃন্দ, মহিয়সী মহিলামণ্ডলী ও স্নেহাস্পদ ছাত্রছাত্রীগণ—

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনের অভ্যর্থনাসমিতির পক্ষ হইতে আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের এই সামান্য নগরীতে আপনাদের শুভাগমন আমাদের পক্ষে যে কত আনন্দের কত উদ্দীপনার বিষয় তাহা বলিয়া প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আপনাদের ন্যায় বরেণ্য অতিথিবর্গকে কি কথা বলিয়া আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, কি ভাষায় আপনাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।

চন্দননগরের বুকের উপর দিয়া অতীতযুগে কত উৎসব কত আনন্দ আসিয়াছে গিয়াছে, গৌরবযুগের কত মহিমোজ্জল ছবি কল্পনায় ভাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আজিকার মত অনুষ্ঠান ইহার ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব অচিন্তনীয়! আপনাদের ন্যায় বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের শুভাগমনে এ স্থান আজ ধন্য হইল।

বঙ্গভারতীর সুসন্তানগণ! আপনারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্য-সম্মিলনীর ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করিয়া কত আনন্দ কত তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, আজি কি আশা লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন জানি না। আমার দেশবাসী আমাকে আপনাদের প্রধান সেবকের কার্য্যভার অর্পণ করিয়া যে সম্মান দিয়াছেন, আমার জীবনে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান, এই সেবকত্বের অধিকার অপেক্ষা বড় অধিকার কখন কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে করি না। কি নাগরিক জীবনে, কি সমাজে, কি সরকারের কাছে, যাহা কিছু সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সে সবই ইহার কাছে তুচ্ছ মনে করি। ইহা আমার প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আমার অন্তরদেবতার নিকট যেমন অপরাধী হইব, আমার নিজের নিকটও তেমনই হইব। সত্যই ইহা আমার প্রাপ্যের অতীত। সবেরই একটা অধিকার, একটা দাবী আছে। আমার যদি কিছু থাকে তবে আছে এই, যে, অন্যের ন্যায় আমিও আমার জন্মস্থান, আমার শৈশব-কৈশোরের ক্রীড়া-ভূমি, যৌবন ও প্রৌঢ়কালের কর্ম্মক্ষেত্র চন্দননগরকে ভালবাসি। কিন্তু মাতৃপূজার মন্দিরে আমার কি অধিকার, কিসের দাবী আছে জানি না। যেমন বড় বড় জাহাজের আবশ্যকতা থাকিলেও ছোট পান্‌সির দরকার আছে, সমাজে যেমন ব্রাহ্মণের আবশ্যকতা থাকিলেও তথাকথিত নীচ চণ্ডালের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না, তেমনই হয়ত বহু শক্তি-সামর্থ্যশালী প্রখ্যাত ব্যক্তি থাকিলেও আমার কোন

কাজ আছে বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সত্যই আমার কথা মনে করিয়া আমি সঙ্কুচিত, কুণ্ঠিত।

সাত বৎসরের পর বাঙ্গালার বাণীসাধকদিগের লুপ্তপ্রায় বড় সাধের এই সম্মিলনীকে আহ্বান করিতে পারিয়া আমরা আনন্দে আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইয়াছি। এই মাতৃপূজানুষ্ঠান আমাদের পক্ষে কত বড় এবং আমাদের শক্তিসামর্থ্যতুলনায় কত সীমাবদ্ধ সে কথা ভাবিয়া দেখিবার তখন অবসর হয় নাই। আমাদের নিজের মত করিয়াই এই যজ্ঞের ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম, এখন এই বিরাট ব্যাপারের সাফল্য আনয়ন করা, আপনাদের সমুচিত সেবা করা যে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অতীত তাহা বুঝিয়া নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হইয়াছি। এ কার্য্য আমাদের নিতান্তই একপক্ষীয়তাদোষে দুষ্ট। সত্য বলিতে কি, আমরা আপনাদের নিকট হইতে অনেক কিছু পাইবার আশায় অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়াই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। আমাদের আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করা ছাড়া আপনাদের যোগ্য উপচার কি আছে যে সেবা করিব? আপনাদিগকে দেখিতেই আমরা চাহিয়াছি, নচেৎ আমাদের কি সম্পদ আছে যে আপনাদের দেখাইব? আপনাদের কণ্ঠের বাণী শুনিয়া, আপনাদের উপদেশ লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইব বলিয়াই আপনাদের আহ্বান করিয়াছি, নচেৎ আমাদের কি আছে যে আপনাদের শুনাইব? আপনাদের দিতে পারি এমন কিছুই আমাদের নাই।

আপনাদিগকে ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর দেখাইবার জন্য আমাদের এ আকিঞ্চন নয়। যেমন দীনজন তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে মা জগজ্জননীকে আনিয়া দরিদ্রতানিবন্ধন বহু উপচারের পরিবর্ত্তে শুধু বিল্বদল গঙ্গাজলে পূজার্চ্চনা করিলেও তাঁহার আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীদের সেই মাতৃমূর্ত্তি, মায়ের পূজা দেখাইয়া তিন দিনের জন্য ভবজ্বালা ভুলিয়া থাকেন, তেমনই আমরাও আমাদের এই দীন মাতৃপূজার মন্দিরে আপনাদিগের ন্যায় সাধকদিগকে আনিয়া আমাদের ভাই ভগ্নীদের দেখাইয়া অতুল আনন্দ লাভের জন্য, আপনাদের শুভাগমনে আমাদের প্রাণে নব শক্তি নব উদ্যম উদ্দীপনা পাইয়া আত্মসুখ, আত্মতৃপ্তি, আত্মপ্রসাদে ধন্য হইবার জন্য এই আয়োজন করিয়াছি। আমি আর কি বলিব, আপনারা কৃপা করিয়া আমাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের দিকে না চাহিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত মনোভাব উপলব্ধি করিয়া প্রসন্ন মনে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

এই সম্মিলনীর অধিবেশন বহুবার বাঙ্গালার বহুস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজের প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য পল্লীপ্রাঙ্গনেও ইহার স্থান হইয়াছে। কিন্তু এবার যেথায় হইতেছে ইহার পূর্ব্বে এমন কোন স্থানে আপনাদের মিলনের ব্যবস্থা হয় নাই ইহা নিশ্চয়। আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, রাষ্ট্রীয় কারণে আমরা আপনাদের মধ্যে থাকিয়াও যেন কিছু বিভিন্ন। যে জেলা এই চন্দননগরের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, সেখানকার ভূগোলে ইহার নাম পর্য্যন্ত নাই, কি ভাষা কি সমাজ কি সংস্কৃতি আপনাদের সঙ্গে সকলেরই পূর্ণ মিল থাকিলেও, একই অন্ন-জলে পুষ্ট হইয়া, একই আবহাওয়ার মধ্যে

বৰ্দ্ধিত হইয়াও, আমরা কেমন যেন একটু স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছি। যেন কোন অলক্ষ্য হস্ত উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র শিথিল করিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন। বাঙ্গালীর যে আশা আকাঙ্ক্ষা, অথবা যে আদর্শ তাহার জীবনের সকল চেষ্টার মধ্যে, তার সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে, আমাদের এই সামান্য সহরের নাগরিকদিগের মধ্যে তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। ভিতরের ও বাহিরের সাম্যের মধ্যে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য না থাকিলেও যেন দিনে দিনে একটা পার্থক্য বা বৈষম্য উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। তাই মনে হয় এই স্থানে এই সম্মিলন সময়োপযোগীই হইয়াছে, সত্যই এস্থানে ইহার আবশ্যকতা ছিল।

বৃহতের মধ্যে থাকিয়াও যেন আমাদের চিন্তা চেষ্টা আদর্শ সব ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া আসিতেছে। সঙ্কীর্ণতাই আমাদের ক্রমে মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাই আজি সাহিত্যের বিরাট যজ্ঞবেদীতে দাঁড়াইবার অধিকার পাইয়াও আমার ক্ষীণ দৃষ্টি উর্দ্ধের দিকে তুলিতে পারিতেছি না। সাহিত্যের আসরে যে সব কথা শুনাইতে পারিলে আপনাদের কিছু তৃপ্তিকর হইতে পারিত এবং শোভনও হইত, তেমন নূতন কথা বলিবার মত শক্তি আমার নাই, সে বিড়ম্বনা করিব না। আমার বড় আদরের চন্দননগর—নালা-ডোবা-জঙ্গলময়, আধি-ব্যাধিনিপীড়িত, ধূলিমলিন, হৃতসৌন্দর্য্য চন্দননগর—তার শত ত্রুটী শত অভাব সত্ত্বেও সে আমার নন্দনকানন। তার কাহিনী, তার ইতিহাস তার গৌরব মহিমা আমার কাছে অমৃততুল্য দেবকাহিনী। তাহার মধ্যে বাস করিয়া আমার সঙ্কীর্ণতা, আমার ক্ষুদ্রত্ব অপূর্ণতা নিষ্ফলতা, তাহাকে ভালবাসিয়া নির্য্যাতন লাঞ্ছনা এও বুঝি আমার বরণীয় অলঙ্কার। আমার চক্ষে এই দীনা মলিনা মাতৃমূর্ত্তিই রত্ন-আভরণা। আমি নিজে ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্রের সেবা করিয়াই বাঙ্গালা মায়ের সেবার তৃপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকি, আর প্রার্থনা করি আমার অবশিষ্ট জীবন যেন ইহার সেবাতেই চলিয়া যায়। আমি এখানে আপনাদের সমীপে চন্দননগরের সামান্য পরিচয়, এই ক্ষুদ্রের সহিত বাঙ্গালা তথা ভারতের সঙ্গে কতটুকু যোগাযোগ আছে তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। এখানকার ইতিহাস সবিস্তরে বিবৃত করিয়া আপনাদের বিব্রত করিব না।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর অদ্বিতীয় শক্তিশালী ইংরাজ, যাহার রাজত্বে রবি কখন অস্ত যান না, তাহার সমৃদ্ধির মূল যে ভারতবর্ষ, সেই সুবর্ণধাম ভারতে বৃটীশ অভ্যুদয়ের প্রথম সোপান এই চন্দননগর। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ ভাগীরথী তীরে অর্লেয়্যাদুর্গের পাদমূলে এই ভূমিতেই ইংরাজের ভাগ্য পরীক্ষিত ও নির্ণীত হইয়াছিল। সে দিন বৃটন্‌লক্ষ্মী প্রসন্ন মূর্ত্তিতে দেখা না দিলে এ দেশে ইংরাজমহিমা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত এ কথা ক্লাইভ কলিকাতা হইতে যাত্রার প্রাক্কালে স্পষ্ট করিয়াই বুঝিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, এবং বিজয়লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলে যে সেই জয়যাত্রা এই স্থানেই পরিসমাপ্তি হইবে না তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই ক্লাইভ্ তদানীন্তন বাংলার ফরাসী সৌন্দর্য্যানুভূতি ও গৌরবের অন্যতম নিদর্শন চন্দননগরের তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত গৌরহাটীতে তাঁহারা

সৈন্যবাহিনীকে লইয়া গিয়া অল্পদিনের পর তথা হইতে পলাশী যাত্রা করেন। আর এই পলাশীযুদ্ধ-বিজয়ই ভারতবিজয়ের সূত্রপাত, রত্নমঞ্জুষাময় ভারতে প্রবেশের সুবর্ণ দ্বার। এই ভারতের অধীশ্বর হইয়াই ইংরাজ জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। যে দিন লণ্ডনে চন্দননগর বিজয়ের সংবাদ পৌছায়, সেই দিনই তথায় ভারতীয় কোম্পানীর কাগজের দর শতকরা বার হারে চড়িয়া যায়।* এ সমস্তই ঐতিহাসিক সত্য এবং এই অতি বৃহতের সহিত চন্দননগরের যোগ থাকিলেও ইহাতে এখানকার গৌরবের কথা কিছু নাই। কিন্তু এমনই আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করিবার আছে যাহা মনে করিতে আনন্দে গৌরবে হৃদয় ভরিয়া উঠে।

বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি পাশ্চাত্য জগতে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-দার্শনিক বলিয়া পরিচিত, তিনি যখন জগৎসমীপে অখ্যাত অজ্ঞাত ছিলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন এখানকার প্রকৃতি। তাঁর কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ হয় এই স্থানেই। তখন তিনি গোন্দলপাড়ার মোরান্ সাহেবের বাগানবাড়ীতে থাকিতেন। এখানকার একটি পৌরসভায় সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি নিজের কথায় বলিয়াছিলেন,—"যখন বালক ছিলাম তখন চন্দননগরে আমার প্রথম আসা। সে আমার জীবনের আর এক যুগ। সে-দিন লোকের ভিড়ের বাইরে ছিলেম প্রচ্ছন্ন; কোন ব্যক্তি, কোন দল আমাকে অভ্যর্থনা করে নি। কেবল আদর পেয়েছিলাম বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে। * * * ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষী সুরে সেখানে বাজ্‌ত সে আমার মনে আছে। মোরান্ সাহেবের বাগানবাড়ী, বড় যত্নে তৈরি, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী ছিল বিচিত্র। তার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুলগাছের আগ্‌ডালের চিকণ পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চারদিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হ'ত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আঙিনাতেই। এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেম –

এই খানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।" †

সে দিন যখন সম্মিলনীর উদ্বোধনের জন্য শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে যাই, তখন চন্দননগরে তাঁহার লেখা আরম্ভ হয়, হাত তখন কাঁচা ছিল, এই কথা বলিলেন। এইখানে বসিয়া তিনি অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। এ সব আমাদের গৌরবের কথা, চন্দননগরের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার কথা।

* Lloyd's Evening Post, 16th Sept., 1757.

† ১৩৩৪ সালের ২১ শে বৈশাখ চন্দননগরের নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির পৌরসভায় অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।
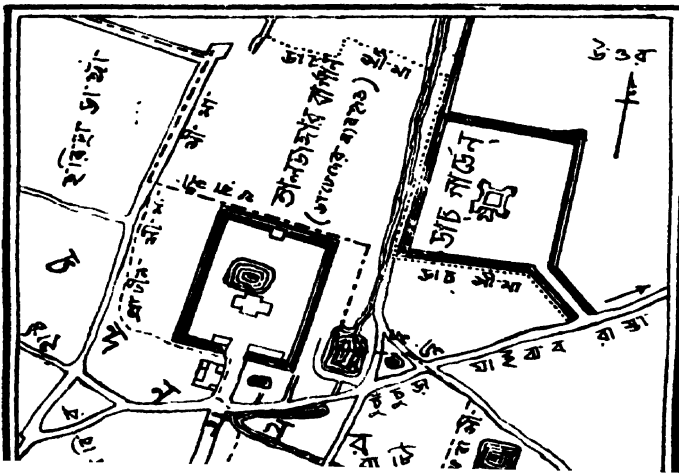
ফরাসীদের বঙ্গে প্রথম অধিকৃত স্থানের নক্সা

তালডাঙ্গার বাগান

চন্দননগর।

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে মার্চ্চের পূর্ব্বের নক্সা।
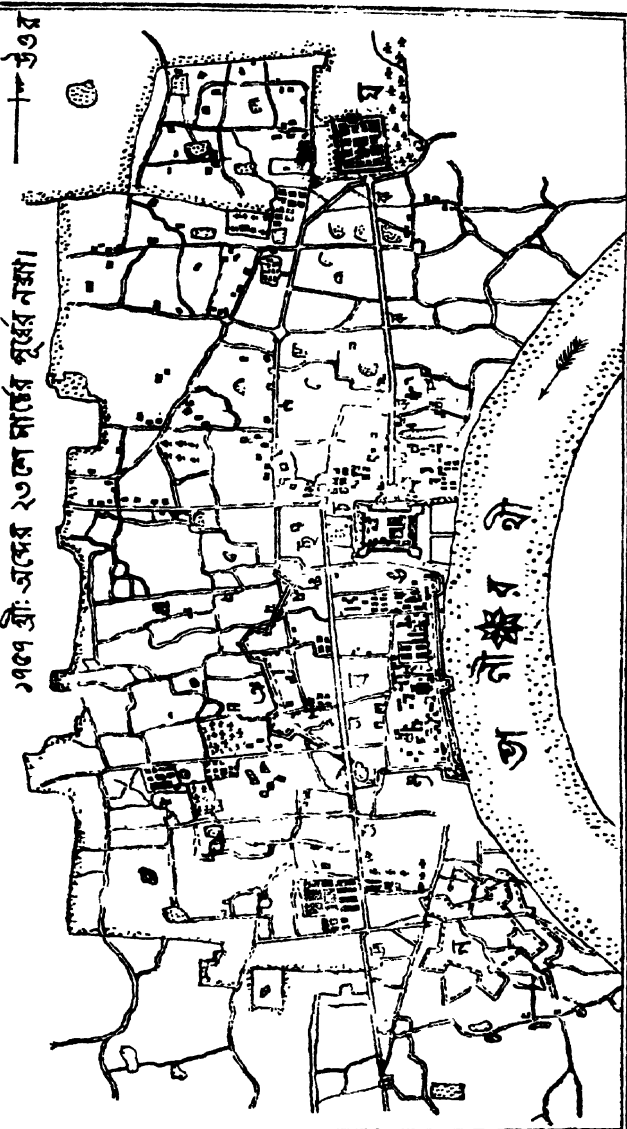
উত্তর

ভাগীরথী

ক — আরল্যাঁ দুর্গ। খ — দুর্গের সীমান্তর্গত স্থান। গ — দিনেমার কুঠি।
ঘ — তালডাঙ্গার বাগান। ঙ — ডাচ্ কুঠি। চ — লাল দিঘী। ছ — গোরস্থান।
জ — গরুটী যাইবার রাস্তা। ঝ — চুঁচুড়া ও হুগলী যাইবার রাস্তা। ঞ — আরল্যাঁ দুর্গের সীমা।

চন্দননগরের মানচিত্র—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের
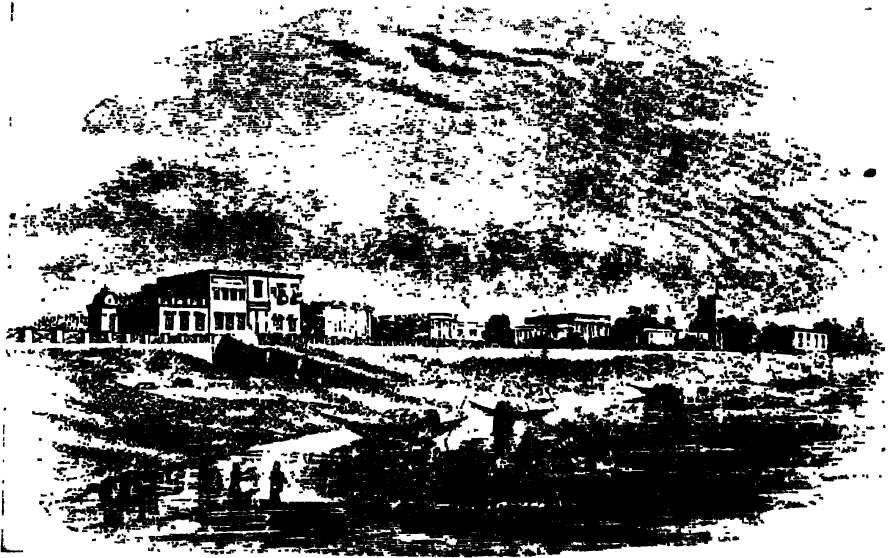
চন্দননগর—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে

পুরাতন কে ডুপ্লেক্স—১৮৩৭

পুরাতন গীর্জ্জা---১৭২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত

ফ্রান্সিস্ ডুপ্লেক্স
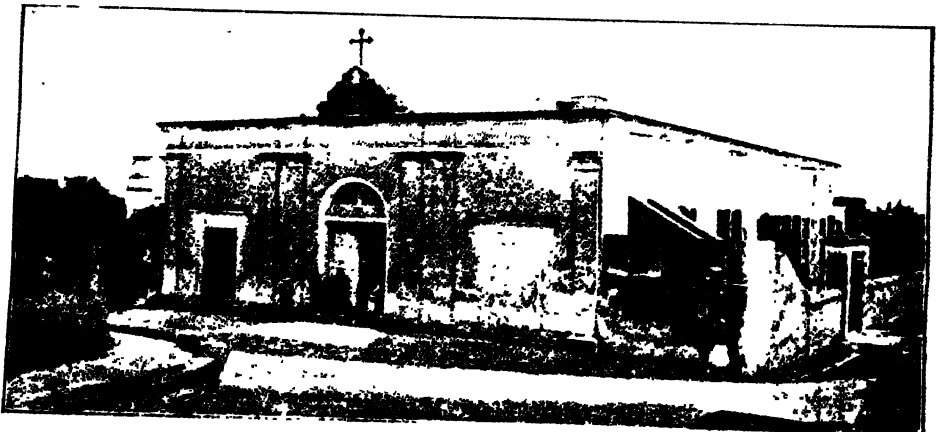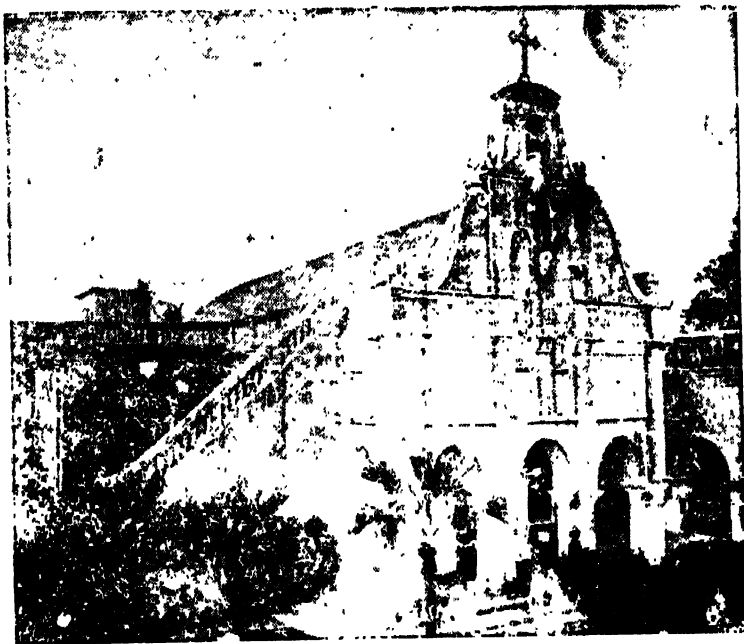
গরুটী প্রাসাদ— গরুটী

মহাত্মা ভূদেবচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের আরম্ভও এই স্থানে হইয়াছিল। এই স্থানেই প্রথম একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বিদ্যালয় এখন আর নাই, বিদ্যালয়-গৃহের ভগ্ন দেওয়ালখানি মাত্র আজিও দাঁড়াইয়া আছে।

এ স্থান কোন ভারতবিশ্রুত সাহিত্যিকের উদ্ভবে গৌরবান্বিত না হইলেও, এখানকার কোন গ্রন্থ বাঙ্গলার সাহিত্যভাণ্ডারে স্থায়ী সম্পদ্‌রূপে গণ্য হইবে কি না বলিতে না পারিলেও, এই সামান্য সহরে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে প্রায় শতাধিক গ্রন্থকারের উদ্ভব হইয়াছে; তন্মধ্যে মহিলা চারি জন। সকলের লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট তিন শতেরও অধিক। এতাবৎ এখান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পত্র, মাসিক ও অন্য সাময়িক পত্র প্রায় কুড়ি খানি প্রকাশিত হইয়াছে। এখানকার প্রথম বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্র 'প্রজাবন্ধু' ইংরাজী ১৮৮২ সালে স্বর্গীয় তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়েক বৎসর সম্পাদিত হয়। উহাতে স্পষ্ট ভাষায় বৃটীশ শাসনের তীব্র সমালোচনা প্রকাশ হওয়ায় বৃটীশ ভারতে উহার প্রচার বন্ধ হওয়ায় উহা উঠিয়া যায়। এখানকার লোকের দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যাও অন্যূন দেড়শত। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" যাহা স্পেন্ দেশের লিস্‌বন্ নগরে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ এখানকার ফাদার গের‍্যাঁ (Father J. F. M. Guerin) নামক জনৈক ধর্ম্মযাজক দ্বারা শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পাদরীর দ্বারাই পরিশিষ্টে ইংরাজী ১৮৩৬ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত গ্রহণগণনার একটি সুন্দর তালিকা দেওয়া আছে।

এই সকলের পরিচয় দিতে একটা আনন্দ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজি যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তিতে মা বঙ্গভারতী আমাদের সম্মুখে সমাসীনা, তাঁর বর অঙ্গ আমরা কোন্ ক্ষুদ্র আভরণে সাজাইতে পারিয়াছি? এমন সৃষ্টিসামর্থ্যবান্ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্য-শিল্পী এখানে কে জন্মিয়াছেন যাঁহার নাম করিয়া আমরা গর্ব্ব করিতে পারি? সাহিত্যশিল্পীর প্রতিভা ও সাধনালব্ধ সৃজনশক্তির উন্মেষ দ্বারাই সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্য-বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য চাই সমসাময়িক প্রভাবমুক্ত একটা উচ্চ উদার দৃষ্টি, একটা দীপ্তিময় কল্পলোকের গভীর অনুভূতি। বাঙ্গালার ভৌগলিক সীমার বাহিরে যে বৃহত্তর বাংলা গড়িয়া উঠিতেছে, ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে তাহার সঙ্গে একটা নিবিড় সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংসর্গ। জাতিজীবনের গতি সাহিত্যের মধ্যেই নথিভুক্ত হইয়া থাকে। জাতির সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, গৌরব অখ্যাতি, শৌর্য্য-কাপুরুষতা সবই সাহিত্যের মধ্যে সুপ্রকাশিত থাকে। সমাজ ব্যতীত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। জাতির নূতন জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই নূতন ভাষা, নূতন ভাবধারা ও তাহারই ফলস্বরূপ নূতনসাহিত্য-সৃষ্টি হইয়া থাকে। আজ চতুর্দ্দিকে যে দুঃখ দুর্দ্দশার চিত্র অবিরত আমাদের নয়নপথে প্রতিফলিত হইতেছে, আমাদের নবসৃষ্ট সাহিত্যমধ্যে তাহার সত্যকার রূপটি ফুটিয়া উঠা আবশ্যক। আমাদের যথার্থ কামনা, বাসনা, ব্যর্থতা, পূর্ণতা

সত্যই তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক। এক কথায় তাহার সহিত আমাদের অন্তরের যোগ থাকা চাই। যে সাহিত্য জাতির আত্মবোধ বা গৌরববোধ আনিতে না পারে তাহার সফলতা কি!

বঙ্গসাহিত্যে তেমন অবদান এখান হইতে কে কতটুকু দিতে পারিয়াছেন বা একেবারেই পারেন নাই, তাহা বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। সে বিষয় বলিতে পারিব না, তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, প্রত্যক্ষভাবে এখানকার কোন মহাপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের রচনা-সম্ভারে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ না হইলেও এখানে এমন একজন সুধী সাহিত্যবন্ধুকে পাওয়া গিয়াছিল, যাঁহার পরোক্ষ দানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গলাসাহিত্য তখনকার যুগে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল। সে লোক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষের ফরাসী কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক থাকায় ফরাসী সরকারের 'দেওয়ান' বলিয়া খ্যাতিলাভ, চন্দননগর লুণ্ঠন কালে ক্লাইভ্ কর্ত্তৃক তাঁহার আবাস বাটী হইতেই অর্দ্ধকোটিরও উপর টাকা লুণ্ঠন করিয়া লওয়ার কথা অথবা তাঁহার দানশীলতা, দেবালয় অতিথিশালা ও গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির পরিচয়ই সাধারণ্যে প্রচারিত থাকিলেও, তদানীন্তন বাংলা সাহিত্য প্রকারান্তরে তাঁহার দানে কতটা সমৃদ্ধ হইয়াছিল সে কথা প্রায়ই ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় না।

প্রাচীন যুগে যখন বাঙ্গালাসাহিত্য প্রধানতঃ পদ্যের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের প্রভাবের কথা উল্লেখের অপেক্ষা করে না। এই ভারতচন্দ্রের প্রতিভাবিকাশের মূলে ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। যখন ভারতচন্দ্র উদরান্ন-সংস্থানের উদ্দেশে দেবানন্দপুর হইতে চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ইন্দ্রনারায়ণই তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন। পরিশেষে নদীয়ার গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় স্থান পাওয়ায় তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। মহারাজ টাকা ধার করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চৌধুরী-মহাশয়ের নিকট আগমন করিতেন। তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একদিন মহারাজকে এই ভারতচন্দ্র রত্ন উপহার দিয়াছিলেন। পরে তথা হইতেই তিনি 'গুণাকর' উপাধি প্রাপ্ত হন। কে বলিতে পারেন ভারতচন্দ্রের প্রতিভার পশ্চাতে মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে এ রত্নের দীপ্তি চিরদিনই বিদ্বজ্জনসমাজে অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইত না।

তাহার পর ভারতচন্দ্রের বাঁশী যখন নীরব হইয়াছে অথচ বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যের আদি সংস্কারক বা অন্য কথায় স্রষ্টা মহাত্মা রামমোহনের অভ্যুদয় হয় নাই, যখন বাঙ্গালাভাষা শিক্ষিত লোকের সকল প্রকার মনোভাব সুষ্ঠুরূপে প্রকাশের উপযোগী অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপাদান বলিয়া কেহ ধারণা করিতে পারিতেন না, যখন দর্শন বিজ্ঞানের জটিলতা দূর করিয়া তাহার গভীর তত্ত্ব এই ভাষার সাহায্যে সাধারণের মধ্যে বোধগম্য করা যাইতে পারে এ কল্পনা কেহ করেন নাই, তখন কবিগান, পাঁচালী, যাত্রার মধ্য দিয়াই প্রধানতঃ সাহিত্যের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য বিকশিত ছিল। সেই যুগে সাহিত্যে চন্দননগরের দান

নিতান্ত নগণ্য নহে। তদানীন্তন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবিভ্রাতৃদ্বয় রাসু ও নৃসিংহ ইংরাজী ১৭৩৪ ও ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "প্রাচীন কবিসংগ্রহ ও বঙ্গের কবিতা" নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় কবিগীতের সৃষ্টিকারদিগের মধ্যে ইঁহারাই প্রথম।

ইঁহাদের পর নিধুবাবু ও হরুঠাকুরের সমসাময়িক নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী ওরফে নিতাই বা নিতে বৈষ্ণব এবং অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গির নামও দিগন্তবিস্তৃত ছিল। নিতাই নিরক্ষর কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুর-লয়সমন্বিত ভক্তিরসাশ্রিত সুমিষ্ট সঙ্গীত লোকের বড় আদরের ছিল। ভট্টপল্লীর ঠাকুর-মহাশয়েরা তাঁহাকে আদর করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, "রামবসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এত সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য নাই।" * "বঙ্গভাষার লেখক" নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় নিতাইয়ের নামে ও ভাবে ভদ্র অভদ্র সকলে গদগদ হইতেন। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের একটা এমনই সহানুভূতি ছিল যে তাঁহার জয়ে তাঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন, পরাজয়ে পরিতাপের সীমা থাকিত না।

অ্যাণ্টনি সাহেবের আদি বাস ছিল চন্দননগরে, তৎপরে তিনি গৌরহাটীতে যেখানে ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লেক্সের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাসাদ ছিল তাহার সন্নিকটে বকুলতলায় বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তথায় এঙ্গাস্ কোম্পানির পাটকলের সাহেবদিগের বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি ভিন্নধর্ম্মী হইয়াও যেরূপ ভক্তিভাবের গীত রচনা ও গান গাহিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক কবির গানের মধ্যেও দুর্ল্ভ। তিনি একটি ব্রাহ্মণমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। তিনি প্রাণ ঢালিয়া হিন্দুদের সহিত যেমন মিশিয়া ছিলেন তাহাতে তখনকার হিন্দুরাও উদার হৃদয়ে তাঁহাকে কোল পাতিয়া দিয়াছিলেন। এক সময় তাঁহার কবির দলের বাঁধনদার গোরক্ষনাথ নামক একজন স্থানীয় গুণী ব্যক্তির সহিত মনান্তর ঘটিলে, যখন তিনি দল ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন তিনি গাহিয়াছিলেন,—

"ভজন পূজন জানি না মা, জাতেতে ফিরিঙ্গি
যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গি॥"†

অ্যাণ্টনি সাহেবের স্বরচিত ভবানীবিষয়ক গানগুলির মধ্যে কতকগুলি এমনই ভাবোদ্দীপক ও প্রাণস্পর্শী যে তাহা যে কোন ভিন্নধর্ম্মীর রচিত তাহা কোন মতেই মনে হয় না। কলিকাতার বহুবাজারে ফিরিঙ্গী-কালী নামে যে বিখ্যাত কালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা তাঁহার ব্রাহ্মণবধূর অভিপ্রায়ানুসারে অ্যাণ্টনির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত।

উল্লিখিত কয়েকজন ভিন্ন নীলমণি পাটনী, বলরাম দাস কপালী, পরাণচন্দ্র রায় প্রভৃতি আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ কবিওয়ালার কথা জানিতে পারা যায়। ইঁহাদের সম্বন্ধে

* বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব।

† কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ আছে—

আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজেও ফিরিঙ্গি
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গি॥

আলোচনা ও বহু প্রশংসার কথা 'সেকাল ও একাল', 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ,' 'বঙ্গের কবিতা', 'Bengali Literature in the Nineteenth Century', 'গুপ্তরত্নোদ্ধার', 'বঙ্গভাষার লেখক,' 'বিশ্বকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই সকল বঙ্গবিশ্রুত কবি ও পাঁচালী দলের প্রাদুর্ভাবের মূলেও যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অর্থানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতাই প্রধান কারণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পুরাতন কবির দলের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায় এবং পাঁচালী কীর্ত্তন ও বাউল গান আরম্ভ হয়। এখানকার পাঁচালী-ওয়ালাদের মধ্যে চিন্তামণি মালা ওরফে চিন্তেমালা ও রামভাট, এবং গীতরচয়িতাদিগের মধ্যে রাম দত্ত, মধু পাত্র ও কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে কীর্ত্তনের দলেরও অভাব ছিল না, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা, মেয়ে কীর্ত্তনের দল অনেকের মতে এইখানেই প্রথম গঠিত হয়। আনন্দমোহিনী ওরফে আন্দিই ইহার প্রবর্ত্তক।

তাহার পর যাত্রার কথা। যাত্রা এ দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও আধুনিক ভাবে যাত্রা প্রবর্ত্তনের মূলে চন্দননগরের কৃতিত্ব কম নহে। পূর্ব্বে গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডী-যাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন ও অনাথকৃষ্ণ দেব উভয়েই তাঁহাদের গ্রন্থে গুরুপ্রসাদকে অদ্বিতীয় যশস্বী বলিয়াছেন। ইহার অনেক পরে মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ওরফে মদন মাষ্টারের যাত্রার দল সে সময় বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। 'Bengali Literature in the Nineteenth Century' ও 'বঙ্গের কবিতা' গ্রন্থে ইহাকে প্রাচীন যাত্রাদলেদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার পর বৌ মাষ্টার, নবীন গুঁই, মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত প্রায় কুড়িটি যাত্রার দলের কথা জানা যায়, তন্মধ্যে অনেকগুলি খ্যাতিসম্পন্ন ছিল।

এখানে প্রথম যে থিয়েটারের উল্লেখ পাওয়া যায় উহা সম্ভবতঃ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। Carey's 'Good Old Days' এ উহা একটী ইংরাজী থিয়েটার বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের লেখা হইতে জানা যায় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে লাভোকা (L'avocat) নামক একখানি ফরাসী নাটক বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। * বাঙ্গালা থিয়েটার সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় এখানে একটি অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়কর্ত্তৃক 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকই সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। উক্ত সম্প্রদায়ের সহকারী অধ্যক্ষ চন্দননগরবাসী মতিলাল শেঠমহাশয়-লিখিত একটি গুলির আড্ডার দৃশ্য ইহাতে সংযোজিত হইয়াছিল এবং সেকালের বঙ্কিম মণ্ডলের রসসাহিত্যিক দীননাথ ধড় মহাশয় ইহার প্রস্তাবনা-গীতটী লিখিয়া দিয়াছিলেন। মাত্র চারি রাত্রি অভিনয়ের পর, সভ্যদিগের অভিনয়-স্পৃহা মিটিলে ঐ দল উঠিয়া যায়। যাহার প্রাথমিক চেষ্টায় আজ এই সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন সম্ভবপর হইয়াছে, সেই চন্দননগর পুস্তকাগার

* রূপ ও রঙ্গ, ১ম সংখ্যা।

অর্লেয়াঁ দুর্গের নক্সা।

ভাগীরথী বক্ষে অর্লেয়াঁ দুর্গের পাদমূলে

বৃটীশ্ রণতরী—টাইগার্, কেণ্ট ও স্যালিস্ব রি
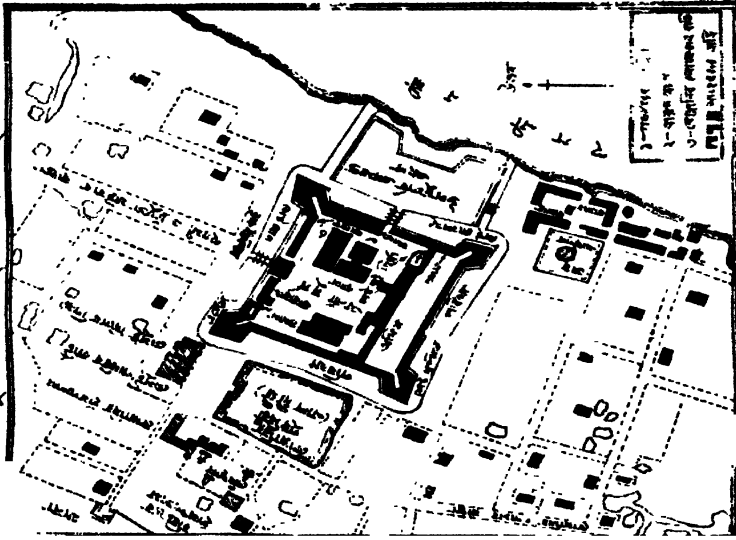
দশভূজা মন্দির
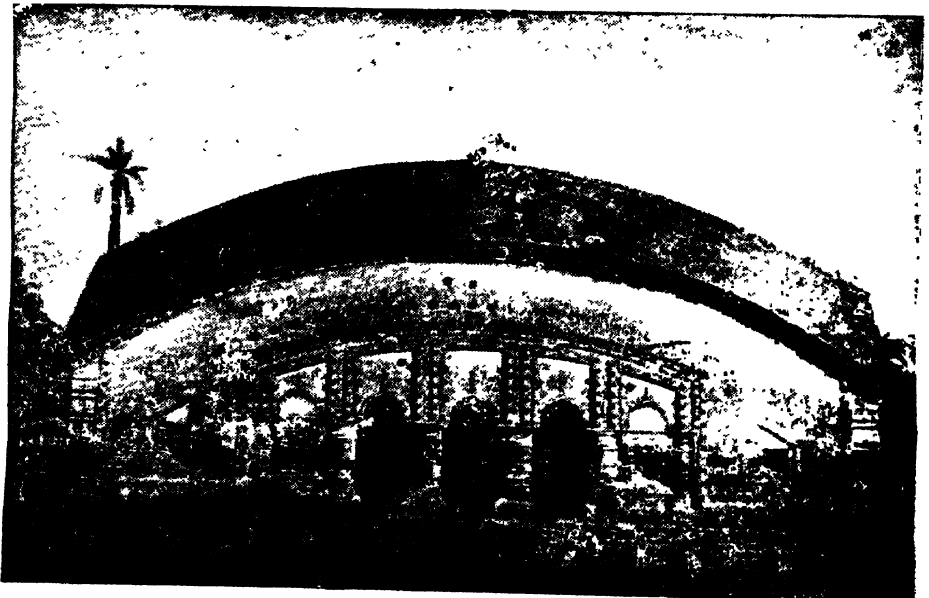
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত নন্দদুলালের মন্দির

বোড়াইচণ্ডীর মন্দির ও নাট্ বাংলা

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতীক

রোম্যান ক্যাথলিক্ গীর্জ্জা

পুরাতন শ্বেতপল্লীর দৃশ্য—১৮২০
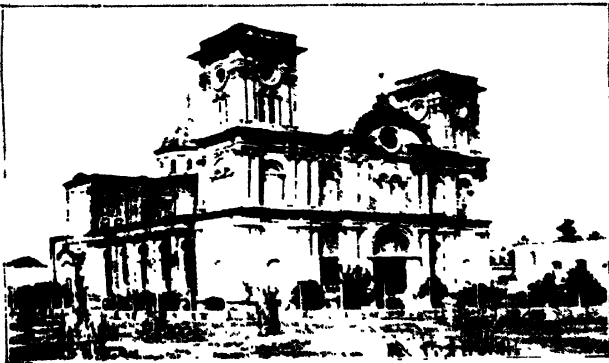
উক্ত থিয়েটারের ষ্টেজ্ বিক্রয়লব্ধ অর্থে ১৮৭৩ সালে যদুনাথ পালিত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমবাবু, ভূদেববাবু, অক্ষয়বাবু, দীনবাবু প্রভৃতি সুধীবৃন্দ এই থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছিলেন।

'প্রণয়পরীক্ষা' অভিনয়ের পর 'রামাভিষেক', 'রত্নাবলী', 'পুরুবিক্রম', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি পর পর বহু নাটক বহু অবৈতনিক-নাট্যসম্প্রদায়কর্ত্তৃক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু মুস্তফি, অমৃতলাল বসু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা উক্ত রামাভিষেক নাটকে অভিনয় করিতেন এবং সেজন্য সর্ব্বদা এখানে আসিতেন।

এখানকার সম্বন্ধে যে কথাই বলা যাক, প্রথম যুগ হইতে বহুদিন পর পর্য্যন্ত ইহার বৈশিষ্ট্য দিয়াছিল এখানকার শিল্প ও বাণিজ্য। ফরাসীদের সঙ্গেই সে পরিচয়ের সূত্রপাত। কবিরামকৃত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক সুপ্রাচীন ভৌগলিক গ্রন্থে এখানকার পল্লীবিশেষের নামের উল্লেখ পাওয়া যাইলেও * ফরাসীদের সঙ্গেই এ স্থানের পরিচয়, এমন কি ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর এখানকার ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষদের ফ্রান্সের ডিরেক্টরকে লিখিত এক পত্রেই চন্দননগর নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিন লইয়া যেমন কলিকাতা, খলিসানী, বোড়ো ও গোন্দলপাড়া এই তিনের সমষ্টিতে তেমনি চন্দননগর। 'মনসা মঙ্গল', ও 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থে এই সব স্থানের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে যখন কলিকাতা সামান্য একটী নগণ্য পল্লীমাত্র ছিল তখন চন্দননগরের স্বর্ণযুগ। লোকসংখ্যা, বাড়ী, পথ ঘাঠ, ব্যবসায় বাণিজ্য কলিকাতার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। ডুপ্লেক্সের সময়ে এখানে লোকসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক ছিল।† বাণিজ্য ছিল সুদূরপ্রসারিত। শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাহিরে চীন, তিব্বত, পারস্য, মোশা, পেগু, জেড্ডা প্রভৃতি স্থান সকলের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন প্রধানতঃ মস্‌লিন্, রেশম, শস্য, অহিফেন প্রভৃতি পণ্যের প্রচুর আমদানী রপ্তানী হইত। লর্ড ক্লাইভ্ এই স্থানকে খুব আড়ম্বর-পূর্ণ ও ধনসম্পৎসম্পন্ন উপনিবেশ বলিয়াছেন। তিনি ইহাকে ভারতের 'শস্যাগার' ("The granary of the islands")‡ বলিতেন। ইহার পরও দীর্ঘকালপর্য্যন্ত এখানকার লক্ষীগঞ্জ কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের আহার্য্য-শস্যাদি সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের খ্যাতি এখনও লুপ্ত না হইলেও পূর্ব্বকালে এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিলাসিসমাজেও বিশেষ আদরণীয় ছিল। চন্দননগর মস্‌লিনের কথা বিখ্যাত ফরাসিস্ উপন্যাসেও উল্লিখিত আছে। সেকালে এখানকার লাল গিলে এবং কাল গিলে নামক একপ্রকার চেক কাপড় ও খাসা নামক কোরা লংক্লথ্ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

* "খলসানি মহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীবরঃ।"—বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১ম ভাগ।

† History of the French in India.

‡ The life of Lord Clive. Vol. I.

গালা, চট, আরসি, চুরুট, রঞ্জনের কাজ, কাশ্মীরি কারিগরদ্বারা প্রস্তুত শাল, মখমলের উপর জরির কাজ প্রভৃতি যাহা এখানে উৎপন্ন হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইত, তাহার কথা এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে। ফরাসী কোম্পানী চন্দননগরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াই বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে কুঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই কুঠী-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষেও চন্দননগর হইতে প্রচুর পরিমাণে গালা, মোম, সোরা, বেত, শালকাষ্ঠ, বস্ত্র, রেসম, মরিচ, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতির রপ্তানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। *

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের পর কতিপয় বৎসর এখানকার অন্যান্য বিষয়ের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হইলেও, ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লেক্সের আগমনের পর হইতে উহা বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন ক্রমে ব্যবসাশ্রী কোলাহলে সুপ্তপল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল, গঙ্গাবক্ষ পণ্যপূর্ণ বহু তরণী ও জাহাজে শোভিত হইল। যেন কোন মায়াবিনীর ইন্দ্রজাল-স্পর্শে সহসা কয়েক বৎসরের মধ্যে চন্দননগর নূতন শ্রী ধারণ করিয়া আড়ম্বর ও শোভা সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে সময় বহির্বাণিজ্যে ও অন্তর্বাণিজ্যে চন্দননগর বাংলার মধ্যে প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। ফরাসী ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া তখন এখানকার যাঁহারা শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিলেন তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীই প্রধান। তিনি কুড়ি টাকা বেতনে কোম্পানীর কার্য্যে সামান্য কুর্ত্তিয়ে (courtier) অর্থাৎ দালাল, পণ্যসরবরাহকার এবং ইজারদাররূপে প্রবিষ্ট হইয়া কোটিপতি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের কথা ছাড়িয়া দিলে, এখনও কুমোরের কাজ ও কাঠের কাজের জন্য চন্দননগর প্রসিদ্ধ আছে। এখানে শেরউড্ কোম্পানী বা ল্যাজেরাস কোম্পানীর কারখানা অনেক দিন উঠিয়া যাইলেও এখনও কলিকাতার ব্যবসায়ীদের জন্য কাঠের আসবাবপত্র প্রধানতঃ চন্দননগর হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে।

এ স্থান বাণিজ্যে যেমন সমৃদ্ধ হইয়াছিল, শিল্পগৌরবেও তদপেক্ষা কিছু কম ছিল না। পূর্ব্বেকার যে সব শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে পূর্ব্বের উল্লিখিতগুলি ভিন্নও মৃৎশিল্প, কাগজ, চিকন, দড়ি, রম্ মদ, দেশী মদ, মাদুর বোনা, নৌকানির্ম্মাণ, শাঁখার কাজ, নীল উৎপাদন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সেকালের উক্ত শিল্প-কারখানাসমূহের মধ্যে এখনও কোন কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যে পল্লীতে বড় বড় দড়ির কারখানা ছিল সেখানকার এখনও একটী রাস্তার নাম রহিয়াছে 'রু করদেরি'। জন্ পিপ্ দ্বারা লিখিত নীল সম্বন্ধে একখানি পুস্তক হইতে জানা যায়, প্রথম যে ইয়োরোপীয় এদেশে নীলের চাষ ও কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি চন্দননগরবাসী ছিলেন। তাঁহার নাম লুই বোনো (Louis Bonnaud)। এখানে নীলের কাজ অপরেও করিতেন। এখনও সে সব কারখানার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

শিল্পের হিসাবে যেমন চন্দননগর কোন কোন শিল্পের পথপ্রদর্শক, তেমনই পরবর্ত্তী যুগে যখন দেশে কলকারখানার প্রবর্ত্তন হয়, যখন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্য কোন

* La Compagine des Indes Orientales.

বাঙ্গালীর চেষ্টার কথা জানা যায় না, যখন "বঙ্গলক্ষ্মী" ও "বেঙ্গল্ কেমিক্যাল্ ওয়ার্কসের" নামও কেহ শুনেন নাই, তখন বটকৃষ্ণ ঘোষ নামে এক উৎসাহী ভদ্রলোক এখানে একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন ম্যার ডাক্তার দীননাথ চন্দ্র নামে অপর একজন ভদ্রলোক 'লণ্ডন্ মেডিক্যাল্ এজেন্সি' নাম দিয়া একটি টিন্‌চার্ ও স্পিরিট্ প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমরা এই সম্মিলনীর সহিত যে একটী ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহাতে [চন্দননগরের সাহিত্য, শিল্প ও ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য সকলের সহিত] উক্ত কলের বস্ত্রাদির এবং উক্ত কারখানার কতকগুলি ঔষধের নমুনা দেখিতে পাইবেন।

কিসের আকর্ষণে জানিনা এই চন্দননগরে বহু প্রসিদ্ধ লোকের আগমন ও বসবাস ঘটিয়াছিল। এই স্থান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল্ মধুসূদন দত্ত, ভারতচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার বড়াল, নবীনচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন সিক্‌দার, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের বসবাসে ধন্য। দর্পনারায়ণ ঠাকুর, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, লালবিহারী দে, রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, হরনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দেশপ্রেমিক, পণ্ডিত, চিন্তানায়কগণের শুভাগমনে এ স্থান গৌরবান্বিত হইয়াছে। ব্রহ্মের রাজকুমার মাইন্‌গুন্, বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদ ও টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় হিসাবেই এখানে বাস করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার, অযোধ্যার রেসিডেন্ট্ বৃষ্টো, কাশিমবাজারের ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষপত্নী ম্যাডাম্ ফ্রান্সিস্ ওয়াটস্ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালীন ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রূপলাবণ্যময়ী ইতিহাসপ্রসিদ্ধা ম্যাডাম্ গ্রাণ্ড—যাঁহার রূপবহ্নিতে এক সময় বাঙ্গালা ও ফ্রান্সের বহু লোক দগ্ধ হইয়াছিল, যাঁহার কথা কবি তাঁহার ছন্দে "Queen of the Ganges, Queen of the Siene" বলিয়া গাহিয়াছেন, যাঁহার একটু মধুর হাসির পরিবর্ত্তে মহামান্য স্যার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ তাঁহার সমস্ত পদমর্য্যাদা তৎপদে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন—তিনি ফ্রান্সে যাইয়া প্রিন্সেস্ দে টালিরণ্ড্ নামে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে এই চন্দননগরেই বাস করিতেন।

সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতভ্রমণে আসিয়া এবং পরে ডিউক্ অফ্ কনোট্ও এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্, স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স, ভিয়ারলেষ্ট, স্যার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি বড় বড় রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা এখানে বেড়াইতে আসিতেন। সেকালের সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পর্য্যটক ও খৃষ্টান মিশনরি বিশপ্ হিবার্ (Bishop Reginald Heber), গ্রাঁপ্রে (L. De Grandpré), বিশপ্ কুরি (Daniel Currie), ষ্ট্রাভোরিনাস্ (Stravorinus), হ্যামিল্টন্ (Hamilton), উইলিয়ম্ হজ্ (William Hodges R. A.) শেভালিয়ে এলবার্ট (Chevalier Albert), মেটো রিপা (Abbote D. Matto Ripa)

সকলেই এই স্থান দর্শন করিয়া তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অম্বরচুম্বিসৌধসম্পদে এ স্থান কোন দিন সমৃদ্ধ ছিল ইতিহাসে এ কথা পাওয়া যায় না, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিশপ্ কুরি ও গ্রাঁপ্রে গরুটী-প্রাসাদকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে দেশে তাজমহল আছে, আগ্রা দিল্লী প্রভৃতির অনুপম প্রাসাদ সকল অবস্থিত, যাহার স্থাপত্যের স্থান অন্ততঃ একদিক দিয়া শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য সকলেরও উপর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেখানে অবশ্য এ কথা কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা জানি না। মনে হয় ইউরোপীয় ধরণের অট্টালিকাসমূহের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ছিল। এই পল্লী-আবাসের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া ঐতিহাসিক মার্শম্যান্ও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ ও মসজেদ্ সমূহ দর্শনে দর্শকের মনে উহার পূর্ব্ব গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া যে একটা গভীর দুঃখের সৃষ্টি করে সেরূপ দুঃখের নিদর্শন যদি বঙ্গে আর কোথাও থাকে তবে তাহা ফরাসী গভর্ণরের ভগ্নপ্রাসাদপূর্ণ এই গরুটীর বাগান"।

এখানকার বর্ত্তমান সৌধসকলের মধ্যে প্রধান গীর্জ্জাটী ভারতের রোমান্ ক্যাথলিক্ গীর্জ্জাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। এখানে আর একটী বিচিত্রগঠনের প্রাচীন গীর্জ্জা আছে যাহা উল্লেখযোগ্য। ১৭২০ খৃঃ অব্দে সম্ভবতঃ তিব্বত মিশনের যাজকগণের দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানকার দশভুজা, বোড়াই চণ্ডী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর প্রতিষ্ঠা-কাল আরও বহু পূর্ব্বে। দশভুজা ও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত নন্দ দুলালের মন্দিরের ন্যায় গঠনকৌশল ও কারুকার্য্য সচরাচর দেখা যায় না। শেষোক্ত মন্দিরটী আগন্তুকগণের মধ্যে এখনও অনেকে দেখিতে যান, কিন্তু উহার মধ্যে যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অনেকদিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছে। উপরি উক্ত কোন কোন দেবীর প্রতিষ্ঠা বা প্রকাশ সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে বাহুল্যভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি স্বদেশিকতা, কি সমাজসংস্কার, যুগধর্ম্মে বাঙ্গালায় যখন যে বন্যা আসিয়াছে চন্দননগর তখনই তাহাতে ঝাঁপ দিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যদেবের পর বাঙ্গালায় শৈব ধর্ম্মের প্রভাব যখন বলবান তখন এখানেও যে তাহার ঢেউগুলি আসিয়াছিল তাহা এখানকার প্রাচীন শিবমন্দিরের বাহুল্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এখনও এখানে শতাধিক প্রাচীন শিবমন্দির জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের উদাহরণ কতিপয় ধর্ম্ম ঠাকুরের অস্তিত্ব হইতে সপ্রকাশ রহিয়াছে। এখনও সেই সকল স্থানের কোথাও কোথাও বৈশাখী-পূর্ণিমার দিন উৎসব হইয়া থাকে। আবার চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব এখানকার বাৎসরিক খুস্তির মহোৎসব হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। তেমনই যে যুগে বাঙ্গলায় হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা একটা পৌরুষের কথা বিবেচিত হইত, তখন এখানেও কতকগুলি হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া খৃষ্টান হন। সে সময় একদিনে এখানকার একটি পল্লী হইতেই সাত আট জন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অল্প কয়েকজন তাহাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামাজিক বিষয়েও

বর্ত্তমান কে ডুপ্লেক্স
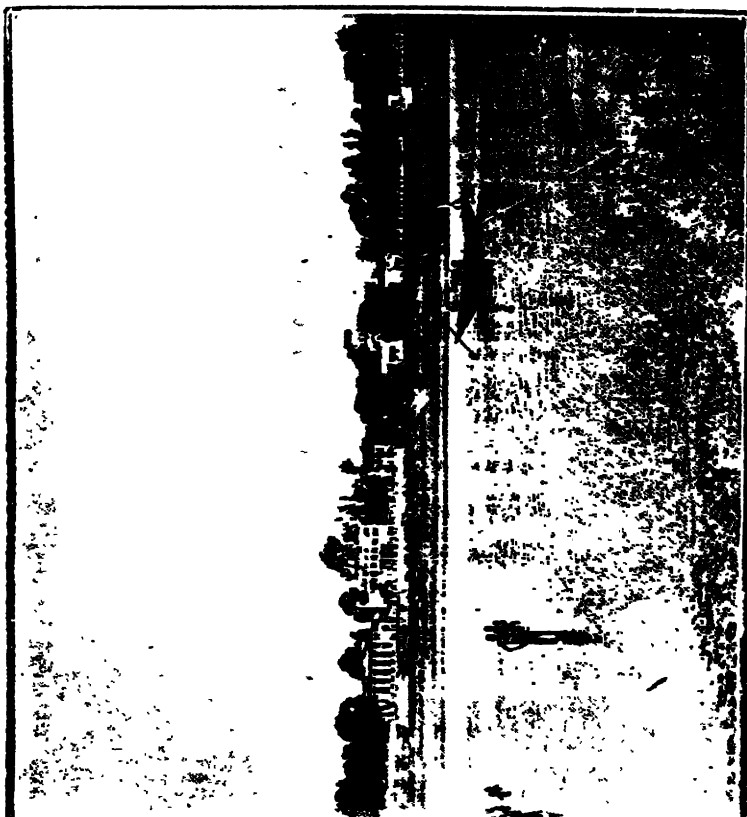
দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর ভগ্নাবশেষ—গোন্দলপাড়া
কবি ভারতচন্দ্র এই বাটীতে বাস করিতেন।

পুরাতন গালার কারখানার ভগ্নাবশেষ

অধুনালুপ্ত মোরাণ্ সাহেবের বাগানবাড়ী—গোন্দলপাড়া

ভূদেব বাবু প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ
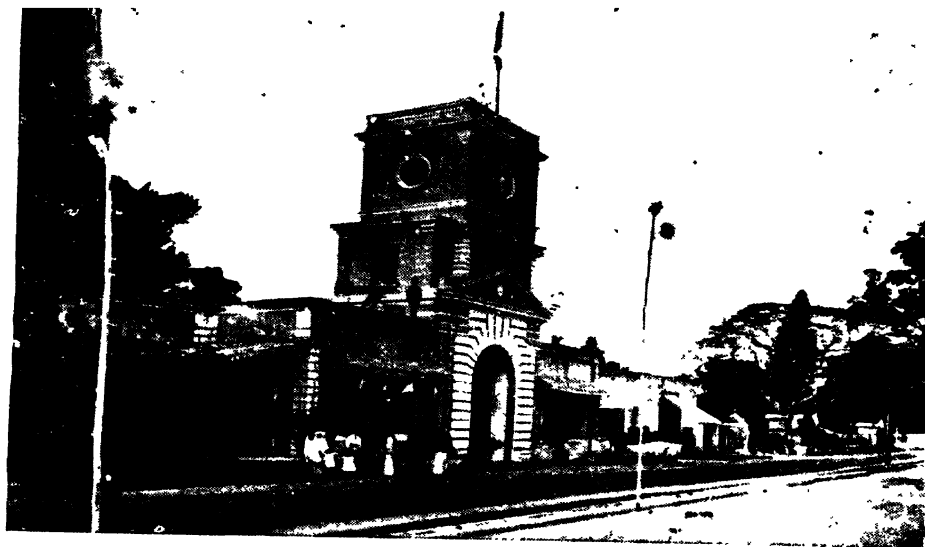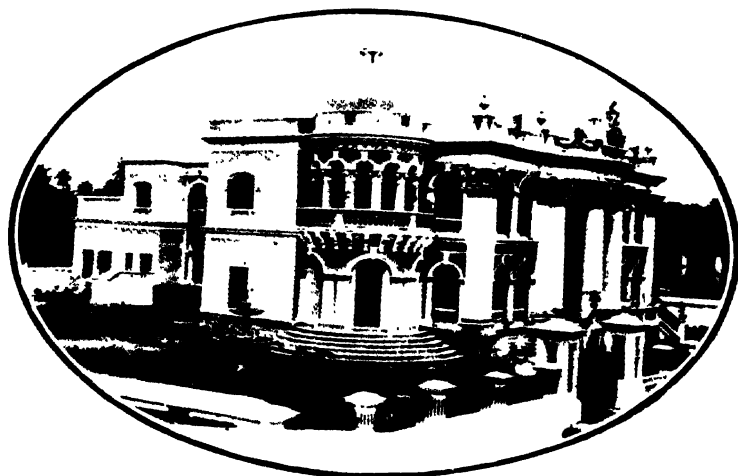
ইহার বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। বঙ্গে যখন সতীদাহ প্রচলিত ছিল তখন এখানেও তাহার অভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহের যখন আন্দোলন হয়, তখন এখানে কয়েকটী বিধবার পুনর্বিবাহ হইয়াছিল। স্বদেশীয়তা-বিষয়েও এস্থান বাঙ্গলার কোন স্থানের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। আবার বিগত মহাযুদ্ধে যখন বাঙ্গালী সন্তানের কাছে দেশের নামে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ডাক আসিল, তখন ভারতবর্ষের মধ্যে চন্দননগরের যুবকবৃন্দই প্রথম বুকের রক্ত দিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিবার জন্য ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে ছুটিয়াছিলেন। প্রথম বাঙ্গালী সন্তান যিনি এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন তিনিও এইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম যোগেন্দ্রনাথ সেন। তাঁহাদের বীরত্বের কাহিনী তদানীন্তন বহু সংবাদপত্রাদিতে আলোচিত হইয়াছিল। হনুমান দাস বাবাজী ও নমাজী সাহেবের ন্যায় সাধক ও অলৌকিকক্ষমতাসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ, শিশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ কুণ্ডু, ফাদার্ বার্থে ও দরগাঁ্যা সাহেবের ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তি, ফাদার বুদিয়ে ও ফাদার পঁর ন্যায় জ্যোতিষবিদ্যাবিশারদ, বসন্তলাল মিত্র ও বেণীমাধব পালের ন্যায় শিল্পী, রাধানাথ বেড়েল ও হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ন্যায় পালোয়ান প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে খ্যাতিসম্পন্ন বহু ব্যক্তির উদ্ভবে অথবা বসবাসে এস্থান গৌরবান্বিত হইয়াছে। উক্ত ফাদার বুদিয়ে ও ফাদার পঁ জয়পুরাধিপতির আমন্ত্রণে তথাকার মানমন্দির প্রতিষ্ঠাবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অন্যান্য যে সকল চিত্রশিল্পী, মৃৎশিল্পী, গায়ক, কথক, যন্ত্রশিল্পী প্রভৃতির উদ্ভবে এস্থান গৌরবান্বিত হইয়াছে বা এখানকার রথযাত্রার উৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজার উৎসব, ফরাসীদের জাতীয় উৎসব, খৃষ্টির মহোৎসব ও অক্ষয়তৃতীয়ার মেলা—যে সবের প্রসিদ্ধির কথা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত—এখনকার এই লুপ্তগৌরব সহরের কথাপ্রসঙ্গে তাহা শুনাইবার লোভ সংবরণ করা কঠিন হইলেও, তাহা বিবৃত করিয়া আর আপনাদের অধিক বিরক্তি উৎপাদন করিব না। কিন্তু যাঁহার কথা না বলিলে যত কিছুই বলা হউক না কেন চন্দননগরের পরিচয় অপূর্ণ থাকিয়া যায়, যাঁহার নামে শুধু চন্দননগর নয় সারা বাঙ্গালা গৌরব অনুভব করে, যাঁহার তুলনাহীন ত্যাগের উদাহরণ সমগ্র বিশ্বেও বিরল, আমার দুর্ভাগ্য সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে পরিচালিত এই ফরাসীরাজ্যে বসিয়াও আজ অপরের দিকে চাহিয়া আমায় তাঁহার নামোল্লেখে মূক থাকিতে হইল।

আপনাদের সহিষ্ণুতার উপর আর অত্যাচার করিব না। আমার এই বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নীরস অভিভাষণ আপনাদের যথেষ্ট শ্রান্তির কারণ হইয়াছে; সে জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। বাঙ্গালীর নিজস্ব যাহা কিছু ছিল তাহার অনেক কিছুই গিয়াছে, যাহা এখনও আছে তাহার মধ্যে গৌরব করিবার বস্তু একটী আমাদের সাহিত্য। সাহিত্য-যজ্ঞে আলোচনা ও মীমাংসার জন্য বর্ত্তমানে পরিভাষা, ব্যাকরণ, লিপি সমস্যা, রাষ্ট্র-ভাষা প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আধুনিক বস্তুতন্ত্র সাহিত্য আমাদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল করিতেছে, হিন্দুর সামাজিক পবিত্রতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে, সীতা সাবিত্রী বেহুলার আদর্শকে মলিন করিতেছে, রসসৃষ্টির

নামে সাহিত্যের বাহন সাময়িক পত্রিকাদির মধ্য দিয়া নিত্য নব আবিলতার সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া এক পক্ষ যে আন্দোলন তুলিয়াছেন, তাহার সমাধান ও সাহিত্যের ধারা নির্ণয় করার সময় আসিয়াছে। সে সকল কোন কথার অবতারণা করিতে না পারিয়া আপনাদের অভ্যর্থনার নামে শুধু আমাদের আত্মকথা প্রচারের সুযোগ করিয়া লইয়াছি।

বর্ত্তমানে সাহিত্যের দিক দিয়া আর একটি সমস্যার কথা মনে হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গসাহিত্যের ধারার মধ্যে একটি সর্ব্বজনীন ভাব লোপ পাইয়া সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রয় করিবে—এরূপ আশঙ্কার মূলে যে সত্য নাই তাহা নহে। অন্যপক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সমস্যা ও পরিভাষা-সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই পথে সাহিত্যিকগণকে খুব ধীরভাবে পদক্ষেপ করিতে হইবে। ভয় হয় যে এই সকল নূতন সমস্যার সমাধানের সুব্যবস্থা না হইলে বঙ্গভাষাভাষীদের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়া পরস্পরকে পর করিয়া দিবে। সে দিকে সাহিত্য-সম্মিলনের গুরু দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করি।

আশা করি—এই সম্মিলনে বহু সুধীজনের সহযোগিতায় বহু নব নব পন্থার উদ্ভাবনে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন স্থায়ী বিমল আনন্দ দানে সমর্থ সর্ব্বদিকে জাতির উন্নতিবিধায়ক সাহিত্যসৃষ্টিই এই সম্মিলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। যুক্তি তর্কে সত্য মিলে না, সত্যকার প্রাণের আবেগে সত্য মিলে। আর সত্যদ্রষ্টাই সেই আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মানবের কল্যাণ সাধন করেন। এই বিদ্বজ্জনমণ্ডলী বাঙ্গালীকে সত্যপথে চালিত করুন, ইহার অধিক আমার কিছু বলিবার নাই।

বহু কাল হইতে বহু সাহিত্যিকধুরন্ধরের শুভাগমনে আমাদের এ স্থান সাহিত্য-তীর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আজ এক সঙ্গে আপনাদের ন্যায় এতগুলি বাণীসাধকের পদরজঃস্পর্শে ইহা মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। এখানকার পূর্ব্ব গরিমার অবশেষ প্রায় আর কিছুই নাই; শুধু ভাগীরথীর পবিত্র সলিলস্পর্শে এই স্থান আজিও মহিমান্বিত। গঙ্গা হইতে ধনুরাকৃতি ধূর্জ্জটিললাটস্থ চন্দ্রকলার ন্যায় আজিও এই সহরের শোভা দৃশ্যমান হইয়া থাকে মাত্র, নচেৎ দিনের পর দিন আঁধার ঘনাইয়াই আসিতেছে। তাই আজি আপনাদের প্রতিভার দীপ্তিতে এই নগরী দীপান্বিতা। ভয় হয় তিন দিনের জন্য আলোকিত করিয়া দীপ-শিখা নিবিয়া গেলে আবার আমাদের গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিবে। তিন দিনের পর বিজয়ার করুণ রাগিণী আবার বাজিয়া উঠিবে। কিন্তু এ সুখ-স্মৃতি কোন দিন আমাদের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যাইবে না। আপনারা আমাদের প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি আমাদের প্রতি আপনাদের এই স্নেহ ক্রমবর্দ্ধমান হউক।

সাহিত্য-রাজ্যে আমাদের স্থান কোথায় তাহা আমরা জানি। আমি আবার বলি এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দ্বারা যে কোন মহাকাজ হইতে পারিবে

এত বড় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলেও, লুপ্তপ্রায় সম্মিলনীর পুনর্গঠনে এই মুহূর্ত্তেই না হউক, এই পরিবর্ত্তন প্রগতির যুগে আপনাদের ন্যায় সাহিত্যের মহারথী ও সাহিত্য-সুহৃদবৃন্দের স্পষ্ট নির্দ্দেশে নিকট ভবিষ্যতে সাহিত্যের সকল অনাচার, আবিলতা দূর হইয়া এই নব জাতির একটা মহাশুভের সূচনা করিতে পারে, এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া এবং আপনাদের সাহচর্য্যলাভ ও সেবায় আত্মতৃপ্তির জন্য এ কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ভগবান তিনিই জানেন, আমাদের সে স্বপ্ন সফল হইয়া এই অধিবেশন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে কি না।

আমার কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে, যে সকল পূজ্য মনীষী এই সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য, ইহার উদ্বোধন করিতে, প্রধান সভাপতরূপে ও শাখা-সমিতির সভাপতিরূপে, সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালন করিতে ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদের অনুগৃহীত করিয়াছেন, যে সকল সাহিত্যিকের সমাগমে এই সভা শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, আমি পুনরায় তাঁহাদের সকলকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমাদের অনিচ্ছাকৃত হইলেও অক্ষমতাহেতু সকল ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে আমি আর একবার আপনাদের সকলকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমার শ্রদ্ধা ও ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার নিবেদন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

চন্দননগর,
৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৪ ।

শ্রীহরিহর শেঠ

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বটকৃষ্ণ ঘোষ

দীনন চন্দ্র

চন্দননগরের স্বেচ্ছাসৈনিক দল

ফ্রান্সের তুলোঁ (Toulon) হইতে জার্মান যাত্রার পূর্বে
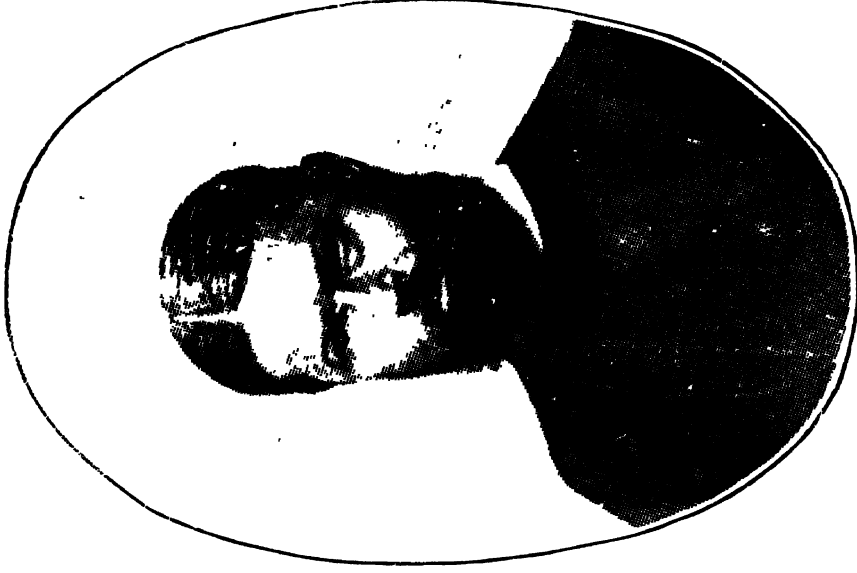
যোগেন্দ্র নাথ সেন

সভাপতির অভিভাষণ

বঙ্গবাণীর উপাসক-উপাসিকাগণ!

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের এই বিংশ অধিবেশনে আমাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি আমার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি এ পদের একান্ত অযোগ্য—আর আমার অযোগ্যতা এমন সুস্পষ্ট যে কাহারই উহা অগোচর থাকা অসম্ভব। কিন্তু বন্ধুত্বের পক্ষপাত এতই প্রবল যে চক্ষুষ্মান্‌কেও মোহান্ধ করে—অভ্যর্থনা সমিতির বহু সদস্যই আমার 'সুহৃৎ সখা', সুতরাং পক্ষপাতী। বিশেষতঃ তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই যে, অকৃতী হইলেও এ অধীন বঙ্গভারতীর একজন প্রাচীন সেবক এবং নানা দুর্ভোগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া অমল-ধবল ভাষা-জননীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—পক্ষপাত-বিনির্মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ঐ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়া যদি বলি, আমার পক্ষপাতী বন্ধুগণ 'ব্রহ্মিষ্ঠ' হইলেও এখনো 'ব্রাহ্মী স্থিতি' লাভ করিতে পারেন নাই—তবে কি তাঁহাদের বিরাগ-ভাজন হইব? যাহা হউক, এই অধিবেশনে যখনই আমার অক্ষমতা আপনাদিগকে পীড়া দিবে—আমার বিনীত প্রার্থনা,—তখন আমাকে দায়-দোষ না দিয়া, অভ্যর্থনা সমিতির উপর দোষারোপ করিবেন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠ ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশন কায়ক্লেশে সম্পন্ন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির যত্ন চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। অধিকন্তু সাহিত্যসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন এ সংবাদও ঘোষিত হইয়াছিল—তথাপি ঐ অধিবেশন যথেষ্ট সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার মত প্রাচীন তাঁহাদের নিশ্চয় স্মরণ হইবে যে, সাহিত্যসম্মিলনের সূত্রপাত হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের প্রথম দিবসে বরিশালে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথই ঐ অনুষ্ঠানের পুরোহিত নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু রাজনীতির কলকোলাহলে এবং 'রেগুলেশন' লাঠির হলাহলে, ঐ মিলিতপ্রায় সাহিত্যসম্মিলনের বোধন না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়াছিল। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে, বিদ্যোৎসাহী ও বদান্যবর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আমন্ত্রণে ও আয়োজনে কাশিমবাজারে সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। তাহার পর প্রায় বর্ষের পর বর্ষ, বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবি-গণ বঙ্গ ও বিহারের নানাস্থানে সমবেত হইয়া এই সম্মিলনরূপ বাণীযজ্ঞে যজ্ঞপুরুষের আবাহন করিতে থাকেন।

আমি সাহিত্য-সম্মিলনের ঐ ঐ অধিবেশনের অনেক কয়টিতেই যোগদান করিয়াছিলাম। তখন কি উৎসাহ কি আগ্রহ লক্ষ্য হইত! আজ কাশিমবাজার, চট্টগ্রাম,

ময়মনসিংহ, বাঁকিপুর, ঢাকা প্রভৃতির কথা মনে পড়িতেছে। মনে হইত বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীর হৃদয়কন্দর হইতে যে গঙ্গোত্রীর পূতধারা উৎসারিত হইতেছে, এ স্রোতের মুখে সমস্ত বাধা-হস্তী ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের জাতীয় অভিশাপ 'নৈতিক পঙ্গুতা' —তাহা হইতে দিবে কেন? শীঘ্রই ঐ সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় প্রবল ভাঁটা লক্ষিত হইল। ভবানীপুরের অধিবেশনে আমরা অনেকেই অনুভব করিলাম—তে হি নো দিবসা গতাঃ। এই নৈতিক পঙ্গুতার জন্য খেদ প্রকাশ করিয়া প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রখ্যাত সাবিত্রী-লাইব্রেরীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত "বাঙ্গালীর জাতীয় অভাব ও অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এইরূপ বলিয়াছিলাম—

"এই নৈতিক পঙ্গুতার ফলে স্থায়ী উদ্যম, ব্যাপী চেষ্টা, সংহত সাধনা বাঙ্গালীর করায়ত্ত নহে। একান্ত উৎসাহ, অসাধারণ অধ্যবসায়, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অসামান্য একাগ্রতা এবং অনন্যপর একনিষ্ঠতা—কর্ম্মসিদ্ধির এই সকল মূলমন্ত্র বাঙ্গালীর অভ্যস্ত নহে। এই জন্য আমাদের একটাও অনুষ্ঠান পরিণত বা স্থায়ী হয় না। আমাদের অধিকাংশ আয়োজনই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। * * আমরা খড়ের আগুন, সহসা চকিত করিতে, চমক লাগাইতে ভাল। প্রথমটা খুব প্রদীপ্ত হই, কত আলো হয়, পরমুহূর্ত্তে সব অন্ধকার! আমরা অন্তঃসারশূন্য আধ্মাত বেলুন; এতটুকু ছুঁচের ঘা'র অপেক্ষা,—তাহা হইলেই স্ফীতি সব গুটাইয়া, একটা কদাকার পিণ্ডমাত্র হই।"

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে এই ৪০ বৎসরে জাতীয় ক্ষেত্রে নানা প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান সত্ত্বেও ঐ পঙ্গুতা এখনও আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছে এবং এই শুদ্ধি-সংঘটনের দিনেও তাহার কোন বিশুদ্ধির লক্ষণ বা সু-ঘটন দৃষ্ট হইতেছে না।

ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ অধিবেশনের পর দীর্ঘ সাত বৎসর কাল সমস্ত নিঝুম নিস্তব্ধ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কথা প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যাইতেছিল। চন্দননগরের অধিবাসিগণ সেই নিষুপ্তি হইতে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া, সেই নির্ব্বাণোন্মুখ উৎসাহ ও আগ্রহকে সঞ্জীবিত করিয়া সাহিত্যসেবিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে সুরভি পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক এবং বঙ্গভারতী তাঁহার অমোঘ বরাভয়দ্বারা চন্দননগরবাসীদিগের মূর্দ্ধা অভিষিক্ত করুন!

১৩২৪ বঙ্গাব্দের শেষে ঢাকায় সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হয়। আমি উহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। আমার অভিভাষণের প্রধান বক্তব্য এই ছিল যে, বঙ্গ-ভাষাই আমাদের যাবতীয় শিক্ষার বাহন হওয়া অত্যাবশ্যক। তৎপ্রসঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলাম, "আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র, স্বাবলম্ব, স্বাধীন 'সামাজিক' প্রস্তুত হইবে—যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে—এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে, নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে, নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে।"

কেন প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীতে ঐরূপ মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না? কেন আমাদের দেশে শিক্ষা বন্ধ্যা হইয়াছে? শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? এ সব প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ বাংলাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশীভাষার দ্বারা শিক্ষাদান। ঐ সম্পর্কে আমি অনেকবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং স্বমত পোষণের জন্ম একাধিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীর অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

আপনাদের স্মরণ হইবে, উহার ঠিক্ পূর্ব্ব বৎসর বাঁকীপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন "দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব। আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব। আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে। * * রাশিয়ান, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়-রূপে গৃহীত হইবে।"

স্যার আশুতোষ বাস্তববাদী ছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সতর্ক করিয়া-ছিলেন—

"যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই, বা থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল বদল করিতে হয় বা নূতন কিছু করার দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে।" একথা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ ও বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন প্রথমাবধিই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। আমার মনে আছে,—১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাংলার জন্য যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ এ পরীক্ষায় যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাংলার বাহনে বিতরিত হয়—তজ্জন্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া (আমিও ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলাম) একটি কমিটি গঠিত করেন। ঐ কমিটি সসঙ্কোচে প্রস্তাব করেন—

That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance Examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate.

ঐ প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তবে মহামান্য সেনেট-সভা প্রজ্ঞার উচ্চ চূড়ায় চড়িয়া—'দিও হে কিঞ্চিৎ, কোরো না বঞ্চিত' এই নীতির অনুসরণ করিয়া এইরূপ বিধান করেন যে, "**An *optional* examination be held in original composition in Bengali and other**

vernaculars for the F. A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate."

ইহার পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের ইউনিভার্সিটি কমিসন দেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিয়া বলেন—

We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the B. A. course although there *need be no teaching* on the subject." ইহার দুই বৎসর মধ্যে গভর্ণমেণ্ট একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার করিলেন। সেটা এই যে, ১৩ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে ইংরাজির বাহনে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত—অধিকন্তু প্রবেশিকা-স্কুলের ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা হইতে একেবারে বঞ্চিত করা অসঙ্গত। কিন্তু এই চমকপ্রদ আবিষ্কার সরকারি রিপোর্টেরই কবলিত থাকে—কার্য্যকারী করা হয় নাই।

ইহার পর প্রধানতঃ স্যার আশুতোষের চেষ্টায় শনৈঃ শনৈঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর এক কোণায় বাংলা ভাষার একটু বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা, এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষার্থী সকল বাঙ্গালী ছাত্রকেই বাংলা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়—সঙ্গে সঙ্গে রচনার রীতি শিক্ষার Models of style-রূপে কয়েকখানি পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করার নিয়ম প্রচলিত হয়। ইহা কথঞ্চিৎ পুরঃসরণ বটে কিন্তু এই কিঞ্চিতে তুষ্ট না হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন বাংলা ভাষার পরিধি বিস্তীর্ণতর করিবার জন্য বরাবরই সচেষ্ট থাকেন। এমন কি বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বাংলা ভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসার কিরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে কয়েকটি সুচিন্তিত মন্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবার স্পর্দ্ধা করেন।

ইহার পর স্যাড্‌লার কমিশনের বহ্বারম্ভ হয়—আমরা ঐ প্রাজ্ঞের মণ্ডলী হইতে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু বহ্বারম্ভের নিয়ম যে 'লঘুক্রিয়া'—তাহার অন্যথা হয় নাই। বিরহী যক্ষের মত আমাদের সান্ত্বনা একমাত্র—

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।

কথায় বলে 'সবুরে মেওয়া ফলে'। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাহারই ফলন হইয়াছে। আজ যুগান্ত-ব্যাপী আশাপ্রতীক্ষার পর—'দিন আগত ঐ!' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি প্রবেশিকা-স্কুল সম্পর্কে নিয়ম করিয়াছেন—One further condition of recognition or of continuance of recognition of a school already recognised, shall be that vernacular shall be the medium of instruction in all subjects other than English, subject to such exceptions granted by the Syndicate in general accordance with the provisions of section 7. Chapter XXX of the Regulations এবং পরীক্ষার্থী সম্বন্ধে নিয়ম করিয়াছেন—Unless otherwise provided, answer papers in all subjects other than

English and other European languages, shall be written in one or other of the major vernaculars, viz., Bengali, Urdu, Assamese and Hindi.

অতএব সাহিত্য-সম্মিলনের এত বৎসরের চেষ্টা এইরূপে সফল হইয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলন এখন বলিতে পারেন—

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম!

এবং যাঁহার ঐকান্তিক উদ্যম ও যত্নে এই বিপ্লবী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—স্যার আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী উপাচার্য্য শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অশেষ সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতে পারেন। প্রতাপী পিতা যাহা পারেন নাই—পুণ্যকীর্ত্তি পুত্র তাহা সম্পন্ন করিলেন—ইহাকেই বলে—পুত্রে যশসি তোয়ে চ!

এখন মাননীয় ভাইস্-চেন্সেলার মহোদয় প্রবেশিকার ঐ নিয়ম আই-এ ও বি-এ পরীক্ষায় প্রসারিত করিয়া কীর্ত্তিমন্দিরের তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করুন—লোহার বাসরে যখন গুণছুঁচ প্রবেশ করিয়াছে, তখন ঐরূপ করা আর দুঃসাধ্য হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে যদি অর্থকৃচ্ছ্র থাকে, তবে তথাকথিত 'Research'-এ ব্যয় সংকোচ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, সুকুমার কলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সুবোধ্য সুখপাঠ্য সুমূল্য গ্রন্থনিচয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করুন—যেন (স্যার আশুতোষের ভাষায়) 'বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত হয়' এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক তমসাচ্ছন্ন কুহর জ্ঞানের ভাস্কর জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়। প্রতি ক্ষেত্রে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কৃতী—এইরূপ সাহিত্যিকদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় সাদরে আহ্বান করিয়া সম্মানের সহিত ঐরূপ গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত করুন—যেমন গুণজ্ঞ ভাইস্ চান্সেলার মহোদয়ের উদ্‌যোগে এ বৎসর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ডিগ্রিধারীদিগের সমাবর্ত্তনে সম্বোধন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। Convocation-address সম্পর্কে এ প্রথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নূতন বটে কিন্তু খুব আশাপ্রদ। কোথায় লম্বশাটপটাবৃতের অশ্রাব্য বাক্যোচ্ছ্বাস - কোথায় বন্দ্য কবিগুরুর মেঘমন্দ্রিত নন্দিত বাণী!

গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।

বিশ্ববিদ্যালয় যদ্যপি নিজ নামের সার্থকতা করিতে চান এবং নিজ motto 'Advancement of Learning'-কে সফলতা দান করিতে চান—তবে তাঁহাকে আর একটি গুরুতর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইবে। অনেকদিন পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচয়িতা মনস্বী Vincent Smith বলিয়াছিলেন—"The Indian Universities suffer from the want of root. They are merely cuttings struck down in uncongenial soil, and kept alive with difficulty by the constant watering of a paternal government." তথাপি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষস্থ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ভারতীয় ভাবে ভাবিতে এবং জাতীয় প্রেরণায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য কি উদ্‌যোগ আয়োজন

হইয়াছে ? এখনও কি আমাদের এই সকল প্রতিষ্ঠান য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হীন অনুকৃতি মাত্র নহে ? কবে সেই শুভদিন আসিবে যে দিন উহারা ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস দর্শন চর্চ্চার সজীব কেন্দ্রে পরিণত হইবে ? সম্ভবতঃ এজন্য আমাদিগকে স্বরাজ্ আগমনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সে কতদিন ?

কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেকটর বর্ত্তমান ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড যাহাকে 'বিরাট্ বেখাপ্পা'—stupendous anomaly বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছিলেন—তাহার প্রতীকার করিতেই হইবে। লর্ড জেট্ল্যাণ্ডের উক্তি স্মরণ আছে কি ? "What did surprise me was to learn that up to the B. A. degree, Indian philosophy finds no place in the curriculum. It is Western philosophy that is taught. And it is only those who proceed with their studies beyond the B. A. degree, who receive at the hands of their University a draught from those springs of profound philosophic thought which have welled up in such rich measure from the intellectual soil of their own country. Frankly that strikes me as a *stupendous anomaly.*" লর্ড জেট্ল্যাণ্ড দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইতিহাসের পঠন পাঠন সম্বন্ধেও উহা বক্তব্য। স্বীকার করি, ঐ বিরাট্-বেখাপ্পা এখন আর পূর্ব্বের মত তত্তটা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' নয় (আকারান্ত বলিয়া ইহাতে স্ত্রীত্ব আরোপ করিলাম)—ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাস অপরিসর হইলেও কতকটা স্থান লাভ করিয়াছে—কিন্তু ঐ নটীর তাণ্ডব কি একবারে স্তিমিত হইয়াছে ? অর্থাৎ বহু বর্ষ হইল ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যে আদর্শ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন, তাহাকে কি আকার দান করা হইয়াছে ? ভিন্সেণ্ট স্মিথের কথা শুনুন :—

'When an Indian student is bidden to study philosophy, he should not be forced to try and accomodate his mind to the unfamiliar forms of European speculation, but should be encouraged to work on the lines laid down by the great thinkers of his own country, who may justly claim equality with Plato, Aristotle and Kant.

The lectures and examinations in philosophy for the student of an Indian University should be primarily on Indian Ethics and Metaphysics, the European systems being taught only for the sake of contrast and illustration * * * * History too should be treated in the same way, and be approached from the Eastern, not the Western side. * * * It is useless to ask an Indian University to

reform itself, because it does not possess the power. Some day, perhaps, the man in power will arise, who is not hidebound by the University traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself to the development of Indian thought and learning, and who will care enough for true higher education to establish *a real University in India.*

এই প্রসঙ্গে আমি ঢাকায় যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার পুনরুক্তি করিতে চাই—'আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আশাপথ চাহিয়া আছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতিদান করিবেন'।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির নিকট শ্রোতারা বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সুকুমার সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্গসাহিত্যের প্রগতিবিভাগের প্রগতি ও উন্নতি বা অধোগতির প্রকৃষ্ট বিবরণ প্রত্যাশা করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় ঐ পথে বিচরণ করিবার মত পাথেয় আমার পুঁজিতে নাই। অতএব বাধ্য হইয়া বিরত থাকিতে হইবে—বিশেষতঃ যখন অভ্যর্থনা সমিতি প্রত্যেক শাখার জন্য স্বতন্ত্র সুযোগ্য সভাপতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তথাপি নিয়ম-রক্ষার জন্য দুই চারি কথা বলিব—ভরসা করি আমার এই বৈচিত্র্যহীন বিরল ব্যাখ্যানে আপনারা বিরক্ত হইবেন না।

প্রথম, বিজ্ঞান :—আমাদের স্পর্দ্ধার কথা যে, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে কেন্দ্র করিয়া বিজ্ঞানক্ষেত্রে বেশ এক গবেষক দল বাংলার ভিতরে গড়িয়া উঠিতেছে এবং বাংলার বাহিরে শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা-প্রমুখ বাঙালী বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানকে ব্যাসকূটের পরব্যোম হইতে পৃথিবীলোকে অবতারণ জন্য আজ রামেন্দ্রসুন্দর কোথায়? 'After life's fitful fever' তিনি ত' অনেক বর্ষ 'স্বর্গলোকে বিশালে' শান্তি-সুখ উপভোগ করিলেন—এখন নামিয়া আসুন। কবির ভাষায় বলি—রামেন্দ্র।

Thou should'st be living at this hour :
Bengal hath need of thee.

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সলার রূপে বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত 'রিসার্চ'-কার্য্য বাংলাতেই হওয়া উচিত।

"With the field of research daily expanding, the question of its vehicle must come to the fore. No country has done real research work on a large scale and with lasting results, that has been handicapped by the language difficulty as we have been."

স্যার দেবপ্রসাদ বিদ্যার্থীদিগের রিসার্চ্চ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব্ববিধ গবেষণা সম্বন্ধেই তাহা বলিতে চাই। অবশ্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নূতন গবেষণার ফল ইংরাজীতে বিবৃত ও প্রচারিত করিলে আশু যশস্বী হওয়া যায়; কিন্তু ইংরাজীর দ্বারে এই যশের লোভ আমাদের সংযত করিতে হইবে এবং স্যার আশুতোষের কথায়—'আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম—তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, বাংলার সম্পত্তি বাঙ্‌লার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিতে হইবে'—যেন বিদেশীয়গণ সেই ভাণ্ডার হইতে বাংলাভাষার দ্বারে জ্ঞান-মধু আহরণ করিতে পারেন।

দর্শন-ক্ষেত্রেও আমার ঐরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বাংলার সৌভাগ্যে বিগত ৭০ বৎসরে এই দেশের মাটিতে কয়েকজন নিপুণ দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—আমার দর্শন-গুরু অধুনা বৈকুণ্ঠবাসী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কৈলাস শিরোমণি, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় উঁহারা দর্শন ক্ষেত্রে যে কিছু কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন—তাহা প্রায় সমস্তই হয় সংস্কৃত না হয় ইংরাজি ভাষায়। এ সম্পর্কে আমার দার্শনিক বন্ধু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাঁচিতে অনুষ্ঠিত বিগত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে দর্শন-শাখার সভাপতিরূপে যে সুচিন্তিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন—উহাতে 'বাংলায় দর্শন-চর্চ্চার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে! ঐ সন্দর্ভের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। একথা স্বীকার করি যে, কয়েক বর্ষ হইতে বাংলাদেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের যুগপৎ আলোচনা করিবার এক নব যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে—ইহাও ঠিক্ যে বঙ্গদেশ দর্শনচিন্তায় পশ্চাৎপদ নয়—কিন্তু কেহ কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, বাংলার বাহনে দার্শনিক জ্ঞান যথাযোগ্য বিতরিত হইতেছে না বলিয়া দর্শনবিদ্যা আমাদের নিজস্ব হইতেছে না এবং মৌলিক দার্শনিক চিন্তা গড়িয়া উঠিতেছে না।

ইতিহাস-ক্ষেত্রেও প্রচুর সফলতার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্ন-তত্ত্ব-সম্পর্কে সতর্ক গবেষণার ফলে বহু অজ্ঞাত ও অলক্ষিত ঘটনা ও রটনা আমাদের গোচর হইতেছে। আজ নিপুণ গবেষক ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা স্মরণ হইতেছে—এ মার্গে তিনিই একরূপ পথ-প্রদর্শক। বাংলার ইতিহাসসম্পর্কে ইতিমধ্যে এত নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—কৃতী ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্রমজুমদার মহাশয়ের প্রবর্ত্তনায় বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় উদ্‌যোগী হইয়াছেন এবং সুখের বিষয় স্যার যদুনাথ সরকারকে ঐ ইতিহাস গ্রন্থনের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—ঢাকার বর্ত্তমান ভাইস্-চান্সলার্ ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চান্সলারের শুভ সম্মিলনে আশা করা যায় ইতিহাস-ক্ষেত্রে অচিরে স্বর্ণ ফলিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ,
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

বলা বাহুল্য ঘটনার ইতিহাস সংকলনের যথেষ্টই মূল্য আছে। কিন্তু চিন্তার ইতিহাসের মূল্য আরও অধিক। ঐরূপ ইতিহাসের জন্য কেবল মত ও প্রমাণ পুঞ্জীভূত করা যথেষ্ট নহে কিন্তু প্রজ্ঞোজ্জ্বল প্রতিভার দ্বারা সমস্ত ঘটনাকে সুবিন্যস্ত করতঃ উহার অন্তর্নিহিত চরম তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা চাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে সহজিয়া দোহা-কোষের আলোচনায় আমি এই বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। আপনারা জানেন প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' প্রথম সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত করেন। ইহার পর ডাঃ সহিদুল্লা কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোঁহাগুলি তাহাদের তিব্বতীয় অনুবাদের সহিত মেলন করিয়া একটি critical সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম ছিল—"Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha."

পরে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী তিল্লোপাদের দোহাবলী ও আরও কয়েকটি অভিনব দোহা সংযুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারে ও কূটার্থনির্ণয়ে প্রভূত প্রযত্ন করতঃ এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সকল দোহা নানাভাবে আলোচিত হইতে পারে—ভাষার দিক্ দিয়া, ব্যাকরণের দিক্ দিয়া, অভিধানের দিক্ দিয়া। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সকল দোহার তখনই যথার্থ সদ্ব্যবহার হইবে যখন আমরা উহাদের সাহায্যে 'সহজ' মতের ক্রমবিকাশ এবং 'সহজ' কিরূপে কামসঙ্কুল 'সহজিয়া'তে পরিণত হইল এবং কবে ও কি প্রকারে উহার মধ্যে তান্ত্রিক mysticism প্রবেশ লাভ করিল—এই সকল প্রশ্নের তথ্য নিরূপণ করিতে পারিবে। এইরূপে বাংলার ধর্ম্মেতিহাসের একটা লুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কৃত হইবে। সহজিয়ারা এখন বলেন বটে—

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্জউ কজ্জু

কিন্তু আরম্ভে, স্বচ্ছ অবস্থায়, সহজ মত যে উচ্চাঙ্গের সাধনমার্গ ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। প্রাচীন দোহাকার বলিয়াছেন—সহজ সিদ্ধিতে পরম মহাসুখ—একাধারে নিখিল দুরিত নাশ এবং ঘনান্ধকারে চন্দ্রমণির ভাস্বর প্রকাশ।

ঘোরান্ধারে চন্দ্রমণি জিম উজ্জোয়া করই।
পরম মহাসুখ এক্কুখনে দুরিয়া সেল হরই॥

অতএব,

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গাসাঅরু
অথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু।

কিন্তু ঐরূপ সমস্যার সমাধান জন্য অসামান্য প্রতিভাশালীর আবির্ভাবের প্রয়োজন। কবে বাংলাদেশে ঐরূপ Synthetic Genius-এর উদয় হইবে ?

সাহিত্যিক বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব না—বর্ত্তমানে তাহার সুযোগ বা অবসর নাই। তবে এ বিভাগে কয়েকটি শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। প্রবীণ সাহিত্যিক

প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ করিয়াছেন। Indian Research Institute হইতে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রধান সম্পাদকতায় 'বঙ্গীয় মহাকোষ' প্রকাশিত হইতেছে। শান্তিনিকেতন হইতে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' মুদ্রিত হইতেছে। উহাতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা শব্দ, প্রাদেশিক শব্দ, বাংলা তদ্ভব শব্দের মূল সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতের পূর্ব্ব-রূপ এবং বাংলা শব্দের অনুরূপ হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, সিন্ধী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার শব্দ, বাংলায় ব্যবহৃত আরবী ও ফারসী ও ইংরাজী, পর্ত্তুগীস প্রভৃতি বিদেশী শব্দ, বাংলা প্রবচন, সংস্কৃত শব্দের অবেস্ত ভাষায় আকৃতি ও গ্রীক্ ল্যাটীন প্রভৃতি প্রতীচ্য ভাষার তুলনীয় সমপর্য্যায় শব্দ ইত্যাদি বহু বিষয়ের সন্নিবেশ আছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও 'ক-কার' শেষ হয় নাই। সমাপ্ত হইলে এই বঙ্গীয় শব্দকোষ বাংলা ভাষার বৃহত্তম ও ব্যাপকতম অভিধান হইবে।

আর একখানি কোষের উল্লেখ করিতে চাই। ইহা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার-সঙ্কলিত 'জীবনীকোষ'। ইহাও এক বিরাট ব্যাপার। শুনিয়াছি ভারতীয় ও বিদেশীয়, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সমস্ত ব্যক্তির পরিচয় এই জীবনীকোষে থাকিবে এবং অনুমান দশ হাজার পৃষ্ঠায় এই বিরাট্ গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। এরূপ অভিধান বাংলায় এই প্রথম এবং ইহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আবশ্যক। সম্প্রতি জীবনীকোষের পৌরাণিক অংশ দুই হাজার পৃষ্ঠায় শেষ হইয়া ঐতিহাসিক অংশের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলার সুকুমার সাহিত্য সম্পর্কে আমি কি বলিব? দেশের বহু ভাগ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখনও ভাষাজননীর সেবা করিতেছেন এবং দেবীর বরে তাঁহার নবনবোন্মেষিণী প্রতিভার স্রোতঃ এখনও স্তিমিত হয় নাই। এই সাহিত্য-সম্মিলন হইতে নিখিল সাহিত্য-সেবীর প্রভাস্বর প্রতিভূস্বরূপ তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছি। তাঁহার পূজাতেই সমস্ত প্রবীণ সাহিত্যিকের পূজা সম্পন্ন হইবে, কারণ, 'সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ'।

বিগত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই বাংলাদেশে যে নবীন সাহিত্যিকসংঘের অভ্যুত্থান হইয়াছে, আপনারা নিশ্চয়ই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই তরুণ দলের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমার বয়োবৃদ্ধা নেত্রী মিসেস্ বেসাণ্ট—যিনি একাধারে নবীনা-প্রবীণা ছিলেন,—বৈদিক ঋষিরা যাহাকে 'তব্যসী নব্যসী' বলিতেন,—তাঁহার মুখের বাণী ছিল 'Youth leads the world'—তরুণেরই জগতের নেতৃত্ব। বস্তুতঃ এই তরুণ দলই বাংলা সাহিত্যের ভাবী ভরসার স্থল। সেজন্য তাঁহাদের দায়িত্ব অসীম। প্রবীণ সাহিত্যিক-দিগের অনেকেরই আয়ুঃসূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আর কয়দিন? বাংলা সাহিত্যের স্বস্তি ও সমৃদ্ধি এই তরুণদলের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই তরুণদলকে আমি বেশ প্রীতির চক্ষে দেখি। যদিও কাহারও কাহারও মধ্যে অকালপক্কতার জরা

ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু কয়েকজনের রচনায় প্রতিভার প্রকাশ বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে —মনে হয় কাহারও কাহারও হৃৎপদ্মে শতদল-বাসিনী তাঁহার রাঙা চরণ অর্পণ করিয়াছেন। বোধ হয় ঐরূপ তরুণদিগকেই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের অমোঘ আশীর্বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

*　　*　　*

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী!
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস্ ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস্ আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা।
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা॥

এই রবীন্দ্রনাথসম্পর্কে আমি তরুণ কবিদিগকে একটু সতর্ক করিতে চাই। তাঁহারা বোধ হয় সকলেই রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী—আমরা অনেকেও তাহাই। কিন্তু অনুরাগ এক অভিভব অন্য। আমার মনে হয় তরুণদলের অনেকে রবীন্দ্রের দ্বারা অভিভূত। আজ যদি এ দেশে কবি পোপ থাকিতেন তবে তিনি ঐ তরুণদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই বলিতেন—

'Every songster has his tune by heart'

অবশ্য, অনুকরণ দোষের নয়। সেক্সপীয়র প্রথম বয়সে মার্লোর অনুকরণ করিতেন। আমাদের দেশে মাঘ ভারবির অনুকরণ করিয়াছেন এবং ভবভূতি কালিদাসের অনুকরণকারী। ফরাসী নাট্যকার মোলিয়্যারকে অনুকরণ জন্য তিরস্কার করিলে তিনি বলিতেন—It was mine by right.

কিন্তু অনুকরণ ও অনুসরণ এক জিনিস নয়। অনুকৃতিতে নিজস্ব করিয়া লওয়া যায় কিন্তু অনুসৃতিতে তাহা করা যায় না।

আর একটি বিষয়ে তরুণদিগকে সতর্ক করিতে চাই—সাহিত্যের ভূমিতে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা। এ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ বিগত রাঁচি বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তৎপ্রতি তাঁহাদের ও আপনাদের প্রণিধান প্রার্থনা করি। তিনি দুঃখ করিয়াছিলেন যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে যে ধারা প্রবাহিত হইতেছে, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ধারা এবং ঐ ধারা ক্রমশঃ অতি ন্যক্কারজনক ভাব ধারণ করিয়াছে। ফলে বাংলার কথা ও কাব্য সাহিত্য যৌন জঞ্জালে জর্জ্জরিত হইতেছে এবং আদিম জৈবিক যৌন বুভুক্ষার বিকাশ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে—সর্ব্বত্রই উলঙ্গ বাস্তবের নির্লজ্জ নৃত্য এবং জুগুপ্সিত কামায়নের চণ্ড চঙ্ক্রমণ দৃষ্ট হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেববাবু এক মাসিকের পূজা-সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন —উহা দেখিবার দুর্ভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল—উহার আরম্ভ হইতে অবসান পর্য্যন্ত একেবারে নগ্ননারী-চিত্রে ভরপুর এবং প্রেমের বিচিত্র গতির ব্যাখানে (অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ ?)—বাইরণ কি প্রকারে বৈমাত্রেয় ভগ্নীর সহিত যৌন সম্পর্কান্বিত হইয়াছিলেন, ডি এচ্ লরেন্সকে কেমন করিয়া তাঁহার জননী যৌনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—এই সকল ন্যক্কারজনক কাহিনীতে পরিপূর্ণ—অর্থাৎ সমস্তটা সাকার ও নিরাকার Nudism-এর জুগুপ্সিত সঙ্গীতে মুখরিত। দেববাবু বলেন, যদি অশ্লীল চিত্র ও সাহিত্যের দৌলতে—যাহা বাজে বেশ এবং বিকায় বেশ—আমাদের সমাজ-বন্ধন, আমাদের পারিবারিক পবিত্রতা, শুচিতা ও শালীনতা নষ্ট হইয়া গিয়া বঙ্গসমাজ অবিমিশ্র promiscuous যৌন-চর্চ্চার সাধন-ক্ষেত্র হইয়া উঠে, তবে কি যে আমাদের ভবিষ্যৎ হইবে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!

অবশ্য সাহিত্যের মধ্যে এই 'সহজ-যানে'র অভিযান—পরকীয়ার সহিত অবৈধ প্রেমের চটুল গল্প এবং চুটকি কবিতা, সাহিত্য শরীরে এই কামিক বিষ-বীজাণুর সঞ্চরণ—আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের 'স্বকৃতভঙ্গ' নয়—ইহা বিলাত হইতে আমদানি—আমাদের পক্ষে ধারকরা জিনিষ। পাশ্চাত্য দেশে এই ব্যাপার কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে—একজন প্রবীণ পাশ্চাত্যের মুখে শুনিবেন কি ? থিয়সফিক্যাল সভার বর্ত্তমান সভাপতি ডাঃ জর্জ্জ এরাণ্ডেল—যিনি অনেক বৎসর যাবৎ সেন্ট্রাল্ হিন্দু কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষরূপে ভারতমাতার সেবা করিয়াছিলেন—তিনি প্রায় ছয় মাস কাল য়ুরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি প্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন :—

What is the matter with Europe ? Almost everywhere is to be found the evil miasma of depraved sexuality. Journals and magazines are allowed to appear whose appeal is frankly sexual. Revues are staged in every country similarly conceived—in London alas ! no less than in the cities of the continent. In Port Said, sex is to all intents and purposes openly merchandised. * * What is disgustingly called 'sex appeal' (the emotional ugliness of debased sex)

is the undercurrent of not a little of the ordinary everyday life of ordinary everyday people—fashion, amusements, reading, social intercourse, and mental and emotional pre-occupation.

ডাঃ এরাণ্ডেল ইয়োরোপে যে sex appeal-এর প্রচারের উল্লেখ করিলেন, লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঐ sex appeal শুধু কাব্য নাটক সিনেমা টকি প্রভৃতির বাহনে নয়—সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন মারফতেও বিতরিত হইতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কালিদাসের যুগে কামিনীরা মুখে লোধ্রপরাগ মাখিয়া, চূড়াপাশে নব কুরুবক তুলাইয়া, কর্ণে শিরীষফুল ঝুলাইয়া এবং হস্তে লীলাকমল ধারণ করিয়া কান্তের মনোহরণ করিত।

হস্তে লীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধম্
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননশ্রীঃ।

ঐ সকল ছিল তাহাদের প্র-সাধন। সে যুগে কিন্তু শ্লথ বক্ষোজের একমাত্র ভরসা ছিল কাঁচুলি। এখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের কল্যাণে কামের তূণীরে নূতন শরসঞ্চার হইয়াছে। ধন্য বিজ্ঞান! ভব্য সমাজে প্রচারিত, একখানি সাপ্তাহিকে হপ্তার পর হপ্তা প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটীর প্রতি লক্ষ্য করুন (এমন আরও কত আছে)।

Now every woman can own the *essential* beauty of firm rounded breasts. *Charmex*, secret product of a great beauty specialist, develops a flat, fallen bust into a perfect form by a new, natural and infallible method.

ঐ সাপ্তাহিকের আর একটা চিত্রসংযুক্ত বিজ্ঞাপন এই—Helen's Bustofine Tablets cures flat chests, cures the shape of fallen breasts ইত্যাদি।

ভারতবর্ষসম্পর্কে এরাণ্ডেল সাহেব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—I pray to God that all these evils may but make little headway in India (তিনি জানেন না এই সংক্রামক ব্যাধির ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে কতটা প্রসার হইয়াছে।). But with the advent of the films, with an increasing and most unfortunate tendency to copy Western methods * * and with a general departure from the great standards set aforetime—there are to be seen in India too, tendencies which may well lead her to disaster—into a disaster all the more terrible bacause she is the background of Aryan civilisation and is still the home of the finest Aryan culture. If India falls, the whole world falls! তরুণেরা এ সকল কথা মনে রাখিবেন কি?

কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার কথা বলিতেছিলাম। এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না—অন্ততঃ আমি বলি না—যে, কাব্য নাটক উপন্যাস হইতে

আদিরসকে নির্ব্বাসন করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিবেন আদি-রসেরও শ্লীল অশ্লীল আছে, কমনীয় ভয়নীয় আছে, সুশ্রী বিশ্রী আছে। আদিরসের এমন ভাবে অবতারণা করা যায় যাহা কেবল অশ্লীল নয়--French cards-এর মত জুগুপ্সিত, ন্যক্কারজনক। পাশ্চাত্য দেশের অনেক নাটক নভেলই এখন এই ধরণের। জোলার উপন্যাসের কথা বলিতেছি না —Anatole France উহাদিগকে ordure বা বিষ্ঠাস্তূপ বলিয়াছেন। (ordure-এর ঠিক অনুবাদ গোবর নয় বড়বা-বর)। এ প্রসঙ্গে আপনাদিগকে ঔপন্যাসিক Aldous Huxley-র কথা স্মরণ করাইতে চাই। Huxley যে একজন প্রতাপী লেখক—সুদক্ষ এবং সুশিক্ষিত—তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই—কিন্তু পাশ্চাত্যে সাহিত্যরুচি কতটা বিকৃত হইয়াছে তাঁহার 'Brief Candles'—বিশেষতঃ 'Point Counterpoint' পড়িলে বেশ বুঝা যায়। আজকাল হাক্স্‌লির খুব নাম ডাক আর এই 'Point Counterpoint' নাকি তাঁহার ঔপন্যাসিক পরাকাষ্ঠা (Masterpiece)—সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ। ইহার আগাগোড়া কুৎসিত কামক্রীড়ার অভিনয়ে উল্লসিত—ইহার টানা পোড়েন রতি ও মদনের উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে উপক্রত—কামো দদ্যাৎ কামঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ। ইংলণ্ডে Restoration Drama-তে যে অবৈধ প্রেমের অনঙ্গরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল—যে নাটককে একজন অভিজ্ঞ সমালোচক—'Domain of Cuckolddom' বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন,—তাহার স্রোত এখন আর অন্তঃশীল নয়—একটানে সর্ব্বগোচরে বহমান হইতেছে। শুধু হাক্স্‌লির 'Point Counterpoint' কেন—H. G. Wells-এর 'New Machilavel'-র কথা ভাবিয়া দেখুন। এমন কি স্বয়ং Anatole France-এর 'Red Lily'ও ঐ দোষবর্জ্জিত নয়।

এদেশে প্রাচীনেরা কাব্য নাটকে স্বকীয়া পরকীয়ার ভেদ করিতেন। শকুন্তলা, মালবিকা, মালতী—দুষ্যন্তের, অগ্নিমিত্রের, মাধবের স্বকীয়া—এমন কি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যা'ও সুন্দরের পরকীয়া নহে।

অবশ্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা স্বতন্ত্র—প্রথমতঃ উহা জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন ঘটিত আধ্যাত্মিক রূপক—আদৌ যৌনঘটন নহে। দ্বিতীয়তঃ, যদিই বা রূপক না হয় তবে 'ভগবান্‌ অপি তা রাত্রীঃ'—'অতএব তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।'

আমার মত প্রাচীন-পন্থীরা যাহাকে 'পরদার' বলেন, এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের আখ্যান-বস্তুতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু পরকীয়া না হইলে পাশ্চাত্য কবি বা ঔপন্যাসিক এক পদও চলিতে পারেন না। সেই জন্য দেখা যায় রামায়ণের সীতা যখন গ্রীসে দ্বীপান্তরিতা হইলেন তখন তিনি ইলিয়দের Helena-র রূপপরিগ্রহ করিলেন—

Is this the face that launched a thousand ships
And burnt the tops of high Ilium ?

এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণ Agamemnon ও Menelausএ এবং দশমুণ্ড রাবণ নবকান্তিক Paris-এ পরিণতি পাইলেন।

ঐটা বোধ হয় এদেশের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষার গুণ বা দোষ। জড়বাদী চার্ব্বাক অঙ্গনালিঙ্গনকেই—বিশেষতঃ সে অঙ্গনা যদি পরকীয়া হয়—পরম সুখ বলিয়াছেন; কিন্তু এদেশের প্রাচীন প্রথা 'মাতৃবৎ পরদারেষু', এবং বুদ্ধদেব পরদারসেবীর অশেষ দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়াছেন—

চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো
আপজ্জতী পরদারূপসেবী।
অপুঞ্‌ঞলাভং ন নিকাম সেয্যং
নিন্দং ততীয়ং নিরয়ং চতুত্থং।—ধম্মপদ, নিরয়বগ্‌গো

যিশুখৃষ্টও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পরদার বারণ করিয়াছেন—কাম-ক্রীড়া ত' দূরের কথা, যদি কামিনীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত কর তবেও তুমি পতিত হইবে—Who looks after a woman to lust with her, has already committed adultery in his heart. এ পথ ব্রহ্মচর্য্যের পথ—সংযমের পথ। এই সকল জগদ্‌গুরুর হিতোপদেশের মর্ম্ম আমরা এতদিনে উপলব্ধি করিতেছি। এখন উস্‌পেন্‌স্‌কির মত উচ্চ দার্শনিকের মুখে শুনিতেছি—curb sex-energy and utilise it in the interests of inner evolution—that is, the evolution of man into superman, his development in the direction of the acquisition by him of higher consciousness and the opening up of his latent forces and faculties অর্থাৎ অতিরিক্ত কামশক্তির তখনই সদ্ব্যবহার হয়, যখন উহাকে সংযত করিয়া বিবর্ত্তনের উচ্চ প্রয়োজনে, মানুষের মধ্যে অব্যক্ত শক্তি ও সম্ভাবনার বিস্ফুরণে, মানুষের সম্বিৎকে উচ্চতর ভূমিকায় উত্তোলনে—এক কথায় মানবের অতিমানবে বিকাশ সাধনে প্রযুক্ত করা হয়।

যাক্ এ সকল আধ্যাত্মিক কথা—প্রকৃতম্ অনুসরামঃ। লক্ষ্য করিতে চাই—৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্য প্রভাবে শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিল তখন কবি কি কৌশলে সেই সকল বিষের বাতি হইতে অমৃতক্ষরণ করাইলেন—শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত, নগেন্দ্রনাথের অনুতাপ এবং গোবিন্দলালের দুর্ভোগ পাঠককে সতর্ক করিয়া দিল। অর্ব্বাচীন সাহিত্যে কিন্তু কামিক আবিলতা-উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে স্বৈরিণীর বিজয়বৈজয়ন্তীই উড্ডীন দেখিতে পাই। তরুণ লেখকেরা ঐ সকল প্রাচীন আদর্শ হইতে কি বিচ্যুত হইবেন?

আমরা এ যুগে অনেকের মুখে Art for art's sake-এর কথা শুনিতে পাই। বেশ কথা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি 'চোখের বালি'তে বিমলার চিত্র আঁকিয়া না 'নৌকাডুবি'তে কমলার চিত্র আঁকিয়া রবীন্দ্রনাথ উচ্চতর আর্টের পরিচয় দিয়াছেন? 'চরিত্রহীনে' কিরণময়ীকে চিত্রিত করিয়া না 'স্বামী'তে সৌদামিনীকে চিত্রিত করিয়া শরৎচন্দ্র উচ্চতর আর্টের অধিকারী হইয়াছেন?

কামিক সাহিত্যের পক্ষপাতীর মুখে আর একটা বাণী শুনিতে পাই—'Follow Nature'—'নিসর্গের অনুবর্ত্তন কর'। যে কদর্য্য সাহিত্যের কথা বলিলাম কেহ কেহ এই ধুয়া ধরিয়া তাহার সমর্থন করেন। এ কথা অস্বীকার করি না যে যাহা নৈসর্গিক—নিসর্গের অনুযায়ী, তাহাই শ্রেয়ঃ এবং যাহা অনৈসর্গিক নিসর্গের প্রতিযোগী, তাহাই হেয়। একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই কিন্তু দেখা যায় যে মহাকবি গেটের ভাষায়—

Two souls alas ! reside within my breast.

এক নয় দুইটি আত্মা মানবের অন্তঃস্থলে বিরাজ করিতেছে। কে? কে? একজন ভূতাত্মা অন্যজন জীবাত্মা, একজন মর্ত্ত্যবিহারী অন্যজন বিমানচারী। সেই জন্য মানুষ একাধারে দেব-মর্কট—তাহার মধ্যে দৈবী প্রকৃতি ও পাশবী প্রকৃতির যুগপৎ সমাবেশ। এক কথায় আমাদের চিত্ত-নদী 'উভয়তঃ বাহিনী—বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায়'। এস্থলে কাব্য, নাটক, উপন্যাস কোন্ প্রকৃতির পোষণে নিয়োজিত হইবে। দৈবীর না পাশবীর? ভূতাত্মার না জীবাত্মার? আমি বলিতে চাই, কাব্যের উচিত—নাটকের উচিত—উপন্যাসের উচিত—মানুষের যে দৈবী প্রকৃতি—**Life-giving empyrean elements**, তাহার মধ্যে যে পরাসম্বিৎ আছে—যাহার শুভজ্যোতিঃ পাপ-তাপের হীনতা-দীনতার অন্ধতমস ভেদ করিয়া কর্ম্মীর ঈশ্বরার্পণে—ভক্তের পরানুরক্তিতে—জ্ঞানীর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে—সেই পরাসম্বিতের শ্রীবৃদ্ধিসাধন। তরুণদলকে স্মরণ করাইতে চাই—সাহিত্যের এই উচ্চ আদর্শ সফল ও সুসিদ্ধ করিতে হইলে আমাদিগকে কামের পঙ্কিলতা এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জ্জন করিতে হইবে।

একদিন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ কল্পে দেশবাসীকে জ্বলন্ত ভাষায় আহ্বান করিয়াছিলেন। সে আহ্বান এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। আমি প্রবীণ নবীনকে—বঙ্গভাষা-ভাষী প্রত্যেক নরনারীকে এই মহনীয় ব্রত উদ্‌যাপন জন্য আহ্বান করিতেছি। আসুন সকলে সমস্বরে দেশমাতৃকাকে আবাহন করি—যেন তিনি আমাদের বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে ভক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়া নিষ্ঠা ও নিয়মের সহিত, শ্রদ্ধা ও সংযমের সহিত আমাদিগকে এই মহৎ ব্যাপারে প্রেরণা দান করেন—যেন আমাদের আকূতি সমানী হয়, আমাদের হৃদয় এক তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হয়—সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ!—বন্দে মাতরম্!

সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা আমাকে এ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন, সেই অনুরোধের অনুবর্ত্তী হয়ে আমিও এখানে উপস্থিত হয়েছি; যদিও আমার দেহ এখন সম্পূর্ণ সচল নয়। আজ বছর দশেক থেকে এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিনে, দেহের দোহাই দিয়ে। আজ যে শরীর সম্বন্ধে আমার অভ্যস্ত সতর্কতা পরিহার করেছি, তার কারণ চন্দননগর কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়; এমন কি ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড যত দূরে, তত দূরে নয়।

কোন সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেই দু'-চার কথা বলতে হয়, অবশ্য লিখিত বক্তৃতা পাঠ করতে হয়। আমিও এ কর্ত্তব্য পালন করব, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যখন চৈতন্য-চরিতামৃত লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাঁর শরীরের দুরবস্থা যদ্রূপ ছিল, আমার অবশ্য তদ্রূপ নয়। আমি এখনও চোখে দেখতে পাই, লিখতেও আমার আঙুল কাঁপে না। তবে এই কথাটি মনে রাখবেন যে, তাঁর বলবার অনেক কথা ছিল, তাই তিনি ওরূপ বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন। আমাদের কিন্তু বলবার কথা বেশী কিছু নেই।

আমার বক্তব্য সঙ্কুচিত করবার আর একটি কারণ এই যে, আমার কণ্ঠস্বর আমার দেহের চাইতেও ক্ষীণ। এ ক্ষীণতার জন্য দায়ী জরা নয়। ভগবান আমাকে চীৎকার করতে পৃথিবীতে পাঠান নি। আমার বিশ্বাস যে, ভূমিষ্ঠ হবামাত্র, আমি কোকিয়ে কেঁদে উঠিনি। আমি যদি আমার লেখা নিজে পড়তে না পারি, ত তা' পড়বার বরাত অপর কাউকেও দেব। বছর দশেক আগে দিল্লীর প্রবাসী-সাহিত্যসম্মেলনে আমার অভিভাষণ, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পড়েন; তারপর কলিকাতায় শরৎ-সম্বর্দ্ধনায়, আমার বক্তৃতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পড়েন; তারপর মেদিনীপুরের সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব সভাসদ্‌দের শোনান। যদি প্রয়োজন হয় ত উক্ত নজিরের বলে আমার কথা অপরের কণ্ঠের মারফৎ আপনাদের শোনাব। এই কারণেই বক্তৃতা করবার পূর্ব্বে আর বেশী পাঁয়তারা করব না।

সভাপতিকে প্রথমেই বিনয় প্রকাশ করতে হয়। যদিও সে বিনয়প্রকাশের কোনই প্রয়োজন নেই। আপনারা যখন কাউকে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন, তখন অবশ্য উক্ত ব্যাপারটা একটা practical joke হিসেবে করেন না; কারণ practical joke করা বালকের ধর্ম্ম—ভদ্রলোকের নয়।

কোন সভার সভাপতি হবার পক্ষে, আমার বর্ত্তমান দৈহিক অপটুতার কথা নিবেদন করলুম। কারণ কথাটা আগে বলে রাখা ভাল। মাঝপথে শেষটা হাল না ছেড়ে দিতে হয়। এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক্।

আপনারা আমাকে এ সাহিত্য-পরিষদে সাহিত্য-শাখার মুখপাত্র হিসেবে বরণ করেছেন। এর কারণ সাহিত্যের যে নানা শাখা আছে, সে জ্ঞান এখন দেশশুদ্ধ লোকের হয়েছে। সাহিত্য কথাটা এখন আমরা কেউই আর সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিনে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে যে উঁচুদরের সাহিত্য গড়া যায়, এ কথা আমি কস্মিনকালেও বিশ্বাস করিনি।

দুটি একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। বাঙ্গলার নব-সাহিত্যের অগ্রগণ্য লেখক যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সুধু গল্প লেখেন নি, কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানেরও চর্চ্চা করেছিলেন, তা যিনি বঙ্কিম সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তিনিই জানেন।

আর রবীন্দ্রনাথ হেন বিষয় নেই যার উপর হস্তক্ষেপ করেন নি। আর প্রতি বিষয়েই তিনি এমন সব কথা বলেছেন, যা আমাদের চিন্তার উদ্রেক করে; আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির নতুন দুয়োর খুলে দেয়।

সহজ কথা এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে বড় সাহিত্যিক হওয়া যায় না। এক কথায়—Intellectকে দুয়োরাণী করে বড় কবি কিম্বা বড় ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না।

পূর্ব্বে যা বলেছি, তার উদ্দেশ্য এ মত প্রচার করা নয় যে, সূর্য্যমুখীর মুখ দিয়ে মনুসংহিতা ব্যাখ্যা করতে হবে, আর উর্ব্বশীর মুখ দিয়ে দেহতত্ত্ব। বলা বাহুল্য যে, উক্তরূপ জ্ঞান প্রচার সুধু কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেই করতে পারে। দর্শন-বিজ্ঞানের সামাজিক ও মানসিক হিসেবে নানারূপ সার্থকতা আছে। এবং এ-জাতীয় জ্ঞান সাহিত্যিক-প্রতিভাকেও পুষ্ট করে। পুরাকালেও দেখতে পাই, কালিদাস তাঁর যুগের দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার কবিপ্রতিভার অন্তরায় নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সাহিত্যের কারবার সুধু ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ নিয়ে—তাহলে বলি যে, আমাদের অবিমিশ্র রাগদ্বেষের কোন ভাসা নেই, এক interjection ছাড়া। আ ই উ ও প্রভৃতি কতকগুলি স্বরবর্ণের সাহায্যেই তা প্রকাশ করা যায়। Emotionকে প্রকাশ করা যায় প্রধানতঃ intellectএর সাহায্যে। সাহিত্য যে intellect বর্জ্জিত, এমন কথা কোনও মনস্তত্ত্ববিদও বলেন নি। এমন কি, বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান anti-intellectualist দার্শনিক Bergsonও বলেন নি। তিনি অবশ্য intellectএর কাছে দাসখত লিখতে রাজি নন; কারণ তিনি তার সীমা নির্দ্দেশ করেছেন। এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটা বলতে বাধ্য হলুম এই কারণে যে, কোন্ সাহিত্য intellectual আর কোন্ সাহিত্য তা নয়, তা নিয়ে ঘোর তর্ক সাহিত্য সমাজে নিত্যই শোনা যায়; অথচ সে তর্কের ভিতর psychology যদি কিছু থাকে ত তা এত সূক্ষ্ম যে, আমাদের সাদা চোখে তা ধরা পড়েনা।

আমি সাহিত্যে intellect-এর স্বত্ব সাব্যস্ত করবার জন্য আপনাদের কাছে উপস্থিত নি। যা স্পষ্ট, তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলে শুধু কুতর্কের আশ্রয় নিতে হয়।

আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতিকে লোকে যে আজকাল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, তাতে সাহিত্য শব্দ তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্তি পায়।

আমরা সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি। তার কারণ সংস্কৃত সাহিত্য—কাব্য ও শাস্ত্র উভয়েই সমৃদ্ধ। ধরুন যদি, এ সাহিত্য কেবলমাত্র কাব্য ও কথার সাহিত্য হ'ত, অর্থাৎ এ সাহিত্যে দর্শন-বিজ্ঞানের চিহ্নমাত্রও না থাকৃত; তাহলে সংস্কৃত সাহিত্য কি হিন্দুজাতির একটি গৌরবের বিষয় হত? আমি নিজে কোন বিষয়েই শাস্ত্রী নই, কিন্তু শাস্ত্রসাহিত্যের মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করি। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যও এই কারণে ইউরোপে অতুলনীয়। আজ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমাজ গ্রীক সাহিত্যের বশ্যতা কাটাতে পারেন নি, এমন কি তাঁরা বলেন যে, তাঁদের মন গড়েছে উক্ত সাহিত্য। গ্রীসের এ প্রভাব প্রধানতঃ সে দেশের কাব্যের প্রভাব নয়, দর্শন-বিজ্ঞানেরই প্রভাব। এখন বলা বাহুল্য যে, আমাদের নব বঙ্গ-সাহিত্য এ ক্ষেত্রে অসম্ভবরকম দরিদ্র।

আমাদের সাহিত্যের এ দৈন্য আমরা, অর্থাৎ আমরা সম্মিলিত সাহিত্যিকরা চেষ্টা করলে কতকটা দূর করতে পারি। এ কথার অর্থ এ নয় যে, আমরা প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখতে পারি। আমরা যদি কোমর বেঁধে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করতে বসি, তা'হলে আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না। স্ব স্ব বিষয়ে কৃতবিদ্য লোক ব্যতীত অপরে কেউ বিজ্ঞানাচার্য্য কিম্বা দার্শনিক গুরু হ'তে পারেন না। দর্শন এবং বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য লোকেরা সকলেই যে সমাজের সব-বিষয়ে জ্ঞান-পিপাসা মিটাতে পারেন—তা অবশ্য নয়; তাঁরা ইচ্ছা করলে বড়জোর text-book লিখতে পারেন। Text-book যে সাহিত্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। যদি এ-জাতীয় পুস্তিকাবলী সাহিত্য-স্বরূপে গণ্য হত, তাহলে এ পরিষদের text-book-শাখা নামক আর একটি শাখা আবির্ভূত হত। যখন বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়ে উঠবে, তখন সম্ভবতঃ কোন কোনও সুলিখিত ও মনোজ্ঞ text-book সাহিত্য হিসাবে গ্রাহ্য হবে। তবে যিনি আমাদের দার্শনিক কিম্বা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগাতে চান, তাঁর কথার পিছনে অনেকটা অর্জ্জিত বিদ্যা থাকা চাই, যা আমাদের মত সাহিত্যিকদের নেই। তবে আমরা কি উপায়ে বঙ্গ-সাহিত্যে জ্ঞানশাস্ত্র আমদানি করতে পারি? আমরা এ-জাতীয় সাহিত্যের চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারি। আমরা যদি সত্য সত্যই এ সব জ্ঞান চাই, তাহলে সে জ্ঞান যোগাবার লোকের অভাব হবে না।

বঙ্গ-সাহিত্যের বিজ্ঞান-শাখা যে অতি ক্ষীণ ও নীরস শাখা, তা'ত সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ। এর কারণ কি? কারণ অতি স্পষ্ট। বিজ্ঞান বলতে এ যুগে আমরা বুঝি

Science। ইউরোপের সকল সাহিত্যই দু'শ আড়াই-শ বৎসর পূর্ব্বে Scienceএর সঙ্গে একরকম নিঃসম্পর্কিত ছিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিই এবিদ্যাকে মহীয়ান করে তুলেছে। Theoretical Science যদি নিষ্ফল হত, তা'হলে পণ্ডিত সমাজে তা মহামান্য হলেও লোকমান্য হ'ত না।

তারপর, আমাদের দেশেও যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাঁরাও এ শাস্ত্রের ক থেকে ক্ষ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত ইংরেজী ভাষার মারফৎ শিক্ষা করেন। এঁদের পক্ষে উক্ত শাস্ত্র বাঙলায় প্রচার করা সহজসাধ্য নয়। বিশেষতঃ এ দেশে যখন এ জ্ঞান সম্বন্ধে সমাজের কোনও জিজ্ঞাসা নেই। অথচ এ কথা সকলেই জানেন যে, এ জ্ঞানে দরিদ্র বলেই আমাদের সমাজ এত দরিদ্র, এত রুগ্ন। আমরা যারা শুধু বঙ্গ-সাহিত্যের নয়, স্বজাতিরও জীবনের অভ্যুদয়কামী, আমরা আশা করি যে, এ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও ভবিষ্যতে বঙ্গ-সাহিত্যের এবং বাঙ্গালী সমাজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করবে। যে মনোভাব Science নামক বিদ্যার জন্ম দিয়েছে, সে মনোভাবে আমাদের জাতি বঞ্চিত নয়। অভাব আছে সুধু সংকল্পের ও সাধনার। আমাদের অন্তরে যে জীবনীশক্তি আছে, সেই শক্তিই নব-বিজ্ঞান ও তার প্রকাশের পথ খুলে দেবে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যকে এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

বঙ্গ-সাহিত্য দার্শনিক সাহিত্যেও নিতান্ত দরিদ্র। এর একটা কারণ, বাঙ্গালী জাতি আধ্যাত্মিক হতে পারেন, কিন্তু দার্শনিক নন। সমাজে প্রচলিত মতামত নির্ব্বিচারে গ্রাহ্য করা অথবা অগ্রাহ্য করাই আমাদের পক্ষে সহজ। আমরা conservative হই বা progressive হই, উভয়ই আমরা সমান নিশ্চিন্তভাবে হতে পারি এবং হয়ে থাকি। আমরা কেউবা সনাতন-প্রথার যথাসম্ভব অনুসরণ করি, কেউবা করি যথাসম্ভব বিলিতী প্রথার অনুকরণ। দুই-ই করি একই কারণে। আমরা সকলেই নিজের সুখসুবিধামত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। এ কথা একবার মনেও ভাবি নে যে, আমাদের সনাতন সমাজ আর বেশীদিন প্রচলিত থাকবে না। আর ইংরেজের সামাজিক হালচালের পিছনে রয়েছে ইংরেজ জাতির ইতিহাস ও তার বিরাট পলিটিক্যাল ও ইকনমিক অভ্যুদয়। যার উপর তার সমাজের দৃঢ় ভিত্তি তা থাকবে না, অথচ আমরা ফাঁকি দিয়ে দ্বিতীয় ইংরাজ জাত হয়ে উঠব—এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।

এ উদাহরণ দিলুম সুধু এই দেখাতে যে, চিন্তার বালাই এড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে চাই। যে, জাতির জীবন চিন্তাহীন, সে জাতির ভিতর থেকে দর্শন বেরবে কি করে? ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই নাছোড় চিন্তা হচ্ছে অন্নচিন্তা। এ চিন্তা থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই এবং হতে পারিনে। দার্শনিক চিন্তা অন্নচিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু সে চিন্তাকে অতিক্রম করে। আমাদের জীবনও আছে, মনও

আছে। যে ভাবনা মনের ভাবনা, সেই ভাবনাই দর্শনের সৃষ্টি করে। যাঁর বিশ্বাস তিনি সব জানেন, তাঁর কোনও ভাবনা নেই। আর জিজ্ঞাসাই হচ্ছে দর্শনের আদি কথা।

অনেকে মনে করেন যে, হিন্দু দর্শনই হচ্ছে হিন্দু সভ্যতার অতুল কীর্ত্তি, আমিও হচ্ছি তাদের দলভুক্ত। আবার একদল নবশিক্ষিত লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, দর্শনের চর্চ্চা করেই হিন্দুজাতি অধঃপাতে গিয়েছে। আমরা যে অধঃপতিত জাত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই; বিশেষতঃ ইংরজেদের যখন মত তাই। আমাদের দর্শন নাকি জীবনের ধার ধারে না; যদি হিন্দু দর্শনের ধর্ম্ম জীবননিরপেক্ষ হয়, তাহলে শঙ্কর এমন কথা কেন বলেছেন যে, যে দার্শনিক মত গ্রাহ্য করলে লোকযাত্রা বিনষ্ট হয়, সে দার্শনিক মত বিচারসহ নয়। আমার বিশ্বাস, হিন্দু দর্শনের রসায়ন আমাদের জাতীয় মনকে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির জন্য ষড়দর্শন যে কতখানি দায়ী, তা যদি কেউ দেখিয়ে দিতে পারেন, তাহলে তাঁকে আমরা পণ্ডিতচূড়ামণি বলে স্বীকার করব। দুঃখের বিষয় এ মত তাঁদেরই, যাদের বিশ্বাস তারা কর্ম্মী, ভাষান্তরে men of action। দর্শনের অর্থ নাকি কর্ম্মহীন জ্ঞান। তথাস্তু। কিন্তু জ্ঞানহীন কর্ম্মেরও কি কোন অর্থ আছে? আমরা জড়পদার্থ নই, সুতরাং জড়ের ধর্ম্ম জীবে আরোপ করায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয়না। হয়ত এঁদের বিশ্বাস, এঁরা দর্শনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘোর বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছেন। Switch টিপলে যে বিজলী বাতি জ্বলে ওঠে, এই জ্ঞান লাভ করলেই electricityর science তাদের করতলগত আমলকিবৎ হয়ে ওঠেনা। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করা বহু আয়াসসাধ্য। বিজ্ঞানচর্চ্চা একরকম যোগসাধনা।

সে যাই হোক, দর্শনচর্চ্চার ফলেই যদি ভারতবাসী দাস হয়ে থাকে, তাহলে আমরা বাঙ্গালীরাও অপর ভারতবাসীদের সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত হলুম কেন?

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একখানিও দার্শনিক গ্রন্থ নেই। গুরুগিরি যার ব্যবসা এমন কোনও ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে, চৈতন্যচরিতামৃত নাকি মহাদার্শনিক গ্রন্থ। কিন্তু আমরা যে অর্থে philosophy শব্দটা ব্যবহার করি, সে অর্থে উক্ত গ্রন্থকে philosophical treatise বলা যায় না। আপনারা ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, এ দুই গ্রন্থ এক জাতীয় নয়।

সেকালের বাঙ্গলা ভাষা দার্শনিক চিন্তাপ্রকাশের উপযুক্ত ছিলনা। বাঙলা ভাষা ছিল, যাকে আমরা বলি abstract terms তাতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আর philosophyর কারবার হচ্ছে প্রধানতঃ abstraction অর্থাৎ সেই সব ভাব নিয়ে যা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়, কেবলমাত্র মনোগোচর। একটি উদাহরণ দিই। আমরা কথায় বলি, ছোটবড়, উঁচুনীচু। এ ভাষা ইন্দ্রিয়ই আমাদের মুখে দিয়েছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার inequality বোঝাতে হলে "অসম" শব্দের জন্য সংস্কৃতের দ্বারস্থ হই।

এ যুগে আমরা সংস্কৃত ভাষা হতে এ-জাতীয় বহু শব্দ সংগ্রহ করে বঙ্গভাষার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছি। সুতরাং এ যুগের বাঙলা ভাষা দার্শনিক চিন্তার বাহন হতে পারে।

যারা আমার কথা এতক্ষণ ধরে, হয় মন দিয়ে অথবা অন্যমনস্কভাবে শুনেছেন, তাঁরা বোধ হয় এখন মন্তব্য করতে পারেন যে, আমি সাহিত্য-শাখার সভাপতি হয়ে এ পর্য্যন্ত সাহিত্য সম্বন্ধে একটি কথাও বলিনি, করেছি শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনসম্বন্ধীয় অনধিকারচর্চ্চা। এর কারণ বলছি। আমি কি পাঠক কি লেখক হিসাবে সাহিত্য কথাটিকে তার সঙ্কীর্ণ অর্থে কখনই গ্রাহ্য করিনি।

পৃথিবীতে যে যে দেশে সভ্যতা নামক জিনিষ আছে বা ছিল, সেই সেই দেশেই সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন সাহিত্য ছিল এবং আছে। আর এ সব সাহিত্য সুধু কথা ও কবিতায় আবদ্ধ নয়। পুরাকালে গ্রীসেও যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি ছিল, ভারতবর্ষেও তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান ও পুরাণ ছিল। এ সব শাস্ত্র সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সাহিত্য বস্তুকেও শতপথ ব্রাহ্মণ বলা যায়। কাব্য, দর্শন প্রভৃতির স্রষ্টামাত্রেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য; আর এ সবেরও শতপথ আছে।

তা ছাড়া কোন যুগেরই সাহিত্যিক সে যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতামত এড়িয়ে যেতে পারে না; ও-সব শাস্ত্রের অন্ততঃ বুলিগুলি তাঁদের কবিতা ও কথার ছন্দে ভর করে। আমাদের ঘরেই তার নিত্য প্রমাণ পাওয়া যায়। শুনতে পাই আমাদের নব-সাহিত্যের গায়ে Freud-এর গন্ধ আছে। অথচ Freudism কি?—Science এবং science ব্যতীত কিছু নয়। তারপর এ সাহিত্যে, realism, idealism, materialism প্রভৃতি কথার সূচনা দেখা পাওয়া যায়। আর এ কথাগুলির অর্থ কি? তাই বোঝাতেই দর্শন শাস্ত্রীরা আবহমান কাল তর্কযুদ্ধ করে আসছেন।

তারপর আর একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কোনও বিদ্বজ্জন সভা কস্মিনকালে কোনও কবি ও কথাকার সৃষ্টি করতে পারেন নি। সেকালের অলঙ্কারশাস্ত্রীরাও ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা স্বীকার করেছেন। প্রতিভা জিনিষটি কি, এ বিষয়ে দেশে বিদেশে দেদার আলোচনা হয়েছে; কিন্তু আজও তার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। আমরা সুধু এইমাত্র জানি যে, প্রতিভা ফরমায়েস দেওয়া যায় না।

অপরপক্ষে নানা শাস্ত্রের শাস্ত্রী আমরা ডেকে আনতে পারি। সমাজ যদি জ্ঞান-পিপাসু হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক সে রসে আমাদের পিপাসা মেটাবেন, এ আশা আমরা করতে পারি।

এ যুগে জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে আমাদের কাব্যসাহিত্যেরও বলবীর্য্য বৃদ্ধি পাবে না; আর দর্শনবিজ্ঞানও সাহিত্যের অন্তর্ভূত না হলে এই দুই শাস্ত্র একরকম সাম্প্রদায়িক বিদ্যা রূপেই থেকে যাবে, যার সঙ্গে লৌকিক মতের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

কিন্তু আমরা সাহিত্যিকরা যদি এই বিশেষজ্ঞদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁদের অর্জ্জিত বিদ্যা ভাষায় প্রকাশ করতে ব্রতী করতে পারি, তাহলে এ বিষয়ে দু' চার কথা অনধিকারচর্চ্চা বলে গণ্য হবে না। এ কারণ দার্শনিক বৈজ্ঞানিককেও সাহিত্য-চর্চ্চা করতে অনুরোধ করি। মনোজগতেও জাতিভেদ আমাদের কারও মনঃপূত নয়।

আমি যখন সাহিত্যিকদের দর্শন বিজ্ঞানচর্চ্চার পক্ষপাতী, তখন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদেরও সাহিত্য-চর্চ্চা করবার অনুরোধ আমার মুখে শোভা পায়।

সত্য কথা এই যে, দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এমন কি, অনেক দার্শনিক গ্রন্থকে কাব্য বলে ভুল হয়। শঙ্কর বলেছেন যে, তিনি বেদান্তকুসুম চয়ন করে তার মালা গেঁথেছেন। বেদান্ত মানে অবশ্য উপনিষদ্। এখন জিজ্ঞাসা করি, এ ফুলগুলি সাহিত্যের কাব্যশাখার ফুল, না দর্শনশাখার ফুল?—এ প্রশ্নের উত্তর ইউরোপের দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা আজও দিতে পারেন নি। কারণ উপনিষদ যে কাব্য নয়, এমন কথাও বলা চলে না; অপরপক্ষেও শাস্ত্র যে দর্শন নয়, এমন কথাও বলা চলে না। ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিলেও Platoর Dialogues ও Bergson-এর নব দর্শন যে অতি উঁচুদরের সাহিত্য, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং যাঁরা কাব্য-রসের রসিক, তাঁরাও এ-জাতীয় দর্শনের অলৌকিক রস সানন্দে পান করতে পারেন।

আর বিজ্ঞানের কথা, অপূর্ব্ব রূপকথা। এ রূপকথা শোনবার কৌতূহল সার্ব্বভৌম। এ রূপকথাও সর্ব্বজনবোধ্য করে বলা যায়। Jeans, Addington প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যরা New Physicsএর যে বাণী আমাদের শোনাচ্ছেন, তা আমাদের মনঃপূত সাহিত্য। কেননা তার অন্তরে মানুষের মন নামক পদার্থ আছে।

আমি এতক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছি, কিন্তু আমার এ বকুনির ভিতর একটি কথা উহ্য রয়ে গিয়েছে। দর্শনই বলো, বিজ্ঞানই বলো, কাব্যই বলো, এ সকলের বাহন হচ্ছে ভাষা। আর কাব্যেই ভাষা তার চরমপদ লাভ করে।

কোন সাহিত্য অগ্রসর হচ্ছে কিম্বা পিছিয়ে পড়ছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় সে সাহিত্যের ভাষা থেকেই। আজকাল যাকে পাঁচজনে তরুণ সাহিত্য বলে, তার ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, এ যুগের অন্ততঃ গদ্যসাহিত্যের ভাষা পূর্ব্বযুগের ভাষা হতে ঢের বেশী মুক্ত ও সজীব। এ লক্ষণ মৃত্যুর লক্ষণ নয়, নূতন প্রাণেরই লক্ষণ। তথা-কথিত তরুণ সাহিত্যের অনেক ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু ভাষার প্রতি নব লেখকরা কেউ উদাসীন নন্। তবে তরুণ সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রায় নিত্যই শোনা যায় যে, তরুণ সাহিত্য সুশীল সাহিত্য নয়। এক কথায় এঁদের সরস্বতী সুশীলা নন্।

বাঙলায় গল্প-সাহিত্যের প্রথম যুগে "সুশীলার উপাখ্যান" নামক একখানি বই ছিল। এখন জিজ্ঞাসা করি, উক্ত গ্রন্থ আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের কি হিতসাধন করেছে? অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সমাজ যদি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েত তা' হবে তরুণ সাহিত্যের ধাক্কায় নয়—ইকনমিক কারণে। সমাজের দোহাই দিয়ে লেখকদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করে তাঁদের বড় লেখক করা যায় না। বড় লেখক সমালোচকদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সাহিত্যসমাজে তাঁর উচ্চাসন অধিকার করেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী,
সাহিত্য-শাখার সভাপতি

স্যার যদুনাথ সরকার,
ইতিহাস শাখার সভাপতি

ভারতে ফরাশী-প্রভাব।

ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

আজ চন্দননগরে বঙ্গভাষি-সাহিত্যিকগণ সম্মিলিত। ফরাশী বিজয়বাহিনীর পুরোভাগে দোদুল্যমান, কবি বেরাঝেঁর কবিতায় উদ্গীত, জগৎপ্রসিদ্ধ সেই ত্রিবর্ণ পতাকার তলে বঙ্গের নানাস্থান হইতে আগত পণ্ডিতগণ আজ মাতৃভাষার উন্নতির এবং লোকমধ্যে জ্ঞান-বৃদ্ধির উপায় আলোচনায় ব্যস্ত। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ইতিহাসের একটা "হইলেও হইতে পারিত" নিজ হইতেই মনে জাগিয়া উঠিতেছে। যদি ক্লাইভ ও ডুপ্লের যুগে ফরাশী নৌবল ভারতসাগরে অপ্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, যদি বাঙ্গালার রাজা পলাশীর যুদ্ধের ক'মাস মাত্র আগে চন্দননগরকে ইংরাজের গ্রাসে পড়িতে না দিতেন, যদি লালি এবং সার্ আয়ার্ কুট পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিতেন,—তবে নিশ্চয়ই ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিত, এই মহাভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিত। তখন, আমরা বৃহৎ ফরাশী রাষ্ট্রমণ্ডলের অঙ্গ হইয়া ভারতের সর্ব্ববিধ ধন ও পণ্যদ্রব্য, চিন্তা ও লোকবল সেই গৌরবান্বিত জাতির ও মহাদেশের সঙ্গে মিলাইয়া দিতাম। আর, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার সজীব স্রোত এবং নববিজ্ঞান ও দর্শনের বৈদ্যুতিক ধারা ইউরোপের লাটিন জাতির সংস্কৃতির ভিতর দিয়া ফরাশী ভাষার সাহায্যে গ্রহণ করিত ;—ইউরোপের সুদূর উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি দ্বীপের টিউটনিক ভাষার যোগে পাইত না ; এই "পঞ্চবিংশতি কোটি মানবের বাস" চিন্তায় ও স্বার্থে আকৃষ্ট হইত সেই মহাদেশীয় অর্থাৎ "কন্টিনেণ্টাল" ভব্য উদার সভ্যতার দিকে, ইংলণ্ডের কতকটা কোণ-ঠেশা সংস্কৃতির দিকে নহে। যদিও ইউরোপীয় সভ্যতাকে এক ও অভিন্ন মনে করা উচিত, তথাপি এই ইংলণ্ডীয় এবং কন্টিনেণ্টাল সভ্যতা ও ভাবপ্রণালীর মধ্যে যে বেশ একটা পার্থক্য আছে তাহা ভারত বুঝিত, তাহার ফলভোগ করিত ; রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য জগৎ আরও বিশ বৎসর পূর্ব্বে চিনিতে পারিত।

কিন্তু ভারতের ললাটে বিধাতা অন্যরূপ লিখিয়াছিলেন। তাই আজ আমরা ফরাশী এবং অন্যান্য লাটিন জাতির সাহিত্য বিজ্ঞান কলা কিছু কিছু অনুবাদের সংকীর্ণ পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া উপভোগ করিতেছি, সেই জ্ঞানসমুদ্রে গা-ডুবাইয়া সাঁতার দিতে পারিতেছি না।

তথাপি, ফরাশীর সহিত বাঙ্গলা দেশের সম্বন্ধ একটা নগণ্য জিনিষ নহে, ইহা আজও অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। ইহার কয়েকটি নিদর্শন ইতিহাস রক্ষা করিয়াছে। দুই শত বৎসর হইল এই শহরের অধিবাসী গ্যাসপার কোরণের সাহেবের নিকট একটি বাঙ্গালী বালককে সাত টাকায় বিক্রয় করা হয়, তাহার পিতার লিখিত দাসখত—ইয়াদী কর্দ ইত্যাদি—পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। আর একটি বাঙ্গালী ক্রীতদাস ফ্রান্সে গিয়া ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লবে একজন নেতা হইয়া পড়ে ; স্ক্রীন সাহেব **A Bengali Sans-culotte in the French**

Revolution নামক প্রবন্ধে তাহার কাহিনী দিয়াছেন। এই চন্দননগরে বসিয়া শাসনকর্ত্তা শিভালিয়ে বহুদিন ধরিয়া দিল্লীতে ষড়যন্ত্র চালাইয়াছিলেন, কি করিয়া দিল্লীর বাদশাহের দরবারে ফরাশী জাতীয় প্রতিপত্তি স্থাপিত করা যায় এবং ইংরাজকর্ত্তৃক বঙ্গদেশ গ্রাসের বদলে ফরাশী জাতিকে সিন্ধু প্রদেশ দেওয়া যায়।

যদি ফ্রান্সে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রবল হইত তবে কেরী ও মার্শমান আর দিনেমারদের কুঠী শ্রীরামপুরে না গিয়া এই চন্দননগরেই আশ্রয় লইতেন, এবং এই শহর প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র, বাঙ্গলা পুস্তক ও সংবাদ পত্রের জন্মদাতা বলিয়া চিরস্মরণীয় হইত।

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ফরাশী প্রভাব কম ছিল না। অসংখ্য নীল ও রেসমের কুঠী বৃটিশ অধিকৃত বঙ্গে, এমন কি কোম্পানীর যুগের আউধ ও দোয়াবা প্রদেশে অনেক স্থানে ফরাশীর দ্বারা চালিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতে ইংরাজ ভ্রমণকারীদের কাহিনী হইতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজশাহী জেলার বিখ্যাত রেশমের কুঠী বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফরাশী-চালিত ছিল।

বঙ্গদেশের ঐতিহাসিকের চক্ষে চন্দননগরের ফরাশী দপ্তর অমূল্য। এগুলি হইতে আমরা এই দেশের শিল্প-বাণিজ্য, রাজশাসনের ধারা ও প্রজার দশা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি, বর্গীর হাঙ্গামা ও নবাব পরিবারে গৃহকলহ প্রভৃতির অতি মৌলিক ও সমসাময়িক বিবরণ পাই। এ সবগুলি ছাপা হইয়াছে। ফরাশী ভ্রমণকারী Comte de Modave ১৭৭৪-৭৫ সালে বঙ্গদেশের তথা মুঘল সাম্রাজ্যের সূক্ষ্ম সমালোচনা-পূর্ণ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্ণিয়ের রচিত ভারত বর্ণনা অপেক্ষাও মূল্যবান। অপর পক্ষে, সিরাজউদ্দৌলা-কর্ত্তৃক কলিকাতা দখলের সময় ইংরাজ সরকারের প্রায় সব কাগজ পত্র লণ্ডভণ্ড নষ্ট হইয়া যায়; শুধু যাহা ইণ্ডিয়া হাউসে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাই বাঁচিয়া গিয়াছে। সুতরাং বৃটিশ বঙ্গের ঐতিহাসিক কাগজপত্র ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন্ কর্ত্তৃক কলিকাতা পুনরুদ্ধারের পর হইতে মাত্র এদেশে সম্পূর্ণ পাওয়া যায়।

এই ত গেল বাঙ্গলার কথা; আর আমাদের প্রদেশের বাহিরে, ভারতবর্ষের অন্যত্রও ফরাশী প্রভাব বহুদিন বিরাজ করিয়াছে। কর্ণাটকে ও বঙ্গবিহারে ইংরাজ জাতির জয়ের পর অনেক ফরাশী সৈনিক ও শিল্পী এই দুই প্রদেশে নিজের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ দেখিয়া, আউধ নবাবের, দিল্লীর বাদশাহের, জাঠরাজার, মালবের ছোট ছোট রাজা নবাবের এবং দাক্ষিণাত্যে নিজামের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিল; তাহারা ভারতীয় পোর্টুগীজ এবং পূর্ব্বে আগত ফরাশী পরিবারগুলির সহিত বিবাহ বন্ধনে মিশ্রিত হইয়া একটী নূতন জাতি ও সমাজ সৃষ্টি করিল। তাহাদের অনেকেই দেশী পোষাক, দেশী নেশা, দেশী রীতি ও পারিবারিক নিয়ম অবলম্বন করিল; যেমন রীণী মাডেকের সহিত অগষ্টিন বার্বেটের কন্যার বিবাহ (১৭৬৬ সালে) ঠিক সম্ভ্রান্ত পর্দানশীন মুসলমান পরিবারের বাল্যবিবাহের মত হইয়াছিল। বিশপ হেবার ১৮২৪ সালে এইরূপ সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচের ফরাশী পরিবার আগ্রায় দেখেন।

ফরাশী সেনাপতিগণ মারাঠা ও শিখ রাজাদের জন্য সৈন্য শিখাইয়া, তোপ ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম গঠিত করিয়া, বহুরণক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিয়া ভারত ইতিহাসে পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। দু বয়েঁ (Savoyard), পেরোঁ, দুদ্রেনেক, বুর্কী, আভিতেবিল, কোর্ট এবং নিজামের রেমং—এই সব বীর ও সুদক্ষ লোকনেতার নাম ও কীর্ত্তি ভারত ভুলিবে না। ছোট ছোট ফরাশী ভাগ্যান্বেষণকারী সেনানীর সংখ্যা গণনা করা যায় না।

এখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়িয়া জ্ঞানের সত্য, শিব ও সুন্দর ক্ষেত্রে আসা যাউক। এখানেও ফরাশী জাতির দান ভারতকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছে, সে দানস্রোত আজও প্রবাহিত হইতেছে। ফরাশী বন্দী সেনা আঁকেতিল দুপেরোঁ সর্ব্বপ্রথমে জুরাথাস্ত্র-ধর্ম্মের শাস্ত্র অনুবাদ করিয়া ইউরোপে তাহার প্রচার করেন। আবার, তিনিই দারাশুকো-কর্ত্তৃক পারসিক ভাষায় রচিত সংস্কৃত উপনিষদ্‌গুলির সংক্ষিপ্ত সার লাটিনে অনুবাদ করিয়া বেদান্তের উদার বাণী পাশ্চাত্য জগতকে প্রথম শুনান। তাঁহার এই গ্রন্থ Oupenikhet পড়িয়াই শোপেনহাবার প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের দিব্যজ্ঞানে নিজ চিত্তের চরমশান্তি লাভ করেন।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান পদ্ধতিতে অঙ্কিত, প্রায় বিশুদ্ধ, মানচিত্র দাঁভিল নামক ফরাশী পণ্ডিত প্রকাশিত করেন (১৭৫২)। ইহাতে প্রদত্ত ভৌগলিক তথ্যগুলি ফরাশী ও অন্যান্য ভ্রমণকারীদের রিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করা।

ব্রায়ান হজসন্ দীর্ঘকাল নেপালে রেসিডেণ্ট থাকিবার সময় বহু পণ্ডিত লাগাইয়া অসংখ্য প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি নকল করাইয়া লন, কতকগুলি খরিদও করেন। ইহার এক বৃহৎ অংশ প্যারিস নগরে আশ্রয় পাইয়াছে। বির্ণুফ (Burnouf) তাহা চর্চ্চা করিয়া, ছাত্র শিখাইয়া, ইউরোপে বৌদ্ধ শাস্ত্রের গবেষণার সূত্রপাত করেন। তিনি প্যারিসে যে বৌদ্ধজ্ঞানের পণ্ডিতদিগের টোল গড়িয়া দিয়া যান, তাহা আজও চলিতেছে, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ ফরাশী ভাষা না জানিলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইতিহাস ও সভ্যতার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব; বৃহত্তর ভারতের সম্বন্ধেও একথা সমান সত্য। ফরাশী পণ্ডিত এমিল সেনার সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া অশোক সম্বন্ধে, মহাবস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে জগতে অদ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তাহার পর সিলভ্যাঁ লেভি এবং শভানে ভারত ও চীনের পুরাতন সংযোগ বিষয়ে জ্ঞানের একটি নূতন মহাপ্রকোষ্ঠের দ্বার আমাদের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছেন। পেলিও এবং পুসাঁ আর দুইটি বিদ্যার ক্ষেত্রে জগতে অগ্রণী।

সিডান যুদ্ধের পর বাঙ্গালী বালিকা তরু দত্ত ফ্রান্সের পরাজয়ে অবসন্নহৃদয়া হইয়াও বলিয়াছিলেন "না, এই মহান জাতি আবার জগতে মাথা তুলিবে, সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইবে।" আজ আমাদেরও সেই আশা, সেই প্রার্থনা।

শ্রী যদুনাথ সরকার

সত্যের দৃষ্টি

দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা যে আমাকে সমগ্র বাংলা দেশের সাহিত্য সভার দর্শন শাখার নেতৃত্ব করিতে আহ্বান করেছেন, আপনাদের এই সহৃদয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই আহ্বানকে আমি দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদরূপেই গ্রহণ করিতেছি। জাতীর সত্তা যেখানে জীবিত, দর্শনও সেখানে জীবিত ; কারণ দর্শন মনীষার শ্রেষ্ঠতম হিকাশ এবং কোন জাতি একটা দার্শনিক দৃষ্টি ভিন্ন তাহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। দর্শন জীবনের ভিতর নিহিত আছে। ইহা জীবনের নৃত্যভঙ্গীর ছন্দকে ধরিবার চেষ্টা ও জীবনের অশেষ ছন্দ ও প্রকাশের উপর একটা সুচিন্তিত দৃষ্টি।

কোন দেশেই দর্শন একটা রূপ নেয় নাই, তাহার কারণ মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসার হতেই হয় দর্শনের সৃষ্টি, এবং একথা বলা চলে না যে মানুষের সব কালেই একরূপ অভিজ্ঞতা ছিল। এই জন্য দেখতে পাই সব দেশেই নানারূপ দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। দার্শনিকেরা সব সময় চান, তাদের চিন্তাধারাকে সর্ব্বপ্রকার ত্রুটিশূন্য করবার জন্য—কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই তাদের বিচার ধারার ভিতর এত পরস্পর বিরোধী রূপ আছে, যে একের তথ্যকে অন্যে অতথ্য বলে প্রতিপাদন করেন। এই জন্যই মনে হয়, প্রত্যেক দার্শনিকের একটা আছে অন্তঃবেদনা ও অন্তঃদৃষ্টি যে দৃষ্টি দেয় তাকে বিশ্বদৃষ্টি ; তাকেই তিনি একটা ন্যায়ের পরিকল্পনা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কথাটা হচ্ছে এই সত্যেরঅনুসন্ধান মানুষ করেছে তিনটী দৃষ্টি নিয়ে—(১) এক বিজ্ঞানের দৃষ্টি (২) দর্শনের দৃষ্টি (৩) আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। বিজ্ঞানের দৃষ্টি চেষ্টা করে আমাদের সংগৃহীত জ্ঞানরাশির ভিতর একটা সংযোগ সূত্র প্রতিষ্ঠা করিতে। ইহা আমাদের বিজ্ঞানলব্ধ তথ্যগুলিকে একত্রীকরণের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পর মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করেই চলে, বিজ্ঞানের আংশিক জ্ঞানগুলি দর্শন সমষ্টিবদ্ধ করে' একটা বিশ্ব-পরিকল্পনা করে। এক সময়ে ইউরোপীয় দর্শনে এরূপ প্রচেষ্টা খুব হয়েছিল। এমন কি আজকাল একদল মনস্বীরা এই দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারেন নাই ; তাঁহারাও Spencerএর মত বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের সমন্বয় করিতে গিয়া একটা Synthetic Philosophy বা Empirical Metaphysics গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন দর্শনের মূল সত্য প্রকৃতরূপে অতীন্দ্রিয় নহে, তাহা সত্য ও শিব হইলেও জীবনের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে তাহার অভিব্যক্তি হইতেছে। এ শক্তির ভিতর সংঘাত ও দ্বন্দ্বই আমাদের চেতনাকে ক্রমশঃ বৃহত্তর বোধের দিকে ধাবিত করছে—প্রকৃতির দ্বন্দ্ব নিরর্থক নয়। ইহার সার্থকতা আছে, বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া শান্তির ও শৃঙ্খলার দিকে ধাবিত হওয়া। উপনিষদের ভাষায় বলিতে হয় অন্ন হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বিজ্ঞান ও বিরাট বিজ্ঞান সত্তার দিকে সৃষ্টি

বিকাশ করতে করতে চলেছে। এই বিকাশের প্রাথমিক স্তরে কোন নিগূঢ় চৈতন্যের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় না; দেশ, কালে শক্তি ক্রিয়মান হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সত্ত্বায় প্রকাশ করিতেছে। * * A living being is also a natural being, but one so fashioned as to exhibit a new quality which is true. A "minded" being is also a living being, but one of much complexity of development. শক্তির সর্ব্বশেষ প্রকাশ মানব চেতনা, সমাজ চেতনা, ঈশ্বর চেতনা। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সব যুগেই একরূপ থাকে নাই। বিজ্ঞানবিৎ দার্শনিকের, যথা অধ্যাপক Alexander বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের গভীর তথ্যগুলিকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা হইলেও, তাহাদের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে বিজ্ঞানের অনুভূতি হ'তে। এবং তাহারা চেষ্টা করিয়াছেন প্রাথমিক অস্তিত্ব হইতে (যাহা বিজ্ঞানের বিষয়) কিরূপে সত্য, সুন্দর ও কিরূপ শিবের আবির্ভাব (যাহাদর্শনের বিষয়) তাহা দেখাইতে। তাহারা অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থ স্বীকার করেন নাই—অথচ Plato প্রমুখ দার্শনিক ঋষিরা যাহাকে বলেছেন অতীন্দ্রিয় (Super Sensible) তত্ত্ব, তাঁরা সেই তত্ত্ব রাজিকে এক অদ্ভুত কৌশলে প্রাকৃত সৃষ্টির বেগ হইতে উৎপন্ন হয়েছে মনে করেন। প্রকৃত সৃষ্টির একটা ধারা আছে। বিস্ময়ের বিষয় চেতনার স্পন্দনের ও ক্রিয়ার অভাব হইলেও, এই প্রকাশশীল ধারার ক্রম একরূপেই প্রবাহিত হবে—ইহার সুসঙ্গত অর্থ ও যুক্তি পাওয়া যায় না প্রাকৃত দেশ, কাল, শক্তি হইতে একটা অপ্রাকৃত দিব্য জগতের উৎপন্ন হওয়ায় ভিতর একটা শুভ প্রচেষ্টা থাকতে পারে—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের দ্বন্দ্বকে নষ্ট করে' দেবার জন্যে; কিন্তু এ চেষ্টা ফলবতী হয় নি। আমাদের দেশের সাংখ্য শাস্ত্রের ভিতর একটা পরিকল্পনা আছে, যাতে সৃষ্টি বিকাশের ক্রম দেখান হইয়াছে, কিন্তু দুইটী বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। (১) চেতনার প্রতিচ্ছায়ায় প্রকৃতির ক্রিয়া (২) সৃষ্টির বিকাশ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলস্তরে। স্বভাব হ'তে নিয়মানুগ সৃষ্টি প্রকাশের প্রচেষ্টার কোন বিশেষ অর্থ নাই—সৃষ্টির ভিতর একটা উদ্দেশ্য থাকলেই চৈতন্যের স্পর্শ ভিন্ন এরূপ বিকাশ সম্ভব হয় না; সাংখ্যাচার্য্যেরা এ সত্যকে বিস্মৃত হন নি। প্রকৃতির ক্রিয়া স্বাভাবিক ও স্বতঃ হইলেও তাহার ভিতর আছে একটা চরম পরিণতি, পুরুষকে ভোগ ও মুক্তি দেওয়া—প্রকৃতির সৃষ্টি সার্থকতা এখানেই—কিন্তু এই সার্থকতা সে লাভ করে পুরুষের সান্নিধ্যে। চেতনার দীপ্তি রহিত হইয়া প্রকৃতি যখন সৃষ্টি করে, তাহার সৃষ্টির সার্থকতার হেতু সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া কঠিন। এই সৃষ্টি কিরূপে পরিণত হয়, ঊর্দ্ধতন পরিস্থিতির বিকাশে, এবং কিরূপেই বা তাহার ভিতর বিকশিত হয় সৃষ্টির উচ্চতম পরিস্থিতি, অবস্থায় দ্বন্দ্ব ও সমাবেশের ভিতর দিয়া, তাহার কোন গভীর কারণের সহিত আমরা পরিচিত হই না। চৈতন্যের সাহায্য ভিন্ন কোন সৃষ্টির পরিকল্পনা ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হয়। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য জগতে চৈতন্য বলিতে সক্রিয় জ্ঞানকেই বা পুরুষকেই বোঝা যায়; এরূপ জ্ঞান বা পুরুষকে স্বীকার করিলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সৃষ্টির অভিব্যক্তির কোন অর্থ থাকে না, এইজন্যই এই সব আচার্য্যেরা এরূপ চেতনার স্পন্দনশূন্য সৃষ্টিধারাকে স্বীকার করিয়া চেতনার ক্রম-

প্রকাশকেই কল্পনা করেছেন। এর নিগূঢ় কারণ এই—ইহাদের দৃষ্টি খুব সূক্ষ্ম নয়, ঈশ্বর বলতে সমষ্টি চেতনাকেই গ্রহণ করেছেন—কিন্তু সমষ্টিগত চেতনা ভিন্ন যে চেতনার নিজস্ব রূপ থাকতে পারে, চেতনার মূর্ত্ত রূপ ভিন্ন যে চেতনার অমূর্ত্ত রূপ থাকতে পারে, এই তথ্য তাদের কাছে সুবিদিত নয় বলেই, তাঁরা মনে করেন তথ্য হিসাবে চেতনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হলেও অত্যন্ত complex এই জন্যই তার প্রাথমিক অস্তিত্ব অসম্ভব। "চেতনা" বলতে functional intelligenceই বুঝেছেন। এইরূপ চেতনাকে বস্তুরূপে কল্পনা করা অবশ্যই ভুল হবে। সৃষ্টির স্থূল, সূক্ষ্ম রূপ থাকতে পারে, ইহার উপরেও ক্রম আছে; কিন্তু ইহার কারণ এও ত হতে পারে যে সৃষ্টি সেইখানেই হয় সূক্ষ্ম, যেখানে আধার উচ্চতর ভাবের ও ক্রিয়ার বিকাশ করতে পারে। কিন্তু সেই ভাব ও ক্রিয়া অন্তর্হিতই থাকে। তার স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বিকাশ না হতে পারে। সূক্ষ্মেরই স্থূল বিকাশ সুষ্ঠু কল্পনা, স্থূলের সূক্ষ্ম বিকাশ অপেক্ষা। কারণ স্থূলের ভিতর আমরা এমন কিছু পাই না যা সূক্ষ্মে বিকাশ হতে পারে।

সুখের বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ভিতর আর একটা দৃষ্টি প্রকাশিত হচ্ছে—যাহা অনুরূপ। বিজ্ঞান ক্রমশঃ তাহার সীমাকে উপলব্ধি করছে। Sir Arther Thomson বলেছেন "Science as science never asks the question why ? That is to say, it never inquires into the meaning or the significance of the manifold being, Becoming and Having been." "Science cannot apply its method to the mystical or the spiritual." বিজ্ঞানের এই সীমা ধীরে ধীরে বিজ্ঞানবিদের নিকট ক্রমশঃই ধরা পড়ছে। বিজ্ঞান সত্যই একটা নামরূপাত্মক জগৎ ভিন্ন বিশ্বাধারের সত্যের রূপের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতে পারে না। দার্শনিকের ভাষায় বলতে হয় বিজ্ঞান প্রাতিভাসিক জগতের সন্ধান দেয়—জগতের প্রাতিভাসকত্ব ভিন্ন বাস্তবত্ব আজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেও লুপ্ত হয়েছে। অধ্যাপক Eddington বিজ্ঞানের শক্তির উৎস যদিও পেয়েছেন দুইটী মৌলিক শক্তির আধারে, negative ও positive, কিন্তু তিনি এই আধার হ'তে প্রাকৃত জগতের সৃষ্টির সম্ভাবনা করেই তৃপ্ত হয়েছেন। শক্তি হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই। বরং প্রাকৃত বিশ্বের অন্তরালে একটা অপ্রাকৃত চেতনার জগতকে স্বীকার করেছেন, এবং সেইটীকে তিনি বাস্তব জগৎ বলে মনে করেন। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যদি চেতনার জগতের ও শক্তির মৌলিকাধারের এই দ্বৈত সত্ত্বাকে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি স্বীকার করেন, যদিও এখনও বিজ্ঞান এমন কিছু পায় নাই, যাহাতে বৈজ্ঞানিক শক্তির মৌলিক আধার চেতনা, এমন কথা বিজ্ঞানের দৃষ্টি বলা যায় তথাপি তিনি নিঃসংকোচে বল্লেন যে এই বিজ্ঞান শক্তি দার্শনিক দৃষ্টিতে চেতনারই projection। বিজ্ঞান অবশ্য দ্বৈত পদার্থ চেতন সত্ত্বা ও শক্তিকে গ্রহণ করেই চলেছে। এই দ্বন্দ্বাত্মক শক্তির পশ্চাতে যে প্রসারিত জগত তাহা চেতনারই জগৎ, সেই জগতই সত্য জগৎ ও বাস্তব জগৎ। বিজ্ঞানের জগৎ নামরূপাত্মক মাত্র। বিজ্ঞান ও দর্শনের মীমাংসা Eddingtonএর হাতে যে-ভাবে

মীমাংসিত হয়েছে, তাহাতে চৈতন্যেরই স্থান বড় ; এবং চৈতন্য সত্বা যে মৌলিক পদার্থ এই সিদ্ধান্তকে সিদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় আমাদের মস্তিষ্কের কোষের স্পন্দনে, সেই স্পন্দনগুলি ভিন্ন আমরা বাহ্য জগৎ বলে প্রকৃত সত্বারূপে কোন বস্তুকে জানিনে—যাহা জানি, প্রকৃতরূপে এবং অপরের স্বরূপে তাহা আমাদের চেতন সত্বা, কারণ আমরা তাহাই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আমাদের কাছে কতকগুলি সংজ্ঞা মাত্র,—সংজ্ঞার অতীত তাহার কোন সত্বা নাই। Eddington বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এরূপ বিজ্ঞানবাদে এসে পৌছেছেন। জীব-চেতনায় ও পরম-চেতনায় সম্বন্ধ তাঁহার মতে অতি সহজ, কারণ জীব-চেতনা পরম-চেতনার সহিত আছে মুখ্যরূপে সংশ্লিষ্ট হয়ে।

নববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অধ্যাপক Haldane প্রাণতত্ত্বের দিক দিয়ে দর্শনে উপনীত হয়েছেন। জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি তিনি স্বীকার করেন নাই। "Bilogy" তাঁহার মতে "needs the conception of organisation." প্রাণ অপ্রাণ হইতে উৎপন্ন হয় না – এবং প্রাণের ক্রিয়ার ভিতর আছে এমন বিষয় সংগ্রহ করার ধর্ম্ম, যাহা দ্বারা প্রাণ বর্দ্ধিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংযোগ রেখে প্রাণ পুষ্ট হয়—এই সংযোগটী একটা উপস্থিত ধর্ম্ম নয়—ইহা তাহার স্বভাব। এই স্বভাব প্রমাণ করে দেয় প্রাণের অন্তর ও বাহিরকে এক করে' বর্দ্ধিত হবার ক্ষমতা। এই সমন্বয়ই প্রাণের স্বরূপ—এই সমন্বয় দৃষ্টি প্রাণকে একটা কেন্দ্রীরূপে ক্রমশঃ পরিণত করে। প্রাণ শুধু ক্রিয়ার অভিঘাত নহে। ইহা একটা পরিস্থিতি, যে কেন্দ্র সমন্বয় আমার প্রাণস্তরে দেখতে পাই, সেই সমন্বয়টী আমাদের মন-স্তরে আরও স্ফুটতর রূপে প্রকাশিত হয়। এখানে এই ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সমন্বয়টী মূর্ত্ত হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব বোধে (sense of personality) প্রাণের সংস্থিতি অপেক্ষা ব্যক্তির সংস্থিতির ভিতর পাই আমরা একটী চেতনের সাড়া, একটী ব্যক্তির বোধকে অবলম্বন করে যার ভিতর আছে "আমি" বুদ্ধির পরিস্ফুরণ। কোন ব্যক্তিই কিন্তু পারিপার্শ্বিক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেনা। পারিপার্শ্বিকের সহিত তার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ আছে। এইজন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেরূপ যেরূপ সম্বন্ধ আছে,—ব্যক্তি শুধু ব্যক্তি মাত্র নহে, ইঁহার ব্যক্তিত্বের সহিত অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ আছে অন্যান্যের ব্যক্তিত্বের—কিন্তু সমষ্টিগত সত্বা আছে ঈশ্বরের, তিনি সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব। Haldane এই সমষ্টিগত সত্বাকে সমাজের উচ্চতম সত্বারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—সমস্ত মানব সমাজ যদিও অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলেও ঈশ্বর থাকবেন একমাত্র সত্বা এবং তাঁহারই ভিতর নিত্যরূপে বিদ্যমান থাকবে—যাহা কিছু সত্য আমাদের স্বরূপে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টি, তাহার রূপ যেরূপই হউক না কেন—আমাদের কাছে দেয় একটা সুদূর দৃষ্টি—অভিব্যক্তির ভাগবতাভিমুখীন বিকাশ। অভিব্যক্তির ধারা মানুষকে অতিক্রম করিয়া আরও উর্দ্ধে ধাবিত হচ্ছে। Alexis Carrel বলেছেন মানুষের যেরূপ বিকাশ সম্ভব তাহা আজিও হয়নি, মানুষের মধ্যে এমনি সব কেন্দ্র আছে যে সে সব কেন্দ্রগুলির পূর্ণ বিকাশ হলে মানুষের এক দিব্য পরিণতি হবে। Alexander প্রমুখ মনস্বীদের দৃষ্টির ভিতর আছে এমনি একটা সূক্ষ্ম রহস্যের দৃষ্টি যার জন্য তারা সমষ্টি চেতনার অভিব্যক্তির

পরও দেখতে পেয়েছেন বিরাট চেতনার সম্ভাবনা। Alexander maintains that we have a vague awareness of deity in some experience which he describes as luminous, the feeling which characterises such experiences is, he says the sense of mystry of something which may terrify us or support us in our helplessness but at any rate which is other than anything we know by our senses or in our reflection. যারা আধ্যাত্মিক রহস্যবাদী তারা Alexanderএর এই মতবাদের ভিতর একটা সত্যের অনুসন্ধান পাইবেন —কারণ আমাদের চেতনা ও পরম চেতনার ভিতর আছে অনেক স্তর—যে স্তর ক্রমশঃ বিকশিত হয়, আমাদের চিত্তের প্রসারতা ও সূক্ষ্মতার সহিত। কিন্তু Emergent অভিব্যক্তি-বাদীদের বিনা কারণে অভিব্যক্তি এরূপ সৃষ্টির স্তর বিন্যাশের কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ তাদের মতে সৃষ্টির এরূপ বিশেষ গতির কোন হেতু নির্দ্দিষ্ট হয় না,—কেন যে সৃষ্টির ধারা যে পথ নিয়েছে, সেই পথেই নেবে, কেন যে এধারারও স্তরের পর স্তরে উচ্চতর সত্বায় বিকাশ হবে ইহার কোন সুসঙ্গত :কারণ পাওয়া যায় না। সৃষ্টির ভিতরে এমনি কি আছে যাহা তাহাকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও দিব্য পরিণতির দিকে নিয়ে যায়? হয় বলতে হবে—এমন :কিছু অদৃশ্য শক্তি এরূপ পরিণতির কারণ, নতুবা ইহার কোন অর্থ নাই। গতির অনুধাবন করিলে মনে হবে Alexender যেন সৃষ্টির ভিতর কোন সূক্ষ্ম প্রেরণার সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু সেটা তাহার মানস চক্ষে বেশ স্পষ্ট নহে। এই যে সৃষ্টির আরোহক্রম, ইহার মূলে শুধু অন্ধ শক্তির ক্রীড়া নাই—এই আরোহ একটা আলোক সম্পাতেই হয়, জীবনে মুক্ত প্রেরণা এমনি অস্ফুষ্টভাবে কাজ করে, কিন্তু তাহার জন্য এমন কল্পনা সঙ্গত হবে না যে এই উর্দ্ধশক্তির বীজ পূর্ব্বে ছিল না—জগন্নাথের রথ চলতে চলতেই পথের অনুসন্ধান করে নিল।

অধ্যাপক হ্যালডেনের অভিব্যক্তির ধারা উর্দ্ধগামী,—তাঁর মতে উর্দ্ধবিকাশ কিরূপে হয় তাহাও সুস্পষ্ট হয়নি। হতে পারে সমস্ত বিশ্ব বীজাধারে এটী organism সমষ্টি প্রাণকেন্দ্র, কিন্তু এই প্রাণকেন্দ্রে অভিব্যক্তি পুষ্ট হয়ে, কিরূপে চেতন পুরুষ-সংঘে বিকশিত হয়, তাহা বেশ পরিস্ফুষ্ট হয় নি। বাধ্য হয়ে বলতে হয়—চেতন-পুরুষ স্তর ও তাহার প্রাণস্তরে সম্বন্ধ সূত্র থাকিলে, একই চেতনা সর্ব্বত্র অনুস্যূত হয়ে থাকে—আকার বিশেষে তাহার হয় ব্যক্তিগত প্রকাশ, আকার বিশেষে তারা হয়ে থাকে অপ্রকাশ। একথা বললে সৃষ্টি একটা (spiritual organism) পরিণত হয়—যদিও তাহার উচ্চ অথচ ক্রম রয়েছে। কিন্তু ইহা হতে খুব পরিষ্কার হয় না যে সৃষ্টির প্রাথমিক বিকাশ হয় প্রাণস্তরে, প্রাণস্তর হ'তে ক্রমশঃ উচ্চস্তরগুলি প্রকাশিত হয়। Haldane অবশেষে বলতে বাধ্য হয়েছেন God হচ্ছেন জগতের কেন্দ্র, যাহাতে অবলম্বন করে আছে সমস্ত সৃষ্টিধারা; কিন্তু তাঁর সত্বা যে অভিব্যক্তি ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে, এমন কোন কথা নেই হতে' পারে না। Haldaneএর দৃষ্টিতে সত্যের সার মূর্ত্তি হচ্ছেন ঈশ্বর। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নানাবিধ ধারার ভিতর দিয়া প্রাচীন

তথ্যগুলি নূতনরূপে আমাদের মানসক্ষেত্রে অবতারণা করিতেছে। প্রভেদ এই বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—কারণ বিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রবৃত্তি হয় বাহ্য জগতের দিকে, বাহ্য জগতের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া তাহার সৃষ্টি হয় ক্রমশঃ প্রসারিত—তখন তার দৃষ্টি নিপতিত হয় বিশ্বগৌরবের দিকে। এই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া দর্শন একটা রূপ নিচ্ছে বটে, তবে ইহাকে প্রকৃত দর্শনের ভিত্তি বলা যায় না, কারণ, শুধু বিজ্ঞান বিজ্ঞানরূপে অপ্রাকৃত তত্ত্বের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। বিজ্ঞান কোন কল্পনাকে অবলম্বন করে দর্শন রচনার একটা পরিচয় দিতে পারে বটে, তথাপি বলতে হয় বিজ্ঞানে দৃষ্টি বাহিরের দৃষ্টি—অন্তরদৃষ্টি নয়, প্রকৃত দর্শনের ভিত্তি হবে অন্তরদৃষ্টি। স্থূলের সূক্ষ্মে পরিণতি দ্বারা বিশ্বরূপের উদ্ঘাটন যতটা স্বাভাবিক, তার চেয়ে স্বাভাবিক অন্তঃচেতনার সাঁড়াকে নিয়ে বিশ্ব-রূপের কল্পনা—কারণ আমাদের চেতনার ধর্ম্ম, স্বরূপও প্রকাশই আমাদের যত নিকট, তত আর কিছু নয়—এইজন্যই কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের চেতনার কোন গভীর স্তরে। কিন্তু এখানেও হয় উপস্থিত নানারূপের সংবেদনা, যাহার কোনরূপে অবলম্বন করিতে গিয়া হয় নানাবিধ দর্শনের দৃষ্টির উৎপত্তি। চেতনার প্রধানতঃ দুইটী সংবেদনা আছে—একটা জ্ঞানাত্মক আর একটা ক্রিয়াত্মক। এই দুইটীকে অবলম্বন করে দর্শনের নানা শাখাপ্রশাখা প্রস্তুত হয়েছে।

অনেক দার্শনিক আছেন যাঁদের দৃষ্টিতে ক্রিয়াশক্তিই হচ্ছে মুখ্যতঃ চেতনার বিশিষ্টরূপ, সেইরূপকে অবলম্বন করে' তারা সৃষ্টিকে এই ইচ্ছারই প্রকাশ বলে স্বীকার করে থাকেন। নিত্যসঞ্চলনশীল ইচ্ছা ও ক্রিয়া সৃষ্টিস্থিতি লয়ের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। পাশ্চাত্য দর্শনে এই ক্রিয়া, গতি সৃষ্টি ক্রিয়াতে তাহার কেন্দ্র হইতে চ্যুত হইয়া কিরূপে বিশ্বে মূর্ত্ত (objetified) হয়ে ওঠে, তাহাই দেখান। পাশ্চাত্য দর্শনের নানা গতি আছে, কিন্তু একটা গতি ইহার বিশেষত্ব, সেটা হচ্ছে সৃষ্টির সহিত সত্যের সংযোগ। এবং সত্যের এই বর্হিমুখীনতা, আত্মকেন্দ্রস্থিত হয়ে সৃষ্টির ভিতর আত্ম-প্রকাশ করা। ইহাতেও অনেক সময় দার্শনিক স্থিতি লাভ হয় নাই—চেষ্টা হইয়াছে এই দেখানোর জন্যে যে সৃষ্টিধারাই অভিব্যক্ত হয়ে সত্য স্ফূর্ত্ত হয় আরও উচ্চস্তর স্থিতিতে—কারণ সৃষ্টিবিকাশের ভিতর দিয়েই পাই আমরা সত্যের সত্যিকাররূপ ; বিকাশ যেখানে নেই সেখানে আছে সত্যের লাঘবতা। Prof. Whiteheadএর বিশেষতঃ আধুনিক কালের ভিতর এই ভাবটী বড়ই প্রবল। অধ্যাপক Whitehead যদিও সত্যের সৃষ্ট-পূর্ব্ব একটী রূপ দেখতে পেয়েছেন, তথাপি সেইরূপকে তিনি উচ্চস্থান দেন নাই। সত্যের সেখানে শক্তি-মূর্ত্তি আছে নিক্রিয় হয়ে ; পরিস্পন্দনের ভিতর দিয়ে সেই মূর্ত্তিটী হয় সৃষ্টিতে জাগ্রত। এই জাগ্রত শক্তিই প্রকৃত সত্যেররূপ ; সত্যের শিবরূপ প্রাথমিক রূপ, কারণ শিবের ভিতর গতি ক্রিয়াহীন—ক্রিয়শীল হয়েই হয় শক্তির পরম স্ফূর্ত্তি—সত্যের এই অনন্ত স্পন্দনযুক্ত রূপই উচ্চতর রূপ, কারণ এখানেই বিকশিত হয় সত্যের মঙ্গলরূপ ও সুন্দররূপ যাহা কল্যাণপ্রদ ও পরম উপভোগ্য।

আদর্শবিজ্ঞান ধারায় একটা ক্রম অভ্যুদয়ের কথা আমরা Croceএর ভিতর পাই, যদিও Croce কোন অপ্রাকৃত জগতের কথা মোটেই বলেন নাই। Croceএর দর্শনের সৃষ্টি খুব সহজ, কারণ তাহার মনটা প্রকাশ হয়েছে মনের বিকাশকে নিয়ে। যদিও Croceএ জ্ঞানের সৃষ্টি প্রাথমিক স্তরে মানসিক ক্রিয়াকে হারিয়ে ফেলেছেন সৌন্দর্য্যিক অনুভূতির ভিতরে— কারণ তাহার মতে সৌন্দর্য্যানুভূতি ঠিক সৃষ্টি নয়, রস ও ভোগ নয়—ইহা প্রকাশ এবং এমনি প্রকাশ যেখানে বিষয় বিষয়ী রূপে জ্ঞানস্ফুট নয়। কিন্তু এরূপ স্তর অতিক্রম করলেই জ্ঞানের সবিষয়তা ও সবিশেষতা স্পষ্টই অনুভূত হয়। ইহাই Croceএর মতে উচ্চস্তর জ্ঞান—ইহাই দার্শনিক প্রজ্ঞা—কারণ দার্শনিক জ্ঞান হবে এমনি কিছু যাহাতে সমস্ত বিষয়ের ও বিষয়ীর পরস্পরের সম্বন্ধ বোধ হবে অত্যন্ত পরিস্ফুট। দর্শন প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, সেইখানেই আমরা পাই সুস্থ মনের অভিব্যক্তির ক্রিয়া ও তাহার ক্রম ঊর্দ্ধ সৃষ্টির স্তরগুলি; সেখানে পাই আমরা তাহাদের নিখুঁত সম্বন্ধ। যাহাই হউক, এই যে জ্ঞানের কেন্দ্রচ্যুতি তাহাও আমরা এখানেও পাই।

ক্যাণ্টের দর্শনে জ্ঞানের একটা স্বরূপতা আছে—জ্ঞান আহরণ করিলেও, বিষয়কে সে আপনার মধ্যে পেয়ে আপনার মত সংগঠন করে নেয়। এই যে বিষয়কে অতিক্রম করবার চেষ্টা তাহার সার্থকতা পূর্ণ দেখতে পাওয়া যায় ক্যাণ্টের নীতিশাস্ত্রে—Kant তাহার নীতির লক্ষ্য করেছিলেন বিষয় সংপৃক্ত শূন্য হওয়া। সৃষ্টি চেতনার বিষয়াকারে বিবর্ত্ত, নীতি দেয় চৈতন্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত হ'তে মুক্তি। Kantএর দর্শন সৃষ্টির ভিতর valueর স্থান খুব ঊর্দ্ধে—কারণ value ভিতর দিয়ে আমরা পাই সেই জগৎ যাহার ভিতর প্রকাশিত হয় চেতনার ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ের কবল হইতে মুক্তি ও সত্যের জগতের সহিত পরিচয়—যদিও সত্যে এখানে নেয় মঙ্গলের রূপে। Kantএর ভিতর St. Augustineএর Civitasdeiএর কথা পাইনা, কিন্তু তথাপি বলতে হয়—তাহার মঙ্গলের জগৎ Kingdom of spiritএর অনুরূপ না হউক; ছায়া। হেগেলের দর্শনের দৃষ্টি সৃষ্টির সংবেগ (Art) ও ধর্ম্ম সংবেগকে (Religion) সমন্বয় করিয়াছে। Art সৃষ্টি করে, সৃষ্টি চৈতন্যের আত্মকেন্দ্র হইতে চ্যুত হইয়া বহিঃ-অভিব্যক্তি। ইহা চৈতন্যের অবতরণ জগতের মধ্যে—নাম, রূপ, ক্রিয়ার ভিতরে। ধর্ম্ম ঠিক জীব-চেতনার নাম রূপ ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া পরম চেতনার দিকে ঊর্দ্ধমুখী গতি। কিন্তু দর্শনের সৃষ্টি ইহাদের সমন্বয়—ইহা ব্যাপক দৃষ্টি, ইহা সত্যের দৃষ্টি। ইহা সৃষ্টির সংবেগের অতীত, ইহা জীব-ব্যক্তির চেতনা, ও ঈশ্বর ব্যক্তির চেতনার সম্বন্ধের অতীত—ইহা সত্যের নিরঙ্কুশ সৃষ্টি, কোন আংশিক সৃষ্টি নয়। হেগেলের দার্শনিক দৃষ্টি অতি উচ্চ হইলেও Hegalএর পূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টি সমষ্টির সৃষ্টি, যে সমষ্টির ভিতরে জীব, ঈশ্বর, জগতের সমন্বিত হইয়াছে। হেগেল ক্যাণ্টের valueর জগতকে অতিক্রম করেছেন, কারণ তাহারা পরম সত্যের ভিতর ethical valueর মধ্যে যে লাঘবতা আছে তাহা নাই মঙ্গলের ভিতর অমঙ্গলকে অতিক্রম করে' আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্পৃহা আছে। তাহার অস্তিত্ব

এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করার চেষ্টা—এই চেষ্টাও আস্পৃহাশূন্য হইলেই তাহার আর কোন স্বরূপ থাকে না। কিন্তু পরম তত্ত্ব (Absolute)এর সে স্বরূপ নয়—সে সব দ্বন্দ্বকেই অতিক্রম করে থাকে। কিন্তু সব দ্বন্দ্বের সেখানে সমন্বয় হইলেও, পরতত্ত্বের কিন্তু এদের নিয়েই হয় স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। এদের পরিপূর্ণরূপে অতিক্রম করে' নয়, এদের নিজের ভিতর সমাদর ও সমন্বয় করে নিয়েই পরম তত্ত্ব স্বরূপে বিরাজ করেন। পূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টি—এই স্বরূপের দৃষ্টি, একটা বিশ্ব-দৃষ্টি। এই বিশ্ব-দৃষ্টি পরম তত্ত্বের প্রাথমিক রূপকে করে বিশেষ করে পরিস্ফুট। রামানুজের ভিতর আমরা এরূপ একটা সমন্বয় সৃষ্টি দেখতে পাই। রামানুজ জ্ঞানের ও সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেন, সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে এক করিয়া পরম সত্তা ও পরা জ্ঞান বর্ত্তমান থাকেন। পরম সত্তার ভিতর জীব, প্রকৃতি, কাল ইত্যাদি সমর্থিত হয়েছে; এদের নিয়েই ও স্বরূপভূত করেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব—এই ব্রহ্ম দৃষ্টি পূর্ণ দৃষ্টি—এই দৃষ্টিই দেয় সত্যকার জ্ঞান। ইহ কালের সীমার অতীত, কাল করে প্রকৃতির ক্রিয়ার সমাবেশ—ব্রহ্ম দৃষ্টিতে যুগপৎ সকলের প্রকাশ হয়—অথচ এই প্রকাশ শুধু প্রকাশ মাত্র নহে—ইহাতে আছে সমষ্টি অস্তিত্বের পূর্ণানুভূতি। রামানুজের সত্যের দৃষ্টি আংশিক জ্ঞানের দৃষ্টিকে ও দৃষ্টির ধারাকে অতিক্রম করিলেও, সেই দৃষ্টি ছিল সমন্বয় দৃষ্টি। সত্য সৃষ্টিধারাকে অতিক্রম করিয়া স্বেমহিম্নি স্থিত হইলেও সত্য কিন্তু এদের অতিক্রম করে' পূর্ণ সত্য হয় না। পূর্ণ সত্যের ভিতর আছে বিশ্বের সমস্ত পদার্থের সমন্বয়—যদিও সেই সমন্বয় সম্পূর্ণ সত্ত্বা সকল পদার্থের ভিতর অবরুদ্ধ হয়নি। বাংলার ভাগবত জনের দৃষ্টির ভিতর সত্যের নির্বিশেষ ও সবিশেষ সৃষ্টির সমন্বয় করার চেষ্টা হয়েছিল, প্রাথমিক দর্শনে সত্যের নির্বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইলেও, সত্যের সত্য রূপটী হয় প্রকটিত সকল বিশেষকে সমাদর করিয়া। রামানুজের সম্পূর্ণ সৃষ্টি সবিশেষ সত্যের মধ্যেই ছিল আবদ্ধ—কিন্তু বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ তত্ত্বের ভিতর নির্বিশেষের সন্ধান পেয়েছিলেন—কারণ নির্বিশেষ সত্যানুভূতির প্রাথমিক দৃষ্টি—যদি জ্ঞানের এরূপ বিষয় নিরপেক্ষ দৃষ্টির সমাদর তাদের ভিতর পাওয়া যায়, তবু কিন্তু তারা মনে করেন জ্ঞানের আত্ম-কেন্দ্র চ্যুত হয়ে বিষয়ের ভিতর দিয়া তাহার সবিশেষতার উপলব্ধি করাই তার স্বভাব। অতএব একভাবে Whiteheadএর মত তাহারা জ্ঞানের এই সচঞ্চল শক্তিকেই তাহারা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়াছেন, যদিও তারা Whiteheadএর মত একটা Ideal valueর জগৎ নিয়ে তৃপ্ত হয়নি—কারণ Ideal valueর বিশ্ব সৃষ্টির প্রকাশের ধারায় সূক্ষ্মতম প্রকাশ হইলেও, তাহা সত্যের পূর্ণ দৃষ্টি নয়। Whitehead পাশ্চাত্য দৃষ্টির সাধারণ পর্য্যায়কে অতিক্রম করিতে পারেন নাই—যে সৃষ্টির বিকাশের ভিতর দিয়া সত্যের মঙ্গল রূপকেই বরণ করে নেয়। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা সৃষ্টির ধারার ভিতর সত্যের পরম রূপের সন্ধান পান নাই, ইহার ভিতর একটা কেন্দ্র গতি থাকিলেও, মানুষের অস্পৃহা চেয়েছে প্রকৃতির অতীত হইয়া সত্যের সুন্দর রূপ, যাহা মানুষের সকল বৃত্তিকে অপ্রাকৃত মাধুর্য্যে পূর্ণ করে। বৈষ্ণবাচার্য্যের এই মধুর ও মঙ্গলের অনুভূতিতেই অধ্যাত্ম জীবন পরিস্ফুট হয়েছে—কারণ spiritual life হচ্ছে জীবনের

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
অর্থনীতি-শাখার সভাপতি।
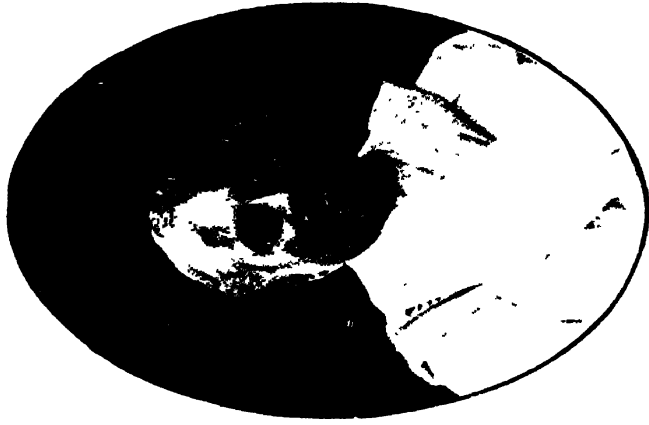
ড শ্রীযুক্ত ম হন্দ্রনাথ সরক
দর্শ শাখ র সভাপতি

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সাংবাদিক সাহিত্য-শাখার সভাপতি।

সৃষ্টি সংবেগের বিরোধী ক্রিয়া। সৃষ্টি সত্যের শক্তির প্রকৃতির বিবর্ত্তনের উদ্বোধন করে, অধ্যাত্ম অনুভূতি এই প্রাকৃত বিবর্ত্তনকে অতিক্রম করে' জীবনের অপ্রাকৃত রস ও আনন্দের অস্পৃহার সত্যের দিব্য প্রকাশের দিকে ধাবিত হয়। সত্যের দিব্য জ্ঞানের ও দিব্য আনন্দের জন্য তাহার অস্পৃহা উর্দ্ধগামী ও নিত্য। নিত্য বিকাশ ও স্ফূর্ত্তির ভিতর তাহার প্রতিষ্ঠা। অধ্যাত্ম জীবন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট দিব্য জীবনের দিব্য ছন্দের পরমানুভূতি। কিন্তু সুন্দরের দৃষ্টি হ্লাদিনীর শক্তির ক্রিয়ার ভিতরই আবদ্ধ। ইহাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই পরম শ্রেয় সাধন হইলেও দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহা সত্যের পূর্ণ রূপ নয়। কারণ সত্যানুভূতি সমগ্র দৃষ্টি, কোন আংশিক দৃষ্টি নয়—তাহাতে প্রকাশিত হয় সকল তত্ত্বগুলি ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও বিকাশের সমস্ত ভঙ্গী। এই দৃষ্টিতে সৃষ্টির সংবেগ, আনন্দের লীলা এবং সমষ্টির রূপ সবই এক বিরাট জ্ঞানানুভূতিতে আত্ম-প্রকাশ লাভ করে। বৈষ্ণবের সত্যানুভূতি শুধু রসের অনুভূতি নহে, ইহাও বস্তুত তত্ত্বের অনুভূতি। বৈষ্ণব চিন্তার ধারার ভিতর একটা সমন্বয় দৃষ্টি আছে—এখানে ধর্ম্মবোধ (value) সুন্দর-বোধ, সত্যবোধ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সত্যের বোধের একটা বিরাট দৃষ্টি থাকিলেও, যাহা ধর্ম্মবোধ, ও সুন্দরবোধকে অতিক্রম করে—সেই দৃষ্টি সবিশেষতাকে অতিক্রম করে নাই—কারণ সত্য সবিশেষ তত্ত্ব। ইহার রূপ বিশেষকে অবলম্বন করেই প্রকাশ পায় দিব্য ও অপ্রাকৃত জীবন, এই বিশেষ বোধ লীলায়িত হয় আনন্দের মূর্চ্ছনায়। রামানুজের এই সত্যবোধের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলেও, বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুভূতির রূপ নিয়েছে ভাগবত তত্ত্বের চেয়ে লীলার আস্বাদনের দিকে। দর্শনের দৃষ্টিতে তাহারা সত্যের অখণ্ডানুভূতির চেয়ে সত্যের গতি-ছন্দের দিকে হয়েছেন অনুরক্ত। কারণ সবিশেষতা এই গতি-ছন্দেরই ভিতর হয় বেশী পরিস্ফুট—অবশ্য আনন্দের অনুভূতির স্তর বিশেষে এই গতিও হয় রুদ্ধ—কিন্তু সে অবস্থা একটা অবস্থা বিশেষ; প্রেমের জীবনের গতিকে ও স্ফূর্ত্তিকে লয় করিয়া এই অবস্থাও থাকতে পারে না—কারণ প্রেমের ধর্ম্ম বৈচিত্র্যকে বিকাশ করে এই জন্য সত্যের অনুভূতি প্রেমের নিকট এক রূপ নয়, বহু রূপ। বলতে হয়, ভাগবত দৃষ্টিতে তত্ত্বের স্থান অধিকার করেছে সুন্দরের রূপ, যদিও এ কথা খুব খাঁটি ইহা সত্যের প্রতি উদাসীন নয়—দিব্য আনন্দের ভিতর আছে সত্যের দৃষ্টি, কিন্তু আনন্দের সংবেগে শান্ত সমাহিত সত্যের রূপ আবৃত হয়ে পড়েছে। অবশ্য অপ্রাকৃত অনুভূতির স্তরে এই দুইয়েরই অনুভূতি হয়; কিন্তু দার্শনিক সত্যের ভিতর পান জীবনের সকল ছন্দ, এবং আর কিছু যাহা সত্যের রূপের ভিতরই আছে; লীলার সংবেগে থাকিলেও, তাহার স্ফুরণ হয় না। কারণ আস্বাদের গাঢ়তায় সেটা আবৃত হয়ে যায়। সত্যের দৃষ্টির তথ্যের দৃষ্টি। এইখানেই বৈষ্ণব দর্শন দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম দৃষ্টি হতে' সত্য দৃষ্টি ভিন্ন হয়ে পড়েছে। আনন্দের দৃষ্টি এখানে থাকিলেও, আনন্দ হতে' তত্ত্ব দৃষ্টি এখানে প্রখর। বৈষ্ণবের দর্শন দৃষ্টি সম্বন্ধ শূণ্য দৃষ্টি নয়। ইহাতে আছে সম্বন্ধের প্রাচুর্য্য, কারণ পরতত্ত্ব সম্বন্ধের সমন্বয়।

পরম তত্ত্বের দৃষ্টির আর এক সুন্দর পরিচয় পাই, আমরা Bradley ভিতর, তিনি তত্ত্বকে সকল সম্বন্ধের অতীত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দার্শনিকের দৃষ্টি সকল সমন্ধ শূণ্য তত্ত্বকে গ্রহণ করে, যাহা Bradleyর কথায় experience; অর্থাৎ বোধ। এই বোধ সকল সম্বন্ধ বর্জ্জিত, সম্বন্ধ বোধের ভিতরই নিয়ে আসে ব্যবধান; যাহা কোন কালে বোধে থাকে না। পদার্থের স্বরূপানুভূতি কখনও সাধারণ জ্ঞানে হয় না; যে জ্ঞান পদার্থকে সব সময় রাখে আমাদের কাছে হতে অন্তর করে। বিষয়কে বুঝি—মননের দ্বারা নয়, তাহার সহিত অভিন্ন হয়ে'—তাহাকে সহজরূপে পাওয়াই তাহার স্বরূপকে পাওয়া। যেই তাহাকে বিচারের ও মননের বিষয় করি, অমনি তাহার স্বরূপ হয়, জ্ঞাতার নিকট হইতে অপসারিত। এই জন্যই Bradley প্রকৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন বোধ। কারণ সংবিদে সকলি প্রকাশিত হয়, তাহার সহিত অভিন্ন হয়ে, তাহার অন্তররূপকে এক করে। কিন্তু Bradleyর এই পরম সংবিদের ভিতর আছে সমষ্টির পূর্ণ রূপ। এখানে মানুষের সব যত জ্ঞান হয় মিলিত এক ঐক্যসূত্রে এবং যত বোধের সব লাঘবতা দূর হয় এক অসীমের অখণ্ড সংবিদ সত্তায়। এই অখণ্ড সত্তার ভিতর, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা অশিব, অসুন্দর তাহার তাহাদের ক্ষুদ্রত্ব, অশিবত্ব ও অসুন্দরকে বিসর্জ্জন দিয়া শাশ্বত সনাতনের ভিতর এক দিব্য পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই অখণ্ড বোধের স্বরূপের ভিতর তাদের পরিণতি এমনি ভাবে হয়, যে তাদের ব্যষ্টিত্বের বা বিশেষত্বের প্রতিভাস হয় না। তাহারা অসীমের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসীমের স্বরূপেই হয় মগ্ন। Bradleyএর দৃষ্টিব একটা প্রসারতা আছে। তিনি সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দর্শনের যে সৃষ্টির শক্তির দিকে দৃষ্টি তাহাকে উদ্ধার করিয়া অসীমের দিকে নিয়েছেন বটে, কিন্তু তবুও Bradleyএর যে বোধ বা সংবিদ সেটা 'দেশকালের অতীত হইলেও একটা এমন বাস্তব পদার্থ যাহা আমাদের জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। মানুষ তাহার চরমানুভূতির ভিতর দিয়ে পায় এরূপ সর্ব্বব্যাপী বোধের একটা অস্তিত্ব—যাহা চিরকালই বহুমুখী অস্তিত্বকে একীকেন্দ্রীভূত করিয়া থাকে নিত্য বর্ত্তমান। এরূপ সংবিদে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ী বিষয় ভাবকে হারাইয়া ফেলি। Bradleyর experienceকে, বোধকে তত্ত্ব বলিলেও, তাহার ভিতর বাস্তব রূপ বেশ পরিস্ফুট, কারণ এরূপ বোধই পরম পদার্থ, ইহা নিজের সত্তায় নিজে বর্ত্তমান, অতএব ইহার চরমানুভূতিতে আমাদের সসীম জ্ঞানের সূত্র হারাইয়া গেলেও ইহা আমাদের কাছে উপস্থিত হয় সবিশেষ বস্তুরূপে। এখানেই আচার্য্য শঙ্করের সহিত Bradleyর মতভেদ। শঙ্কর মতে বোধ বোধমাত্র; সবিশেষতা ও নির্বিশেষতা বোধের উপর আমাদের বুদ্ধির কল্পনা—বোধ বোধরূপেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা বস্তুরূপে ভাবি, যখন আমরা এই বোধকে ভিত্তি করিয়া একটা বিশ্ব কল্পনা করি। শুধু বোধের নির্ব্বিষয়তা শঙ্করের প্রতিপাদ্য নহে, ইহার তথা-কথিত বাস্তবত্বকে (objectivity) তিনি গ্রহণ করেন নাই। কারণ বস্তুদৃষ্টি জ্ঞান-দৃষ্টিকে অতিক্রম করে থাকে—যদিও শঙ্কর বহুস্থানে ব্রহ্মকে 'ভূত' বস্তু বলেছেন তথাপি বলতে

হয়, ইহা বস্তু দৃষ্টি নয়, কারণ সত্যই অদ্বৈত জ্ঞানে বস্তু দৃষ্টির কথা উঠতে পারে না, কারণ বস্তু দৃষ্টি জ্ঞানকে অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু জ্ঞান যেখানে বস্তুস্বরূপ এবং যে জ্ঞান, জ্ঞান মাত্রই সেখানে বস্তু দৃষ্টির কথা না বলাই ভাল, কারণ সাধারণতঃ এরূপ জ্ঞান কোন কোন subjective বা objective পদার্থের সন্ধান দেয় না। Bradleyএর মতে বোধ যদিও সত্যিকার আমাদের জ্ঞানের দ্বৈত ভূমিকে অতিক্রম করে, তাহা হইলে সেই জ্ঞান-সত্ত্বাকে বিশ্ব-বিধৃতিরূপে নির্ণয় করা যায়, কারণ তাহার ভিতর জ্ঞান পুঞ্জগুলি হচ্ছে নিয়ত পরিবর্ত্তিত। শঙ্করের জ্ঞান সত্ত্বাকে, এরূপ কোন সংজ্ঞা দিতে পারা যায় না, কারণ এই বোধের নাই কোন রূপ বা কোন অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানরাশি, অতএব ইহা চিরকালই থাকে সকল সম্বন্ধ শূন্য হয়ে, সকল উপাধি বর্জ্জিত হয়ে। ইহা আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় স্বরাট্ রূপে, ইহা দেয় জ্ঞান স্বারাজ্য, এই জ্ঞান স্বারাজ্য প্রকাশিত হয়, আবরণের সব ভেদ বর্জ্জিত হয়ে—নিত্য উপাধি বিহীন, নিত্য স্বাধীন প্রজ্ঞারূপে। ইউরোপীয় দর্শনের দৃষ্টিতে তথ্যের এরূপ দৃষ্টি বিরল—কারণ ইউরোপ সত্যের সে মহিম্ন স্থিত ভাবকে অতিক্রম করিয়া সত্যকে পেতে চেয়েছে, তাহার বিশ্ব প্রকাশের ভিতর। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ সাংখ্য, বেদান্ত ও যোগদর্শনে সত্য পরিস্ফুট হয়েছে প্রকাশের স্বরূপকে অতিক্রম করে। সত্যের এই নিরঙ্কুশ দৃষ্টি সব প্রকাশের অতীত, ইহা মানস ও অতিমানস স্তরেরও অতীত, এই জন্যই ইহাকে "শান্তং" বলা হয়। মন, বাক, চিত্ত এখানে নির্ব্বাপিত। সৃষ্টি প্রকাশের ধারাকে অতিক্রম করিয়া সত্যিকার দর্শন অতীন্দ্রির অনুভূতিকে গ্রহণ না করে পারে না, কারণ দর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, দর্শন সূক্ষ্ম জগতের সন্ধান না নিয়ে পারে না। এই জন্যই বলতে হয় প্রজ্ঞার জাগ্রত ভূমির জ্ঞানই যথেষ্ট নয়—জাগ্রত আমাদের কাছে এত বেশী পুষ্ট তাহার কারণ, আমাদের ব্যবহার এই ভূমিকেই অবলম্বন করে' সম্পন্ন হয়। ইউরোপীয় দর্শন প্রায়ই এইরূপ অভিজ্ঞতার ভিতর আজ আবদ্ধ হইয়াছে, এইজন্যই প্লেটোর আদর্শ জগতের সন্ধান আমরা বর্ত্তমান দর্শনে হারাইতে বসিয়াছি এবং Platoর আদর্শজগতের অন্যরূপে রচনা ও অভিব্যক্তির চেষ্টা দেখতে পাইতেছি। কথাটা হচ্ছে এই যে আমাদের জাগ্রত অভিজ্ঞতার পশ্চাতে রহিয়াছে সূক্ষ তত্ত্বের জগৎ। উপনিষদ এই জন্য স্বপ্ন জগৎ, সুষুপ্তির জগতের কথা বলেছেন, কারণ যেখানে জ্ঞান মুক্ত হয় বিষয় জ্ঞান হ'তে এবং এই বিষয় উন্মুক্ত জ্ঞান দেয় আমাদের নিকট সত্যের প্রকৃত কৃষ্টি। দর্শন এরূপ জ্ঞানকে ধরতে পারে না, তাহার কারণ দর্শনের দৃষ্টি ততটা প্রসারিত নয়। এই জন্যই ভারতীয় দর্শনের একটী স্বাতন্ত্র্য রূপ আছে, সেটা হচ্ছে একটা অতিন্দ্রীয় বোধের উপর দৃষ্টি। এইখানেই তত্ত্বের হয় সম্যক পরিচয়, কারণ মনন আমাদের যেরূপই হউক না কেন, তত্ত্বের অনুভূতি না হলে, তাহার দৃষ্টি পূর্ণ হয় না। এই জন্যই ভারতীয় দর্শনের ভিতর আছে তত্ত্ববিষয়ের সহিত অধ্যাত্মানুভূতির কথা যুক্ত হয়ে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টি বা দর্শন দৃষ্টির স্বরূপ, যাহাই হউক না কেন, সত্যের পূর্ণ দৃষ্টির জন্য আমাদের আবশ্যক আছে অধ্যাত্মানুভূতির আলোক। একথা আজ দর্শনের বিচারক্ষেত্রে আপাততঃ

..কৃত হলেও, এই অনুভূতিকে নিয়ে দর্শন দৃষ্টি বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাহার কারণ অনুভূতির আছে নানা স্তর। প্রাণের সংবেগ হ'তে, শান্ত মনের সাড়া হ'তে, অতিমানসের প্রসারিত স্বচ্ছময় আলোক হ'তে আমাদের অনুভূতির সঞ্চার হয়। এ বিষয়ে উপনিষদ দিয়াছে অতি সুন্দর দৃষ্টি। প্রাণের স্তরে অনুভূতি দেয় বিশ্বপ্রাণের সম্যক পরিচয়, বিজ্ঞান দেয় বিশ্ববিজ্ঞানের অনুভূতি, আনন্দ দেয় বিশ্ব-আনন্দের ও রসের অনুভূতি—কিন্তু প্রাণ, বিজ্ঞান, আনন্দ সকলকেই অতিক্রম করে' থাকে আত্মানুভূতি। আমাদের সমস্ত সত্ত্বার ভিতর আছে এই বিশ্ববিজ্ঞান ও বিশ্বসত্ত্বার সহিত পরিচয় করিবার একটা অবশ্যম্ভাবী প্রেরণা—কারণ ইহারা পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত—এই জন্যই ভারতীয় সত্যদৃষ্টিতে একটা উদার দৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায়—সত্যের অনুভূতিকে অব্যাহত রাখবার জন্য প্রাণের ধ্যান, মনের ধ্যান, বিজ্ঞানের ধ্যান, আনন্দের ধ্যান করতে হয়, কারণ এই ধ্যানের ভিতর দিয়ে ইহাদের সত্যরূপ প্রকাশ পায়—দৃষ্টি ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হয় এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে আমরা ক্রমশঃ অবগাহন করি এমনি তত্ত্বে যেখানে প্রাণ শান্ত, মন বিলীন, বিজ্ঞান স্তব্ধ, আনন্দ অপ-সারিত - সত্য যেখানে আপনার শুদ্ধ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদে এরূপ তত্ত্ব হইতে সৃষ্টির কথা আছে, কিন্তু সৃষ্টির প্রকাশকে অব্যক্ত তত্ত্ব হইতে বড় বলা হয়নি ; সৃষ্টি এই অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থা—যদিও সেই ব্যক্ত ভাবে হয় না তাহার পরিস্ফুরণ। উপনিষদ বিদ্যা এমনি গূঢ় অনুসন্ধান করেছে তত্ত্বের, যে অবিকলিত চিত্তে বলতে পেরেছে, যাহা তত্ত্ব তাহা ব্যক্ত, অব্যক্তের অতীত ; এবং এই পরম তত্ত্ব কোন দিনই ধরা পড়েনি বিশ্বের সৃষ্টির কোন সূত্রে। এমন কি, এই তত্ত্বে আমরা বিশ্বের কোন মূল সূত্র দেখ্‌তে পাই না। সত্যের এই যে দৃষ্টি ইহা সকল সম্বন্ধশূন্য দৃষ্টি। সৃষ্টির সহিত সত্যের সম্বন্ধের কথা সাংখ্য, পাতঞ্জল স্বীকার করে নাই,—কারণ এই সব আচার্য্যেরা সৃষ্টিকে প্রকৃতির কাছেই অর্পণ করিয়াছেন—বেদান্ত সত্যের দৃষ্টিতে সংসৃতিকে স্বীকারই করেন নাই, কারণ বিশ্ব সত্যের দৃষ্টিতে সংসার, কোন দিন ছিল না, কোন দিনই নাই। এই কথায় আমরা হয়ত বিস্মিত হই, কিন্তু সত্যিই জ্ঞানবিচারে এই বিশ্ব প্রত্যক্ষীভূত হইলেও, ইহাকে কালাতীত সত্যের সহিত অভিন্ন ভাবা যায় না। অবশ্য ব্রহ্ম সত্ত্বাকে সংহত করে', বিশ্ব রচনা করেন এই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়—কিন্তু বিশ্ব-রচনা, বিশ্ব জ্ঞানের বিষয় হইলে তাহার রূপ মায়িক, অর্থাৎ নামরূপাত্মক, কিন্তু বাস্তব নহে—আমাদের জ্ঞান যত দিন ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হয়, তত দিন হয়ত এরূপ বিশ্ব আমাদের কাছে উদ্‌ভাসিত হবে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় হইলেই বিষয় সত্য হবে এমন ত কোন নিয়ম নাই। সত্যের সহিত এইরূপ বিশ্বের কোন সম্বন্ধ নাই—কারণ সত্য সকল ক্রিয়া, স্পন্দনের অতীত, দেশ কালের মধ্যে সত্য ধরা পড়ে না। এমন কি এইরূপ দেশ-কাল-ক্রিয়াত্মক বিশ্ব আমাদের মনের লয় হইলেও থাকে না। আচার্য্য শঙ্করের সত্য দৃষ্টি Bradley's এর সত্য দৃষ্টি হইতে এখানে পৃথক। Bradleyর বোধ বা সংবিদ্ সব স্তরের জ্ঞানের সামঞ্জস্য বা সমন্বয়। শঙ্করের সত্য দৃষ্টি প্রজ্ঞাস্বরূপ। দেশ, কাল ও ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সত্যের যে রূপ আমাদের

কাছে প্রতিভাত হয়, তাহা তাহার অখণ্ড রূপ নয়। ক্যান্ট দেশ কালের জগৎকে একটা মনোময় সৃষ্টি বলেছেন, যদিও এই মনোময় সৃষ্টির অতীত একটা বাস্তব সত্তা আছে, যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। শঙ্কর সৃষ্টিকে মায়িক বলেছেন। ইহার অর্থ ক্রিয়াত্ব থাকিলেও সত্যত্ব কিন্তু নাই—সত্যের কালের ভিতর দিয়া কোন প্রকাশ বা স্ফুরণ নাই। এই সত্যই আমাদের স্বরূপ। জীবের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নতা স্থাপন করিয়া মানুষের যে চিরন্তন বোধি তাহাও দেশ কালের অতীত ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তত্ত্বের গভীর আলোচনা, আমাদের জ্ঞানের ও সংবিদের আলোচনা হইতে পরিস্ফুট হয়। কারণ মানুষের সংবিদের রূপই দেয় তাহার দার্শনিক দৃষ্টি। Descartes ও Kantএর দর্শনেরও উৎপত্তি হয়েছে এই সংবিদের বিচারে; Descartesএর আত্মা সংবিদযুক্ত নিত্য প্রকাশ ক্রিয়ার আলয়; Kantএর দর্শনের ভিত্তি এই আত্ম-সংবিদের উপর (যাহাকে তিনি নাম দিয়েছেন Synthetic unity of apperception), কিন্তু যে সংবিদের মধ্যে আত্ম-তত্ত্ব কখনও বিকাশ হয় না। বিষয়ী রূপ যে আত্মা সে কখনও বিষয় হ'তে পারে না। এ কথা শঙ্করের কথার প্রতিধ্বনি; কিন্তু ক্যান্টের চেয়ে শঙ্করের দৃষ্টি আরও প্রসারিত। ক্যান্টের Synthetic unity of apperceptionর একটা হয়ত সংবিদাত্মক অনুভূতি ও সত্তা থাকলে (Epistenological unity and reality) Kantএর মতে তাহার বাস্তবত্বের কোন অনুভূতি নেই। শঙ্করের সংবিদই পরম সত্তা, বিষয়-বিষয়রূপ জ্ঞানে তাহার ধৃতি না হইলেও, তাহার স্বতঃ স্বপ্রকাশ। বিষয়ীর বিষয় সম্বন্ধ ভিন্ন জ্ঞানই প্রকৃত প্রকাশ। ক্যান্টের দর্শনের গতি আর এক স্তর আরোহণ করিলে শঙ্কর মতবাদের সহিত তাহার কোন ভেদ থাকিত না।

কিন্তু Kant তাহা পারিলেন না, কারণ তাহার দর্শনে একটা স্বাভাবিক লাঘবতা ছিল—সেটা এই যে জ্ঞানের মূলীভূত কারণ thing-in-itself (ভূতবস্তু), তাহাকে Kant বিষয় রূপেই পেতে চেয়েছেন। ভূতবস্তুকে তিনি জ্ঞানের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখাতে পারেন নি। ভূতবস্তু জ্ঞানস্বরূপ, এবং বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধের অতীত এই বোধ তাঁহার ছিলনা বলিয়া বিজ্ঞানের জগৎকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে ইচ্ছার জগৎকে অবলম্বন করিতে হয়েছিল। যে অনুভূতির স্পর্শ থাকিলে Kantএর দর্শনের শক্তি অন্যরূপ হইত, তাহা Kantএর ছিল না বলিয়াই তাহার দর্শনে স্ফুট হয়েছে একটা বিজ্ঞানের জগৎ ও আর একটা ক্রিয়ার জগৎ। বিজ্ঞানের জগতে বিষয়ীকে অবলম্বন করে বিষয় জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত হয়,—এখানে সত্যই theoretical reason এর হয় প্রাধান্য, কারণ জ্ঞান বিষয়ীতে আশ্রিত। এই জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হইলে বিষয়বোধ হয়, সুতরাং এই বিজ্ঞান জগতে জ্ঞানের বিষয় হতে' হয় প্রাধান্য।

ইচ্ছার জগতে বিষয়ী বিষয়ের সম্বন্ধ ঠিক বিপরীত—এখানে বিষয়ী বিষয়কে অনুধাবন করে। এখানে বিষয়ই পায় প্রাধান্যতা, কেননা বিষয় ভিন্ন ইচ্ছার কোন অর্থ থাকে না। ইচ্ছার ভিতর থাকে বিষয়কে নিয়ে তার মত করে' তাকে গড়ে তোলা, তাকে

রূপ দেওয়া—কিন্তু বিষয় ছাড়া থাকতে পারে না। বিষয়কে প্রধান করাই তাহার স্বরূপ বিষয়ের মধ্যেই পায় যে তাহার স্ফূর্তি—অতএব বলতে হয় will এর জগতে subject এর চেয়ে objectএর প্রাধান্য। Object এর যাহা হউক না কেন, ইচ্ছা ও ক্রিয়া ইহার সত্বাকে মুখ্য করে তোলে আমাদের কাছে।

Kant এর দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল—এই দুই জগৎ; বিজ্ঞান ও ইচ্ছার জগতের মধ্যে Kant নিজেই কোন সমন্বয় করিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁর দর্শনকে অবলম্বন করে' নানা গবেষণা হয়েছে। একটি ধারা নিয়েছে বিজ্ঞানের প্রাধান্য—এই ধারাকে অবলম্বন করে' Fichte ও Hegelএর দর্শন প্রস্তুত হয়েছিল, আর একটা ধারা নিয়েছে ইচ্ছার প্রাধান্য, যাহাকে অবলম্বন করে' হয়েছে Schopen-hauer ও Royceএর দর্শন। Royce তাহার দার্শনিক রচনাতে ইচ্ছা শক্তিকে বড় স্থান দিয়েছেন। "To be তাহার ভাষায় means to fulfil a purpose—in fact, to fulfil in final individual expression, the only purpose, viz the Absolute purpose."

কিন্তু এই দুই পক্ষ ছাড়া আর একটী পক্ষ আছে যেখানে Theoretical Reason বা Practical Reason এর স্বরূপের ভিতর আছে যে বিষয়ীর বা বিষয়ের প্রাধান্য তাহা থাকে না—তাহারা যেন একটা সমতার অন্তর্গত হয়। Bradley ও Mac Taggert এরূপ সমতাকে পেয়েছেন আমাদের ভাবের (Feeling) স্বরূপে—আমরা যখন শুধু জানিনে, অনুভব ও আস্বাদ করি, তখন আমার জ্ঞাতা বা কর্ত্তা এই দুই ভাবেরই হয় অন্তর্ধান, আমরা নূতন জগতে প্রবেশ করি যেখানে আমাদের স্বভাব পরিপূর্ণ সত্বায় প্রতিষ্ঠিত হয়—আমরা যেন বিষয়ী বিষয় ভাব শূন্য হই। অনুভব গভীর হইলেই যেন বিষয়ের সহিত এক হইয়া যায়। Knowing ও Willing এর বিশ্রান্তি হয় এইরূপ সমতা বোধের মধ্যে ;—এখানেই প্রকাশ হয় আর এক নবীন জ্ঞান যাহা সম্বন্ধ শূন্য হইয়াই হয় প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই চেতনার বোধরূপ। পাশ্চাত্য দর্শন এ-রূপে এরূপ সম্বন্ধ শূন্য বোধে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তথাপি বলতে হয়, প্রকৃত বোধ স্বরূপ ভাব যে সাক্ষীতে প্রতিষ্ঠিত, সেই সাক্ষীর সহিত এদের পরিচয় হয় নি। জ্ঞানে যেখানে প্রকৃত সমতা বিরাজ করে সেইখানেই প্রকৃত রূপে আমরা পাই—বিষয় বিষয়ী সমন্ধ হইতে মুক্তি। এই সমতা জ্ঞানের অবস্থায় থাকে, কারণ জ্ঞানের সব ক্রিয়ার ভিতরেই থাকে তাহার প্রশান্ত উদাসীনতা, সব স্থলেই এবং সব অবস্থায়। পাশ্চাত্য দেশে যাঁহারা absolutists তথ্যের এরূপ উদাসীন প্রশান্তির বিষয় জ্ঞাত নন, তাঁহাদিগকে বিষয় বিষয়ীর স্পর্শচ্যুত অবস্থায় বিশেষের অনুসন্ধানে Feelngকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বোধের এই সাক্ষী রূপ বিষয়ী বিষয় ভাব বর্জ্জিত, বোধের এই অবস্থা অনুভূতি স্বরূপ ; এখানেই ব্যক্তিবোধ, বিশ্ববোধ, নির্ব্বাপিত হয়। এই প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা মাত্র—ইহাই অমৃত, ইহাই অশোক, ইহাই অদ্বৈত দৃষ্টি—

বিচারের দৃষ্টিতে সত্যের স্বরূপ যাহাই নির্ণীত হউক না কেন, একথা সত্য যে ভারতবর্ষে বিচার-দৃষ্টি সত্যের সন্ধানে একমাত্র দৃষ্টি নয়। বিচারের পথও পথ, কিন্তু মনন

বা বিচার প্রকৃতরূপে সত্যকে অনুসন্ধান করিলেও সত্যকে অধিকৃত করিতে পারে না। কারণ সত্যের অপরোক্ষ দৃষ্টি দেয় মানুষকে পরম সম্পদ্। এবং বিচারের লাঘবতা এইখানেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার Hibbert lecturesএ বলেছেন, সত্য মনের বিষয় নয়। মন যখন ধ্যানে হয় লয়, তখনই হয় প্রতিফলিত সত্যের জ্যোতিঃ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। উপনিষদেও আছে অধ্যাত্মযোগের দ্বারাই দেবকে জানিয়া মানুষ হর্ষশোকের অতীত হয়। তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, তত্ত্ব বিচার, তত্ত্ব দর্শনের পথ মাত্র। প্রকৃত তত্ত্বদর্শনের সহিত আছে সমস্ত জীবনের সম্বন্ধ। সমস্ত জীবনটাকে এমনি ভাবে গঠিত করতে হয় যাহাতে সত্য গ্রহণ করবার যোগ্যতা আমাদের ভিতর জেগে ওঠে; বিচার যাহাই হউক না কেন, সত্য গ্রহণ ও সত্য উপলব্ধি আবশ্যক করে ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা—এই ভাগবতবৃত্তিকে অবলম্বন করে' প্রকৃত উপলব্ধির দ্বার ভিতর হতেই উন্মুক্ত হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ভিতর এমনি একটা সত্তার স্ফুরণ আসে, যে অতীন্দ্রিয় তথ্যগুলি তাহার কাছে আপনি প্রকাশিত হতে থাকে—সত্যের দীপ্তি, সত্যের ভাতি তাহার হৃদয় কন্দরে প্রকাশিত হয়। তখন তিনি হন সত্য দ্রষ্টা। তার সমস্ত জীবনটী সত্যের ছন্দে হয় পূর্ণ, তিনি কল্যাণসৃষ্টিতে হন অভিষিক্ত। ভারতবর্ষের দর্শনসৃষ্টি এইরূপে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে পরিণত হয়। জ্ঞানের শেষ সীমায় প্রতিষ্ঠা হয় না, বিরাটের ছন্দ প্রতিষ্ঠিত না হলে। জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে আসে জীবনের ছন্দ-প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই বুঝতে পারি ছন্দের উপাসনাকে কেন এত বড় করা হয়েছিল, বেদে ও উপনিষদে।

সত্যের জীবনে বিরাটের ছন্দ হয় পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত—অন্তরে, মনে, প্রাণে কোথায়ও লাঘবতা থাকে না। একটা দিব্য শান্তির ও কল্যাণের মূর্চ্ছনায় জীবন হয় পূর্ণ। সত্য-দীপ্ত জীবন জীবনের সকল ছন্দের ভিতর দিয়ে স্থিত হয় পরম শান্তিতে। শান্তি ও অভয় তাহার প্রতিষ্ঠা, ছন্দ তাহার প্রকাশ। সত্যের ভাবনার সহিত আমাদের সত্তা ক্রমশঃ এক হয়ে ওঠে, তখনই আমাদের অন্তর প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে এবং আমাদের চিত্ত ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় মনের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে' দিব্য জ্ঞানের অকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। তখন উপনিষদের ভাষায় বলতে হয়, আকাশ, বাতাস ধ্যান করছে, পৃথ্বী ধ্যান করছে, অন্তরীক্ষ ধ্যান করছে। ধ্যান গভীর হলে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় বলতে হয়, "সমস্ত দিক সকল প্রসন্ন" "সকল ভুবন হরির শরীর।" এরূপ বিরাট জ্ঞান ও আনন্দের ছন্দ আমাদের অন্তরকে পূর্ণ করে এবং এইরূপ ভাগবতী ছন্দ ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর হয়ে বাক মনের আস্বাদের অতীত শান্তির ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়—যেখানে সত্য এমন গভীর ভাবে প্রকাশিত হন যাহা মানবের কোন কল্পনা বা কোন সূক্ষ্মানুভূতি ধারণ করতে পারে না। সত্য সেখানে স্বদীপ্তিতে পূর্ণ। সত্য সেখানে সত্যই।

অনেক সময়ই একটা কথা শুনতে পাওয়া যায় দর্শন শাস্ত্রের কার্য্যকরিতা নাই—ইহা লোপ পেত বসেছে। দর্শন অবশ্য অনেক বিষয় আলোচনা করে, যাহার সহিত সাধারণ জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু দর্শনের প্রকৃত লক্ষ্য ত সেখানে নয়—ইহার প্রকৃত লক্ষ্য সত্য দৃষ্টি ও সত্য ভাবনা—যাহাতে জীবনটা সত্যের শক্তিতে হয় পূর্ণ। এই অংশই ছিল ভারতবর্ষের

দার্শনিক-জীবনের পরাকষ্ঠা। এই জন্যই এদেশে ঋষিত্বের এত আদর। সত্য যখন জীবনের ছন্দকে গ্রহণ, জীবনের সকল ভাবে, চিন্তায়, অবতরণ করে, তখনই হয় সত্য প্রতিষ্ঠা। এই সত্য প্রতিষ্ঠা জীবনকে দেয় শক্তি, তৃপ্তি, আনন্দ। এই ভাবে দেখলে মনে হয় দর্শন অত্যন্ত কার্য্যকারী ; আবশ্যক শুধু এরূপ অবস্থা জাগাইয়া তোলা যাহাতে সত্য হবে প্রতিষ্ঠিত শুধু বুদ্ধিতে নয়, বাক্যে, মনে, প্রাণে। এরূপ সত্য প্রতিষ্ঠাই দেবে শক্তি ও শান্তি। উপনিষদে দেখতে পাই বাক্যের উপাসনা, মনের উপাসনা, প্রাণের উপাসনার কথা আছে—ইহা অতি গভীর কৌশলে আমাদের প্রত্যেক শক্তিটীকে সত্য প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। এতেই তো সত্ত্বা দীপ্ত ও দৃপ্ত হয়ে ওঠে। যখনই প্রাণ, মন, বুদ্ধি বিশ্ব ছন্দে উংবোধিত হয়, তখন তাহাদের দিব্য জ্ঞান প্রতিষ্ঠা হয়—তখন প্রাণ বিশ্ব ছন্দে নৃত্য করে, অন্তর বিশ্বদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে' "পশ্যন্তী" বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্ম জগতের দ্রষ্টা হয়। এইরূপে মানুষের সমস্ত শক্তি দিব্য শক্তিতে পূর্ণ হয়ে জীবনকে দিব্য সুষমায় প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্বাতীত সত্ত্বায় জ্ঞানের সহিত বিশ্বের অন্তর জ্ঞানের সব বৈভবে পূর্ণ হয়। ধ্যানের নিত্য প্রশান্তির ভিতর স্থিত হয়েও জীবন হয় সকল রস, সকল বিজ্ঞানে পূর্ণ, প্রাণের স্বচ্ছন্দতায় জড়তা হতে হয় মুক্ত।

ভারতবর্ষের সাধনা কখনও ব্যক্তিতে বদ্ধ থাকে নাই। ব্যক্তির মুক্তিকে গ্রহণ করলেও, জাতির মুক্তির প্রতি ভারতের আচার্য্যেরা উদাসীন ছিলেন না। কারণ আর কিছু নয়—সভাই ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সমষ্টির দিকে—সমষ্টির সত্ত্বাই বিরাট সত্ত্বা। সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির বিসর্জ্জনই দেওয়া পরম কল্যাণ। সত্য বোধ উদ্‌বোধিত হইলেই মানুষ এই বিরাট সমাজকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে পায় এবং তখন বিশ্ব কল্যাণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নিজমুক্তিকে বিসর্জ্জন করে।

এখানে যখন কোন দিব্য ভাব প্রতিষ্ঠা হয়, তখন মানুষের এই কল্যাণবোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে বিরাট সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়। এর দ্বারা বিশ্ব-ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিশ্ব-ধর্ম্ম-চক্র কল্পনা নয়! যারা যোগযুক্ত, তারা অনুভব করেন এই বিশ্ব একটী ধর্ম্ম সংঘ, এবং যাহার অন্তরে এমনি শক্তি ক্রিয়মাণ যে সমস্ত মানব জাতি এইরূপ ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে' ঊর্দ্ধপ্রসারিত চেতনা হতে' শক্তি ও কল্যাণকে অবতীর্ণ করাইয়া মানুষকে নবীন জীবন-বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করাইবে। একটা দিব্য জাতির স্বপ্নেই এদেশের সত্য-দ্রষ্টারা উংবোধিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় সত্য দৃষ্টির এ অংশ উপাদেয় ও অত্যন্ত উংসাহপ্রদ। ঋষিদের দৃষ্টি আমাদের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হউক—আমরা তাহাদের অনুপ্রেরণায় মগ্ন হয়ে' নবীন নৈমিষারণ্য সৃষ্টি করি—যেখানে দিব্য জীবনের অনন্ত প্রসারিত জ্ঞান, অপরিমিত বীর্য্য ও অপরাজেয় সংঘ-শক্তি একটী নবীন জাতি সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী,

কথা-সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী।

বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবিকাগণ।

কথা-সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ

"কথা" এই শব্দটির অর্থ সংস্কৃত অভিধানে "প্রবন্ধ কল্পনা" বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। মহামুনি ভরত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "প্রবন্ধস্য কল্পনা বহ্বনৃতা স্তোকসত্যা" অর্থাৎ "প্রবন্ধের বহু মিথ্যা ও অল্প সত্যপূর্ণ কল্পনা"। সুতরাং 'কথা' বলিলে প্রধানতঃ কাল্পনিক বৃত্তান্ত বুঝায়।

"আখ্যায়িকা" বলিতে আমরা সাধারণতঃ তাহাই বুঝিয়া থাকি। প্রসিদ্ধ কোষকার অমরসিংহ "আখ্যায়িকা" শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন "উপলব্ধার্থ কথা",—অর্থাৎ "আখ্যায়িকা" বলিতে গল্পকথাবিশেষ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু দণ্ডী এই উভয়বিধ রচনার মধ্যে এক শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন এবং একই লেখকের দুইখানি সুপরিচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে বাণভট্টের "কাদম্বরী" কথা-শ্রেণীর এবং "হর্ষচরিত" আখ্যায়িকা-শ্রেণীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।* সুতরাং দণ্ডীর আদর্শ গ্রহণ করিলে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিষয় লইয়া বিরচিত রচনাকে 'কথা' এবং ইতিহাস বা অতীত কাহিনীকে "আখ্যায়িকা" বলা আবশ্যক। কিন্তু দণ্ডীকৃত শ্রেণীবিভাগ অনেকে মানিতে চাহে না।

"সাহিত্য" এই শব্দটীর সংস্কৃতভাষায় তিনটী বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়,—

(১) যাহা কোন কিছুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাহাই সাহিত্য

(২) মেলন বা একত্র মিলন

(৩) "মনুষ্যকৃত-শ্লোকময়-গ্রন্থবিশেষঃ"

এবং শেষোক্ত গ্রন্থসমূহের উদাহরণস্বরূপ উক্ত হইয়াছে "ভট্টি-রঘু-কুমারসম্ভব-মাঘ-ভারবি-মেঘদূত-বিদগ্ধমুখমণ্ডল-শান্তিশতক-প্রভৃতয়ঃ"। দেখা যাইবে ইহার মধ্যে গদ্যরচনার স্থান নাই। "সাহিত্য" বলিতে যে "শ্লোকময় গ্রন্থ" বুঝায় তাহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃতের "সাহিত্য" ও পশ্চিমের "Literature" ঠিক এক জিনিস নহে। কিন্তু আজকাল আমরা "Literature" অর্থে 'সাহিত্য' কথাটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং তাহাতে এত বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, মনে হয় 'সাহিত্য' শব্দের অপর কোন প্রকার সংজ্ঞানির্দ্ধারণ এক্ষণে আর সম্ভব নহে। সাহিত্য বলিতে এক্ষণে আমরা সমস্ত লিখিত গ্রন্থ বুঝিয়া থাকি ; অর্থাৎ সাহিত্য বলিতে কোনও একটি বিশেষ ভাষাভাষী, কোন একটি বিশেষ জাতির লেখকবর্গের সৃষ্ট লিপিবদ্ধ চিন্তারাশি বুঝায়।

সুতরাং 'বাঙ্গালা কথাসাহিত্য' বলিতে বাঙ্গালাভাষায় যে সকল কথা অর্থাৎ বহু মিথ্যা ও অল্প সত্যপূর্ণ কাল্পনিক বৃত্তান্ত লইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রবন্ধ নিবন্ধাদি রচিত হইয়াছে ও তাহা লইয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই বুঝায়।

---

* কাব্যাদর্শ

ফরাসী দেশে ম্যসিয় ফাগুয়ে (Faguet) নামে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক ছিলেন। তিনি ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ভাষা যে স্তধু সাহিত্যের উপাদান তাহা নহে; উহার সর্ব্বাঙ্গ জাতির পদচিহ্নাঙ্কিত। ভাষা সমাজের অভিব্যঞ্জনা। ঐ অভিব্যক্তি পক্ষিরবের মত আকাশমার্গে মিলাইয়া না গিয়া চিরদিনের মত সাহিত্যের মর্ম্মরগাত্রে অঙ্কিত থাকে। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টিও করে, আবার উহার আশ্রয়ে আত্মরক্ষাও করিয়া থাকে। মনুষ্যের ভাষা আছে। সে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সে সাহিত্য সনাতন হইয়া থাকে। তাই মানুষ—'মানুষ', নিছক পশু নহে। পশুর স্মৃতি নাই, স্মৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার নাই। তাই পশুর উন্নতি বা বিকাশ নাই। মনুষ্যের স্মৃতি আছে, স্মৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার সাহিত্য আছে; তাই মানুষ নরদেবতা হইয়াছে, পরে আবার হইতেও পারিবে। সাহিত্যের সৃষ্টি ধর্ম্মের উপাদানে হইয়া থাকে। সে ধর্ম্ম প্রথম স্তরে বিভীষিকার উপাসনা, সৌন্দর্য্যের আরাধনামাত্র। পরে মানুষ স্তরে স্তরে যেমন উন্নীত হয়, তদনুসারে তাহার সাহিত্যও আকারান্বিত হয়। এই অসংখ্য স্তর বিন্যস্ত সাহিত্য বিশ্বমানবতার ইতিহাস—দেবত্বের উন্মেষ-কাহিনী।"

সাহিত্য সম্বন্ধে ম্যসিয়ে ফাগুয়ের এই যে অভিমত তাহা সর্ব্ব দেশে ও কালে সমভাবে প্রযুজ্য। বাস্তবিক প্রাচীন ও আধুনিক পৃথিবীর সব ভাষার সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সাহিত্য মূলতঃ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং লোকচিত্তানুরঞ্জনার্থ বা রসসৃষ্টির জন্য বহু মিথ্যা ও অল্প সত্যপূর্ণ কাল্পনিক বৃত্তান্ত রচনা অথবা পাশ্চাত্য দেশসমূহের "romance," "novel" বা "fiction" রচনা সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম যুগে হইতে পারে না। একথা বিশেষ করিয়া প্রমাণ করা আবশ্যক নাই।

কথা-সাহিত্যের উদ্ভব মনুষ্য সমাজে কবে, কোথায় ও কি উপলক্ষ্য করিয়া হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা যে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে বিদ্যমান ছিল তাহার অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও অনুমান প্রমাণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। মনুষ্যমাত্র প্রায় একই ভাবাপন্ন। চিরদিনই সে কল্পনাবিলাসী। আদিম যুগের মানব মানবীরা যে শুধু তাহাদের পত্রাবরণে লজ্জানিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত তাহা নহে; সেই পত্রাবরণের সৌকুমার্য্যসাধনে যে তাহাদের আগ্রহ যত্নের অবধি ছিল না তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। স্তধু অঙ্গাবরণ লইয়াই নহে, অঙ্গাভরণের জন্যও তাহাদের প্রচেষ্টার সীমা ছিল না। পত্র, পুষ্প, লতা, গুল্ম, আরণ্য প্রকৃতির মধ্যে যেখানে যেটী সুন্দর দেখিয়াছে তাহাকেই অলঙ্কারের কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছে। স্বেচ্ছায় দেহচর্ম্ম সূচীবিদ্ধ করিয়া বিচিত্র বর্ণের উল্কি আঁকিয়াছে। বৈচিত্র্যের প্রতি এই স্বভাবজ আকর্ষণ যদি তাহাদের অন্তরে না থাকিত তাহা হইলে আজিকার দিনের এই প্রচুরতার উদ্ভব কিছুতেই হইতে পারিত না। বর্ত্তমান সভ্যতার এই যে বৈভব, এই যে প্রাচুর্য্য, এ সকলই সেই অসভ্য আদিমানবের অন্তরতম প্রদেশের গুহানিহিত অস্ফুট কল্পনার,—যাহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহারই স্বাভাবিক পরিণাম। তা'র সুগভীর

অনুভূতির এবং তীব্রতম তপস্যালব্ধ ফলে প্রসূত সুসভ্য মানবের কল্যাণময় চিত্তের দান। যদি সে দিন সেই গুহা অথবা অরণ্যবাসী আদি মানবের অন্তর কেন্দ্রে বিচিত্র কল্পনার বীজ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে এই ইন্দ্রজালতুল্য মানবৈশ্বর্য্যের সমাবেশ আজ নিরন্ধ্র অন্ধকারময় অস্বপ্নলোকেই চিরসমাহিত থাকিয়া যাইত। এই বৈচিত্র্যময়ী ধরণীবক্ষে হিংস্র শ্বাপদ এবং তদপেক্ষাও হিংস্রতর মানবপশুসমাকুল অরণ্যানী ব্যতীত জনপদের অভ্যুদয় হয়ত কোনদিন হইতে পারিত না।

মানুষের কল্পনাশক্তি শুধু তাহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার প্রেরণায় অথবা জৈবিক মনের স্বভাবজ সুখাভিলাষপ্রবৃত্তির অনুসরণে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় স্থূলতর বস্তুজগতের সৃষ্টি করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই। প্রত্যেকটি মানবচিত্তগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তার অন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবসমূহকে বিশ্লেষণ করার যে নিগূঢ়তম বিস্ময়ানন্দ তাহা সে লাভ করিয়াছে। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় সপ্তস্বর্গ এবং অভিশপ্ত প্রেতলোকের সৃষ্টি সেই অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনাদেবীর কার্য্যফল। কথাসাহিত্যের উৎপত্তির সন্ধান করিতে গিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, আদিম অর্দ্ধবর্ব্বর নরনারীর অন্তরে যে কল্পিত রূপকথার সৃষ্টি হইয়াছিল, ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মানবের কল্পনা শক্তি ক্রমশঃই উৎকর্ষ লাভ করিয়া উদ্দামতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অতঃপর কাব্য, নাটক, কথা, আখ্যায়িকাদি সরস রচনার সৃষ্টি হইল। স্বর্গ, নরক, পুণ্য পাপের আদিম কল্পনার সহিত মানব তাহার অতীন্দ্রিয় ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়া আরও অনেক বৃহত্তর এবং মহত্তর কল্পনার যোগ-সাধন করিল এবং তাহা সহস্র শাখাপল্লবে পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হইয়া মানবের অবসর বিনোদনের প্রধানতম উপাদানে পরিণত হইল। যত দিন যাইতে লাগিল, জীবনধারাও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইতে লাগিল, কল্পনার কল্পলোকে স্রষ্টা নরও নিষ্ক্রিয় রহিল না। রূঢ় বাস্তবকে সে তা'র সুমোহন তুলিকার বিচিত্র বর্ণপাতে নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া আঁকিল। কথাসাহিত্য এমনই করিয়া মানবেতিহাসে নিজস্ব একটা স্থান পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বৈদিক যুগেও কথা বা আখ্যায়িকার প্রচলন দেখা যায়। ঋক্‌সমূহে বড় বড় বিষয় লইয়া আলোচনার মধ্যে রূপকচ্ছলে গল্পরচনাও দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি ঋক্ শব্দ সম্ভারে এক একটি কাব্য-কথা। এক একটি শব্দের মধ্যে যে অমেয় কাব্যসৌন্দর্য্য আছে পরবর্ত্তী যুগের বহু কাব্যে বা খণ্ডকাব্যে তাহার অর্দ্ধেকও নাই। অনাবৃত আকাশের আনীলবক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া ভাস্বতী ওদতী উষার রক্তিমরাগদ্যোতনার যে অনবদ্য স্তুতি বৈদিক ঋষি-কবি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছেন, উষাসমাগমকুতূহলী দ্বিধাসংশয়হীন কলকণ্ঠ কানন বিহঙ্গের মতই তাহার সঙ্গীতমূর্চ্ছনা অপার্থিব মাধুর্য্যে এবং বর্ষার মেঘমন্দ্রের মতই অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে বিমণ্ডিত। সাহিত্যের মূলে যে সত্যের ও শক্তির একান্ত প্রয়োজন সেই সত্যোপলব্ধি ও তেজের সঞ্চয় ছিল বলিয়াই ভারতীয় সাহিত্যের অপর সকল শাখার মত কথাসাহিত্যও জল্পনার বিজৃম্ভনমাত্র থাকিয়া যায় নাই। একদিন পূর্ণানুভূতিসম্পন্ন

আত্মোপলব্ধ সত্যদ্রষ্টা লেখকবৃন্দ বিশুদ্ধ বিশোকাজ্যোতিঃতে জ্যোতির্ম্ময় চিত্ত লইয়া নূতন আলোকের নূতন চিন্তার নূতন ভাবধারার উদ্ভাবন করিয়া বিশ্বকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। আজ আমরা যথায় তথায় "সত্যদ্রষ্টা ঋষি" দেখিতে পাই। কিন্তু সত্য কি এবং ঋষিই বা কে সে সংজ্ঞাবোধ আমাদের ফুরাইয়াছে। শুদ্ধসংযম, প্রশান্তচিত্ত এবং পূর্ণ জ্ঞানাধিকার ব্যতীত স্রষ্টা হইলেও দ্রষ্টা হওয়া যায় না। এই স্বাধীনচেতা বীরপুরুষেরাই জগতে মহাকাব্যের যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। উপনিষদে হৈমবতী উমার আবির্ভাব পূর্ব্বাহ্লেই হইয়াছিল। কথার এবং আখ্যায়িকার কাব্যে পুরাণে ষোড়শোপচারে পূজাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। দেবী সরস্বতী অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দ্বারা দর্শনীয়া। তাঁহার কৃপায় সাধকগণের উচ্চ সাধনাবলে কখন নৈমিষারণ্যের ধূমব্যাপ্ত যজ্ঞভূমে, কখনও তমসাতটের সুশীতল তরুচ্ছায়ায় জগতের আদিমতম ও শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্যসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইতে থাকিল। আত্মা তখনও অবসন্ন হয় নাই, গৃহদেবতা তখনও বিশ্বদেবতারূপে শুধু ভূলোক নহে, দ্যুলোকও অধিকার করিয়া রহিয়াছিলেন। আদিকবিরা তাঁহাদের চরিত্র বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের পাত্র এবং জাতির প্রধানতম শিক্ষক ছিলেন। একদেশদর্শী, মাত্রা-জ্ঞানপরিশূন্য তরুণ বা বালকের অক্ষম হস্তে সেদিন লেখনী সঞ্চালিত হয় নাই। তাই সাধনায় সফলতা দেখা দিয়াছিল। পূজামন্ত্রে শিলাখণ্ড দেবতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অন্ধকার দেউলে দেউলে আলোকশিখা উর্দ্ধশিখে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। পরাজয়ের কালিমা কোথাও কলঙ্কক্ষেপ করিতে পারে নাই। আজ অন্য সকল বিষয়ের মত আমাদের কথাসাহিত্যের মধ্যেও বৈদেশিক অনুকরণ স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। জাতির জীবনে যখন বৈচিত্র্যের অবসান হয়, আত্ম-প্রত্যয় যখন চূর্ণ হইয়া যায় তখন এইরূপই ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে ও জাতীয় জীবনের ইতিহাসে কোন প্রভেদ নাই। জীবনের উচ্চ মনোবৃত্তিসমূহ সুপরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যে তেজ ও বল দেখা যায় না। অধীন বা উচ্ছৃঙ্খল জাতির মধ্যে কখন কখন দু একজন বড় লেখক দেখা দিলেও জাতীয় সাহিত্যের এমন দিনে সৃষ্টি হয় না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার সত্যতা প্রমাণ হয়। জাতীয় ইতিহাস যে সাহিত্যের কতটা পরিপন্থী তাহা উক্ত দুই দেশের সাহিত্য হইতে স্পষ্ট দেখা যায়।

আমাদের দেশে এক সময় যেমন হিন্দু বা মুসলমান কেহই মাতৃভাষা বাঙ্গালার চর্চ্চা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না; হিন্দু সংস্কৃতে এবং মুসলমান ফারসী ও উর্দ্দুতে গ্রন্থ রচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইংলণ্ডে এলিজাবেথের যুগের পূর্ব্বে ঠিক সেই অবস্থাই ছিল। রাজনৈতিক গুরুত্বে ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব যেমন মহিমায় গৌরবে সমুজ্জ্বল, সাহিত্যের দিক দিয়াও তাহা উহা অপেক্ষা কোন রকমে অল্প জ্যোতির্বিমণ্ডিত নহে। একদিকে ক্ষুদ্র বৃটিশদ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা যেমন নূতন নূতন দেশে আধিপত্য বিস্তারপ্রয়াসী হইয়াছিল তেমনই তাহার কাব্য নাটকেও নূতন নূতন তেজের ও বলের নবজাত ভাব-ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। খ্যাতনামা লেখকবর্গ লাটিন ছাড়িয়া ইংরাজী

ভাষায় রচনা আরম্ভ করেন। জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক নাটকসম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন, "নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়; কারণ যথার্থ নাটকে সামাজিক চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই সুপরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি তাহার ভিতরে কোথায় প্রাণ প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। শুধু একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে কোথায় তাহার ছেদ হইয়াছে তাহাই আবিষ্কার করা—তাহা যাহাতে সেই সমাজের লোকের উপলব্ধি হয় সে শিক্ষা শুধু নাটক হইতেই হয়।" রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডীয় নাটক যে উৎকর্ষের চরমে আরোহণ করিয়াছিল সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবন গঠনে মহাকবি সেক্সপিয়ারের দান সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধ বিষয়ে ফাগুয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:—"ফরাসীবিপ্লবের ঠিক পূর্ব্বেকার ফরাসী-সাহিত্য বিলাসের সাহিত্য ছিল। তাহা ঠিক সমাজের মত প্রকাশ করিত না। তাহার প্রভাব ফরাসীসমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহার পর বিপ্লবসূচক যে সাহিত্য ফরাসীদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে খৃষ্টান সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে না। ভলটেয়ার, রুসো, ডিডেরো প্রমুখ অগ্নিবর্ষী লেখকবর্গকে কোন মতে খৃষ্টান বলা যায় না। তাঁহাদের প্রভাবে শুধু ফরাসীদেশে কেন, সমগ্র ইউরোপে, খৃষ্টান মতের খণ্ডন হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে ভলটেয়ার, রুসোর লেখাও সহস্র বৎসরের খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের ও সভ্যতার ফলে ফরাসী ভাষায় ও সাহিত্যে যে মজ্জাগত খৃষ্টানী ভাব দেখা দিয়াছিল তাহাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। ভাষার সৃষ্টি একদিনে হয় না। উহার পুষ্টিলাভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে বহু যুগ লাগে। এই সকল বিভিন্ন যুগমধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি, মত ও বিশ্বাস সব কিছুই ভাষার মধ্যে স্তরে স্তরে সমাবিষ্ট দেখা যায়। একটি মাত্র রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা উহাদের এক কথায় বিলুপ্ত করা সম্ভব নহে। ফরাসীবিপ্লব ধ্বংসমূলক হইলেও এবং ভলটেয়ার রুসো প্রমুখ লোকদুর্ল্লভ প্রতিভার অধিকারী লেখকবর্গ বিপ্লবের স্বপক্ষে লেখনী পরিচালন করিতে থাকিলেও উহাদের সকলকার সমবেত প্রচেষ্টার ফলে ফরাসী-সাহিত্যকে তাহার ধর্ম্মের বেদী হইতে নামান সম্ভবপর হয় নাই।"

ফরাসী-সাহিত্য আলোচনা করিয়া মনীষী ফাগুয়ে যে তিনটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা সকল সাহিত্য সম্বন্ধে সমভাবে প্রযুজ্য বলিয়া এখানে দেওয়া যাইতেছে,—

(১) জাতীয় সাহিত্য জাতির মেদমজ্জার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত এবং সমাজের উচ্চ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সকল স্তরেই পরিব্যাপ্ত।

(২) জাতীয় সাহিত্যকে একটী পুষ্পমাল্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে অর্থাৎ মালা গাঁথা পুষ্পসমূহের মতই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ডোরে পারম্পর্য্যশালি-

ভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং অতীতের সহিত সম্বন্ধবিরহিত ভবিষ্যৎ সাহিত্য গড়িয়া উঠা অসম্ভব।

(৩) জাতীয় সাহিত্য জাতির সমাজ-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ম্যসিয় ফাগুয়ের সিদ্ধান্তত্রয় সকলযুগেও সকল দেশে সকল সাহিত্য সম্বন্ধে সমান সত্য। সুতরাং সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে সাহিত্যকে আমাদের জাতীয় ভাবধারার সহিত সংযোগপরিশূন্য অতীতের সহিত যোগসূত্রবিহীন শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতগণের জন্য সৃষ্ট হইলে চলিবে না। সে সাহিত্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে না; তাহার পক্ষে স্থায়িত্বলাভ করা সম্ভব নহে। এ কথা যে কতদূর সত্য তাহা রুষ সাহিত্যের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়। রুষ সাহিত্য পিটার-দি-গ্রেটের পূর্ব্বে নিতান্ত নগণ্য ছিল না। পিটার-দি-গ্রেট অন্যান্য সকল বিষয়ে রুষিয়াকে পশ্চিম ইউরোপের সমতুল্য করিবার জন্য যে নানা সংস্কারকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু তিনি যে পশ্চিমের সাহিত্যের আদর্শে রুষ সাহিত্যকেও পুনর্গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সে কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না। শিক্ষা সংস্কারের ফলে ফরাসী সভ্যতা ও সাহিত্য রুষিয়ার অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজে দীর্ঘকাল একাধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। ফলে বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের আমাদের বঙ্গদেশের শিক্ষিতসমাজের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল রুষিয়ার শিক্ষিতসমাজের অবস্থা এই সময় অবিকল সেই রূপই ছিল। তাহাদের মধ্যে রুষিয়ানত্ব ছিল না বলিলেই হয়। তাহারা তখন বিলাসী ফরাসীত্বের স্বপ্নবিভোর ছিল। তখনকার অবস্থা যে কিরূপ ছিল তাহা বুঝাইতে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, খাঁটি রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি পুস্কিনও বার বৎসর বয়সের মধ্যেই ভলটেয়ার মলিয়ের প্রমুখ ফরাসী সাহিত্যরথিবৃন্দের লেখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সেই বয়সেই মলিয়েরের অনুকরণে ফরাসীতে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আজন্ম ফরাসী আবহাওয়ার মধ্যে লালিতপালিত পুস্কিন তাঁহার মাতৃভাষায় অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতামহী এবং তাঁহার বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট। উক্ত ধাত্রীর নাম ছিল এরিণা রোডিও নোভনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধা বালকের কর্ণে রুষিয়ার অতীত গৌরবের কাহিনী, গাথা ও উপকথাদি বলিয়া তাহাকে মাতৃভাষায় এবং স্বদেশের সমাজধর্ম্মে অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। পরিণত বয়সে পুস্কিন এ ঋণ কখনও বিস্মৃত হন নাই।

সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য এত দীর্ঘস্থায়ী হইবার কারণ এই যে, তাহা জাতির সমাজ-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ছিল না—সমাজের সকল স্তরের লোকেই তাহার রস-গ্রহণে সমর্থ ছিল।

কথা-সাহিত্যের উৎপত্তি সর্ব্বপ্রথম কবে, কোথায়, কিরূপে হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। প্রাচীনযুগে মানুষের অভাব অল্প থাকার জন্য জীবনে সমস্যা তাদৃশ প্রবলভাবে দেখা দেয় নাই। দ্বিতীয় স্তরে সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া গড়িয়া

উঠিয়াছিল। এ সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, সর্ব্ব-প্রাচীন ছোট গল্পের সন্ধান প্রাচীন মিশর হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার নাম আনপু ও বাটার উপাখ্যান (Anpu and Bata)। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আধুনিক যুগের ছোট গল্পের সহিত তাহার সাদৃশ্য নিতান্ত অল্প নহে। দুইজন লোক একই বালিকাকে ভালবাসে এবং তাহাদের একজনের সহিত তাহার বিবাহ হয়; অপর ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব ও কার্য্যকলাপ হইল গল্পটীর বর্ণনীয় বিষয়। কথিত আছে, মিশরদেশের পঞ্চম রাজবংশের সময় গল্পটীর রচনা কাল। সুতরাং খৃষ্টাব্দের কয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয়ের ভার বিদ্বজ্জনের প্রতি অর্পিত হইল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও কথার অস্তিত্ব দেখা যায়। বৌদ্ধ জাতকসমূহে সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা পণ্ডিতগণ খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকের বলিয়া মনে করেন। জাতকগুলির মধ্যে বৌদ্ধ বিশেষত্ব কিছুই নাই। জনসমাজে প্রচলিত কাহিনীগুলির মধ্যে মধ্যে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞানমূলক গাথা জুড়িয়া দিয়া বৌদ্ধরা সেগুলি নিজেদের করিয়া লইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্রের অনেক গল্প জাতকেও দেখা যায়, অর্থাৎ উভয়েই লোকসমাজে প্রচলিত কাহিনী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'হিতোপদেশের মূল উৎসগ্রন্থ আজিও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। উহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিরচিত হইয়াছিল। পারস্যরাজ খুসরু নাশিরবানের রাজত্বকালে (৫৩১-৫৭৯ খৃঃ অঃ) তাহা পাহলবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সে গ্রন্থও আজ লুপ্ত। কিন্তু কালিলগ ও দীমনাগ নামে তাহার যে সিরিয়াক ভাষান্তর অল্পকাল মধ্যে হইয়াছিল আধুনিক যুগে তাহা আবিষ্কৃত হইয়া পাশ্চাত্যদেশে মুদ্রিত হইয়াছে। এই সিরিয়াক অনুবাদ হইতে উহা গ্রীক্ আরবী প্রমুখ ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান 'পঞ্চতন্ত্র' মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার মাত্র। গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা"র রচনাকাল আজিও নিরূপিত হয় নাই। লক্ষসংখ্যক শ্লোকে পৈশাচী ভাষায় বিরচিত এই সুবৃহৎ গ্রন্থ আকারে মহাভারতের সহিত উপমেয় ছিল। পরবর্ত্তী যুগে উক্ত গ্রন্থাবলম্বনে বিরচিত ক্ষেমেন্দ্র কবির "বৃহৎকথামঞ্জরী" এবং সোমদেবের "কথাসরিৎ-সাগরে"র নাম সুপরিচিত।

'জাতক' ও 'পঞ্চতন্ত্রে'র পরবর্ত্তী কালে রচিত 'অবদান' গ্রন্থগুলির নাম অতঃপর করা আবশ্যক। এগুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী মধ্যে নানা প্রচলিত কাহিনী, কিম্বদন্তী, আখ্যায়িকার সহিত ধর্ম্মোপদেশ মিলাইয়া সংস্কৃতভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। অবদানগ্রন্থমালার মধ্যে "দিব্যাবদান", "অশোকাবদান", "শার্দ্দুলকর্ণাবদান", "অবদানশতক", "বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা" এই কয়টীর নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। জৈনদিগের "কল্পসূত্র", "কথাকোষ", "কথারত্নাকর", "মহাবীরচরিত", "পদ্মপুরাণ", "উত্তরপুরাণ" প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। এগুলি ঠিক কথাসাহিত্যের গ্রন্থ না হইলেও ইহাদের মধ্যে অনেক গল্প, কথা ও আখ্যায়িকার সংগ্রহ দেখা যায়। সংস্কৃতে কথাসাহিত্যের আরও কয়েকটী গ্রন্থের নাম করা গেল :—

বেতাল পঞ্চবিংশতি

শুকসপ্ততি

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা (ক্ষেমঙ্কর)

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা (কালিদাস ?)

দশকুমারচরিত (দণ্ডী)

বাসবদত্তা (সুবন্ধু)

কাদম্বরী (বাণভট্ট)

প্রবন্ধকোষ (রাজশেখর)

প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যও প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাবের জন্য একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন যুগে বর্ণপাত করিয়া গিয়াছেন। তখনকার দিনে সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান বিষয় ছিল "গীতিকাব্য", "পুরাণ" "চরিতাখ্যান" বা "মঙ্গলকাব্য"।

পাল রাজাদিগের সময় হইতে প্রথম বাঙ্গালাসাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়। ধর্ম্ম-ঠাকুরের মহাত্ম্যপ্রচার সেই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যোগীপাল, মহীপাল, মাণিকচাঁদ, রমাইপণ্ডিত, ঘনরাম, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, প্রভুরাম, সীতারাম প্রভৃতি অনেকে ধর্ম্মের পালা রচিয়া গিয়াছেন। "ডাকের কথা" এবং "খনার বচন" এ দুইটির নামও করা আবশ্যক। উহাতে সহজবোধ্য ভাষায় নানা ক্ষুদ্র প্রচলিত ছড়ার সংগ্রহ দেখা যায়। অন্যান্য দেশে ধর্ম্মবিসংবাদ লইয়া রক্তপাত ও মারামারি চলিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে তাহার ফলে রক্তের পরিবর্ত্তে সাহিত্যের নদী ছুটিয়াছে। বহু বিভিন্ন ধর্ম্মমত এবং উপাসকসম্প্রদায় সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য নানা গান ও গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার ফলে আজ বঙ্গসাহিত্যে আমরা এত অধিকসংখ্যক "মঙ্গল" বা "মাহাত্ম্য" পাইয়াছি। এখানে মাত্র কয়েকটীর নাম করা হইল :—

শীতলামঙ্গল বা শীতলামাহাত্ম্য

পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গল বা সুবচনীর কথা

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কথা

ষষ্ঠীমঙ্গল

কমলামাহাত্ম্য

সারদামঙ্গল বা লক্ষ্মীমাহাত্ম্য

গঙ্গামঙ্গল বা গঙ্গামাহাত্ম্য

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংস্রবের ফলে বাঙ্গালাসাহিত্য নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কাব্যসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য ইত্যাদির মত কথাসাহিত্যও নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গালাসাহিত্যের

প্রথম যুগে পদ্যরচনার সমধিক প্রচলন ছিল। গদ্যরচনা একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে এবং মিঃ হলহেডের প্রচেষ্টায়। তাঁহার Grammar of the Bengali Language" রচনার পর হইতে আরবী, ফারসী, হিন্দীর জগাখিচুড়ি হইতে বাঙ্গালাভাষার উদ্ধারসাধন হইতে থাকে এবং পরিশেষে মহাত্মা রামমোহন রায় এবং রামরাম বসু প্রভৃতির হস্তে বাঙ্গালা গদ্যের দ্বিজত্ব ঘটে। এই সময়ে উপনিষদ্ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ এবং মহাত্মা রামমোহনের মিশনরীদের এবং পণ্ডিতবর্গের তাঁহার সহিত বিতর্কমূলক রচনায় বাঙ্গালাসাহিত্য কণ্টকিত হইয়া উঠিলেও তাহার ফলে ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইহার ফাঁকে ফাঁকে "বত্রিশ-সিংহাসন", "বেতালপঞ্চবিংশতি", "হরপার্ব্বতীমঙ্গল", 'প্রশস্তিপ্রকাশিকা", "মাধব-মালতী", "কামিনীকুমার", "বাসবদত্তা" প্রভৃতি গদ্য ও পদ্যাত্মক কথাসাহিত্যের বহুল প্রচার চলিতেছিল! বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং ৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষিবৃন্দের দানের কথা আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য নহে। টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচরণ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"কে কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চস্থান দিতে হয়। চলিত ভাষায় সর্ব্বজনবোধ্য এমন পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে আর রচিত হয় নাই। পথপ্রদর্শনকারীর কৃতিত্ব অনুবর্ত্তী অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিকতর। এখানে বলা সঙ্গত যে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যে বাঙ্গালাভাষায় রচিত সর্ব্বপ্রথম পুস্তক; বঙ্কিমী ভাষার পূর্ব্বাভাস যে ইহাতে বর্ত্তমান তাহা ঐ পুস্তক পাঠ করিলে সহজেই দেখা যায়।

ইহার পর শীতশীর্ণ বনস্থলীর মধ্যভাগে নববসন্তাগমের মতই বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে সহসা অভ্যুদিত হইয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবক্ষের পরিস্ফীতির ন্যায়ই বাঙ্গালাসাহিত্যের বক্ষে সেদিন যে জোয়ার বহিয়াছিল আজিও তাহাতে ভাটার টান দেখা দেয় নাই। বঙ্কিমসাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার কথাসাহিত্য তেমনই অপূর্ব্ব রূপ পরিগ্রহ করিল, যেমন সে একদিন বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য লইয়া করিয়াছিল। গীতিকথার যুগ সেই হইতে অস্তাচলের পথ অবলম্বন করিয়াছে, যদিও ইহার ঠিক অনতিপূর্ব্বযুগেই মাইকেলের "মেঘনাদবধে"র জীমূতমন্দ্রধ্বনি এবং "ব্রজাঙ্গনা"র বর্ষাবায়ুবিতাড়িতা বন-মর্ম্মরে আর্ত্তা প্রকৃতির মৃদু আর্ত্তনাদ গৌড়জনকে প্রোৎসাহিত এবং অশ্রুপ্লুত করিয়া তুলিয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগকে প্রধানতঃ কথাসাহিত্যের যুগ বলা যায়। যদিও প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলা আবশ্যক যে, এই কথাসাহিত্যের উদ্ভব প্রধানতঃ পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের অনুকৃতি দ্বারা আমরা লাভ করিয়াছি; তথাপি এ কথাও অসত্য নহে যে বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যের সমস্তটাই নিছক পরানুকরণ নয়। কোন বড় বিষয়ের পদাঙ্কানুসরণ করিতে গেলে কতকটা ছাপ তাহাতে পড়িবেই, তাহা অপরাধজনক নহে। অনুকরণ করিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিয়া বসাতেই প্রকৃত দৈন্য প্রকট হয়। আমাদের বর্ত্তমান

লেখকসম্প্রদায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে অভিজ্ঞ হইয়া technique সম্বন্ধে উন্নতিলাভ এবং মনস্তত্ত্বের গভীরতম সত্য ও তথ্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের পরিবেষ্টনীর কুহক ও প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে স্বকীয় সমাজের প্রাণ ও ভাবধারা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞানও লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ হয়ত তজ্জন্য অভিনিবেশ সহকারে চেষ্টাও করিতেছেন না। এই হেতু আমাদের কথাসাহিত্য সম্পূর্ণ নিজস্ব সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিতেছে না। এই দারিদ্র্যদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকৃত আত্মানুভূতি লাভ করিতে পারিলে বাঙ্গালা কথা-সাহিত্য বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের মত বিশ্ব-সাহিত্যের জয়মাল্য অর্জ্জন করিতে পারিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর কাব্যে, নাট্যে, সঙ্গীতে, প্রবন্ধে সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে যিনি একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন সেই দীপ্তকর রবীন্দ্রের উজ্জ্বলকিরণধারা আজিও বাঙ্গালা-সাহিত্যের উপর বর্ষিত হইতেছে। কথাসাহিত্য তাঁহার কাছে সামান্য ঋণে ঋণী নহে। আজ বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ, বিশেষতঃ কথাসাহিত্যগগন, রবিচ্ছায়াপ্রতিফলিতালোক শত চন্দ্রোদয়ে উদ্ভাসিত। একদা সাহিত্যগগনে বঙ্কিমের রেখায় যে খণ্ডচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল তাহা কলায় কলায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বয়ংজ্যোতিঃ নক্ষত্রের সাক্ষাৎ সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে পাইলেও কথাসাহিত্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী এখনও পায় নাই।

বর্ত্তমান বাঙ্গালার কথাসাহিত্যিকদিগের (তা' কি নর, কি নারী) লেখা লইয়া আলোচনা করিতে বসিলে একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সে জন্য সে চেষ্টা হইতে বিরত হওয়া গেল। অতঃপর সাহিত্যিকগণের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা লইয়া সামান্য কিছু আলোচনা করিব। যে কোন ফসল ফলাইতে হইলে প্রথমে তজ্জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। উহার উৎকর্ষ কাম্য হইলে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য নিষ্পন্ন করা আবশ্যক। সাহিত্যের ক্ষেত্রের অবস্থাও অনুরূপ। যে কোন বিষয়ের ফসল ফলাইতে হইলে সেই বিষয়ের শিক্ষার পরিণত অবস্থায় পৌছিতে হইবে। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা পূর্ণফল লাভ করা যায় না। যিনি যে বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে সে বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক লিখিতে গেলে যেমন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পূর্ণতা আবশ্যক, দার্শনিকের পক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটা সম্ভব নহে। কথাসাহিত্যিকের দায়িত্ব কাহার অপেক্ষা তুচ্ছ নয়। রূপকথা ও সমাজকথার এইখানে প্রভেদ। একের বিষয়-বস্তু শুধু কল্পনার পরিসরসাপেক্ষ। অপরকে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজনীন মত ও পথের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় গ্রহণ এবং মানবচরিত্রের ও মনোভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানার্জ্জন এবং বিশ্লেষণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। সেজন্য ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে লেখকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। লেখককে ভূয়োদর্শনের জন্য সাধ্যানুসারে দেশভ্রমণ করিতেও হইবে। পল্লীবাসীর সুখদুঃখের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে না পারিলে কথাসাহিত্যিকের কথা প্রাণের স্পন্দন লাভ

করিতে পারিবে না ;—শুধু মুখের কথাতেই পর্য্যবসিত হইবে। বিষয়বস্তুর অভাবে যদিও তাঁহার পথ দিকে দিকে অবরুদ্ধ, তথাপি জনসাধারণের সঙ্গে সমান হইয়া মিশিতে পারিলে অন্ততঃ কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যের নিকট কর্জ্জ করা দেহাত্মবাদযুক্ত অশ্লীল ও অবাস্তর রচনার অপেক্ষা মনোজ্ঞ, অনভিজ্ঞ নাগরিকের পক্ষে শিক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিতে পারিবেন। কথাসাহিত্যে বহুজ্ঞতার অভাবে খুব বড় শক্তিমান্ লেখকের লেখাও যে কতখানি একঘেয়ে হইয়া দাঁড়ায় তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হইতেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কথাসাহিত্যিকের পক্ষে ভাষাসংযম অভ্যাস করা যে কত আবশ্যক তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তুচ্ছ, এমন কি হীন বিষয়বস্তুও ভাষাসৌন্দর্য্যে এবং শ্লীলতাপূর্ণ শব্দসম্ভার প্রয়োগে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে এবং সাধারণ বা মহৎ বিষয়ও ভাষার অসংযমে ও অপপ্রয়োগে অপাঠ্য হইয়া যায়। বর্ত্তমানের খ্যাতিসম্পন্ন অনেক কথা-সাহিত্যিকের রচনা হইতে পূর্ব্বোক্ত কথা দুইটীর যাথার্থ্য সমর্থিত হয়। কথাসাহিত্যিককে স্রষ্টার আসন লইতে হয়। তিনি স্বধু সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করিষাই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। সত্য ও অসত্য দুই লইয়াই তাঁহার কারবার। কঠিন বাস্তবের ততোধিক রুক্ষ কঠোর মূর্ত্তিকে ঢাকিয়া নীরসকে সরস করিয়া প্রকাশ করাতেই তাঁহার কৃতিত্ব। "শুষ্কং কাষ্ঠং" বলিলে তাঁর চলে না; "নীরস-তরুবরঃ" বলিয়া শুষ্ককাষ্ঠদর্শকের চিত্তে রসসঞ্চার করিতে হয়। সমাজদর্পণে প্রতিফলিত নরনারীর ফটোগ্রাফ গ্রহণ তাঁহার কার্য্য নহে; মোহিনী তুলিকাপাতে সে রূপ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করাতেই তাঁহার খ্যাতির পরিপূর্ণতা।

ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা যে বর্ত্তমানে আর্থিক সমস্যা সে সম্বন্ধে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। দেশের কোটি কোটি নরনারী অর্দ্ধাশনে দীনাতিদীনরূপে কালযাপন করিতেছে। উহাদের মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের, শিক্ষার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করার একান্ত প্রয়োজন আছে। কর্ম্মহীন বেকারের সংখ্যা এদেশে গণিয়া শেষ করা যায় না। ইহাদের জীবিকার উপায় করিতে হইবে। ভারতবর্ষের তথা বঙ্গীয় কৃষকগণের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভূমিকর্ষণ করে, অনাবৃতদেহে শীতাতপ সহ্য করিয়া শস্যোৎপাদন করে, ভোগ করিতে পায় না। এ সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিকভাবে দেশবাসীর সমবেত চেষ্টার দ্বারা সম্ভব। এই সকল সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া মানুষের রুচি, প্রবৃত্তি এবং চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করা হইল কথাসাহিত্যিকের কর্ত্তব্য। অবশ্য সে চেষ্টা যে কোথাও হয় নাই এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু এখনও আধুনিক লেখকলেখিকাবৃন্দের মধ্যে কেহই তেমন করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, যেমন করিয়া অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" নাটক লিখিয়া পারিয়াছিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচার উচ্ছেদসাধনে উহা যে অংশতঃ সহায়তা করিয়াছিল সে কথা সকলেই জানেন। তবে ইহাও বলা প্রয়োজন যে এ যুগে নীলদর্পণের মত নাটক লেখা এবং তাহা প্রকাশ্য

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা অসম্ভব। অনেকটা এই কারণে বর্ত্তমান যুগের সমস্যা সমূহ লইয়া উন্নত ধরণের উপন্যাস বা নাটকের সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না। মানুষের পঙ্গু মন কোন বৃহত্তর বা মহত্তর সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগী নহে।

আমাদের যে সমস্যা প্রধানতম সেই স্বাধীনতার কথা লইয়াই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সর্ব্বোত্তম সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ, জাতীয় চরিত্রের পূর্ণ পরিণতি, মানবচিত্তের শ্রেষ্ঠ অবদান এইখানেই; কথাসাহিত্যেরও প্রকৃত প্রাণশক্তি এইখানে সন্নিহিত। আমাদের পক্ষে তাহা অস্পৃশ্য। স্রোতোহীন বদ্ধসলিল তড়াগবক্ষ যেমন ধীরে ধীরে পঙ্কিল হইতে থাকে তেমনই করিয়া আমাদের কথাসাহিত্যের নির্ম্মল সলিলও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ক্রমশঃই আবিলতর হইয়া উঠিতেছে। বৈদেশিক কথাসাহিত্য এবং সিনেমা প্রভৃতির সংস্রবে জনসাধারণের রুচি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ ধরণের রচনার চাহিদা বাড়িয়াছে। পাঠকবৃন্দের রুচি অনুযায়ী সম্পাদক এবং প্রকাশকগণ লেখকদিগকে ঐ জাতীয় রচনায় উৎসাহিত করিতেছেন। আমাদের চিরন্তন সমস্যা সমূহের বহির্ভূত পাশ্চাত্য সমাজের গুরুতর সমস্যা সকল আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও কতকটা অভিনব। ঐ সকল বিষয়ের অভিনবত্বে অভিভূত হইয়া আমাদের তরুণ এমন কি প্রবীণ লেখকেরাও সাহিত্যে ঐ জটিল সমস্যাসমূহের ভার নিক্ষেপ করিতেছেন। যতই চমকপ্রদ হোক উহা আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ না করিয়া ভারাক্রান্ত এবং সমাজের আবহাওয়া দূষিত করিতেছে। অর্দ্ধশিক্ষিত তরলমতি জনসাধারণের মধ্যেই লঘু কথাসাহিত্যের প্রসার দেখা যায়। ইংলণ্ডেও আজকাল সমালোচকগণ অভিযোগ করিতেছেন যে, যতদিন হইতে ইংরাজীতে কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন হইতে ইংরাজী সাহিত্যে মৌলিক রচনার শক্তি হ্রাস পাইতেছে। বহু ভাষার মধ্য দিয়া বহু দেশের সহিত সংস্রবে আসার ফলে জাতীয় সাহিত্য একদিকে লাভবান্ হইলেও আর একদিক দিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদি না তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষায় যত্নবান্ হওয়া যায়।

আজকাল মুদ্রাযন্ত্রের সুলভতার প্রসাদে এদেশে মাসিক ও সাপ্তাহিকের কিছুমাত্র অভাব নাই। অবিদ্বান্, কচি ও কাঁচা তরুণ লেখক ও পাঠকের দ্বারা লিখিত ও সমর্থিত রচনার আদর্শ প্রায়শঃ হীনতামূলক হয়। সেজন্য উপযুক্ত সমালোচকের আবশ্যকতা আছে। আমাদের সাহিত্যকে জনসাধারণের সাহিত্য করিতে হইলে এযুগে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্ম বা ঐতিহ্যমূলক রচনাই হোক অথবা সামাজিক জীবনের সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতির কাহিনীই হোক সুধু তাহাতে রাজা বা রাজতুল্যদিগকে লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। লক্ষ্মীমন্তদিগের ঐশ্বর্য্যসম্ভারের বর্ণনায় বা কনকনে টাকার ঘনঘনে আওয়াজে এ যুগের বুভুক্ষিত বেকারদলের পাংশু অধরে আনন্দের স্মিত-হাস্য স্ফুরিত হইবে না। বরং হিংস্র বিদ্বেষবহ্নি স্ফুরিত হইতে পারে। আবার নরনারীর মধ্যের দেবত্বকে মাথায় ধরিতে না শিখাইয়া তাহার হীনতার পূজা করিতে শিক্ষা দিলে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

এই সকল কারণ পরম্পরা এবং সর্ব্বপ্রকার বাধার কথা ভাবিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। পরিমার্জ্জিত রুচি এবং মহত্তম বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যতের কথাশিল্পীদিগকে যাহাতে যথার্থ প্রগতিশীল করে সে জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করা। শিক্ষার সেই মূল নীতি পরিত্যক্ত হইলে সে শিক্ষা কুশিক্ষা ব্যতীত অপর কিছু নয়। যে শিক্ষা শিক্ষিত জনগণকে অগ্রগতির অভিমুখী করিতে সমর্থ তেমন শিক্ষার প্রবর্ত্তন কোন বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট করিয়া থাকেন বলিয়া জানা যায় না। দেশ-বাসীর জ্ঞান বর্দ্ধিত হওয়া এবং বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হওয়া তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী। গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসিয়া না গিয়া এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ করাই হইল আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের কর্ত্তব্য। সাধারণকে যিনি যেটুকু দিতে সমর্থ তাদের অগ্রগমনের অপরিপন্থি-ভাবে দান করিলেই সে দান সার্থক। নিসর্গতঃ নিম্নগামী জীবনকে প্রবৃত্তিমার্গের প্রশস্ত পথপ্রদর্শনে মৈত্রীসাধন করা হয় না। সংসারে দেখি যে পিসিমা মাকে লুকাইয়া রোগা ছেলেকে কুপথ্য যোগান, তিনি মা'র বাড়া হইয়া ওঠেন।

কথাশিল্পী যে সুধু রূপকার তাহা নহেন তিনি কর্ম্মকারও বটেন। রূপসাধনা অরূপের মধ্য দিয়া হয় না, তাই সৌন্দর্য্যের উপাসক নিসর্গের শোভা অথবা দেহীর দেহ-রূপকে কেন্দ্র করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হন। প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্য্যের খণ্ড খণ্ড প্রকাশকে এবং নরনারীর সুসংযত রূপকে তিনি তুলির টানে ফুটাইয়া তুলেন। কথাশিল্পী মানবচিত্তের কদর্য্য নগ্নতার চিত্র সত্যের খাতিরে আঁকিতে হয় আঁকুন, কিন্তু যে মনুষ্যত্বের সহায়তায় মানব জীবশ্রেষ্ঠ হইয়াছে তাহার সেই মহত্বের চিত্রকে তাঁহাকে কেন্দ্র করিতে হইবে। দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতার পরাভব এবং আসুরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা শিল্পীর কর্ত্তব্য নহে। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক অথবা ঐতিহাসিকের তুলনায় জনসাধারণের সম্বন্ধে কথাশিল্পীর দায়িত্ব অনেক অধিক এবং তাঁহার প্রভাবও সমধিক। বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ একাধারে সকলেই কথাসাহিত্যের পাঠক বা অভিনয়দর্শক। শিক্ষিত মন অপেক্ষা অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত কাঁচা মন লইয়াই তাঁদের কারবার। শিল্পীর আনন্দে, শিল্পরচনা ব্যতীত শিল্পোন্নতি করা যায় না। সেই জন্য শিল্পীর চিত্তোন্নতি প্রয়োজন। এই চিত্তোন্নতি দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি হইবে সুদূরপ্রসারিত, হৃদয় হইবে উদার, আশয় হইবে মহৎ এবং উদ্দেশ্য হইবে মানব-কল্যাণ। তবেই তাঁহাকে বলিব সত্যদ্রষ্টা এবং ঋষি। মানুষের জীবনযজ্ঞের তিনিই হইবেন অধ্বর্য্যু, তিনিই হইবেন উদ্গাতা এবং তিনিই হইবেন ঋত্বিক্।

শ্রীঅনুরূপা দেবী

কাব্য-শাখার-সভানেত্রীর অভিভাষণ

কবি ও কাব্য

এই সাহিত্য-সম্মিলন-মণ্ডপে যাঁহারা আমার ভক্তিভাজন, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম জানাইতেছি। তদ্ভিন্ন অন্য সকলেই আমার হৃদয়ের প্রীতি ও স্নেহ গ্রহণ করিবেন।

এখন প্রথম কথা এই যে আমার দিন তো ফুরাইয়াছে, অংশুমালী সূর্য্যদেব তো পশ্চিমাকাশে ডুবিয়া যাইতেছেন, মানসিক শক্তি তো জবাব দিতেছেন, তবে আবার আজি এ "অভিভাষণ" প্রকাশের বিড়ম্বনা কেন?

এই সুবুদ্ধি অথবা দুর্ব্বুদ্ধির কারণ এই যে, আমি বাল্যকাল হইতেই মা বীণাপাণির চরণ-তলে আশ্রয় পাইয়া, ভাগ্যের অনেক নির্য্যাতন, অনেক নিপীড়ন সহিতে পারিয়াছি, সেই করুণাময়ীর অপার্থিব করুণা, আমার অস্থি, মজ্জা, শিরা শোণিতে প্রবহমানা; তাই তাঁহারই নামে, আমার প্রতি প্রীতিস্নেহপূর্ণ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যানুরাগী চন্দননগর-বাসীদিগের শুভানুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য তাঁহাদের স্নেহের, সাদরের এবং অনুগ্রহের আহ্বানে, আমার বর্ত্তমান অবস্থা, উপযোগিতা ভুলিয়া, যোগ্যতা অযোগ্যতা বিবেচনা না করিয়া প্রকৃত পক্ষে "আত্মবিস্মৃত" এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিতেছি,—এই "অভিভাষণ" প্রকাশ করিতেছি—করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, ইহা সুবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি, তাহা সেই পদ্মাসনা মা বীণাপাণিই জানেন।

বিশ্ববিধাতার আশীর্ব্বাদে আমার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। পুরাকাল হইতে এখানে বহু ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ, মুনি ঋষি প্রভৃতি ধর্ম্মবেত্তা, বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ প্রণেতা শাস্ত্রকারগণ, আত্মত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীগণ, জ্যোতির্ব্বিদ্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিদ্বান্ মনীষিগণ, অমৃতময় কাব্য রচয়িতা অমর কবিগণ এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই স্বার্থপরিত্যাগী, সকলেই লোকহিতব্রত—ইহাই তাঁহাদের শিক্ষণীয়, ইহাই তাঁহাদের করণীয় কার্য্য। এই মহামানব সকল আমাদের ভারত মাতার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন! যেমন উচ্চতর সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলে, মানবের চিত্তে একটী আভিজাত্য-গৌরব জন্মিয়া থাকে, পুণ্যভূমে, সুকীর্ত্তিপূর্ণ দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও লোকের মন সেইরূপ গৌরবান্বিত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি দেবি পুণ্যভূমে ভারতমাতঃ! দেবকল্প-মহামানব-গণ-প্রসবিনি! তোমার বক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মের ভাণ্ডার নিহিত; তুমিই রামায়ণকার, মহাভারতকার বাল্মীকি ব্যাসদেবের প্রসূতি। কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি মহা-কবিকুল-জননি! তুমি জগতের মহীয়সী, মহিমময়ী, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।

এই ভারতবর্ষের যে প্রদেশে আমরা জন্মিয়াছি, সে বড়ই রমণীয় প্রদেশ। এই দামোদর, বলেশ্বর, রূপনারায়ণ, ভৈরব প্রভৃতি নদ, গঙ্গা, যমুনা, কপোতাক্ষী, ময়ূরাক্ষী

প্রভৃতি নদী প্রবাহিতা, ফলবান-সুদৃশ্য-পাদপশ্রেণী-পরিশোভিতা, কাননে, আকাশতলে বিহঙ্গ-রাজি-কূজিতা, বিচিত্রবর্ণময়ী কুসুমাভরণ-ভূষিতা, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-বসন্ত-প্রভৃতি-ছয়-ঋতু-মনোহর-লীলায়িতা, সেই "সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গজনীর কথা বলিতেছি। অনেকের ধারণা ছিল—বোধ হয় এখনও কাহারও কাহারও থাকিতে পারে—এখানে জন্মিলে লোকে, জলবায়ু জন্য—প্রাকৃতিক নিয়মে, সাধারণতঃ লোকে রমণী-সুলভ-কুসুমসুকুমার-দেহবিশিষ্ট, অলস, শ্রমবিমুখ, সর্ব্বতোভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এইখানেই রাজা প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, চাঁদ রায়, পীর খাঁজাহান আলী, সেনাপতি মৃণ্ময় (মেনাহাতী) বীর কমল রায়, আশানন্দ ঢেঁকি, লাঠি সড়কীওয়ালা বাঙালি যুগে যুগে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অধিক কি আমাদেরই মধ্যে অনেকের প্রপিতামহ, পিতামহদেব, সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

এ তো গেল শারীর উৎকর্ষ। মানসিক উৎকর্ষও সামান্য নহে। এদেশে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ এবং জ্যোতির্ব্বেত্তাও অনেক আবির্ভূত হইয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয় আলোচনা করিতে আজি ক্ষান্ত রহিলাম।

এই বঙ্গ জননীর কোলে জন্মিয়া, মানসিক শক্তির স্ফুরণে এবং হৃদয়োচ্ছাসের প্রবলতায় অনেকেই কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইয়া মহাকবি এবং সুকবি রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীহর্ষদেব, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ; সুললিত কবিতায় রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা, সুমধুর কবিতায় মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস; শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক দ্বিজ মাধব; এইরূপ বহু পুরাণের অনুবাদক কবিগণ, পুরাতন যুগে বঙ্গভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (ইনি হরপার্ব্বতী মঙ্গল, মঙ্গলমালতী, চন্দ্রবংশোদয়কাব্য, কালীপুরাণ প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করেন), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রভৃতি সুকবিগণ অনেকেই সুললিতকবিত্বপূর্ণ আখ্যানকাব্য এবং সঙ্গীতাবলী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই যুগের শেষ দিকে অনেক বিখ্যাত ও অখ্যাত কবিগণ উপরোক্ত কবি-কুলের পথানুসরণ করিয়া বহুবিধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

ইহার পর যুগে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিওয়ালা রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির কবিত্বে বঙ্গভাষা সম্পদ্-শালিনী হইতে থাকেন।

ইহার পর যুগে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হন। ইহাদের জন্য ভাষা পরিমার্জ্জিত ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ হইতে থাকে।

এই যুগের মধ্য যুগ, বঙ্গ কাব্য, কবিতার অতি শুভ যুগ, অতি গৌরবময় যুগ। বঙ্গ ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। কবিসম্রাট্, বহুভাষাবিদ্ মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া সাহিত্যসেবীদিগকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইহার

শেষ যুগে রাজকৃষ্ণ রায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিতামৃত ঢালিয়া বঙ্গভাষাকে অমৃতময়ী করেন।

এই সকল কবিদিগের কাব্যসমূহ প্রধানতঃ চতুর্ব্বিধ। যথা মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য এবং দৃশ্যকাব্য। প্রথম ত্রিবিধ কাব্য পদ্যময়। দৃশ্য কাব্য অর্থাৎ নাটক ও প্রহসন পদ্য ও গদ্যে বিরচিত।

মধুসূদনের মেঘনাদ বধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রাদি বাঙ্গলা ভাষায় মহাকাব্য বলিয়া খ্যাত। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁহারা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সংস্কৃত মহাকাব্যে এবং বাঙ্গলা মহাকাব্যে বিচার করিবেন না।

এ যুগের মধুসূদনের বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, নবীন-চন্দ্রের অবকাশ রঞ্জিনী, রাজকৃষ্ণ রায়ের অবসর সরোজিনী, ঈশানচন্দ্রের চিত্তমুকুর, কবিবর বিহারীলাল কৃত কাব্যগ্রন্থাবলী এই সকল গীতিকাব্য আখ্যা পাইয়াছে। মধুসূদনের তিলোত্তমা, হেমচন্দ্রের ছায়াময়ী, রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের সুরধুনী কাব্য এই সকল গ্রন্থকে আখ্যানকাব্য বলা যায়। এই যুগে রামনারায়ণ তর্করত্নের নব নাটক, মধুসূদন দত্তের পদ্মাবতী, শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রভৃতি, দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী নাটক, পরবর্ত্তী কালে গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অমৃত-লাল বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু প্রভৃতি কাব্যকারগণের গ্রন্থাবলী দৃশ্যকাব্য (নাটক) নামে অভিহিত; ইহাদের লিখিত প্রহসনও আছে। ইহার পরে কবিশেখর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দৃশ্যকাব্য সকল জনমনোরঞ্জনে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল দৃশ্যকাব্য বঙ্গভাষার পরম গৌরবের জিনিষ।

ইহার পরে পদ্যকাব্য। পূর্ব্বে কাদম্বরী ও বাসবদত্তা ভিন্ন এদেশে কোন পদ্য কাব্য ছিল কি না বলিতে পারি না। ইহার পরে যিনি পদ্যকাব্য প্রণয়ন করেন তিনি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার ভাবোজ্জ্বলা ভাষা আর আবেগময়ী সুন্দর সরলতাপূর্ণ ভাষা; মনোহারিণী কল্পনার জীবন্ত ও সুরুচি সঙ্গত ভাষা বঙ্গ সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। তিনি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কমলাকান্ত, তাঁহার উপন্যাসরাজি, তাঁহার গদ্যগ্রন্থ, তাঁহার উত্তরচরিতাদি সমালোচনা এক একখানি অপূর্ব্ব পদ্যকাব্য। শুনিয়াছি ইংরাজীশিক্ষিত যুবকেরা তখন মাতৃভাষাকে দারুণ অবহেলা করিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাদের মাতৃভাষা আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাসবলী, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর "বঙ্কিমচন্দ্র" তিন খণ্ড, চন্দ্রনাথ বসুর ত্রিধারা, হরিনাথ মজুমদারের বিজয়বসন্ত, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভ্রান্ত প্রেম, এ সবই অপূর্ব্ব গদ্য কাব্য।

ইহার পরে কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ইহার প্রতিভাও সর্ব্বতোমুখী। ইহার আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, দৃশ্যকাব্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি গদ্যকাবং

স্যার হরিশঙ্কর পাল

ইনি প্রদর্শনী-বিভাগের দ্বারোদ্ঘাটন কবিয়াছিলেন।

মুহম্মদ সাহীদুল্লাহ
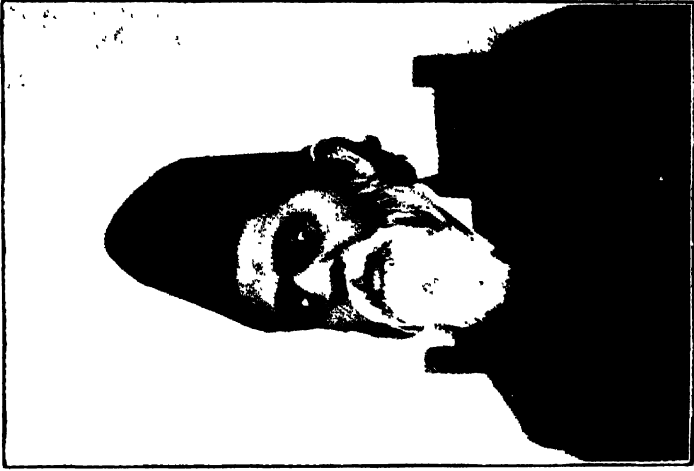
বানান-সমস্যা আলোচনা সভার সভাপতি

শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু

কাব্য-শাখার সভানেত্রী

সমূহ উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া কবিবরকে অমর যশে যশস্বী করিয়াছে। দেশে বিদেশে কবির যশঃসৌরভ-বিস্তার হইয়াছে। "রবি কবি"র প্রতিভামুগ্ধ বহু ব্যক্তি তাঁহারই আদর্শে কবিতা, উপন্যাস ও গল্প লিখিতেছেন; অনেকে তাহাতে কৃতকার্য্য হন, আবার অনেকে হন না। যাহা হউক এই যুগে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়-কুমার বড়াল, চিত্তরঞ্জন দাশ, রজনীকান্ত সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, ললিতচন্দ্র মিত্র, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতি গীতি কাব্য রূপ অমূল্য রত্নরাজিসমূহে, ভাষাভাণ্ডার সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছেন। এ যুগের গদ্যকাব্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাবলী, শ্রীমান হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপন্যাসাবলী, কবিশেখর শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ সোমের মধুস্মৃতি*, সাহিত্যসাম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী এবং সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবীর উপন্যাসাবলী, আরও অনেক মহিলার যথা প্রভাবতী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রভৃতির † উপন্যাসরূপ গদ্যকাব্য; এই সকল গদ্যকাব্য বঙ্গভাষার যে অপূর্ব্ব রত্ন তাহা বোধ হয় দেশের সকলেই জানেন।

উপরুক্ত চতুর্ব্বিধ কাব্য ব্যতীত আর এক কাব্য—ব্যঙ্গকাব্য। হুতোম পেঁচা, টেক-চাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি রসসাগরগণ বঙ্গভাষায় হাস্যরস-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন।

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, আমাদের দেশমাতৃকা কেবল কবিরূপ পুত্ররত্ন জন্যই রত্নগর্ভা বলিয়া জনসমাজে পরিচিতা নহেন। ইঁহার অনেক দুহিতারও অনন্য-সাধারণ কবিত্বশক্তি। বেদ-শ্লোকরচয়িত্রী আর্য্য মহিলাগণ, খেরীগাথারচয়িত্রী বৌদ্ধ-মহিলাগণ ভারতবর্ষে সুপরিচিতা। আমাদের বঙ্গ জননীর কোলেও অনেক সুপ্রসিদ্ধা কবি কন্যা জন্মিয়াছেন। পুরাতন যুগে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রামী রজকিনীর সুমধুর পদাবলী শুনিলে মন মুগ্ধ হয়। কবিবর চণ্ডীদাসের ভীষণ অপমৃত্যুতে রামীর হৃদয় ভাঙিয়া যে কবিতা স্রোতে উচ্ছ্বলিত হইয়াছিল, তাহা শুনিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। ইহার বহুকাল পরে পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকটি মহিলা কবি আবির্ভূতা হন। ইঁহাদের নাম—চন্দ্রাবতী, ইনি রামায়ণের অনেক অংশ, মানসগীতি, গীতিকবিতা প্রভৃতি রচনা করেন।

বিদুষী কবি আনন্দময়ী। ইনি হরিলীলা নামক আখ্যানকাব্য, এবং অনেক গীতি-কবিতা প্রণয়ন করেন। ইঁহার বিদ্যাবত্তার বহু খ্যাতি আছে। ইঁহার স্বামী বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার পত্নীর বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার যশ লোপ করিয়াছিল।

---

* 'মধুস্মৃতি' জীবনী হইলেও ইহা যে একখানি উপাদেয় গদ্যকাব্য, ইহা বোধ হয় উক্ত গ্রন্থের পাঠক পাঠিকা সকলেই স্বীকার করিবেন।

† অনেক গদ্যকাব্য-লেখিকা মহিলাদিগের নামোল্লেখ করিতে বাকী রহিল, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

স্নকবি গঙ্গা দেবী—ইনিও অনেক গীতিকবিতায় কবিত্ব প্রকাশ করেন। কবিতাগুলি মাঙ্গল্য কর্ম্মে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় প্রচলিত।

ইহার পরে—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে স্নকবি দ্বিজতনয়া। ইহার নাম অথবা পরিচয় অপ্রাপ্য। তবে ইহার রচিত দৃশ্যকাব্য উর্ব্বশী নাটক আছে। তাহাতে কবিতা ও গীতি সন্নিবেশিত আছে। *

ইহার পরবর্ত্তী যুগে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর অভ্যুদয়। ইহাকে লোকে কেবল মহিলা কবি বলে না, গৌরবার্থ "কবিসাম্রাজ্ঞী" বলিয়া থাকে। তাঁহার রচিত বহুতর কবিতা, বহুতর সঙ্গীত, বহু আখ্যানকাব্য, উপন্যাসরূপ বহু গদ্যকাব্য, বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে রত্নরূপে রক্ষিত হইতেছে। ইহার পরে মহিলা কবি প্রসন্নময়ী দেবীর নাম উচ্চারিত হয়। ইহার নীহারিকা প্রভৃতি গীতিকাব্য, আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা প্রভৃতি গদ্য কাব্য অতি উপাদেয় বলিয়া খ্যাত। আমরা "বঙ্গের মহিলা কবি" গ্রন্থ হইতে কতকগুলি বঙ্গ মহিলা কবির নাম উল্লিখিত করিলাম। মহিলা কবি স্বর্গীয়া গিরীন্দ্র মোহিনী। ইনি অশ্রুকণা, আভাষ প্রভৃতি গীতিকাব্য লিখিয়া বিশেষরূপে যশস্বিনী হইয়াছেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহার কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আলো ও ছায়া রচয়িত্রী কামিনী রায়। ইনি আলো ও ছায়ার জন্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকটে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আলো ও ছায়া গীতিকাব্য, তিনি আরও ১০।১২ খানি কাব্য লিখিয়াছেন। স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী, স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী, স্বর্গীয়া বিরাজমোহিনী, স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগ, স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসু, বিনয় কুমারী বসু, স্বর্গীয়া সরোজ কুমারী দেবী, শ্রীযুক্তা লজ্জাবতী বসু, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, শ্রীযুক্তা সুরমা সুন্দরী ঘোষ, শ্রীযুক্তা অম্বুজসুন্দরী দাসগুপ্তা, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্তা প্রফুল্লময়ী দেবী, শ্রীযুক্তা অপরাজিতা দেবী, শ্রীযুক্তা উমা দেবী, শ্রীযুক্তা লীলা দেবী, শ্রীযুক্তা মৃণালী সেন, শ্রীযুক্তা লীলাবতী দেবী (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের কন্যা) স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা মুস্তফী, স্বর্গীয়া সুশীলাসুন্দরী সেন, ইত্যাদি ইত্যাদি মহিলা কবিগণ স্বীয় প্রতিভা-জ্যোতিঃতে (সুললিত গীতিকবিতায় সাহিত্যাকাশ আলোকিত করিয়াছেন।) যাঁহারা ইহাদের সবিশেষ পরিচয় চাহেন, তাঁহারা শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বঙ্গের মহিলা কবি" গ্রন্থে জানিতে পারিবেন।

মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। কাব্যের অনুশীলনে কেবল মানব-চিত্তের স্ফূর্ত্তিকারিণী চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির বিকাশ সাধিত হয় না, ইহা মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান সহায়। একথা শুধু আমরা বলিতেছি না, একজন বিজ্ঞ সাহিত্যরথীর কথা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কবিতা স্বভাবতঃই মনুষ্যের হৃদয়হারিণী হয় কেন?—এই প্রশ্নের অনেক প্রকার

* এই সকল মহিলা কবিদিগের কথা আমরা শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্গের মহিলা কবি" গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিলাম।

উত্তর হইতে পারে। সংসারে যাহা দেখিতে পাই না, কবিতার কমনীয় স্নিগ্ধ আলোকে সেই স্পৃহনীয় শোভা নয়নগোচর হয়, এইজন্য কবিতা হৃদয়হারিণী। সর্ব্বত্র যাহা শুনিনা, কবিতার অস্ফুট আলাপে, সময়ে সময়ে সেই পবিত্র মধুর ধ্বনি মনুষ্যের শ্রুতিপথে প্রবেশ করে, এজন্য কবিতা হৃদয়হারিণী। আমরা পৃথিবীর ফুলে ও ফলে কিংবা পৃথিবীর কোন বস্তুতেই যে রসের আস্বাদ পাই না, কবিতায় কদাচিৎ সেই অনির্ব্বচনীয় রসাস্বাদে কৃতার্থ হই, এইজন্য কবিতা হৃদয়হারিণী। কিন্তু এই সমস্ত উত্তরের উপর সর্ব্বপ্রধান উত্তর এই যে, মাটির মানুষ প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং স্বার্থ ও প্রয়োজনের শাসনে, মহত্ত্বের যে উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, কবিতার অপার্থিব মানুষ সেই দুর্নিরীক্ষ্য দুরারোহ উচ্চতায় অবলীলাক্রমে উত্থিত হইয়া মনুষ্যের কলুষপঙ্কিল কল্পনাকে যেন কি এক অলৌকিক শক্তির সহিত ক্রমশঃই সেই ঊর্দ্ধলোকে আকর্ষণ কিংবা আহ্বান করে মনুষ্যকে—ক্ষণকালের জন্য হইলেও—ক্ষুদ্রতা ও নীচতার নিম্নভূমি হইতে সবলে তুলিয়া লইয়া, মহত্ত্বের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আলেখ্য দেখাইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহিত করিয়া রাখে, এইজন্যই কবিতা মনুষ্যের হৃদয়গ্রাহিণী। পৃথিবীতে যে কয়খানি কাব্য আছে, মহত্ত্বই তাহার মূলমন্ত্র। যে কাব্য এই মন্ত্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, অধঃপাতের আপাতমধুর সঙ্গীত শুনাইয়া, মনুষ্যের মন ভুলাইতে যত্ন পাইয়াছে, তাদৃশ বিকট বস্তুকে কাব্য বলা শব্দ শাস্ত্রের বিড়ম্বনা।" *

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি জ্ঞান নহে। কিন্তু নীতি জ্ঞানের যে উদ্দেশ্যে, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য; কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন।" কাব্যানুশীলন এই কারণে মনুষ্যত্ব লাভের সহায়, তবে কুসংসর্গের ন্যায় কুসাহিত্য, কুকাব্য যে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য একথা সকল মনীষিগণই বলিয়াছেন।

আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাকারী, সেই প্রথিতযশাঃ, সাহিত্য-জগতের সেই মহারথিগণের প্রাণপণ আয়াসে আমাদের সাহিত্য আজি উন্নতি শেখরে অধিরোহণ করিয়াছে। তাঁহারা আজি স্বর্গবাসে থাকিয়া এই কৃতকার্য্যতার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন কি না কে বলিবে? আমাদের কত আনন্দের, কত গৌরবের কথা, আমাদের বঙ্গভাষাকে জষ্টিস্ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জষ্টিস্ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত করিতেছিলেন। আশা ফলবতী না হইতেই কালের আহ্বানে অকালে চলিয়া গেলেন! কিন্তু স্যর আশুতোষের সুযোগ্য পুত্ররত্ন, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতৃদেবের অসমাপ্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে একান্ত চেষ্টা করিতেছেন। দয়াময় জগদীশ্বর তাঁহাকে চিরজীবী এবং সম্যক্ প্রকারে জয়যুক্ত করুন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রার্থনা করি।

আমাদের আজিকার প্রার্থনা—মা বঙ্গ-ভারতী আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল বিধান করুন। এই সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতা চন্দননগরবাসী ও

---

* প্রভাত চিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

প্রবাসীদিগকে আমার অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করিলাম। অনেক বলিবার কথা বলা হইল না, যাহা বলিলাম তাহাতেও অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল, সকলে অনুগ্রহ করিয়াই আমাকে ক্ষমা করিবেন।

বিদায় কালে বঙ্গ কবির সহিত বলি—

"বাঙ্‌লা দেশে জন্মিয়াছি বাঙ্গালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোণার বাঙ্‌লা তাঁকেই প্রণাম করি"

শ্রীমানকুমারী বসু

সাংবাদিকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

আমাকে যে বিষয়ে বলবার ভার দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টী সম্বন্ধে আমি এই রকম সভায় ও আরও অনেক সভায় অনেকবার বলেছি। সুতরাং এই বিষয়ে আমার বক্তব্য কতকটা একঘেয়ে হয়ে এসেছে। আর যাঁরা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার বক্তৃতা শুনেছেন তাঁদের আরও একঘেয়ে লাগবে।

বিলাতে ফ্লেচার নামে একজন (নাট্যকার নন) একবার বলেছিলেন যে, কোন দেশের গাথা যদি তাঁকে রচনা করতে দেওয়া হয়, তবে সেই দেশের আইন কে করে তা তিনি গ্রাহ্য করেন না। আমেরিকার ওয়েণ্ডেল ফিলিপস খবরের কাগজ সম্বন্ধেও এই কথা বলেছিলেন। অবশ্য সংবাদপত্রের একটা উচ্চ আদর্শ প্রাণে রেখেই তিনি এই কথা বলেছিলেন। যদি আমরা সেই আদর্শ সম্মুখে রেখে সংবাদপত্র চালাতে পারি তবে সমাজ ও জাতির উপর এমন একটি প্রভাব আনতে পারি যার ক্ষমতা আইনের চেয়ে কিছু কম নয়।

খবরের কাগজ চালাতে গেলে আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে অনুমতি নিতে হয়। কারণ সংবাদপত্র দেশের মধ্যে এমন চিন্তা এমন ভাবধারা বিস্তার করতে পারে যাতে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা উল্‌টে যেতে পারে। অবশ্য সব দেশে এ নিয়ম নেই ; কারণ সেই সব দেশের লোকদের ক্ষমতা রাষ্ট্রের উপর ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই যে ম্যাজিষ্ট্রের কাছে অনুমতি লওয়ার ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থায় তাঁরা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন যে সংবাদ-পত্রের ক্ষমতা খুব বেশী এবং এজন্য তাঁরা আগে থাকতে সাবধান হতে চান।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সাংবাদিকেরা সাহিত্যিকের পর্য্যায়ে পড়েন কি না। এখানকার উদ্যোক্তাগণ চিকিৎসা সাহিত্য, বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রভৃতির ন্যায় সাংবাদিক-সাহিত্য নামে একটী শাখা করেছেন। অবশ্য সংবাদপত্রে সুবিখ্যাত লেখকের লেখা অনেক বেরোয় এবং আমরাই তা দেশকে দিই। সেই লেখাগুলি যে সাহিত্য সে কথা স্বীকার করতেই হবে। সেজন্য যদিও আমরা সংবাদপত্র চালাই এবং ঠিক সাহিত্যিক নই, তথাপি এই গুণের জন্য আমরা সাহিত্যিকের গণ্ডীর মধ্যে আসতেও পারি।

আমাদের একটী গুণ আছে, সেটা এই যে, যে কোন তত্ত্ব, তথ্য, মতবাদ, সংবাদ আমরা সোজা করে লিখতে পারি, অন্ততঃ চেষ্টা করি, যাতে সাধারণ পাঠক বুঝতে পারে। তাতে আমাদের অনেক সময় একটু বাধা অতিক্রম করতে হয়। বাধা এই যে, পরিষ্কার করে একটী কথা বললেই অনেক সময় আইনের কবলে পড়তে হয়, সেজন্য মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখতে হয়।

তারপর আর একটি কারণে আমরা সাহিত্যিক পদবাচ্য হতে পারি ; আমরা অনেক সময় অনেক নূতন শব্দ সাহিত্যিকদের জন্য রচনা করে দিই। হয়ত বিলাতী টেলিগ্রামে হঠাৎ একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের কিম্বা আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয় নূতন রকম কিছু আলোচনা বা পরিস্থিতির সংবাদ এসেছে। তার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নাই। আমাদের তখনি তার একটী বাঙ্গলা শব্দ রচনা করে কাগজে ছাপাতে হয়। সেই শব্দ হয়ত অনেক সময় বদলাতে হয় কিন্তু অনেক সময় টিকেও যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে, সংবাদ জিনিষটা কি ? পৃথিবীর অনেক ছোট বড় ভাল খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। কারণ, অসাধারণ, অদ্ভুত, মন্দ যেগুলি সেইগুলিই সংবাদ! ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে If a dog bites a man, it is no news, but if a man bites a dog it is news ! এই ব্যঙ্গোক্তি বাহিরের ঘটনা সম্বন্ধে। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। তা হচ্ছে অন্তরের ঘটনা। মনে করুন যদি দর্শন শাস্ত্রের কোন নূতন চিন্তাধারা অথবা কোন ঐতিহাসিক আবিষ্কার, বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব, শিল্পের কোন নূতন পরিকল্পনা বা রীতি বাহির হয় তবে এগুলিও ঘটনা এবং মূলতঃ মানুষের মনের ঘটনা। এগুলিকে পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করা আবশ্যক।

সাংবাদিক হতে হলে মানুষের কি কি যোগ্যতা অর্জ্জন করা দরকার? এজন্য তাঁদের অনেক কিছু শিখতে হবে। অবশ্য আমরা যে এই সমস্ত শিখে তারপর কাগজ চালাচ্ছি তা নয়—তবে শিখে কাগজ চালালে আমরা যে ভাবে চালাচ্ছি তার চেয়ে উন্নতভাবে তাঁরা চালাতে পারেন। এজন্য কিছু কিছু আইন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এবং তার সঙ্গে সংখ্যা-তত্ত্ব ও সাংখ্যিক তথ্য (statistics) সম্বন্ধে জ্ঞানও থাকা দরকার। এগুলি একটু নীরস জিনিষ : অনেকে এ সমস্ত লিখবার চেষ্টা করেন না কিন্তু দক্ষ সংবাদপত্রসেবী হতে গেলে এগুলো জানা বিশেষ দরকার। তারপর শাসন কার্য্যের সমালোচনা আমাদের অনেক সময় করতে হয় এবং এও একটা বিদ্যা, যা সহজে লব্ধ হয় না। শ্রমিক ঘটিত সব ব্যাপার, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান জানা আবশ্যক। অবশ্য একথা আমি বলি না যে সাংবাদিক সকল বিদ্যাই জানিবেন। মোটামুটী ভাবে সবের কিছু কিছু জানলেই হবে। আমাদের দেশের অনেক বড় বড় কাগজওয়ালা ভুলে যান যে, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ দক্ষ সহকারী রাখা আবশ্যক। ইতিহাস ভাল করে জানা দরকার—বিশেষ করে আমাদের দেশে। তার কারণ জাতীয় অবসাদ ও নৈরাশ্য থেকে জাতিকে বাঁচাবার ইতিহাসের চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় আর নেই। আমরা যদি কোন দিন অবসাদ বা নৈরাশ্যে পড়ি তাহা হইলে অন্যান্য দেশের এবং জাতির পতন উত্থানের ইতিহাস আমাদের দেশকে উদ্বুদ্ধ করবে। তারপর সমালোচনার জন্য সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়েও কিছু কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। সংবাদপত্র হচ্ছে সকলের সেবক। সংবাদপত্রের সাহায্য ভিন্ন কারো

চলতে পারে না। মোট কথা এমন কোন বিদ্যা নাই, যা শিখলে সংবাদপত্রসেবীর কোন কাজে না লাগতে পারে। আর সর্ব্বোপরি জানা দরকার সেই বিদ্যা—যাতে বিমুক্তি হয়। এই বিমুক্তিটা বাহ্য ও আভ্যন্তর সবভাবেই গ্রহণ করতে হবে। আমরা যাতে এই মুক্তির সহায়ক হ'তে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে।

বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী যাঁরা হতে চান তাঁদের নীচু থেকে কাজ করতে হবে। তাঁদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর হওয়া চাই, প্রমাণপুস্তকাবলী (Reference Book) ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার এবং ফটোগ্রাফী শিক্ষা করাও আবশ্যক। তাঁদের খুব শ্রমশীল হতে হবে—গাধার খাটুনী খাটতে হবে। তারপর সত্যবাদী নিরপেক্ষ হওয়া তাঁদের উচিত এবং নেশার বশীভূত হওয়া উচিত নয়। ধর্ম্মবিষয়ে ঔদার্য্য, পরমতসহিষ্ণুতা এবং অন্য মতের প্রতি শ্রদ্ধা—এ গুণগুলিও বিশেষ করে দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক বিদ্যাশিক্ষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আমার কথা এই যে, এ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত কারণ জীবনে কেহ সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বন করুন বা নাই করুন এই বিদ্যা শিখিলে মন বড় হয়, বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় এবং মানুষ নানাবিধ জ্ঞানের অধিকারী হয়। তারপর একটা কথা উঠেছিল যে, এমনিতে সংবাদিকেরা খেতে পায় না, তার উপর আবার এই বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা হলে বেকার সমস্যা বেড়ে যাবে মাত্র। এ বিষয়ে আমার কথা এই যে, বিজ্ঞান যাঁরা পড়েন, বা আইন যাঁরা পড়েন তাঁরা সব সময় বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারজীবী হন না। আর বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে যদি ভয় করেন, তবে উচ্চশিক্ষা সঙ্কুচিত করে ফেলবার বা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা ক'রলেই হয়।

শিক্ষিত সাংবাদিক তৈরী করা যেমন আবশ্যক, তেমনি দরকার খবরের কাগজের বাজার তৈরী করা অর্থাৎ পাঠকদের সংখ্যা বাড়ানো। এই জন্য দেশের সমস্ত নরনারীকে লিখনপঠনক্ষম করতে হবে। যদি পাঠকসংখ্যা বাড়ে তবে কাগজের চাহিদা আপনা থেকেই বাড়বে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, ভারতের মধ্যে বাংলা একখানি কাগজের কাটতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—দৈনিক ৫৬ হাজার। কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় এটা অতি সামান্য। জাপানের একটা কাগজের কাটতি দৈনিক ৩০ লক্ষ।

আমার শেষ কথা এই যে, আমরা যদি বড়জাতি হই তবে বড় সাংবাদিক হতে পারবো। ছোট জাতি, ছোট মন, ছোট বুদ্ধি নিয়ে আমাদের বড় কিছু করার সাধ্য থাকতে পারে না।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

বর্ত্তমান সভ্যতায় জৈব-রসায়নের দান

বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি পদে বরণ করিয়া আপনারা আমাকে যে গৌরবান্বিত করিয়াছেন সেজন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। জননী বঙ্গভাষার দীন সাধক বলিয়া গৌরব করিতে পারি এমন কিছুই আমি করি নাই। তবে মনে হয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-পরিভাষা সম্বন্ধে সামান্য যাহা কিছু আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে তাহার জন্যই আপনারা আমার সম্বন্ধে এইটুকু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন। আমার দোষ ত্রুটিও আপনারা একটু স্নেহের চোখে দেখিবেন এইটুকুই আমার ভরসা।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—"বর্ত্তমান সভ্যতায় জৈব রসায়নের দান"।

রসায়নের যে শাখা জৈব রসায়ন নামে খ্যাত উহা অপেক্ষাকৃত নূতন। শত বর্ষের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গাছপালা, জীব জন্তুর দেহ প্রভৃতিতে অম্ল, শর্করা, উপক্ষার ইত্যাদি নানা জাতীয় যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে উহারা জীবনী শক্তির (Vital force) ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। কোন কৃত্রিম উপায়ে উহারা প্রস্তুত হইতে পারে না। এবং এই কারণেই রসায়নের যে শাখায় এই সমস্ত বস্তুর বিষয় আলোচিত হইত তাহার নাম জৈব রসায়ন দেওয়া হইয়াছিল।

১৮২৮ সালে জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক ভোয়েলার (Woehler) কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া (Urea) নামক একটি অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগিক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। ইউরিয়া মূত্রের একটি প্রধান উপাদান এবং এই পরীক্ষা হইতেই প্রথম প্রমাণিত হয় যে জীবনীশক্তি ব্যতিরেকেও তথাকথিত "জৈব" পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার পর ১০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে। বৃক্ষে, পত্রে, ফুলে, ফলে, জীবজন্তুর দেহে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহার সমস্তই যদিও এখন পর্য্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে রসশালায় প্রস্তুত হয় নাই তথাপি ঐ সকল পদার্থ যে এই ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে সে সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

জীবদেহে ও তরু-গুল্মাদিতে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে তাহার অধিকাংশই অঙ্গার-যৌগিক। একদিকে যেমন অঙ্গার-যৌগিকগুলির স্বরূপ ও গুণ অপরাপর মৌলিক পদার্থদিগের যৌগিক হইতে অনেক ভিন্ন, অপর দিকে তেমনি অঙ্গার-যৌগিকগুলি সংখ্যায়ও অনেক বেশী। এইজন্য জৈব রসায়ন নামের পুরাতন সার্থকতা না থাকিলেও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবিধার জন্য রসায়নের যে অংশে অঙ্গার-যৌগিকগণের বিষয় আলোচিত হয় উহা জৈব রসায়ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা জৈব রসায়ন অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে ইহা সাধারণতঃ তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্য্যায়ের আলোচ্য বিষয় খনিজ তৈল (Petroleum)

এবং তাহার সহিত যে দাহ্ গ্যাস পাওয়া যায় তাহাদের উপাদান সমূহ এবং এই সকল হইতে নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লব্ধ অথবা উহাদিগের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ অঙ্গার-যৌগিকসমূহ। খনিজতৈল বা গ্যাস উভয়েই অঙ্গার ও হাইড্রোজেন এই দুইটি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে রাসায়নিক সংযোগের ফলে উৎপন্ন "মুক্ত শৃঙ্খল" যৌগিকগণের (Open-chain compounds) মিশ্রণ মাত্র।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আলোচ্য বিষয় পাথুরে কয়লা হইতে অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation) ফলে উদ্ভূত আলকাতরা হইতে আংশিক পাতন (Fractional distillation) দ্বারা লব্ধ হাইড্রোজেন ও অঙ্গারের "বলয়" যৌগিক (Ring compounds) সমূহ এবং উহাদিগ হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লব্ধ অঙ্গারযৌগিক পদার্থ-সমূহ। বস্তুতঃ জৈব রসায়ন বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার অধিকাংশই এই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলা যাইতে পারে যে জৈব রসায়নের মূলে প্রধানতঃ যে দুইটি বস্তু অর্থাৎ খনিজ তৈল (ও গ্যাস) এবং পাথুরে কয়লা, আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার মূলেও প্রধানতঃ সেই দুইটি বস্তু।

মানুষ খাদ্য, পরিধান ও আশ্রয় স্থান ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। কোন সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা থাকে যে এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহ করিতেই সমাজভুক্ত প্রত্যেকের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয় তখন সেই সমাজ সভ্যতার নিম্নতম স্তরে অবস্থান করে। ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে অনেক সমাজ যে গুলি বর্ত্তমানকালে সুসভ্য বলিয়া পরিচিত তাহারা এক সময়ে এই অবস্থায় ছিল। পরে কৃষিকর্ম্মের দ্বারাই হউক বা ব্যবসায়বাণিজ্যের দ্বারাই হউক বা ভূগর্ভস্থ খনিজাদি উত্তোলন এবং উহা হইতে প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহ নিষ্কাসন দ্বারাই হউক সমাজের মধ্যে ধন বৃদ্ধির ফলে এমন একটি শ্রেণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল যাহাদের যথেষ্ট অবসর ছিল। এই শ্রেণীর দ্বারাই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ললিতকলা ইত্যাদি আলোচিত ও পুষ্ট হওয়াতে তাহারা যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই সমাজ সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে।

সভ্যতার উন্নতি এবং বিস্তারের জন্য যে কতকগুলি লোকের অবসরের প্রয়োজন ইহা অবিসম্বাদি সত্য। সমাজের মধ্যে অবসরসৃষ্টি অনেক প্রকারে হইয়া থাকে। আদিম মানব যখন প্রথমে প্রস্তর এবং পরে ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে শিখিল তখন হইতেই তাহার অবসরকাল অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আমরা অনেক স্থলেই প্রাচীন সভ্যতার মূলে দাসত্বপ্রথা দেখিতে পাই। গ্রীসীয় অর্ণবপোতবিশেষে দাঁড় টানিবার জন্য ন্যূনাধিক ১৭০ জন ক্রীতদাসের প্রয়োজন হইত। এথেন্স যে সময় সভ্যতার উচ্চতম শীর্ষে অবস্থিত তখন সেখানে ১ লক্ষ স্বাধীন অধিবাসী ও ৪ লক্ষ ক্রীতদাসের বাস ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে বহুলোককে বাধ্যতামূলক কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক শিল্প, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা করিবার অবসর পাইত।

সুখের বিষয় এখন আর সে দিন নাই। পাথুরে কয়লা এবং খনিজ তৈল আমাদের দাসের কাজ করিতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে জাহাজবিশেষ চালাইবার জন্য খনিজ-তৈল-সাহায্যে যে শক্তির উদ্ভব করা হয় তাহা দুই লক্ষ দাসের শক্তির সমান। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সভ্যতার মূলে যে এই দুইটি বস্তু তাহা বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না। একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাও বেশ বোঝা যায় যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে যুদ্ধ কলহ ও বিবাদ বিসম্বাদ তাহার মূলে অনেক স্থলেই সভ্যতার এই দুইটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আয়ত্ত করিবার প্রচেষ্টা।

সুতরাং দেখা গেল যে বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে জৈব রসায়নের পরোক্ষভাবেও যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে জৈব রসায়ন, বিশেষতঃ ব্যবহারিক জৈব রসায়ন আমাদের বাস্তবিক জীবনে কি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মানুষ খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান অধিবাসিগণের যথোপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ এখন চিন্তাশীল মনীষিগণের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশই মাটি হইতে পাইয়া থাকি, কারণ ইহাতেই ফলশস্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমস্ত জীবজন্তুর আহার্য্য যোগাইয়া থাকে। সুতরাং আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ বাড়াইতে হইলে আমাদিগকে হয় ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে অথবা সম্ভব হইলে কৃত্রিম উপায়ে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বৃক্ষপত্রাদির উপাদান—মূলতঃ অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন এই চারিটি। ইহার মধ্যে প্রথম উপাদান ইহারা বায়ুর অঙ্গারাম্ল হইতে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাদান মাটির জলীয় ভাগ হইতে গ্রহণ করে। চতুর্থ উপাদান অর্থাৎ নাইট্রোজেন বায়ুতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলেও গাছপালা প্রভৃতি ইহা সাধারণতঃ বায়ু হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। ভূমি হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন-যৌগিক পদার্থসমূহ সারভাবে ব্যবহার করিতে হয়। কৃত্রিম সারের অধিকাংশই অজৈব রসায়নের বিষয়ীভূত—তবে ক্যালসিয়ম স্যায়ানামাইড (Calcium Cyanamide) নামক একটি অঙ্গারযৌগিক কৃত্রিম সার প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রসশালায় কৃত্রিম উপায়ে যে সমস্ত অঙ্গার-যৌগিক প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যও আছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষাশর্করা যাহা রোগীর পথ্যহিসাবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয় তাহা অনেক স্থলে এখন আর দ্রাক্ষা রস হইতে প্রস্তুত হয় না; শ্বেতসার হইতে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাক্কেরিন নামক যে অঙ্গার-যৌগিক এখন সিরাপ, সরবত, লেমনেড ইত্যাদির জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, উহা ঠিক খাদ্যদ্রব্য না হইলেও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তৈল, বসা প্রভৃতি হইতে যে মার্গারিন নামক কৃত্রিম মাখন প্রস্তুত হয় উহা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে দুগ্ধ হইতে উদ্ভূত

মাখনের তুল্যমূল্য না হইলেও ইহা যে একটি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নানাবিধ তৈলে কৃত্রিম উপায়ে হাইড্রোজেন যুক্ত করিয়া যে "ভেজিটেবল" ঘৃত এখন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে উহাও খাদ্যহিসাবে ঘৃত হইতে অনেকাংশে অপকৃষ্ট হইলেও ঘৃতের অভাব কিয়ৎপরিমাণে মোচন করিতেছে।

সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে উহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব বাড়িয়া যায়। মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়ে। নূতন নূতন অভাব মোচন করিবার জন্য তাহাকে পদে পদে শিল্প ও বিজ্ঞান, আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাহায্য লইতে হয়।

সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বস্তুর দিকে মানুষের দৃষ্টি স্বভাবতঃ প্রথমেই আকৃষ্ট হয় রঞ্জক পদার্থসমূহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এবং এই ক্ষেত্রেই জৈব রসায়নের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রথমেই উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে যে সমস্ত রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হইত তাহার অধিকাংশই উদ্ভিজ্জগৎ বা প্রাণিজগৎ হইতে পাওয়া যাইত। নীলের গাছ হইতে নীল রং, মঞ্জিষ্ঠা হইতে লাল রং, লাক্ষা-কীটের ক্রিয়ায় উৎপন্ন লাক্ষা হইতে তথা কোচিনিয়াল নামক মেক্সিকো-দেশীয় এক প্রকার কীটের শুষ্কদেহ হইতে অলক্ত বর্ণ এবং হরিদ্রা হইতে হরিদ্রাবর্ণ প্রস্তুত হইত।

১৮৫৬ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত জৈব-রাসায়নিক উইলিয়ম হেনরী পার্কিন (William Henry Perkin) কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে যে সমস্ত পরীক্ষা করেন তাহারই অন্যতমের ফলে অ্যানিলিন মভ (Aniline mauve) নামক বেগুনি কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত হয় এবং ইহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে বর্ণক পদার্থ প্রস্তুত করা বিষয়ে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৮৫৯ সালে ফরাসী রাসায়নিক ভেয়ারক্যাঁ (Verquin) ম্যাজেন্টা রং আবিষ্কার করেন। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসরই নূতন নূতন বিচিত্র কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত ও জনসমাজে প্রচারিত হইতে থাকে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জৈব রসায়নের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর গ্রোবে ও লিবেরমান (Graebe and Liebermann) নামক জর্মান রাসায়নিকদ্বয় কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন (Alizarine) নামক মঞ্জিষ্ঠার বর্ণক পদার্থ প্রস্তুত করেন। মঞ্জিষ্ঠা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্ণক পদার্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। রোমক বৈজ্ঞানিক প্লিনির গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। মঞ্জিষ্ঠাজাতীয় উদ্ভিদের চাষ কেবল ভারতবর্ষে নহে, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইটালী ও তুরস্ক দেশেও যথেষ্ট হইত। কিন্তু রসশালায় কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন প্রস্তুত হওয়ার ফলে এই ব্যবসায়শাখায় প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব আসিয়া পড়ে এবং ফলে মঞ্জিষ্ঠাজাতীয় উদ্ভিদের আবাদ একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন প্রস্তুত করিতে হইলে আলকাতরা হইতে উদ্ভূত অ্যানথ্রাসিন নামক অঙ্গার-যৌগিকের প্রয়োজন হয়। আমরা পরে দেখিব যে আলকাতরা

যে পাথুরে কয়লা হইতে পাওয়া যায় তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহারা জৈবরসায়নবিদ্‌গণের সাহায্যে বর্তমানকালের উদ্ভিদ্‌বিশেষকে স্থান-ভ্রষ্ট করিয়াছে ইহা বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না।

মঞ্জিষ্ঠার বর্ণক পদার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম নীলের সম্বন্ধেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। ১৮৭৮ সালে জর্মান বৈজ্ঞানিক বায়ার (Baeyer) কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা নীলের বর্ণক পদার্থ প্রথম প্রস্তুত করেন। পরে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী পরীক্ষা ও বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ের পর নীল কৃত্রিম উপায়ে রসশালায় সংশ্লেষণ করিবার এমন একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় যে কৃত্রিম নীল স্বভাবজাত নীলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় এবং বলা বাহুল্য এই অসম প্রতিযোগিতায় স্বভাবজাত নীল অচিরাৎ পরাস্ত হইয়া যায়।

প্রাচীনকালে মিউরেক্স ব্র্যাণ্ডারিস্ (Murex brandaris) নামক একপ্রকার শম্বুক হইতে Tyrian purple নামক এক প্রকার নীলাভ লোহিত বর্ণের রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত হইত। অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ার জন্য কেবল রাজা ও সম্রাড্‌গণের পরিচ্ছদরঞ্জনে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারিত। ১৯০৯ সালে জর্মান জৈব-রাসায়নিক ফ্রিডলেণ্ডার (Friedlaender) ১২০০০ শম্বুকের দেহ হইতে পরীক্ষোপযোগী রঙ প্রস্তুত করতঃ প্রথমে বিশ্লেষণ এবং পরে কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত করেন যে এই বর্ণক ও নীলের বর্ণক পদার্থ মূলতঃ একই বস্তু। প্রভেদের মধ্যে নীলে যে হাইড্রোজেন থাকে তাহার কিয়দংশের স্থান প্রথমোক্তটিতে ব্রোমিন নামক মৌলিক পদার্থ দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে।

বর্ণক পদার্থসমূহ প্রস্তুত করা বিষয়ে জৈব রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টা আশাতিরিক্ত সাফল্যে মণ্ডিত হওয়ায় বহু মেধাবী ছাত্র জৈব রসায়ন অধ্যয়ন ও গবেষণায় আকৃষ্ট হন। ফলে শুধু বর্ণক পদার্থ নহে অন্যান্য নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী অঙ্গার যৌগিক রসশালায় সংশ্লেষিত হয়।

সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বর্ণক বা রঞ্জক পদার্থের ন্যায় নানাজাতীয় গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি মশলার গ্রাহকতা বা চাহিদা বাড়িতে থাকে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ গন্ধদ্রব্যের মূল্য স্বভাবতঃ একটু বেশী হওয়ায় উহাদের বহুল ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রেও জৈব-রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় বিশেষ ফলযুক্ত হইয়াছে। কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি মশলা প্রভৃতির উপাদান (Principle) অনেক স্থলেই রসশালায় প্রস্তুত হইয়া জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের বস্তু হইয়াছে।

জৈব-রাসায়নিকগণ স্বভাবজাত অঙ্গারযৌগিকসমূহ প্রথমে বিশ্লেষণ এবং পরে সেগুলি সংশ্লেষণ করিয়া উহাদের পরমাণবিক বিন্যাস বা অভ্যন্তরীণ গঠনের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। উহারা দেখিয়াছেন যে পরমাণুগণের বিন্যাসভেদে অঙ্গারযৌগিক সকলের গুণেরও অনেক তারতম্য হইয়া থাকে। কোন পদার্থ বর্ণক হইয়া থাকে, কোন পদার্থ বা গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পদার্থবিশেষ আবার জীবদেহের উপর নানাপ্রকার ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে অর্থাৎ সেইগুলি ঔষধরূপে ব্যবহার করা চলে।

জৈব রসায়নের শেষোক্ত অঙ্গ এখন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। আপনারা অনেকেই জানেন যে কোকেইন নামক উপক্ষার (Alkaloid) যাহা অল্পকালস্থায়ী অসাড়তা উৎপাদন করিবার জন্য চিকিৎসকগণ যথেষ্ট ব্যবহার করেন, দক্ষিণ-আমেরিকাজাত এরিথ্রোক্সাইলন কোকা (Erythroxylon coca) নামক বৃক্ষের পত্র হইতে পাওয়া যায়। রাসায়নিকগণ বিশ্লেষণ এবং পরে সংশ্লেষণ দ্বারা ইহার পরমাণু-বিন্যাস বা অভ্যন্তরীণ গঠন সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। পরে কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা বিটা ইয়ুকেইন (B Eucain) নামক এমন একটি অঙ্গার-যৌগিক প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার পরমাণুবিন্যাস কোকেইনের মত জটিল না হইলেও অনেকাংশে ইহার অনুরূপ এবং যাহা সহজেই প্রস্তুত করা যায়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সামরিক অস্ত্রচিকিৎসাগারগুলিতে এই যৌগিকটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ ইহার ক্রিয়া কোকেইনের অনুরূপ।

কোকেইন এবং বিটা ইয়ুকেইন সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা কুইনাইন এবং ইহার পরিবর্তে এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত অ্যাটেব্রিন (Atebrin) এবং প্ল্যাস্‌মোকিন (Plasmochin) সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। জীবদেহে ম্যালেরিয়া-উৎপাদনকারী জীবাণু নষ্ট করিতে ইহাদের শক্তি কুইনাইন হইতে কোন অংশে অল্প নহে।

এইরূপে ধীরে ধীরে আপনার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার করিয়া জৈব রসায়ন সভ্য মানবের নানাপ্রকার নূতন নূতন অভাব দূর করিবার এবং সভ্যজগতের দ্বারা উপস্থাপিত নানাপ্রকার প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে। জীবতত্ত্বের দুরূহ তথ্যগুলি এখন অনেকাংশেই তাহার আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। ভিটামিন (Vitamine) বা খাদ্যপ্রাণ, হরমোন (Hormone) বা জীবগ্রন্থির অন্তঃরসের সক্রিয় পদার্থ প্রভৃতির স্বরূপ কি তাহা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে জৈব-রাসায়নিকগণ এখন বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এই সমস্ত পদার্থের পরমাণুবিন্যাসসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে উচ্চাঙ্গের জৈব রসায়নের প্রয়োজন। আমার সীমাবদ্ধ পরিভাষায় তাহা ব্যক্ত করা সম্ভব হইবে না।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমান সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের যে পরিমাণ অবসরের প্রয়োজন তাহা আমাদের তত দিনই থাকিবে যত দিন পাথুরে কয়লা বা খনিজ তৈল বা উভয়ের দ্বারা আমরা যথোপযুক্ত কার্য্যকরী শক্তি উদ্ভূত করিতে পারিব অর্থাৎ যতদিন আমরা ইহাদের দ্বারা ক্রীতদাসের কাজ করাইয়া লইতে পারিব।

কিন্তু এই দুইটি পদার্থের কোনটিরই ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে অতি প্রাচীনকালে জলাভূমিতে উৎপন্ন গাছপালার অবশিষ্ট রাশীকৃত হইয়া উহার উপর বহুকালব্যাপী তাপ ও চাপের ফলে পাথুরে কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যায় আমরা পাঠ করি যে শক্তির বিনাশ নাই, রূপান্তর মাত্র আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে বায়ুস্থ অঙ্গারাম্ল হইতে অঙ্গারভাগ গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত গাছপালা নিজেদের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল সেইগুলি এখন পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া আমরা তাহাদেরই সাহায্যে তাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি উৎপন্ন

করিয়া রেলগাড়ী, জাহাজ, কল, কারখানা চালাইয়া থাকি। এই সমস্ত শক্তি যে অতি প্রাচীনকালে বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মির শক্তির রূপান্তরমাত্র তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পাথুরে কয়লা যেমন অতি প্রাচীনকালের গাছপালার অবশিষ্ট হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তেমনি বৈজ্ঞানিকগণের মতে খনিজ তৈলও অতি প্রাচীনকালের অ্যালগা, ডায়াটম (Alga, diatom) প্রভৃতি নিম্ন স্তরের উদ্ভিদের অবশিষ্ট হইতে, অংশতঃ সামুদ্রিক মৎস্য ও শম্বুকাদি জীবের অবশিষ্ট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যখন পাথুরে কয়লা বা খনিজ তৈল ব্যবহার করি তখন মাতা বসুন্ধরার দীর্ঘকাল ধরিয়া অতি যত্নে সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া থাকি। এই বিষয়ে যদি আমরা সতর্ক না হই তবে অপব্যয়ী পিতৃ-পিতামহের বংশধরগণের যে দুরবস্থা আমরা আমাদের চোখের সম্মুখে নিত্য দেখিয়া থাকি আমাদের সুদূর ভবিষ্য-দ্বংশীয়গণেরও সেই অবস্থা হওয়া অনিবার্য্য।

এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি অনেক দিন হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছে। উঁহারা এক দিকে যেমন পাথুরে কয়লার তপোৎপাদনী শক্তি যাহাতে সম্যগ্‌রূপে কাজে লাগান যায় তাহার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন অপর-দিকে তেমনি জৈব-রসায়ন বিহিত প্রক্রিয়াবলীর সাহায্যে পাথুরে কয়লায় হাইড্রোজেন যুক্ত করিয়ায় অন্তর্দহন এন্‌জিনে (Internal combustion engine) ব্যবহারোপযোগী তরল অঙ্গারযৌগিকসমূহ প্রস্তুত করিতেছেন। কারণ, পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে সমপরিমাণ ইন্ধন ব্যবহারে বহির্দহন এন্‌জিন অপেক্ষা অন্তর্দহন এন্‌জিনে অনেক অধিক শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে।

আমরা এতক্ষণ জৈবরসায়নের কেবল গঠনের দিক দেখিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু উহার একটা ধ্বংসের দিকও আছে। জৈব-রসায়নসাগর-মন্থনের ফলে শুধু যে অমৃত উঠিয়াছে তাহা নহে গরলও যথেষ্ট উঠিয়াছে। একটা চলিত কথা আছে যে প্রত্যেকেই নিজের মৃত্যুবাণ সঙ্গে লইয়া আসে। মহাকালের সেই শাশ্বত নিয়মের বশেই জৈব-রাসায়নিকগণ রসশালায় নানাজাতীয় বিস্ফোরক পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান-সভ্যতা-ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র,
ন-শাখার সভাপতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস,
চিকিৎসা-শাখার সভাপতি।

চিকিৎসা শাখার সভাপতির অভিভাষণ

নমো বিধাতৃদেবায় সুশ্রুতেভ্যো নমো নমঃ।
মধুসূদনগুপ্তায় স্মিচ্চার্ল্‌সেভ্যো নমো নমঃ॥

যে বিধাতাপুরুষের কৃপায় এই পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু জ্ঞানী গুণীর দর্শনলাভ করিয়াছি, তাঁহার চরণে শত শত প্রণাম। যে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রোগ চিকিৎসা ও নিবারণ প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। যে মধুসূদন গুপ্ত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সামাজিক ভ্রূকুটী অগ্রাহ্য করিয়া নব আয়ুর্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহাকে নমস্কার। যে চার্ল্‌স্‌ দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা বিশেষভাবে ধাত্রীবিদ্যা অধ্যয়নে আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নমস্কার। যে ডেভিড্‌ স্মিৎ এ দেশীয় রোগীদের হিতের জন্য এত বড় অধ্যক্ষ পদত্যাগ করিয়া তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাকে নমস্কার।

"বৃদ্ধা ধাত্রী" এই সাহিত্য-সম্মিলনের বিভাগবিশেষের সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য আহূত হইয়া, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া যে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। দ্বিশঙ্কু দ্বারা মাতৃগর্ভ হইতে সুসন্তান আকর্ষণ করা এবং মানসগর্ভ হইতে সুশ্রাব্য রচনা প্রসূত করা যে এক নয়, এই ভাবনাই কুণ্ঠার প্রধান কারণ। বিশেষ সঙ্কোচের কারণ জনৈক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস রচয়িতার ইঙ্গিত। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন পাঠকেরা আমার "বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজ নামচা" বাদ দিয়া আর সব গল্প পড়েন। চুয়ান্ন বৎসর ধরিয়া বহু ব্যক্তিকে তিক্ত ঔষধ পান করাইয়াছি; কিন্তু "রোগী করয় যেন ঔষধ পান" তদ্রূপ এত বড় সুধীমণ্ডলী আমার নীরস রচনা বাধ্য হইয়া শ্রবণ করিবেন এই কথাটা মনে করিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিলাম, এমন সময়ে স্বয়ং নারায়ণ এবং একাধারে হরি ও হর আমাকে অভয় প্রদান করিলেন। আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাদের স্কন্ধে দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

এখানে আসিবার পক্ষে একটী স্মৃতিও সহায় হইয়াছিল। একষট্টি বৎসর পূর্ব্বে এই চন্দননগরে একটী ঘটনা আমার মনে জাতীয়তা-ভাব-উদ্রেকের কারণ, এই কথাটা ঐ স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। জনৈক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চন্দননগর দিয়া ফিরিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম কতিপয় ফরাসী সৈন্য নাকি ডঙ্কা বাজাইয়া ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। ঘোষণার কারণ কতকগুলি ইংরাজ সৈন্যের উপদ্রব। তাহারা নাকি এক মদের দোকানে উপস্থিত হইয়া মদের বোতল লুণ্ঠন করিতেছিল এবং ফরাসী পুলিশ তাহাদিগকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাইতেছিল। এমন সময় ফরাসী সীমার ওপারে ইংরাজ পুলিশ সংবাদ পাইয়া ইংরাজ সৈন্যকে ছিনাইয়া লইয়া যায়। ফরাসী গবর্ণরের অনুরোধেও সেই সৈন্য সম্বন্ধে ইংরাজ

সরকার কোন বিচার করেন নাই। তাই ফরাসী সরকারের অনুমতি লইয়া এই সমর ঘোষণার অভিনয়। সঙ্গীয় বন্ধুবর হাসিলেন এই মুষ্টিমেয় ফরাশীর বাতুলতার উল্লেখ করিয়া। আমি বলিলাম "বাতুলতাই বল আর যাহাই বল, চারিদিকে পরিবেষ্টিত ইংরাজ ব্যূহের মধ্যে এই মুষ্টিমেয় ফরাশী যে অভিমন্যুর ন্যায় সাহস প্রদর্শন করিতেছে ইহাতে জাতীয়-ভাববিহীন আমাদের কি শিক্ষণীয় কিছু নাই ?"

সম্মিলনের সফলতা

দূরে পশুশক্তিসম্ভূত রক্তারক্তি এবং নিকটে গৃহবিবাদের কোলাহলের মধ্যে মিলন-শক্তি-বৃদ্ধির প্রয়াস অতীব প্রশংসনীয়। এমন সময় ছিল যখন বিবিধ চিকিৎসাপন্থীর মধ্যে পরস্পর মুখ দেখাদেখি ছিল না। নব-আলোক-গর্বিত আলোপন্থী মনে করিতেন আয়ুর্বেদপন্থী জলপ্লাবন-পূর্ব্ব শিলীভূত পদার্থ মাত্র, এবং হোমিওপন্থী অবৈজ্ঞানিক হাতুড়ে বিশেষ। আয়ুর্বেদপন্থী মনে করিতেন আলোপন্থীরা বিদেশীয়-আসুরিকবিদ্যা-সম্পন্ন দেশের শত্রু। কিন্তু পৃথিবী গোল। এক স্থান হইতে দুই ব্যক্তি বিপরীত দিকে চলিয়া সেই একস্থানেই মিলিত হয়। সকলেরই একই উদ্দেশ্য—রোগনাশ; কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ মুখ ফিরাইয়া বিপরীতদিকে চলিতে চলিতে যখন দেখা গেল পরস্পর মুখোমুখি ঠেকাঠেকি হইতেছে, তখন পরস্পরের মনোভাব জানাজানির দরুণ বুঝিতে পারা গেল সকলেরই গন্তব্য স্থান এক, তখন সঙ্ঘের ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতার বোঝা ফেলিয়া দিয়া প্রকৃত জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন বোধ হইল। সেই প্রয়োজনবোধের ফলেই এই সম্মিলন। পথের দু'ধারে শত্রুশিবির। শত্রু-জনপদধ্বংসী দৃশ্য ও অদৃশ্য রোগ। শত্রু জয় করিতে হইলে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। সূক্ষ্মদেহধারী অদৃশ্য শত্রু রোগবীজাণু মেঘনাদের ন্যায় আড়ালে থাকিয়া জনপদ উৎসন্ন করিতেছে। উত্তর-কোশলার দৈববল-সম্পন্ন রামচন্দ্রের ন্যায় আয়ুর্বেদপন্থীকে বিদেশী আসুরিকবলসম্পন্ন বিভীষণ আলোপন্থীর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া মায়াবী শত্রুকে নাশ করিতে হইবে। তাই আজ সর্ব সম্প্রদায়ের একত্র সমাবেশ। পরস্পরের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাউক আলোপন্থী বিভীষণের বিক্রমের কারণ কি ?

প্রতীচ্যে মধ্য বা তামসিক যুগ

বৈদেশিক চিকিৎসা-প্রণালীর আধিপত্যের কারণ একমাত্র রাজপোষকতা নয়, কিন্তু সময়োপযোগী নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। উন্নতি একদিনে হয় নাই। বিদেশী জ্ঞানার্থীকে জ্ঞানপথে চলিতে চলিতে বহুবার হোঁচট খাইয়া উঠিয়া গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। পথে ছিল বহু বাধা পূর্ব সংস্কার, তথাকথিত ধর্ম্ম, ভাষা, বর্বরোচিত যুদ্ধ বিগ্রহ। এই সমুদয় প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামই প্রতীচ্য আয়ুর্বিজ্ঞানের ইতিহাস। বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদের বিশ্বাস ছিল রোগ দৈবাধীন এবং আরোগ্য লাভের

উপায় বিশেষ বিশেষ দেব দেবীর ভজনা। গ্রীক দেবতা এপলো এবং জলদেবী করনিসের পুত্র এস্‌কিউলেপিয়াস্‌ ছিলেন দেববৈদ্য। তাঁহারই ভজনার ফলে যখন যমরাজের প্রজা সংখ্যা হ্রাস হইতেছিল গ্রীক ইন্দ্র ঝিয়াস্‌ বজ্রাঘাতে এস্‌কিউলিপিয়াসের প্রাণ সংহার করেন। দেববৈদ্য হত হইলেও বিশেষ বিশেষ রোগ উপশমের জন্য বিশেষ বিশেষ দেবতার ভজনা হইত। পুরোহিতেরা দৈববাণী হইতে চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা সকল সময় দৈবের উপর নির্ভর করিতেন না। বেবিলনের ধর্ম্মযাজকেরা রোগীকে হাটে লইয়া গিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে পথিকদের মত জিজ্ঞাসা করিতেন। মারিভয়ের সময় দেবতাদের সন্তোষের জন্য ভোজের এবং নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইত।

ধর্ম্মযাজকেরা বিশ্বাস করিতেন অনেক রোগের কারণ ভূত। মার্টিন লুথারেরও এই বিশ্বাস ছিল। সাধু ইগ্‌নেসিয়াকর্ত্তৃক ভূত ছাড়াইবার একটী চিত্র আছে। ভূত ছাড়াইবার নাম ছিল এক্‌সরাসিজ্‌ম্‌। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সুতরাং তাঁহার স্পর্শে রোগ সারে বহুদিন পর্য্যন্ত অনেকের এই বিশ্বাস ছিল। ১৭১২ সালে সামুএল্‌ জন্‌সন্‌ প্রমুখ দুইশত অন্ধকে সেণ্ট্‌জেম্‌স্‌ প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল দৃষ্টিলাভের জন্য রাণী আনের নিকট। কিন্তু রাণীর স্পর্শে দিব্য চক্ষু লাভ না করিয়া তাহারা ভাগ্যদেবীর উপরই দোষারোপ করিল। কতকগুলি রোগের নাম ছিল মরবাস্‌ রিজিয়াস্‌ বা রাজশাসনাধীন রোগ। কিন্তু তাহারাও রাজভয়ের কোন পরিচয় দেয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পাদ্রীদের কুসংস্কারের হ্রাস দেখা যায় নাই। ১৮৫৩ সালে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবকালে এডিনবরার ধর্ম্মযাজকেরা হোম্‌ সেক্রেটারী লর্ড পামার্স্‌টোন্‌কে অনুরোধ করেন একটী ব্যবস্থা করিবার জন্য যাহাতে সমগ্র জাতি একদিন অনশনে হত্যা দিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে ওলাউঠা নাশের জন্য।

তথাকথিত ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে ছিল বিরোধ। পুরোহিতদের ভয়ে গ্যালিলিওকে বলিতে হইয়াছিল:

> Perish all Physical Science
> Rather than one article of Faith be lost"
> "পদার্থ বিজ্ঞান হউক ধ্বংস
> তবু যেন ধর্ম্মবিশ্বাসের একটী সূত্র না হয় লুপ্ত"

রক্তসঞ্চালন-আবিষ্কর্ত্তা হার্ভিকে লোকভয়ে এগার বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার মত গোপন করিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

এই ত গেল সংস্কার ও ধর্ম্মের বাধা বিজ্ঞানের পথে। ভাষাও বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ ছিল। লাটিন ভাষায় অনূদিত গ্রীক চিকিৎসাগ্রন্থ সকলের বোধগম্য ছিল না। আরবের অধিকৃত দেশসমূহে তাহাদের সহজ ও তেজস্বিনী ভাষার প্রভাবে চিকিৎসাগ্রন্থগুলি সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হইয়াছিল। আরবের আলি আব্‌বাস্‌ ইব্‌ন্‌ আইবি সাএবি আল্‌ প্রভৃতি চিকিৎসকের গ্রন্থ লাটিন ভাষায় তরজমা হইবার পর রোমরাজ্যে

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকপাত হয় বটে, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি যখন ইউরোপের দেশে দেশে স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হয়, তখনই চিকিৎসাবিদ্যা বিস্তৃতি লাভ করে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয় দেহতত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তির উপর। কিন্তু মানবদেহ ব্যবচ্ছেদের পক্ষে প্রধান বাধা ধর্ম্মযাজক। সুতরাং ব্যবচ্ছেদের প্রথম আরম্ভ শূকরদেহে। শারীরস্থান গ্রন্থের নাম এই জন্য ছিল "আনাটমিয়া পোর্সাই" বা শূকর দেহতত্ত্ব। শূকরকে মারা হইত গলার ধমনী কাটিয়া এবং শূকরকে পশ্চাতের দুই পা ধরিয়া ঝুলাইয়া। রীতিমত শিক্ষার জন্য শব ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ করেন বলোনা বিদ্যালয়ে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সার্জন্ মণ্ডিনো, দুই একটী প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির শব লইয়া। ব্যবচ্ছেদের জন্য মানব শব ব্যবহারের পক্ষে পাদ্রীরা ছিলেন বিরোধী। এই বিংশ শতাব্দীতেও মেডিকেল স্কুল সমূহে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের শব ব্যবচ্ছেদের জন্য পাওয়া যায় না এই সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতায়। অথচ মুসলমান রাজ্যে টলিমিদের আমলে শব এম্‌বাম্‌মেণ্ট বা রক্ষার জন্য পেট কাটিয়া নাড়ীভুঁড়ী প্রভৃতি বাহির করা হইত এবং মিশরের বৈজ্ঞানিকেরা যথাসাধ্য দেহাংশের বর্ণনা করিতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন কবিরাজ সদস্য নাকি হিন্দুসংস্কার-সমিতির পক্ষে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন শবব্যবচ্ছেদ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ! হা সুশ্রুত! হা পঞ্চমবেদ আয়ুর্ব্বেদ !!

মণ্ডিনোর "আনাটমিয়া মণ্ডিন" পুস্তকের নানা ভাষায় পঁচিশটী সংস্করণ হইবার পর ইউরোপে শবব্যবচ্ছেদ-বিজ্ঞানের উন্নতি যদিও পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এই প্রথা বিস্তৃত প্রচলনের সহায়তা করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ জেরিমি বেন্‌থাম্ মৃত্যুর পূর্ব্বে এই উইল করিয়া যান তাঁহার শব যেন ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

মেডিকেল স্কুল সমূহে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থার জন্য ১৮৩২ সালে আনাটমি আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

আনাটমি বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক সার্জারীর প্রধান সহায় ক্লোরফর্ম, কিন্তু ক্লোরফর্মের তখনও আবিষ্কার হয় নাই! আফিম জলে গুলিয়া সেই জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া শুকাইয়া রাখা হইত। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে সেই স্পঞ্জ গরম জলে ভিজাইয়া রোগীর নাকে ধরা হইত। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সার্জন এবং ফিজিশিয়ানদের উপাধিদানকালে ঘটা হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উপাধি দেওয়া হইত বাক্‌কা-লরিএট্ (Bacca-Laureate)। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদেরও ঐ উপাধি ছিল। উপাধিধারী বাক্কা বে লরেল জাতীয় বৃক্ষের ফলে গ্রথিত সুগন্ধি মালা পরিতেন; এই প্রথাই বোধ হয় ঐ উপাধির মূল। এখনও অমেরিকায় বি, এ, উপাধিধারীদের বিদায় দিবার সময় যে বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহার নাম বাক্‌কা-লরিএট্ উপদেশ।

এইরূপে প্রতীচ্যে চিকিৎসাবিদ্যার গতি ধীর পদসঞ্চারে, আরব হইতে স্পেনে, স্পেন্ হইতে ইতালীতে এবং ইতালী হইতে সমগ্র ইউরোপের দিকে। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে খৃষ্টধর্ম্মযাজকদের কৃপায় দুই একটী হস্‌পিস্ বা পান্থনিবাস যদিও হাসপাতালে পরিণত

হইয়াছিল, রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হাসপাতালে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় অনেক পরে। শুশ্রূষা চিকিৎসার একটী প্রধান অঙ্গ। ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেল্ কর্ত্তৃক রীতিমত শুশ্রূষার সূত্রপাত ক্রিমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে।

বৈজ্ঞানিক যুগ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাবিদ্যার আরম্ভ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, শারীরস্থান-বিদ্যা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগেও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ও ব্যবহারের লোপ হয় নাই। তখনও রোগবিশেষে ডাইনীর প্রভাব সেক্স্পিয়ার প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিও স্বীকার করিতেন। ক্রম্উএলের পার্লামেণ্ট্ তিন হাজার ডাইনীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া, জীবন্ত অগ্নিতে জীয়ন্ত দগ্ধ করিয়া, গভীর জলে ডুবাইয়া, শ্বাস রুদ্ধ করিয়া সভ্যতার পরিচয় দিয়াছে।

কোনও কোনও ডাক্তারের অদ্ভুত ভৈষজ্যজ্ঞান ছিল। সার কেনেল্ম্ ডিগার তরবারি-আঘাত-জনিত ক্ষত আরোগ্যের জন্য এক প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত করিতেন। ঐ ঔষধ ঘায়ে প্রয়োগ করিতে হইত না। তরবারির গায়ে ঐ চূর্ণ মাখালেই ঘা সারিয়া যাইবে এই তাঁহার ব্যবস্থা। প্যারেসেল্সাস্ নামক বিখ্যাত ডাক্তারের ঘা সারিবার ব্যবস্থা ছিল আরও সুন্দর। ফাঁসি-হত ব্যক্তির খুলি-চাঁচা চূর্ণ, ভল্লুকের চরবী, কেঁচোর আঁত এবং শেওলা মিশ্রিত একটী মলম তিনি প্রস্তুত করিতেন এবং কোন ক্ষত স্থানের রক্ত লইয়া একখণ্ড কাষ্ঠে মাখাইতেন। ঐ কাষ্ঠখণ্ড ঐ মলমের ভিতর রাখিয়া দিলে নাকি বিশ মাইল দূরস্থিত রোগীর ঘা সারিয়া যাইত। এই ডাক্তার দ্বয়ের চিকিৎসাকাহিনী পাঠ করিয়া একটী গল্প মনে পড়িল। একদা গঙ্গার বক্ষে এক রণতরী ভাসিতেছিল। জাহাজের একশত গোরা সৈন্য কলেরার আক্রমণে মৃতপ্রায়; হৃৎপিণ্ডের অবস্থা অতি শোচনীয়। কোন ডাক্তার চিকিৎসা করিতে অগ্রসর হন না। ডিঃ গুপ্তের একজন কম্পাউণ্ডার ন ভেতব্যং বলিয়া একশত মাস্টার্ড্ প্লাস্টার প্রস্তুত করিয়া গড়ের মাঠে বিছাইয়া দিল। জাহাজের রোগীরা অবিলম্বে উঠিয়া বসিয়া যখন 'জল দাও' বলিয়া চীৎকার করিল জাহাজের কাপ্তান ডাঙ্গায় আসিয়া কম্পাউণ্ডারকে পাঁচ শত মুদ্রা পুরস্কার দিলেন, গল্পকথক তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অণুবীক্ষণ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জরায়ু প্রভৃতি পরীক্ষার যন্ত্র; উনবিংশ শতাব্দীতে ক্লোরফর্ম্, রঞ্জনরশ্মি, রেডিঅম্ প্রভৃতি; রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, সুস্থ ও রুগ্ন দেহের বিবরণ; এবং বিশেষ বিশেষ বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সমবেত চেষ্টা ঐ সমুদয় কুসংস্কার ও কুচিকিৎসা বিদূরিত করিয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করিয়াছে।

রোগ নিবারণ

এতদিন রোগনিবারণ-বিদ্যার পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। "রোগ ও মৃত্যু, ঝড় জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পের ন্যায়, যখন দৈবাধীন, নিবারণের চেষ্টা বাতুলতামাত্র।" এই

ধারণাহ্রাসের এবং রোগনিবারণ-বিদ্যার অভ্যুদয়ের ইতিহাস একই। মানুষ যখন আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল; তাহার গৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গনই তাহার সমস্ত জগৎ ছিল ততদিন পরের ভাবনায় সময়ক্ষেপ করে নাই। কিন্তু নানাবিধ ঘটনার তাড়নায় যখন সে ঘরের বাহির হইয়া দেখিল পরের মঙ্গলের উপর তাহার মঙ্গল নির্ভর করে তখন সর্ব্বসাধারণের রোগ বিপদ্ নিবারণের চেষ্টা করিতে হইল। দ্বিতীয় জর্জ্জের একাদশবর্ষব্যাপী রাজত্বকালে যুদ্ধাস্ত্রের ঝনঝনার বিরাম; ইংরাজ জাতির নিদ্রার আবেগ, দিনের বেলায় খেলা, রাত্রে মদ্যপান, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ও আয়াসের বৃদ্ধি; ১৭৩৮ সালের ইংলণ্ডের এই ইতিহাস। এ হেন সময়ে আসিলেন মেথডিস্ট ওএস্‌লি, "জাগো জাগো" বলিয়া লোকের দ্বারে করাঘাত করিয়া। নিপীড়িত রুগ্ন অসহায়দের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে মর্ম্মভেদী বাণীর এই সারমর্ম্ম চিন্তাশীলদের, মর্ম্মে প্রবেশ করিল। মার্কিন স্বাধীনতা ফরাসী বিপ্লব, ধন-নিপীড়িতজনের জন্মগত অধিকারের দাবি, অবহেলিত রুগ্নের আর্ত্তনাদ, সমাজনেতৃবৃন্দের হৃদয় নব নব ভাবে উদ্বেলিত করিয়া কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করিতে লাগিল। নব প্রবর্ত্তিত নানাবিধির আসরে একটী আসন নির্দ্দিষ্ট হইল রোগনিবারণবিধির। রাজকুমার বলিলেন রোগ-চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ-নিবারণ শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান এবং যুদ্ধবিপ্লবের ফলে রোগনিবারণশাস্ত্র-প্রতিষ্ঠার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কারাবদ্ধদের কাতর ধ্বনিও এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার মূলে। হাওয়ার্ড কর্ত্তৃক ১৭৭৪ সালে বন্দীদের দুর্দ্দশার এবং কারাগারের ভীষণ অবস্থার কাহিনী পার্লেমেণ্টে বর্ণনার কালে টাইফাস্ প্রভৃতি মারাত্মক সংক্রামক রোগ নিবারণ বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। এই সহৃদয় কর্মবীর ১৭ বৎসর ২৩টী জেলের মহামারী-বীজাণুপূর্ণ-বায়ুর ভিতরে বাস করিয়া দৈববলে আপনার জীবন রক্ষা করিয়া সহস্র সহস্র বন্দীর প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সময়ে ভূপর্য্যটক কুক টাটকা ফল মূল প্রভৃতি খাদ্যের অভাবে জাহাজের নাবিকদের স্কর্ফি রোগে মৃত্যুর বিবরণ সম্বলিত "নাবিকদের স্বাস্থ্য প্রণালী" অভিহিত একখানা পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক প্রচারের ফলে ইংরাজদের টাটকা ফল-মূলের উপর ভক্তি বাড়ে। তখনও খাদ্যপ্রাণের আবিষ্কার হয় নাই। কুকের প্ররোচনায় ১৭৯৬ সালে ব্রিটিশ জাহাজ সমূহে নেবুর রস ব্যবস্থা বিধি প্রবর্ত্তিত হয়।

এই ১৭৯৬ সাল আর একটী কারণে স্মরণীয়। জনৈক গ্রাম্য ডাক্তার জেনার এই বৎসরে ছুরিকার অগ্রভাগে একবিন্দু গো-বসন্ত-বীজ মাখাইয়া জনপদধ্বংসী বসন্ত মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারের টীকা-প্রণালী প্রচলনের জন্য পার্লামেণ্টে যখন বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয়, জনৈক্য সদস্য এই বলিয়া প্রতিবাদ করেন যে গো-বীজ দেহে প্রবিষ্ট হইলে মানুষ গো-প্রকৃতি সম্পন্ন হইবে। জেনারের গো-বসন্তবীজ ভিএনা, কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্, বাগদাদ, বসোরা এবং বোম্বাই ঘুরিয়া লর্ড ক্লাইভের আমলে ১৮০৩ সালে কলিকাতায় আসিয়াছে এবং তদবধি কোটি কোটি ভারত-

বাসীর দেহে গো-বীজ প্রবেশ করিয়াছে, তাই কি আমরা বিদেশী রাখালের পাচন-যষ্টি পরিচালিত হইয়া তাহাদেরই নির্দিষ্ট গোষ্ঠে চরিতেছি ?

১৭৯৬ সালের আর একটী স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। ঐ বৎসর জার্মান্ ডাক্তার হানিমান একটী প্রবন্ধ লিখিয়া হোমিওপাথি মত প্রচার করেন। কলেনের মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনূদিত করিবার সময় হানিমানের নিজদেহে ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রথম পরীক্ষা সিংকোনা লইয়া। ঐ ঔষধ আহারের পর তাঁহার নাকি জ্বর কম্প ও ঘাম হয়। এই ঘটনা হইতে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, সুস্থ দেহে যে ঔষধের যে মাত্রায় যে রোগের সৃষ্টি হয়, অসুস্থ দেহে সেই মাত্রা সহ্য হয় না। সুতরাং সেই ঔষধের সেই মাত্রা সেই রোগে কমাইয়া ব্যবহার করা উচিত। সেই মাত্রা যতই কমান যায় ততই নাকি তাহার তেজ বৃদ্ধি পায়। যাহা হউক এই মত প্রচলনের পর আলোপাথিক জগতে ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করিতে হইবে। স্ট্রিক্‌নিয়া প্রভৃতি তিক্ত ঔষধের $\frac{1}{100}$ গ্রেণ মাত্রায় আল্‌কালএড্ টাব্‌লেট গলাধঃকরণের পক্ষে সহজ হইয়াছে। এ দেশে বিষস্য বিষমৌষধং কথাটা যদিও প্রচলিত ছিল, হোমিওপন্থীরা বলেন আধুনিক সিরম্ ভ্যাক্‌সিন্ দ্বারা চিকিৎসা তাঁহাদেরই অনুকরণমাত্র।

রোগ নিবারণ শাস্ত্রের উন্নতি

এই প্রকারে অষ্টাদশ শতাব্দীর গর্ভে নানাবিধ নব নব ভাবরসে পরিপুষ্ট হইয়া উনবিংশ শতাব্দী জন্মগ্রহণ করিল। চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালেও স্বতন্ত্রভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখনও দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বকার স্বাস্থ্যসম্পন্ন পরিচ্ছন্ন রোম লণ্ডনের ঘরে ঘরে আবর্জনাকুণ্ড ও মল-ডোবা প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া অলক্ষিতে হাসিতেছে; এমন সময় "দৈব-প্রেরিত" ওলাউঠার আবির্ভাব ১৮৩১ সালে। লণ্ডন গেজেট পাঠে জানা যায় মড়কের ভয়ে সর্ব্বত্র ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। প্রবর্ত্তিত কোআরেণ্টাইন বা সংসর্গ-প্রতিষেধক বিধির মধ্যে বিজ্ঞান অপেক্ষা ভয়ের মাত্রাই বেশী ছিল। রোগীর বাড়ীর দরজায় "সাবধান" লিখিত টিকিট মারা; রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বাহিরে আসিতে না দেওয়া; বাহির হইতে খাদ্য আনিয়া রোগীর দরজায় রাখা এবং খাদ্যদাতা চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ভিতর হইতে আসিয়া খাদ্য না নেওয়া; রোগীর আত্মীয় স্বজনের বহির্গমন রোধ করিবার জন্য বাড়ীর চারিধারে সৈন্যের পাহারা রাখা; ইত্যাদি বিধিতে রোগনিদান-সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ইংরাজদের বহুকাল এই ধারণা ছিল কলেরা হাওয়াতে উড়িয়া বেড়ায়। আমি একদা টাউন হলে ওলাউঠার বীজাণু কাঁচের টিউবের ভিতরে রাখিয়া দেখাইতেছিলাম। তদানীন্তন বড় লাট লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন্ দেহরক্ষকপরিবেষ্টিত হইয়াও কাঁচটিউবে আবদ্ধ কলেরা-জীবাণু দেখিয়া দুহাত পশ্চাতে হটিয়া গেলেন বোধ হয় ঐ সংস্কারবশতঃ। ১৮১৫ সালের আইন অনুসারে এপথিকারী ফিজিসিয়ান শ্রেণীভুক্ত হইলেন

ঘটে, কিন্তু তখনও ডাক্তার রেজিষ্টরীভুক্ত এপথিকারী রূপান্তরিত গ্রোসার বা মুদি, সার্জন রূপান্তরিত বার্বার বা নাপিত এবং ফিজিশিয়ান রূপান্তরিত পাদ্রীবিশেষ। তাই ওলাউঠার বীজাণু যে রহিয়াছে রোগীর মলে এবং ওলাউঠা ছড়ায় মলমিশ্রিত জল বা মলভোজী মক্ষিকার স্পৃষ্ট খাদ্য, এই আবিষ্কার করিবার মতন ডাক্তার তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ১৮৮২ সালে।

যাহা হউক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের পরে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তখনও শান্তি-স্বস্ত্যয়নে বিশ্বাস ছিল। ওলাউঠার প্রশমনের জন্য রাজাদেশে উপবাসের ব্যবস্থা হয়। ওলাইচণ্ডী কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। যাহা হউক রোগ নিবারণ শাস্ত্র বা স্টেট্ মেডিসিনের ভিত্তি স্থাপন হয় ১৮৩৭ সালে। এই সালে জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই হর্ষ বিষাদ জড়িত রেজিষ্টরি আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টরি পুস্তকে কেবল জন্ম মৃত্যু সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয় না, জাত ও মৃতদের বাড়ীর ঠিকানা থাকে। ইহা দ্বারা জানা যায় পল্লীস্বাস্থ্যের অবস্থা কি; জন্মহার বৃদ্ধি হইতেছে কি না; কোন পল্লীতে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক ইত্যাদি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ১৮৪৮ সালে জল, বায়ু, খাদ্য, বাসস্থান, গোর-স্থান প্রভৃতির সম্বন্ধে নানাবিধ খাদ্য-ঔষধ আইন, টীকা আইন প্রভৃতি বিধির প্রবর্ত্তন এবং রোগ নিবারণ সম্বন্ধে নব নব তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে প্রতীচ্যে সাধারণের স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। তথাকার স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সগর্বে বলিতেছেন তাঁহাদের পরমায়ু ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বসন্ত কলেরা সম্বন্ধে তথ্য পুঁথি পড়িয়া জানিতে হইতেছে; "শ্বেতাঙ্গ প্লেগ্" অভিহিত যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ কমিতেছে, কালকবলমুক্ত শিশুরা জননীর কোল যুড়িয়া হাসিতেছে এবং স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে কৃষি বাণিজ্য দেশের সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছে।

ভারতে চিকিৎসা বিদ্যা

মনীষী কর্মবীরদের অদম্য উৎসাহে এবং অধ্যবসায়ে তমসাচ্ছন্ন প্রতীচ্যরাজ্যের বৈজ্ঞানিক আলো উদ্ভাসিত রাজ্যে পরিণতির ইতিহাস এতক্ষণ আলোচনা করা গিয়াছে। এখন স্বদেশে ফিরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব একদিন যে ভারতগৌরব আয়ুর্বেদ-সূর্য্যরশ্মি প্রতীচ্যে ঘন অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছিল, আজ সেই রশ্মি নিষ্প্রভ খদ্যোত আলোকে পরিণত হইয়াছে কেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরাই বলেন সপ্তম শতাব্দীতে খালিফ্ আল্মনশূরের পৃষ্ঠপোষকতায়, চরক ও সুশ্রুত আরবিক ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। সুশ্রুতের আরবিক সংস্করণের নাম কিতাব শ্বসুন-আল-হিন্দি (Kitab-Shaushoon-al-Hindi) এবং কিতাব-দি-সুশ্রুদ্। কিতাবের গ্রন্থকর্ত্তা ইবন্ আবিল্ সাইবিআল্। লাটিন ভাষায় অনূদিত এই আরবিক সুশ্রুতই ইউরোপের আয়ুর্বিজ্ঞান জ্ঞানের মূল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতীচ্য চিকিৎসাবিদ্যা প্রাচ্যের নিকট ঋণী।

সুশ্রুতের শারীরস্থান, শল্যতন্ত্র, রোগের শ্রেণীবিভাগ, ঔষধের ও খাদ্যের গুণাগুন, নানাবিধ অস্ত্রের ও যন্ত্রের বর্ণনা ও প্রয়োগ প্রণালী, গর্ভিণী ব্যাকরণ, মূঢ়গর্ভের বিবরণ, মাসে মাসে গর্ভস্থ শিশুর বিকাশ, শিশুপরিচর্য্যা, পশু চিকিৎসা, পটিবন্ধন, বিষের চিকিৎসা ইত্যাদি পাঠ করিয়া প্রতীচ্যের পণ্ডিতেরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ নহি কিন্তু তাঁহারাই বলেন সুশ্রুতের নাগার্জ্জুন-সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং সুশ্রুতের কতিপয় অধ্যায় উদ্ধৃত হয় বাগভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়ে এবং মাধবনিদানে। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় খালিফের আদেশে অনূদিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। প্রতীচ্যে রক্তসঞ্চালনতত্ত্ব আবিষ্কর্ত্তা হার্ভির বহুপূর্ব্বে সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"স্বাঃ শিরাঃ সঞ্চরন্ত্রক্তং"

কেপিলারী বা কৈশিকীর বর্ণনাও করিয়াছেন—

"একৈকা শতধা সহস্রধা, শরীরং গবাক্ষিতং"

হার্ভি ১৬১৬ সালে রক্তসঞ্চালন মত প্রচার করিয়া সমসাময়িকদের উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত সুশ্রুতের মত সকলে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। সুশ্রুতের সময় অস্ত্রবিদ্যা উন্নতির কত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তাঁহার ছিন্ন কর্ণবন্ধন ও নাসাগঠন প্রণালী পাঠ করিলে সম্যক্ ধারণা হয়। ছিন্ন দেহাংশ যোড়া দেওয়া হইতেছে সম্প্রতি প্রতীচ্যে; কিন্তু সুশ্রুত কাটা কান যোড়া দিয়াছেন বিলাতী সার্জনদের জন্মের বহুপূর্ব্বে। থাঁদা নাক টিকল করার প্রথা বা রাইনো প্লাস্টি অতি আধুনিক, কিন্তু সুশ্রুতের গ্রন্থে এই প্রণালীর বর্ণনা আছে।

শুশ্রূষা বিদ্যা

অতি পুরাতন গ্রন্থেও শুশ্রূষা-বিদ্যার উল্লেখ আছে। যজুর্ব্বেদ বলেন সরস্বতী শুশ্রূষা দ্বারা ইন্দ্রকে রোগমুক্ত করিয়া পূর্ব্ব শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়ানি দধতঃ

এই সূক্ত অনুসারে সরস্বতী ভিষক্; কেবল ভিষক্ নহেন, বাক্য দ্বারা ইন্দ্রকে সুস্থ করিয়াছিলেন। ৯৪ সূক্ত অনুসারে সরস্বতী অশ্বিনীকুমারদের স্ত্রী। এই সরস্বতীর ব্যবস্থা অনুসারে প্রস্তুত সারস্বত ঘৃত নাকি বন্ধ্যাদোষ দূর করিত।

অপ্রজানাঞ্চ নারীণাং নরাণাং স্বল্পরেতসাম্।

ঘৃতং সারস্বতং নাম স্বরস্বত্যা বিনির্ম্মিতম্॥

পুরাকালে যুবক যুবতীদের সহপাঠের ব্যবস্থা ছিল। দক্ষ প্রজাপতির মেডিকেল কলেজেই বোধ হয় অশ্বিনীকুমারদের এবং সরস্বতীর শিক্ষালাভ এবং পূর্ব্বরাগ।

ঐতিহাসিক যুগে হাসপাতাল এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা ছিল। তা প্রহ্ম (Ta Prohm) মন্দিরে রাজা জয়বর্ম্মণের একটী তাম্রলিপিতে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুমান, ইহার রচনার কাল ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ রাজার রাজ্যে ১০২টী

হাসপাতাল ছিল। হাসপাতালের নাম গিলালশালা বা আরোগ্যশালা। শুশ্রূষাকারীর নাম ছিল সেবাশৈরুষ এবং শুশ্রূষাকারিণীর নাম ছিল সেবাশৈরুষী। শুশ্রূষাকারিণীদের মধ্যে জয়াবতীর বিশেষ উল্লেখ আছে।

আয়ুর্ব্বেদে শুশ্রূষাকারকদের নাম ছিল উপস্থাতা। তিনি ছিলেন গুণচতুষ্টয়ের অধিকারী: উপচারজ্ঞতা, দাক্ষ্য, ভর্ত্তানুরাগ এবং শৌচ। এই প্রকার গুণসম্পন্ন পরিচারক বংশের লোপ কবে হইয়াছে বলা যায় না। তদভাবে প্রতি ঘরে ঘরে শুশ্রূষার ভার ন্যস্ত হইয়াছে অশিক্ষিতা কুটুম্বিনীদের উপর।

ইংরাজী চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, ওআর্ড্ বেহারা ও আয়ারাই রোগীর শুশ্রূষা করিত।

ভারতের এই অঞ্চলে ফরাশী পাদ্রীরা হস্‌পিস্ বা অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ হস্‌পিস্ হাসপাতালে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই এক সম্প্রদায় চন্দননগরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কিম্বা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আশ্রম স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় বলেন ১৭৫৩ সালে জেস্যুট সম্প্রদায়ের একটী হাসপাতাল ছিল চন্দন-নগরে। ইহাতে তিন শত রোগীর স্থান ছিল। এই হাসপাতালের নাম ছিল ন্যাশনাল হাসপাতাল। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় ফরাশী চন্দননগর এই অঞ্চলে হাসপাতালে চিকিৎসা বিদ্যা ও শুশ্রূষা বিদ্যা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অগ্রদূত। কলিকাতায় প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৯ সালে। ইউরোপে হস্‌পিস্ বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মূলে ধর্মযাজক; কলিকাতায় প্রথম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরক্ষক পুলিশ। প্রথমে ইহার স্বরূপ ছিল হস্‌পিস্ বা রাস্তায় কুড়ান অনাথদের আশ্রম।

১৮৫৯ সালে লেডি ক্যানিং এবং কলিকাতার ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের চেষ্টায় "কলিকাতা হাসপাতাল নার্স্ ইনস্‌টিটিউট" নামক সমিতি স্থাপিত হয় দেশীয়া ও বিদেশীয়া ফিরঙ্গ স্ত্রীলোকদের নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য। কলিকাতা কর্পরেশন ১৯২৫ সালে দেশীয় স্ত্রীলোকদের শুশ্রূষা-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এখন অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা এই বিদ্যা যদিও শিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু এখনও নার্সের নামে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাই শিক্ষিতা মহিলারা এই ব্যবসা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। এক সময় বিলাতেও নার্সেরা অপাংক্তেয় ছিলেন। ১২৮১ সালের গীল্‌ড্ হল বিধি অনুসারে ভদ্রমহিলার পোষাক পরা নার্সদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময় ভদ্রমহিলাদের অঙ্গশোভা ছিল এক প্রকার পশুলোমযুক্ত কাঠবিড়ালী চর্ম্মশোভিত ভারী রেশমী পরিচ্ছদ। এখন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলারা জনহিতকর কর্ম্মকুশলতার জন্যও শুশ্রূষা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁহাদের মাসিক বেতন ১২০্ হইতে ৬০০্ পর্য্যন্ত। আশা করা যায় আমাদের শিক্ষিতা মহিলারা এই শিক্ষা লাভ করিয়া স্ত্রীলোকদের বেকার সমস্যার সমাধান করিবেন এবং গৃহে গৃহে শুশ্রূষার দ্বারা বহু লোকের প্রাণরক্ষা করিবেন।

পুরাকালে হিন্দু-ও-বৌদ্ধ-প্রভাবিত দেশসমূহে চিকিৎসা-বিদ্যা ও শুশ্রূষা-বিদ্যার এমন

উৎকর্ষ ছিল; জিজ্ঞাসা করি তখন তেমন ছিল, এখন এমন কেন? মুসলমান রাজত্বকালে সম্রাট্‌কন্যার পোড়া ঘা সারাবার মতন দেশে একজনও কবিরাজ কিম্বা হেকিম ছিলেন না, তাই ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেশ-প্রাণ ডাক্তার সেই ঘা সারাইয়া, কাঞ্চন পুরস্কার উপেক্ষা করিয়া, স্বদেশী ব্যবসার অনুমতি লইয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যসৌধের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ একে ত জনসাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত; তাহারও অনেকগুলি অপ্রাপ্য। চরকের পূর্ব্বে রচিত আত্রেয়-কথিত ভেল সংহিতা আজও বোধ হয় তাঞ্জোর পুস্তকালয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া আছেন। এখানকার দু' চারিখানা হস্তলিখিত গ্রন্থ পুরুষানুক্রমে নাড়াচাড়া করিয়া তাহারই কৃপায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে-ছিলেন। এখন যদিও বঙ্গভাষায় সেই সমুদয় গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের বোধগম্য হইয়াছে, কিন্তু সময়োচিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের যথোচিত চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় কি? আলোপন্থীদিগকেও এই প্রশ্ন করা যায়। আমরা প্রতীচ্য প্রদীপের আলোকে দেখি, ঐ আলোকে পড়ি এবং ঐ আলোকে বসিয়া লিখি। এক কালাজ্বর ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা সার উপেন্দ্র ব্রহ্মচারীর নামই প্রতীচ্য পণ্ডিতদের সম্মুখে বারম্বার ধরিয়া গৌরব রক্ষা করি।

ম্যালেরিয়া-ওলাওঠা-বসন্ত-যক্ষ্মা-প্রপীড়িত জনগণের সেবা এবং স্থান-কাল-উপযোগী চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া যদি আয়ুর্বিজ্ঞান শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং বিদ্যার একনিষ্ঠ সেবক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আয়ুর্বিজ্ঞানের উন্নতির আশা করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই আসেন অর্থোপার্জনের আশায়। জীবিকানির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অর্থ সঞ্চয়ই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলে যেন তেন প্রকারেণ একটা ছাপ লইয়া চাকুরী কিম্বা চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিলে অপ্রসন্না বিদ্যার অভিসম্পাত লাভ করিতে হয়। আয়ুর্বেদ বলেন:

'কুর্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসা-পণ্য-বিক্রয়ম্।
তে হিত্বা কাঞ্চনরাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে॥'

বিদ্যালয় হইতে উপাধিভূষিত হইয়া ডাক্তারেরা যখন অজ্ঞাত-উপকরণ বিলাতী ঔষধের চর্ম-থলি হাতে লইয়া দ্বারে দ্বার ফিরি করেন, তখন সত্য সত্যই মনে হয় তাঁহারা পাংশুরাশির উপাসনা করিতেছেন। "চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা" তাঁহারা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

চাই বিদ্যার একনিষ্ঠ সেবা এবং গবেষণা-প্রবৃত্তি। প্রত্যেকে এক এক জন চরক কি সুশ্রুত, কখ্ কি জেনার, রস্ কি রঞ্জন হইবেন, এ আশা করা যায় না। কিন্তু রামায়ণোক্ত কাঠবিড়ালী হইয়া উদ্যমশীলতা-সেতু-নির্মাণের সহায় হইয়া যে পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠা-সীতা উদ্ধার করিতে পারি আমরা প্রত্যেকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিদ্যা অর্জন এবং শাস্ত্রোন্নতি করিতে হইলে, চাই সংযম ও একনিষ্ঠা। আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যা সপত্নী সহ্য করেন

না। সহরের নানাবিধ চিত্তাকর্ষণী অবিদ্যা দ্বারা আকৃষ্ট হইলে যে অবস্থা হয়, শ্রীমদ্ভাগবত একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"বহ্বঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি"

প্রজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কূর্ম যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনার দেহের অভ্যন্তরে টানিয়া লয়, তেমনি জ্ঞানার্থীকে বিদ্যা বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে চক্ষু কর্ণাদিকে টানিয়া লইয়া আত্মস্থ হইয়া একমাত্র বিদ্যা ধ্যানেই মগ্ন থাকিতে হইবে।

সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। প্লেটো বলিয়াছেন "Life is short ; Art is long ; the Occasion fleeting ; to know is Science ; to believe one knows is Ignorance." "আমি সব জানি" এই গর্বের স্থান নাই নবীন জগতে। কালের সঙ্গে তাল দিয়া চলিতে হইবে। বেতালা হইলে কাল গুণীজন-আসর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। পুরাতন ঋষিদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও অনুমান দৃষ্টি ব্যতীত একটী তৃতীয় দৃষ্টি ছিল সূক্ষ্ম দৃষ্টি। এখন সেই দৃষ্টির অভাব। সময়োপযোগী জ্ঞান লাভ করিতে হইলে চাই চক্ষুর চক্ষু অণুবীক্ষণ ও অফ্‌থাল্‌মস্কোপ্‌। আলোকের আলোকরঞ্জন রশ্মি, কর্ণের কর্ণ স্‌টেথেস্‌-কোপ্‌, স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শেন্দ্রিয় স্‌ফিগ্‌মোগ্রাফ্‌। কিন্তু কেবল যন্ত্রের অধীন হইয়া ঈশ্বরদত্ত চক্ষু কর্ণ নাসিকা হারাইলে চলিবে না। ব্যয়সাধ্য যন্ত্রাদির অভাবে গ্রাম্য চিকিৎসা কি চলিবে না ?

যাহা হউক আয়ুর্বিজ্ঞান শাস্ত্রোন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। এই চেষ্টার অভাবে ভৈষজ্যের জন্য ভারত হইতে প্রতি বৎসর ২॥০ কোটি টাকা বিদেশে যাইতেছে। অথচ অসংখ্য তরুলতার জননী ভারত। সমুদ্র-সমতল হইতে গিরিশৃঙ্গ সম উচ্চ, শীত গ্রীষ্মাদি ষড় ঋতু প্রভাবান্বিত, এমন কোন দেশ নাই, যে দেশের তরুলতার উৎপত্তি ভারতে অসম্ভব। নিষ্ঠা থাকিলে প্রত্যেক তরুলতার মধ্যে জ্ঞান গুরুমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক তরুলতায় নৃত্যগুরু হ্লাদিনী শক্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাই নৃত্যকুশল হইয়াছিলেন। বৃন্দা তাই বলিয়াছিলেন :

তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ

ভারতের চিকিৎসককে প্রতি তরুলতার মধ্যে গুরুমূর্ত্তি দর্শন করিতে হইবে। প্রত্যেক তরুলতা যখন নব নব জ্ঞান শিক্ষা দিবে, তখন ভারতের চিকিৎসক আনন্দে "ইউরিকা, ইউরিকা" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে জ্ঞানবিজ্ঞান পথে চলিতে চলিতে নব নব সত্য আবিষ্কার করিবেন। নব নব ভৈষজ্য সম্পদে ভারত-ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে এবং মাতৃভূমি রোগশূন্যা হইয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইবেন। সেই মূর্ত্তির সমক্ষে নতশির হইয়া আমরা সমস্বরে বলিব "বন্দে মাতরম্‌"।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ
স্বকুমার কলাশাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,
শিশুসাহিত্য-শাখার সভাপতি

শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ

শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

শিশু সাহিত্যের জন্মকথা

কে জানে সে কত লক্ষ কোটিবৎসর আগে, একদিন স্নেহময়ী জননীর বুকে শিশু আসিয়া প্রথম দেখা দিল। সে দিন সেই প্রথম মাতৃস্তন্যের জীবনধারা যেমন তাহার প্রাণকে সঞ্জীবিত করিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখের বাণী সুমধুর স্বরলহরী গুঞ্জনে, গানে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়া শিশুর হৃদয়ে এক নূতন সজীবতা আনিয়া দিল। স্বপ্নের আবেশে তাহার পেলব নয়ন-কলি নিমীলিত হইল! মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানী গানই শিশু-সাহিত্যের স্বপ্নপুরীর প্রথম তোরণদ্বারখানি মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

ঘুমপাড়ানী গানের মধ্যে যে মদিরতা আছে, যে মধুর আবেশ-বিহ্বল ভাব আছে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের সকলকেই যে ঘুমপাড়ানী গানের মধ্য দিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। এখনও কি আমাদের কাণে গুঞ্জরিয়া উঠে না—

ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী ঘুমের বাড়ী যেয়ো,
বাটা ভরে পান দিব গাল পুরে খেয়ো!

খোকা ও খুকুর গোলাপের মত কমতনু তাহার মুখের অর্দ্ধস্ফুট ভাষা, উপদ্রব, হাসি-কান্না সকলই যে স্নেহময়ী জননীর কাছে পরম নিধি। শিশুকে বুকে লইয়া তাহার বুক জুড়াইয়া যায়। তাই মায়ের মুখের ভাষা গানের সুরে সুরে ফুটিয়া উঠে।

বুক জুড়ানো ধন
আমার পদ্মলোচন!
কেঁদ না রে সোণার যাদু
থাম কিছুক্ষণ
দুধ হয়েছে বলক তোলা,
মিছরি আছে হাটে,
খাবে আমার সোণার যাদু
যত পেটে আটে।

আবার কখন আদর করিয়া বুকে চাপিয়া বলেন,—

আমার কত দুঃখের ধন!
আমার ক্ষিদে-হারা দুখ-পাসরা দুঃখ-নিবারণ
আমার কত দুঃখের ধন!

এই যে স্নেহের বাণী, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে চিরন্তন সত্যরূপে প্রকাশিত। আমাদের স্নেহময়ী বঙ্গ-জননী যেমন স্নেহের সন্তানকে আদর করেন, তেমনি কোথায় কোন্ সুদূর দেশের সাগরকূলবাসিনী মাওরি-আত্মীয়া জননীও তেমনি গাহিয়া আসিতেছেন—

খোকা আমার, খোকা আমার, তুল্ তুলসীর পাতা।
বেনা মূলের গুচ্ছ আমার রাখ্ রে বুকে মাথা।
মৃগনাভীর কৌটা আমার খোকা ঘুম যায়,
গুগ্ গুলু ধূপ ধূনার আবেশ খোকার চোখে আয়।

জাপানী-জননীর মুখে শুনিতে পাই—

ঘুমো আমার সোণার খোকা, ঘুমো মায়ের বুকে
আকাশ জুড়ে উঠ্‌লো তারা ঘুমোরে তুই সুখে।
হাত পা নেড়ে কান্না কেন? কান্না কেন এত?
চাঁদ উঠেছে, ঘুমোরে তুই সোণার চাঁদের মত।
একটি দিয়ে চুমো,—ঘুমোরে তুই ঘুমো।*

আমরা ঘুমপাড়ানী গানে এবং ছেলেভুলানো ছড়াগুলির কথার মধ্যে যাহা কিছু পাই, তারা সুধু মায়েরই ভাষা। স্নেহময়ী মাতা কখন শিশুর মলিন মুখখানি দেখিয়া আদর করিয়া বলেন—

কে বকেছে, কে মেরেছে, কে দিয়েছে গাল,
তাই তে খোকা রাগ করেছে, ভাত খায়নি কাল।

কখনও দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইতে না পারিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—

এক যে আছে একনড়ে
সে থাকে তালগাছে চড়ে।

আমরা ক্ষুদ্র শিশুটিকে বাধ্য করিবার জন্য পৃথিবীর সবদেশের জননীর মুখেই যে সব যুক্তিপূর্ণ আদর ও তাড়নার ছড়া শুনিতে পাই, সেগুলি মায়েরই ভাষা। মা যখন ঘুমন্ত শিশুটিকে বুকে লইয়া বলিতে থাকেন—

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?

এ মায়ের অভিজ্ঞতার কথা। কিংবা যখন বলেন—

খোকা যাবে বিয়ে কর্ত্তে হস্তী-রাজার দেশে
তারা রূপোর খাটে পা রেখে সোণার খাটে বসে।

কিংবা—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান।

প্রভৃতি ছড়া মায়ের কল্পনার সৃষ্টি।

---

* কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ।

ায় সর্ব্বত্র ঘুমপাড়ানী গান আছে। যদিও শিশু ভাষার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তবু বাঁশীর সুরের ন্যায় মধুর স্বর লহরীতে গীত এই গানগুলি শিশুদিগকে ঘুমের দেশে লইয়া যায়। সেই সে অতি প্রাচীন বৈদিকযুগের জননী হইতে যুগযুগান্তের নবাগতা জননীও এই গান গাহিয়াই শিশুদের জন্য স্বপ্নরাজ্য রচনা করিবেন। সে মিশরই হউক, গ্রীসই হউক, আসিরিয়াই হউক, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ইহাই হইতেছে **শিশু-সাহিত্যের প্রথম স্বরূপ**।

রূপকথা ও সাহিত্য

তারপর ধীরে ধীরে মাতৃক্রোড়ের শিশুটি, যে শুধু একদিন মায়ের বুকের শুন্যধারা পান করিয়া তৃপ্ত থাকিত,—সে ক্রমে ক্রমে মায়ের কোল হইতে নামিয়া আসিল, হাঁটিতে শিখিল, চলিতে শিখিল, বলিতে শিখিল, তখন তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইল এক নূতন জগৎ। নূতন অজানাদেশের অভিনব আলোকরশ্মি আসিয়া তাহার প্রাণে জাগাইয়া দিল অভিনব কল্পনার সাড়া! ঘুমপাড়ানী গান বা ছড়া শুনিয়া আর তাহার মন শান্ত থাকিতে চাহিল না। সে চাহিল আরো কিছু নূতন জানিতে ও শুনিতে, তাহার অতৃপ্ত অশান্ত মন চাহিল রূপকাহিনীর স্বপ্ন-রাজ্যে প্রবেশ করিতে। তখন একদিন স্বপ্নরাজ্যের তোরণখানি খুলিয়া গেল। দেখা দিল সেইখানে রূপকথার রূপবাণী—আর দেখা দিল সেই অচিনপুরে কত রাজা, রাজপুত্র, কত বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কত পাষাণপুরী, কত শুকপাখী, কত রাক্ষস-রাক্ষসী, দৈত্য-দানব, কত ধূ-ধূ-করা তেপান্তরের মাঠ, কত সিন্ধাবাদ নাবিক, কত জীব-জন্তু—সে সব অত শত কি আমরা জানি!

গল্প শুনিবার ব্যাকুলতা ও আন্তরিক আগ্রহ যে দিন হইতে শিশুর মনে জাগিয়া উঠিল, সে দিন হইতেই তাহার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি হইল রূপকথার অপরূপ ভাণ্ডার। মা কিংবা ঠাকু'মা যখন বলিতে লাগিলেন—'এক যে ছিল রাজার পুত্র, কোটালের পুত্র, তাঁদের ছিল পক্ষিরাজ-ঘোড়া, যে ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহারা চলিলেন দেশ-ভ্রমণে, মাথায় তাঁদের উষ্ণীষ, কোমরে ঝলমল্ করে সোণার খাপে তরোয়াল, টগ্‌বগ্ করিয়া ঘোড়া ছুটিয়াছে, এমন সময় একটা অজগর,—অমনি শিশুরা সোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—'তারপর—তারপর কি হইল রাজপুত্র কোটালপুত্রের—পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় গেলেন তাঁহারা;—' পৃথিবীতে কি এমন কোন মানুষ আছেন যিনি কোনদিন সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকারে ঢাকা গৃহ-অলিন্দে, কুটীরে বা রাজপুরীতে বসিয়া গল্প শুনিতে আবদার করেন নাই?

রূপকথার সৃষ্টি

রূপকথার সৃষ্টি কি ভাবে কেমন করিয়া হইল, সে কথা বলা বড় কঠিন। সে ইতিহাস খুঁজিতে যাইয়া দেখা যায় পৃথিবীর সবদেশের রূপকথার মধ্যেই একটি যোগসূত্র রহিয়াছে। কথাটি সত্য। আপনারা দেখেন নাই এমন কথা বলি না, কিন্তু আমি দেখিয়াছি এবং

সবদেশের খোকা ও খুকুরা জানে যে, রূপকথাগুলির পাখা আছে, তাহারা পাখা মেলিয়া উড়িয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালা দেশের সেই সুদূর প্রান্তে পদ্মাতীরের একটি শ্যামতরু-ছায়াস্তরালের নিভৃত কুটীরের অলিন্দে স্তিমিত প্রদীপালোকে বসিয়া ঠাকু'মা মালা জপিতে জপিতে যে কাহিনীটি তাঁহার নাতি-নাতিনীদের কাছে বলিতেছেন, সে কাহিনীটিই আমার সঙ্গে যদি আপনারা আরবের ঊষর প্রান্তরে উটের পিঠে চড়িয়া বালুকাতরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে আসিতে পারেন, তবে শুনিতে পাইবেন বেদুইন-নারী মরুভূমিতে তাহাদের শিবিরে বসিয়া তাহার গল্পপ্রিয় শিশুদিগকে সেই গল্পটিই শুনাইতেছে। —উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড যেখানে যাইবেন, সেখানেই তাহা শুনিতে পাইবেন। কোথায় বৃদ্ধ সাঁওতাল শীতের সন্ধ্যায় কুটিরের সম্মুখে আগুন জ্বালিয়া—কমু' ও ধর্মু'র গল্পটি বলিতেছেন,—ঠিক্ সেই গল্পটিই আপনারা শুনিতে পাইবেন রুসিয়ার নীল পাহাড়ের নীচে বনানীপ্রান্তের বিজনপল্লীর প্রাচীনাদের মুখে। কাজেই রূপকথার যে পাখা আছে, তাহা কি সত্য নয়? অনেক সময় একথাটা আশ্চর্য্যই মনে হয় যে, রূপকথার পক্ষিরাজ ঘোড়া কেমন করিয়া পাখা মেলিয়া একদেশ হইতে অন্যদেশে চলিয়া যাইয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সে বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই ইতিহাস শুধু সুন্দর নয় কৌতুহলোদ্দীপকও বটে।

রূপকথার বিশিষ্টতা

শিশু-সাহিত্য বলিতে রূপকথাই হইতেছে তাহার ভিত্তি ভূমি। রূপকথার ইতিহাস আমাদের অনুসন্ধান ও গবেষণার যোগ্য। ইতিহাস ও বিজ্ঞান সত্যের সন্ধানী। আমার মনে হয় শব্দবিজ্ঞান, মনস্তত্ব এবং জাতিতত্বের দিক্ দিয়াও রূপকথার ইতিহাস আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

কোনও দেশের বিশিষ্ট রূপটি জানিতে হইলে সে দেশের জাতীয় চরিত্র, রীতি-নীতি, সামাজিক নিয়ম ও অনুষ্ঠান বুঝিতে হইলে রূপকথার আলোচনা প্রয়োজনীয়। ইহার দ্বারা আমরা যেমন ভাষা ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও নানা বৃত্তির উন্মেষ হয়, নানা ভাবের সৃষ্টি হয়, নানা সৌন্দর্য্যের কল্পনা অনুভূত হয় এবং নানা অলৌকিক রহস্যময় কাহিনীর তত্ত্বানুসন্ধানে কৌতুহল জাগিয়া উঠে। এই আলোচনার দ্বারা আমাদের মনের মধ্যে নানা বৃত্তির উন্মেষ হয়। কখনও দুঃখ-দারিদ্র্যের করুণ গল্পটি শুনিয়া চোখে জল আসে, কখনও অত্যাচার ও অবিচারের কথা শুনিয়া ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, কখনও নীল সাগরের বুকের অজানা দ্বীপের অজানা মানুষের কথা শুনিয়া বিস্মিত হই! কখনও বা নির্বুদ্ধিতার গল্পে—কোনও হবুচন্দ্র রাজার কাহিনী শুনিয়া হাসিতে হয়। আমরা এই ভাবে রূপকথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়া পাই একটি অপূর্ব্ব মিলনের বাণী, যে বাণী প্রচার করিয়া দেয় সুধু একটি কথা,—পৃথিবীর সব মানুষই একই ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত। মানুষ মানুষের ভাই—এক বিরাট মানবজাতি পৃথিবীর অধিবাসী।

রূপকথার দেশ-ভ্রমণ

ইউরোপের নানাদেশে প্রচলিত রূপকথা, পৌরাণিক আখ্যান প্রভৃতির বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ ও এসিয়া মহাদেশ হইতে যাইয়া তথায় পৌঁছিয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। নরওয়ে হইতে স্পেন, ইটালি হইতে স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচলিত রূপকথা ও পৌরাণিক কাহিনীগুলির আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐগুলির অধিকাংশই এসিয়া ও ভারতবর্ষের প্রচলিত গল্প ও কাহিনীর রূপান্তর মাত্র।

কেমন করিয়া এসিয়ার রূপকথা ইউরোপের মাটিতে আসিয়া আপনাদের আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিল? দক্ষিণ ইউরোপে তুর্কীদের স্বভাবসিদ্ধ গল্প বলিবার প্রবৃত্তি হইতেই এসিয়ার কাহিনী দক্ষিণ ইউরোপে প্রচারিত হয়। উত্তর ইউরোপে প্রায় দুইশত বৎসর কাল মোঙ্গোলিয়দের শাসনপ্রভাব বিদ্যমান ছিল, কাজেই তাহাদের প্রভাব বশতঃ গল্পগুলি সেখানে প্রচারিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে এসিয়া ও ইউরোপে আর্য্যজাতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব কাহিনী, দুই মহাদেশে একই সময় প্রচারিত হয়। তাঁহার মতে—সেই অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ একই দেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের এক শাখা আসিলেন ভারতবর্ষে। এজন্য একই দেশের অধিবাসী, একই জাতি যখন দুই বিভিন্ন মুখে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহাদের গল্প ও কাহিনীর মধ্যে যে একটি ঐক্যধারা প্রবাহিত হইবে, তাহা ত স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের গ্রাম্য কাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি কাহিনী আছে, যে গুলি সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত। ডাক্তার উইলসনের মতে এসিয়া গল্প-রাজ্যের জন্মভূমি। আর তার মূল উৎস উৎসারিত হইতেছে শতধারায় শতবর্ণচ্ছটায় ভারতবর্ষ হইতে।

অনেকের মতে ধর্ম্মযুদ্ধের সময় (During the Crusades) দলে দলে যোদ্ধারা পূর্ব্বদেশে আসিয়াছে ও সে সময়ে পূর্ব্বদেশের কাহিনী পশ্চিম ইউরোপে প্রচারিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। তারপর ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকা যে দিন স্পেনের আকাশে শোভা বিস্তার করিতে লাগিল, সেদিন হইতে ইউরোপে এসিয়ার শিক্ষা ও সভ্যতার নবীন আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গল্প ও ইতিহাস ইউরোপের নানাদেশে প্রচারিত হইতে থাকিল। তখন মোস্লেমসভ্যতা ইউরোপে এক নবীন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইউরোপীয় জাতিসমূহের উপর মোস্লেমসভ্যতার প্রভাব অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের নাই।

আব্বাসবংশীয় খলিফাদের মধ্যে আবুজাফর আল্‌মনসুর হইতে আরম্ভ করিয়া খলিফা আল্ মামুনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বোগদাদের সমৃদ্ধির অবধি ছিল না। এই সময়কার অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী ও নবম শতাব্দীর মধ্যে যে সকল খলিফা রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে আল্‌মনসুর, মাদি হাদি ও সুবিখ্যাত হারুন-অল-রসিদের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই সকল খলিফারা চীন, তিব্বত এবং ভারতবর্ষের নানা রাজা-মহারাজার সহিত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির দ্বারা এক মহামিলনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা ইতিহাস

পাঠে জানিতে পারি যে, এই মহানুভব নৃপতিগণ ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় হিন্দুদিগকে বিশেষ ভাবে নিজ নিজ দরবারে নিমন্ত্রিত করিয়া সাহিত্য, দর্শন, গল্প ও কাহিনীর—এককথায় সাহিত্যের নানা বিভাগে জ্ঞান প্রচারের জন্য উৎসাহিত করিতেন। এ সমুদয় খলিফাদের প্রভাববশতঃ ভারতবর্ষের রূপকথা, নীতিকথা, পৌরাণিক আখ্যান ইউরোপে প্রচারের সুযোগ পাইয়াছিল।

প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষ, পারস্য এবং আরব দেশের গল্প ও কাহিনী লোকের মুখে ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। পরে এইগুলি অনুবাদের সাহায্যে প্রচারিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ সাহিত্য এই সব গল্পের মূল উৎস।

ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ খসরু নসীরবানের রাজত্বকালে পঞ্চতন্ত্র পহলবী ভাষায় অনূদিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে সিরিয়াক্ এবং আরব্য ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। সিরিয়াক্ ভাষায় ঐ গ্রন্থের নাম দেওয়া হয় 'কলিলগ ও দমনগ' এবং আরব্য-ভাষায় 'কলিনা ও দমিনা'। পঞ্চতন্ত্রের করটক ও দমনক শৃগাল দুইটির নামই কলিনা ও দমিনা হইয়া পড়ে। আরবীয় অনুবাদক কলিনা ও দমিনার আদি রচনা বিদপাই বা বিদ্যাপতি বলিয়া প্রচার করেন। এই বিদপাই শব্দ অপভ্রংশ হইয়া পিল্‌পাই বা পিল্পে হইয়া পড়ে। পিল্‌পাইয়ের গল্পের গ্রীক অনুবাদ ১০৮০ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। ক্রমে ক্রমে পারসিক, আরবীয়, হিব্রু, ল্যাটিন প্রভৃতি নানা ভাষার অনুবাদের সাহায্যে প্রচারিত হইয়া ইউরোপের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে অল্পাধিক রূপান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।

এইরূপে রূপকথাগুলি অবশেষে ভাষার আকারে রূপান্তরিত হইয়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে এই দিকে আলোচনা করিতেছেন। আমাদের দেশের তরুণেরা যদি রূপকথার সোনার পুরীতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে একদিন সত্য সত্যই সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্‌মহলের ঘুম ভাঙ্গিবে এবং রূপরাণী জাগরিত হইয়া তাঁহার পাষাণপুরীর সুপ্ত ও লুপ্ত ইতিহাসের দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন!

সংস্কৃত ও পালিভাষায় শিশু-সাহিত্য

সংস্কৃত ভাষা অনন্ত রত্নভাণ্ডার। পালি ও সংস্কৃত ভাষার জাতক, রামায়ণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী, কথাকোষ, অবদান, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, বত্রিশসিংহাসন, পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ কথা-সাহিত্যের অপরূপ ভাণ্ডার! কিন্তু একমাত্র পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থই শিশু-সাহিত্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নহে। জাতক, রামায়ণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শিশু-সাহিত্যের উপযোগী অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প চয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সমুদয় গ্রন্থ কোনরূপেই শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না! বাঙ্গালা দেশের ছেলে মেয়েদের কাছে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ সুপরিচিত। এই দুই গ্রন্থেই কথাচ্ছলে, গল্পচ্ছলে, অনেক সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ আখ্যান আছে।

পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ পাঁচটি তন্ত্র বা ভাগে বিভক্ত। পঞ্চতন্ত্রে সমুদয় গল্প শিশু-সাহিত্যের উপযোগী নহে। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এই দুইখানি গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চতন্ত্র তাঁহার প্রথম গ্রন্থ এবং উহা হইতেই সার সঙ্কলন করিয়া তিনি হিতোপদেশ প্রণয়ন করেন। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের রাজা অমরশক্তির পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চতন্ত্র এবং পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রদিগের শিক্ষা দিবার জন্য হিতোপদেশ বিরচিত হয়। পঞ্চতন্ত্রে বিষ্ণুশর্ম্মা রাজার বিনীত অনুরোধে তাঁহার পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—'রাজন্ আমি শত গ্রামবিনিময়েও বিদ্যাবিক্রয় করিব না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, ছয় মাসের মধ্যে যদি কুমারগণকে সুশিক্ষিত করিতে না পারি, তবে আমি আমার এই নাম ত্যাগ করিব। আমি স্বার্থলোভে কথা বলিতেছি না। আমার অশীতিবৎসর বয়স, আমি বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি নিষ্কাম হইয়া আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।' এই বিষ্ণুশর্ম্মা বাঙ্গালী ছিলেন।

পশু-পক্ষি-জীবজন্তু-প্রভৃতির গল্প

আমরা শৈশবে যখন শুনিতাম—

সিংহীর মামা ভোম্বল দাস
বাঘ মেরেছে গণ্ডা দশ!

তখন সম্মুখে সিংহের ও ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি কল্পনায় গড়িয়া তুলিতাম। তখন তাহাতে কতই না আনন্দ হইত। ছোটদের কাছে, শিশুদের কাছে জীবজন্তুর গল্প বড়ই প্রিয়। সে বনের হিংস্র-জন্তু সিংহ, ব্যাঘ্রই হউক, কিংবা পোষা কুকুর, বিড়াল, গরু গাধার গল্পই হউক না কেন।

শিক্ষা ও উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে যুগে মানুষ, নিবিড় বনে-জঙ্গলের নিভৃত কুটীরে বা তপোবনে বাস করিত, তখন তাহাদের প্রতিবাসিরূপে বাস করিত বন্য জন্তু, পাখীর দল,—সর্প, ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, কাক, পারাবত, চটক, শ্যেন, পেচক ইত্যাদি নানাজাতীয় পশুপক্ষী। বনবাসীরা তাহাদের চরিত্র ও গতিবিধি আলোচনা করিবার সুযোগ পাইতেন বলিয়াই তাহাদের চরিত্র অবলম্বনে অনেক আখ্যান বিরচিত হইয়াছে। তাই কাক, কূর্ম্ম, মৃগ, মূষিক, শূকর, শৃগাল, হস্তী, সিংহ, শশক, সর্প—সকলকেই নায়করূপে দেখিতে পাই। সংস্কৃত প্রত্যেক কথাগ্রন্থেই জীবজন্তুর প্রভাব বিদ্যমান। পশু-পক্ষীর পরে আসিল—ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানা এবং কল্পিত সব প্রাণীর কথা, তারপর সমাজের উন্নতি ও শিক্ষা সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইলে—জিহ্বা, উদর, মৃন্ময়পাত্র, কাংস্যপাত্র প্রভৃতির সহিত তুলনা-মূলক শিক্ষাপ্রদ কাহিনী। এই সব গল্প বৃদ্ধেরা ও প্রবীণেরা শিশুদিগকে এবং শিশুপ্রতিম প্রতিবেশীদিগকে বলিতেন। এই সমুদয় গল্পের মধ্য দিয়া যে বিবিধ রস পরিবেষিত হইত, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শিশু-সাহিত্যের এই সকল কাহিনীর সৃষ্টি হইত বক্তার মুখে মুখে। যে গুলি লোকের ভাল লাগিত, সে গুলি লোকের মুখে মুখে শ্রুত হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে, যে গুলি ভাল লাগিত না, সেইগুলি লুপ্ত হইয়াছে। এইভাবে কত গল্প ও কাহিনী যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কেই বা তাহার সন্ধান জানে? আমরা ঐতিহাসিকগণের নিকট হইতে জানিতে পারি যে, এই কথা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম প্রচেষ্টা হইয়াছিল ভারতবর্ষে ও গ্রীসদেশে।

গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ কথা-রচয়িতা ঈশপ খৃষ্টের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেমস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং য়্যাড্মন নামক এক ধনী ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। পশুপক্ষী সম্বন্ধে গল্প রচনা করিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি এই সকল পশু-পক্ষীর কল্পিত গল্প রচনা করিয়া লোকদিগকে পরিহাস করিতেন। এইজন্য ঈশপকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। অনেকের মতে ঈশপ তাঁহার গল্পের আখ্যান-ভাগ বৌদ্ধ জাতক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে 'ঈশপের কথা' নামে ঈশপের গল্প প্রথম প্রচারিত হয়। পরে উহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফিডাস্ নামক একজন গ্রীক্ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার সেই অনুবাদই বর্ত্তমানকালে একরূপ অবিকৃত ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হইতেছে।

রূপকথার শ্রেণীবিভাগ

আমরা রূপকথার কাহিনীগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি:—১। বীরত্ব-ব্যঞ্জক বা দুঃসাহসিকতার গল্প। ২। হাস্য-কৌতুকের কাহিনী। ৩। নির্ব্বোধের গল্প। ৪। অলৌকিক কাহিনী, যাহাতে অসম্ভব সম্ভব হয়, সে সকলের মধ্যে টুপি, জামা, জুতা, কার্পেট, দড়ি, লাঠি, আংটি প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে শূন্যপথে ভ্রমণ করা যায়, শত্রুকে লাঞ্ছিত করা যায়, আপনাকে অদৃশ্য করা যায়, গুপ্তধন লাভ হয়। এইরূপ কত কি অসম্ভাবিত বিষয় সম্ভব হয়। ৫। রাক্ষস রাক্ষসীর গল্পের সহিত অনেক রাজপুত্র ও কোটাল পুত্রের সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া থাকি। এই সব গল্পের রাক্ষস ও রাক্ষসীরা প্রায়ই কোন না কোন রাজপুত্রের হাতে প্রাণ হারায়, তাহাও আবার অধিকাংশ স্থলে কোন না কোন রাজকন্যার মন্ত্রণাগুণে। সেই যে রাক্ষস ও রাক্ষসী তাহারা সারাদিন পরে সন্ধ্যাকালে যখন রাজপুরীতে ফিরিয়া আসে, তখনই মানুষের গন্ধ তাহাদের নাকে যাইয়া পৌঁছে, অমনি বলিয়া উঠে—

হালুমলো গেলুমলো।
মানুষের গন্ধ পেলুমলো।

কিন্তু মানুষের সন্ধান সে কেমন করিয়া পাইবে? রাজপুত্র যে স্তূপীকৃত ফুল-বেলপাতার আড়ালে লুকাইয়া আছেন! রাক্ষসরাক্ষসীর কি সাধ্য আছে তাহার সন্ধান পায়? এদিকে রাজকন্যা, রাজপুত্রকে বলিয়া রাখিয়াছেন, কোন্ সরোবরের জলমধ্যে স্ফটিকস্তম্ভের ভিতরকার শুকপাখীর ভিতর রহিয়াছে রাক্ষসের প্রাণ!—Jack and the Giant এর

গল্পটি আমরা সকলেই জানি। জ্যাক যেমন দুর্গে প্রবেশ করিল অমনি দুর্গের সে দৈত্য বলিয়া উঠিল,—

Fe, fa, fun !
I smell the blood of an Englishman,
Be he alive, or be he dead,
I'll grind his bones to make me bread.

এই সব রাক্ষস-ও-দৈত্য-বিজয়ী বীরেরা প্রায়ই দেবতার বরে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তারপর অশ্ব, তরবারি এবং নানা অস্ত্রও লাভ করিয়া থাকেন। একজাতীয় গল্পের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গল্প হইতেছে মহাভারতের ভীমকর্ত্তৃক বক রাক্ষস-বধ। বাঙ্গালী কবি কাশীরাম দাস তাঁহার রচিত মহাভারতে এই বক-রাক্ষসের কাহিনীটি অপূর্ব্ব কবিত্বসম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল গল্পের কতকগুলিকে পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মমনোবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা রূপক বলিতে চান! রূপকই বলুন আর যাহাই বলুন না কেন, চিরদিনই নবাগত বালক-বালিকাদের কাছে ভীমের বক-রাক্ষস-বধের কাহিনী মহত্ত্বের ও গৌরবের পরিচয় দিবে। ৬। বৃহদাকার পক্ষী, অজগর সর্প—রূপকথার কাহিনীর মধ্যে আমরা অনেক বৃহদাকার পক্ষীর ও অজগরের পরিচয় পাই, যেমন মহাভারতের গরুড়, যুদ্ধরত গজকচ্ছপকে মুখে করিয়া উধাও হইলেন হিমালয়ের দিকে! হাতীলিঙ্গ পক্ষী কৌশাম্বীর রাণীকে লইয়া উড়িয়া গেল! অন্যান্য দেশেও গরুড়ের মত পাখী যে নাই তাহা ত নহে। মহাভারতের যেমন গরুড়, জেন্দের ইয়োরোস্, পারস্যের শিমুর, আরবের অক্, তুর্কের কার্গা, জাপানের কির্ণি, প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যের ফিনিক্স। ৭। পাষাণপরিণতি—আমরা আবার রূপকথার কাহিনী শুনিতে প্রায়ই দেখিতে পাই যে রাজপুত্র বা রাজকন্যা অভিশাপবশতঃ পাষাণে পরিণত হইতেছে। রামায়ণের অহল্যা-পাষাণীর গল্প সর্ব্বজন-বিদিত। সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 'শুকসপ্ততি' গল্পে এইরূপ পাষাণপরিণতির অনেক করুণ-কাহিনী আছে। ৮। জলপুরী, পাতালপুরীর ও বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনী—সে ত অফুরন্ত। আমাদের দেশের এই সব অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের সাহিত্যভাণ্ডার গল্পসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছেন। এণ্ডারসেন্ ও গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় নানা দেশের রূপকথা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পরীর গল্পগ্রন্থ (Fairy Tales) প্রচার করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের বালক বালিকারা নিজেদের দেশের রূপকথা যতটা না জানে, তাহারা তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী এণ্ডারসেন্ ও গ্রীমের পরীর গল্পের সহিত পরিচিত। এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, সভা সমিতি এবং মাসিক-পত্র প্রচার করিতেছেন—আমরা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। ইংরাজ-লেখকেরাও এ বিষয়ে একান্ত অগ্রণী। তাঁহারা আমাদের দেশের রূপকথা সংগ্রহ করিয়া অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

'ইতিহাসমালা'র নাম আপনারা অনেকেই জানেন। সে কালে গল্পকেই সাধারণতঃ ইতিহাস বলিত। এই গ্রন্থে ১৫০টি ক্ষুদ্র গল্প আছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন

হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। কেরী সাহেব বাঙ্গালীর অন্তঃপুর হইতে বুদ্ধা ঠাকু'মা ও দিদিমাদের কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ। বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে লালবিহারী দে'র Folk-Tales of Bengal এবং ডাক্তার দীনেশচন্দ্রের Folk-Literatures of Bengal ইংরাজীতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বাঙ্গালা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের 'ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাদার ঝুলি' Classical literature এর অন্তর্ভুক্ত। তারপর শ্রীযুক্তা শান্তা ও সীতা দেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা' ব্যতীত আরও দুই একখানা গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে।

শিশু-সাহিত্যের এই বিরাট বিভাগটির প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই বিষয়টির তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব-পদাবলী ও শিশু-সাহিত্য

বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব মহাজনপদাবলী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্পর্কে যে সমস্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে একটি নীলকান্তি শিশুর নবনীত-কোমল ঢল ঢল লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিখানি আসিয়া চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হয়।—পদাবলীর মধ্যে শিশুরঞ্জন কবিতার এক অপূর্ব্ব সন্ধান পাই। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাঘটিত বহুপদ কবিত্বপূর্ণ, শ্রুতিমধুর এবং শিশুলীলার হৃদয়গ্রাহী চিত্র। যেমন ভাষার সরলতা, কোমলতা ও লালিত্য, তেমনি ভাবের মাধুর্য্য। কিন্তু এ যাবৎ এগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যে কখনও দেখান হয় নাই। বৈষ্ণব কবিতার এই অংশ বলিতে গেলে বাঙ্গালা-সাহিত্যে অজানিত, অপরিচিত বৈষ্ণব-কাব্যের অরণ্যে বাস করিতেছে।

মাতা যশোমতীর স্নেহের দুলাল চঞ্চল শিশুটিকে বধ করিবার জন্য কখনও পূতনা রাক্ষসী আসিতেছে, কখনও কালীয়নাগ ফণা তুলিতেছে; কেমন করিয়া এই শিশুটিকে বাঁচাইবেন, সেই চিন্তা সেই ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া মাতা যশোমতীর মাতৃহৃদয়ের গভীর স্নেহ ও আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্ত কবিগণ আমাদের কাছে যে অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শিশু সাহিত্যের পরম বস্তু। প্রাচীন কবিগণের এই বাৎসল্য-রসের ভাবধারা—কৃষ্ণকমল গোস্বামী হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও অনুপ্রাণিত হইয়া শিশুরঞ্জনপ্রিয় সাহিত্যের এক নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছে। ননী ছানা খাওয়া—ননী চুরি করা—গোষ্ঠ-যাত্রা, কালীয়-দমন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা হইতে আমরা তাঁহার শিশু-সুলভ চঞ্চলতা, সাহসিকতা এবং সরল সুন্দর চরিত্রের মধুরতা দেখিতে পাই। আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও রাম চরিত্রকে শিশুদের নিকট অবতার রূপে চিত্রিত না করিয়াও—তাঁহাদের শিশু-জীবনের চিত্র শিশু-সাহিত্যের মনোজ্ঞ উপাখ্যানরূপে উপস্থিত করিতে পারি। ইংরাজ লেখকগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা-সম্পর্কিত ঘটনা লইয়া অনেক শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমরা এই দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে কালকেতুর বিক্রম শিশুদের পরম উপভোগ্য।

ইংরাজশাসন ও শিশুসাহিত্য

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর শিক্ষা-বিষয়ক আদেশ প্রচারের পর হইতে এদেশে নূতন শিক্ষারীতি প্রবর্ত্তিত হয়। সেই প্রথম যুগে পাঠশালা ইত্যাদি স্থাপিত হইলে পর দেখা গেল যে শিশুদের পড়িবার মত কোনও পুস্তক নাই। তখন শ্রীরামপুরের মিশনারী-সম্প্রদায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য 'শিশুবোধক' নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা ঈশপের ও অন্যান্য গল্পের বই, 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি প্রকাশ করেন। - কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিশু-সাহিত্যের দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 'দিগ্দর্শন' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন—তাহার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিস্তার। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। উহার প্রথম সংখ্যায় ছিল।—১। সূচনা, ২। হোমা ৩। গ্রাম্য গ্রন্থালয় ৪। জিব্রা-পশুর বিবরণ ৫। শিখ ইতিহাস। ৬। কৌতুক-কণা। পত্রিকার আকার ছিল—প্রথমে ডিমাই ৪ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।—সে যুগে সাধারণ জ্ঞানবিস্তারের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিতে গেলেও 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'কে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই পত্রিকা বিলাতি 'পেনি গেজেটের' আদর্শে প্রকাশিত হইত এবং চিত্রাদি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিত।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক ও সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু শিশুসাহিত্যের আনন্দ পূর্ণ অভিযানের দিক্ দিয়া তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন নাই। তবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত 'কথামালা', 'আখ্যান-মঞ্জরী' প্রভৃতি সেকালে শিশুদের মনে দেশীয় না হইলেও বিদেশী বালক ও মহাপুরুষগণের অবদান-কাহিনী ও গল্প শুনিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'গোচারণের মাঠ' এক সময়ে শিশু-সাহিত্যে পরম আদরণীয় হইয়াছিল। সে সময়ে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসু প্রভৃতি মনীষিগণ শিশুসাহিত্যের দিক্ দিয়া কিছু কিছু দান করিয়াছেন।

শিশুসাহিত্যে মাসিক পত্রিকা

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 'সখা' নামে শিশুদের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক উৎসাহী যুবকের প্রাণে শিশুদিগকে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিবার জন্য যে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই ফলে তিনি রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া, শিশুপাঠ্য বিবিধ ইংরাজী

গ্রন্থ পড়িয়া—ছবি সংগ্রহ করিয়া তবে 'সখা' প্রকাশ করেন। 'সখার' প্রতিষ্ঠাতা সেই প্রমদাচরণ সেনকে আজ আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। 'সখার' লেখা সরল ও সরস ছিল। বিষয়-বৈচিত্র্যও ছিল। ছবিগুলি আর্টিষ্ট প্রেসে কাঠে খোদিত হইয়া মুদ্রিত হইত। আজ এখানে যে সব প্রাচীন ও প্রাচীনা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সেই ষাট বৎসর আগে যখন খোকা ও খুকু ছিলেন—তখন তাঁহাদের কাছে 'সখা' ছিল দুর্লভ নিধি। প্রমদাচরণ অকালে প্রাণত্যাগ করিলে পর—স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, অন্নদাচরণ সেন, ভুবনমোহন রায় প্রভৃতি 'সখা'র সম্পাদকতা করেন। ঐ সময়ের কিছু পরে 'সখা' ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী'র সহিত মিলিত হইয়া 'সখা ও সাথী' নামে প্রকাশিত হয়।—সেই যুগে একজন মহীয়সী মহিলা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মাতৃহৃদয়ের স্নেহ ও কোমলতা লইয়া 'বালক' প্রচার করেন। 'সখার' পরে ক্রমে ক্রমে 'মুকুল', ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উৎসাহে 'বালক বন্ধু' প্রভৃতি ছোটদের অনেক মাসিক পত্রিকাদি প্রকাশিত হয়।—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা, ঢাকা এবং বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে যে সকল শিশুদের মাসিক পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার একখানাও বাঁচিয়া নাই। চন্দননগরবাসী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'অবকাশ-বন্ধু'ও এক সময়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

শিশুসাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টুরূপে যিনি পরিচিত, যিনি ছিলেন—শিশুদের পরম প্রিয়জন, যিনি বাঙ্গালী শিশুদের হাতে হাতে 'সন্দেশ' বিতরণ করিতেন—যাঁহার বিরচিত 'ছেলেমেয়েদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের গল্প' প্রভৃতি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে, সেই সৌম্যদর্শন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশুসাহিত্যের গ্রন্থ-রচনায় এবং পত্রিকা-সম্পাদনে এক নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন ।

আমরা 'সন্দেশের' মধ্য দিয়াই পাইয়াছিলাম অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী 'আবোল তাবোলের' অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি সুকুমার রায়-চৌধুরীকে। তাঁহার 'আবোল তাবোল' Nonsense Rhymes এর অপরূপ দান। আমাদের বাঙ্গালী শিশুরা প্রতিদিন বইয়ের বোঝা কাঁধে করিয়াই জীবন-পথে চলে, তাহাদের এই হাস্যবিরল জীবনে সুকুমারই শুধু অনাবিল হাস্যরস পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতা ও ছড়া শুধু শিশু নয়, শিশুদের পিতা ও অভিভাবকগণের গুম্ফশোভিত গুরুগম্ভীর মুখেও হাসির লহর ফুটাইয়া তোলে। উপেন্দ্রকিশোরের যোগ্য পুত্র ছিলেন সুকুমার।—তাঁহার ভগ্নী সুখলতা রাও এবং কনিষ্ঠভ্রাতা সুবিনয় এখনও শিশুসাহিত্যে পিতৃনামের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা শিশুসাহিত্যের মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'মৌচাক' ও 'শিশু-সাথী'কে সর্ব্বাগ্রে অভিনন্দিত করিতেছি। 'মৌচাকে'র সপ্তদশ বর্ষ চলিতেছে, 'শিশু-সাথী'র পঞ্চদশ বর্ষ চলিতেছে। অন্যান্য মাসিকের মধ্যে 'মুকুল' (নবপর্য্যায়), 'রামধনু', 'মাসপয়লা' 'কৈশোরিকা', ও নব প্রকাশিত 'রংমশালের' নাম করিতে পারি। আরও হয়ত দুই একখানি আছে, যাহা আমি জানি না। শিশুদের এই সব মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণ ও ও প্রকাশকগণ দিনদিনই তাঁহাদের প্রচারিত পত্রিকার উন্নতির জন্য মনোযোগী হইতেছেন

এবং তাঁহাদের দৃষ্টিও আজ সুদূর-প্রসারিত। আজ তাঁহারা জাতিগঠনের যে পুণ্যব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহার পূর্ণ সফলতাই আমাদের বাঞ্ছনীয়। এদিক্ দিয়া কিন্তু আমাদের অনেক কিছু উন্নতি করিবার পথ রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রকাশিত যে কোন শিশুদের মাসিকের সহিত তুলনা করিবার মত যোগ্যতা এখনও আমরা অর্জ্জন করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, তাহার অনেক কারণও রহিয়াছে। আপনারা দেখিতে পাইবেন যে বর্ত্তমান সময়ে 'Strand Magazine', 'Windsor Magazine' প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজি মাসিক পত্রিকাগুলিতে ছেলেদের বিশেষ পৃষ্ঠা থাকে। সুপ্রসিদ্ধ 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী পত্রিকায় 'ছেলেদের পাততাড়ি' প্রকাশ করিতেন, তাহাতে শিশুদের জানিবার মত নানা বিষয় প্রকাশিত হইত। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার 'চতুষ্পাঠী' ঠিক্ ঐ আদর্শে চলিতেছে। আশা করি 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণও এই রীতি প্রবর্ত্তন করিবেন। বিলাতের কি দৈনিক কি সাপ্তাহিক প্রত্যেক পত্রিকাতেই Children's Corner নামে একটি বিভাগ আছে। আমাদের দেশের সম্পাদকগণের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

শিশুদের সাপ্তাহিক

আপনারা অনেকেই জানেন যে বিলাত হইতে 'The Children's Newspaper' নামে শিশুদের জন্য একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক Arthur Mee. ১৯১৯ সাল হইতে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতেছে। 'Children's Newspaper'এর শিরোভাগে লিখিত আছে—The Story of the World to-day for Men and Women of to-morrow. এই পত্রিকাখানির আকার বেশ বড়, প্রতি-সংখ্যায় ২০ পৃষ্ঠা থাকে। ইহাতে শিশুদের জানিবার মত পৃথিবীর সমুদয় সংবাদ আছে, চিত্রের সংখ্যাও অফুরন্ত। আমরা জানিতে পারিলাম শিশুদের সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে এই পত্রিকাখানিই প্রথম এবং সবচেয়ে প্রাচীন। আমাদের দেশের শিশুদের জন্য এইরূপ একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের শিশুসাহিত্য

আমার অনেক দিন আগের কথা বলিতেছি,—আমি যখন আট নয় বৎসরের বালক তখন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'হাসি ও খেলা' দেখি। সেই জীবনে প্রথম ছবির বই দেখিয়াছিলাম। তখনকার দিনে এ বইখানা হাতে পাইয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলাম সে কথা এখনও মনে পড়ে। সেই 'যায় রে যায় সোণামণি, মামার বাড়ী যায়',—'শুধু দৌড়ে এলে চল্‌বে না, সন্দেশ তায় মিলবে না' শুনিলে এখনও সন্দেশের লোভ ছাড়িতে পারি না। তাঁহার সব ক'খানি বই চিরদিন শিশুদিগকে আনন্দ দান করিবে। সেকালের সেই 'সখা'র আমল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শিশু-সাহিত্যের যাঁহারা সেবা করিয়া

আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ যোগীন্দ্রনাথ, কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কুলদারঞ্জন রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মানকুমারী বসু, দাদা জলধর সেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দীনেন্দ্রকুমার রায়, অপূর্ব্বকুমার দত্ত প্রভৃতি এখনও জীবিত রহিয়াছেন। দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, স্বর্ণকুমারী, মণিলাল, ললিতকুমার, প্রিয়ম্বদা দেবী, উমা দেবী প্রভৃতির নাম আজ স্মরণ করিতেছি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও শিশু সাহিত্য

আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা। নদীর অপর পারে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, সে মাঠ অতিদূরে চক্রবাল রেখার সহিত যাইয়া মিশিয়াছে। আমরা যখন পাঠশালায় পড়িতাম,তখন আমাদের সুদূর পল্লীগ্রামে সাহিত্যের বার্ত্তা অতি অল্পই পৌঁছাইত, তখন 'পদ্যপাঠ' ও 'পদ্যমালা'র কবিতাই ছিল একমাত্র আদরণীয়। সেই সময়ে একদিন এক বর্ষণমুখর শ্রাবণের সন্ধ্যায় আমার স্বর্গীয় দাদা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

দিনের আলো নিবে এলো, সূর্য্যি ডোবে ডোবে,
আকাশ ঘিরে মেঘ উঠেছে চাঁদের লোভে লোভে।

*　　*　　*

বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলে বেলার গান,
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

সেই আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অমৃত-রসের প্রথম সন্ধান পাই। সেদিনকার সেই সন্ধ্যায়—

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেও করে না মানা।

শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল, মেঘেরা যেন আমার কানের কাছে আসিয়া তাহাদের অনেক লুকোচুরির কথা বলিয়া গিয়াছিল।

অৰ্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে যাঁহার সাহিত্য-সাধনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের সোণার মন্দিরের দ্বারখানি খুলিয়া গিয়াছে, যিনি আজ বাঙ্গালার ও ভারতের গর্ব্ব সেই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ শিশুদের মঙ্গলের জন্য আজিও অজস্রভাবে পুষ্প-পল্লবে তাহাদের যাত্রাপথে নব নব আনন্দ-তোরণ রচনা করিতেছেন।

আমরা আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি শুধু বাঙ্গালার নয়, সমগ্র বিশ্বজগতের শিশুরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর দেখিতে পাইতেছে,—কত 'বীরপুরুষ', কত 'সাত ভাই চম্পা', কত 'কানাই মাষ্টার', 'তালগাছ', 'কাগজের নৌকা', আর 'ইচ্ছামতী নদী' বহিয়া চলিয়াছে—কত শরৎ ও বসন্তের উৎসব হইতেছে। শিশু-সাহিত্যেও তিনি বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্। গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' সংগ্রহে সব দিক্ দিয়াই তিনি নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার 'শিশু', 'শিশুভোলানাথ', 'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' প্রভৃতি গ্রন্থ শিশু-সাহিত্যের অমূল্য কোহিনূর। শান্তিনিকেতনের মহর্ষির সাধন-পীঠ তাই আজ

তপোবনের পুণ্য আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। সেখানকার উন্মুক্ত নীলাকাশ, দিগন্তপ্রসারী মাঠ, সাঁওতাল-পল্লী, রাঙামাটির পথ বালকদের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির যে একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহার উপলব্ধি জাগাইয়া দিয়াছে। শিশু-মনস্তত্ত্বের গোপন-কথাটি তিনি জানেন বলিয়াই তাঁহার লেখায় শিশু-সাহিত্যের প্রকৃত রূপটি আমরা দেখিতে পাইতেছি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কথাপ্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারি।—

"আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য করুণ রসের উদ্রেক করে' তাদের হাসিয়েছি, কাঁদিয়েছি। তা'ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোট গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে ৫।৭ দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরী করবার আমার শক্তি ছিল। এই বানান গল্পের অনেকগুলি আমার "গল্প-গুচ্ছে" স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে—গল্পে গানে, রামায়ণ মহাভারত পাঠে সরস হয়ে উঠে তার চেষ্টা করেছি।"

আমরা আজ শিশুদের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি এবং প্রণতি জানাইতেছি।

শিশু-সাহিত্যের নূতন যুগ

এখন আমরা শিশু-সাহিত্যের নূতন যুগে আসিয়া পড়িয়াছি। ইউরোপের ও আমেরিকার মনীষীরা ও নবজাগ্রত জাপান কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসেরি, নার্সারি বিদ্যালয় (সম্প্রতি কলিকাতা সহরেও এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে) প্রতিষ্ঠা করিয়াও শিশুদের শিক্ষার জন্য এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছেন।

তাঁহারা শিশুদিগকে কেবল শিশু বলিয়াই মনে করেন না, তাঁহারা তাহাদিগকে জাতীয় সম্পদ বলিয়া মনে করেন। প্রত্যেক শিশুর মনে তাঁহারা এই ভাব জাগাইয়া দেন যে—Children, you will be the citizen of the future ! এই যে শ্রদ্ধার ভাব—এই যে বুঝিতে দেওয়া, তোমরা মানুষ—ক্ষুদ্র নহ,—এই শিক্ষাই ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে দেশ-প্রেমিক ও মাতৃভূমির সুসন্তান করিয়া তোলে। তাঁহাদের শিশু সাহিত্যও এইভাবেরই দ্যোতক।

বাঙ্গলাদেশ ও শিশুসাহিত্য

বাঙ্গালাদেশে শিশু-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে উপলব্ধি অতি অল্প দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অল্প সময় হইলেও—শিশু-সাহিত্যের নানা বিভাগে আমরা যে অর্ঘ্য-ডালা সাজাইতে পারিয়াছি, তাহা ভারতের অন্য যে কোন প্রদেশের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাতির ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আমরা শিশু-সাহিত্যে গঠনে মনোযোগী হই নাই। আমরা যদি শিশু-সাহিত্যের একখানা ক্যাটালগ প্রস্তুত করি তাহা হইলে বেশীর ভাগই পাইব—ছড়া ও গল্প। এমন কি ডিটেক্টিভ উপন্যাস ও ভূতের গল্পকেও আমরা শিশু-সাহিত্যরূপে পরিচিত করিতে ইতস্ততঃ করি না।

আমাদের দেশের লেখকেরা ও প্রকাশকেরা Graded বা ক্রমপদ্ধতি-অনুযায়ী কোন গ্রন্থ রচনা করেন না। কাজেই পাঁচ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের জন্য বই কিনিতে যাইয়া ষোল বৎসরের ছেলের উপযোগী বই কিনিতে হয়। ইহাতে ছেলেমেয়েদেরও যেমন নিরুৎসাহের কারণ হয় তেমনি অভিভাবকেরও অর্থের অপব্যয় হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রকাশকেরা ও গ্রন্থকারেরা এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আপনারা ঐ সব দেশের পুস্তক-প্রকাশকগণের কোন একখানা ছেলেদের বইয়ের ক্যাটালগ খুলিলে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহারা এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। যেমন **Gift Books for Children, Ages 5-11 years; Gift Books for Boys and Girls, Ages 12 to 16 years; Gift Books specially suitable for Girls**—ইত্যাদি। আমাদের দেশের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

শিশু-সাহিত্যের মাসিকপত্রিকা-সম্পাদকগণের এদিকে একটা কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি নিজ নিজ সম্পাদিত পত্রিকায় মাসিক একটা পুস্তকের বিবরণী দেন তবে ভাল হয়। বিদেশী সম্পাদকেরা এ বিষয়ে যত্নশীল। তাঁহারা "কি বই কিনিবে?" এই শিরোনামায় সে সব বইয়ের সচিত্র পরিচয় দিয়া থাকেন। ছবির বই, রূপকথা ও গ্রাম্য কাহিনী, জীব-জন্তুর কাহিনী, দেশবিদেশ, পৃথিবীর পরিচয়, সমুদ্রের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, দুঃসাহসিকতার কাহিনী—এইভাবে বইয়ের পরিচয় থাকে।

জেনেভার আন্তর্জাতিক শিক্ষাসঙ্ঘের কথা আপনারা জানেন—উক্ত সঙ্ঘ বাঙ্গালা-দেশের নারী-শিক্ষাসঙ্ঘের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলার শিশু-সাহিত্যের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া সে সমুদয় পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তাহা জেনেভায় পাঠাইয়া দেন, ঐ সমুদয় পুস্তক জেনাভার আন্তর্জাতিক শিশু-পাঠাগারে রক্ষিত হইবে।—বাঙ্গালার এই নারীসঙ্ঘ রূপ-কাহিনী, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পুরুষ ও নারীদের জীবনী, জীবজন্তুর কথা, ছোটদের কবিতা হইতে পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। জানি না তাঁহারা কি ভাবে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। বিশ্বশিক্ষারাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি এইভাবে বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি অনুবাদ করিয়া নানাদেশে প্রচার করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং একটা প্রীতির সম্বন্ধস্থাপনেরও সুযোগ হয়।

শিশুসাহিত্যে কি চাই?

শিশুদের মনোবিজ্ঞান এবং শিশু-প্রকৃতি বুঝিয়াই আমাদের শিশু-সাহিত্য গড়িতে হইবে। আমাদের দেশে যেমন শিশু প্রতি মুহূর্ত্তে তাড়িত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, এমন কোন দেশে হয় না। আমরা তাড়না করিতে জানি—স্নেহের অবিচার ও অত্যাচার করিতেই জানি, মানুষ করিতে জানি না।—আমার একটি মেয়ে ছেলেবেলায় আমাকে বলিত —'বাবা! দিনরাত কেবল পড়ার কথাই বল, খেলার কথা ত একবারও বল না!' কথাটা আমি ভুলিতে পারি নাই। শিশুদিগকে শিক্ষার আনন্দ দেওয়ার জন্য শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি।

শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের প্রাণে আগ্রহ ও উৎসাহ জাগাইয়া দেওয়াই হইতেছে শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাজ। হাসি, খুসি, গল্প, খেলার মধ্য দিয়াই শিশুদের শিক্ষার পথে অগ্রসর করিতে পারিলে তাহারা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইবে। আমাদের শিশু-সাহিত্যে ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাণি-বিজ্ঞানের কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাই। তারপর যে ভাষায় ইতিহাস লিখিত হয় তাহাতে ছেলেদের মন উহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে না। যে সব ইতিহাস আছে তাহার অধিকাংশই পাঠ্য পুস্তক। সে সব বই সরকারি বাঁধা নিয়মে লিখিত। কাজেই তাহা ভাষা ও চিত্র সৌন্দর্য্যে শিশুদের মন আকর্ষণ করিবার মত হয় নাই। ইংরাজ লেখকেরা আমাদের ভারতবর্ষ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর বই লিখিয়াছেন। সেদিন এই শ্রেণীর কয়েকখানি বই আমার হাতের কাছে আসিয়াছে। 'Children's India' বইখানার নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। বইখানার পাতায় পাতায় ছবি, পুরু কাগজে ও বড় বড় অক্ষরে ছাপা। অথচ পত্রাঙ্ক এক শতেরও কম। অষ্ট্রিয়ার একজন মহিলা The World Library for Children নাম দিয়া জাপান, চীন হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সব দেশের গল্পের কথা বলিয়াছেন। প্রত্যেক সংখ্যার দাম মাত্র এক পেনি। ভারতের কোনও প্রাদেশিক ভাষায় আজ পর্য্যন্তও ইহার অনুবাদ হয় নাই। Child Educationএর মত ছোটদের কোন মাসিক বাঙ্গালাদেশে আছে কি? আমাদের আজ কত বড় দুর্ভাগ্য যে বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস জানে না। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত গুপ্তের পর—(অবশ্য তাঁহারা পাঠ্য পুঁথিই লিখিয়াছিলেন)—কেহ কি ছেলেদের জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন? "পৃথিবীর ইতিহাস—চিত্রে ও গল্পে" প্রকাশ করিয়া শিশির পাব্‌লিশিং হাউস একটি মহৎ কাজ করিয়াছেন।

ভূগোলের ন্যায় এমন একটি মনোজ্ঞ বিষয়ের কি একখানিও উৎকৃষ্ট পুস্তক আমাদের আছে? ভারতবর্ষের একখানা চিত্রবহুল ভূগোলের বই অনায়াসেই রচিত হইতে পারে। এসিয়ার ও পৃথিবীর নানাদেশ ও মহাদেশের সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ লিখিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে ভূগোলবিষয়ক কোনও পত্রিকা নাই। National Geographical Magazine, Geographical Magazine প্রভৃতি পত্রিকা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ছবি দেখিয়াও ছেলেরা অনেক কিছু জানিতে ও শিখিতে পারে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্গত ভৌগোলিক সমিতি হইতে একখানি পত্রিকা সম্প্রতি বাহির হইতেছে, তাহার কোনও সংখ্যা দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই।

ইতিহাস ও ভূগোলের দিক্ দিয়া আমাদের শিশু-সাহিত্যে দিবার মত অফুরন্ত ভাণ্ডার পড়িয়া আছে! সেই রত্ন-ভাণ্ডার হইতে আজ আমাদের রত্ন চয়ন করিতে হইবে, নতুবা—

> দেখ বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
> ভারতের মানচিত্র! উত্তরেতে ঐ মসীরেখা—

দেখাইয়া হিমালয় পর্ব্বতকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। হিমালয়ের বিভিন্ন চিত্র

দেখাইয়া হিমালয় পর্ব্বতকে বুঝাইতে না যাইয়া এইরূপ নীরস ভাবে শিক্ষা দিলে, তাহারা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইবে কিরূপে? ইতিহাসের দিক্ দিয়া সেই সুধু রাজার পর রাজাদের অর্থহীন নাম মুখস্থ করিলে—কোথা হইতে ইতিহাসের সরসতা আসিবে?

শিশু-পাঠাগার

শিশুদের চঞ্চল মন, সব সময় একই দিকে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। এ জন্য প্রত্যেক স্কুলে শিশুদের জন্য লাইব্রেরী (Children's Library) থাকা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হয়ত ছোট একটি শিশু খেলিতে খেলিতে ক্লান্ত হইয়া একখানা রঙিন ছবির বই দেখিয়া আসিল,—কখনও বা একখানি হাসির কবিতার বই পড়িতে লাগিল, হয়ত বা কেহ যন্ত্র-বিজ্ঞানের, ছাপাখানার কিংবা হেঁয়ালির বই লইয়া মনঃসংযোগ করিল—কেহ হয়ত ইতিহাস ও অর্থনীতির বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, কেহ বা খেলার বই, শিকারের বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল, কেহ বা বিজ্ঞানের বই, উড়োজাহাজের গল্প লইয়া বসিল! একজন হয়ত পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবি লইয়া বসিল,—এই ভাবে শিশুদের পড়িবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, তাহারা সাহিত্যের মূল্য বোঝে, ভাষা শিখিতে চায়, বুঝিতে পারে যে, বই না পড়িলে জ্ঞান অর্জ্জন করা যায় না। চঞ্চল শিশুদের এই ভাবে সাহিত্যানুরাগী করিতে হইলে প্রত্যেক স্কুলের শিশু পাঠাগারে চাই নানাপ্রকারের শিশু-সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থের সমাবেশ।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারসম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই আন্দোলনের নেতৃবর্গকে ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ন্যায় Children's Library movement-টাকেও সজাগ করিয়া তুলিতে বলি। কলিকাতা করপোরেশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই শ্রেণীর শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাঙ্গলাদেশের জেলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটিও এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। তারপর ব্যক্তিগতভাবে ধনী ও মধ্যবিত্ত এমন কি সাধারণ অবস্থার লোকেরাও নিজ নিজ বাড়ীতে শিশুদের জন্য ছোট খাট লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিতে পারেন।—আমাদের দেশের একমাত্র সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান সাহিত্যপরিষদ। তাঁহারা সুধু পুরাতত্ত্বকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, উষার অরুণ জ্যোতির মধ্য দিয়াই নবাগত তপনের প্রকাশ। পাশ্চাত্য প্রকাশকগণের মত, তাহাদের প্রতি বৎসর উৎকৃষ্ট গ্রন্থের (Children's Best Books) পরিচয় প্রকাশ করা আবশ্যক। ১৯৩৬ সালে Bengal Government "Catalogue of Books for Class Libraries of High and Middle Schools in Bengal" প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ছেলেদের উপযোগী শিশু-সাহিত্যের ইংরাজী ও বাঙ্গালা বইয়ের নাম আছে। এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ছোটদের পক্ষে এই লাইব্রেরী—শিশুদের আনন্দ, বিশ্রাম এবং প্রতিভা উন্মেষের কেন্দ্রস্থান।

শিশুদের শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগী করিবার জন্য আজকাল জাপান, জার্ম্মানি, সোভিয়েট রুশিয়া, ইটালি, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সিনেমার সাহায্যে শিশু-সাহিত্যের

উৎকৃষ্ট গ্রন্থের, নানা দেশের এবং শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়া থাকে,—আমাদের দেশে কি শিক্ষা-বিভাগ, কি সিনেমা কোম্পানী ঐরূপ Educational Film দেখাইবার কোন উদ্যোগই করেন নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এইরূপ কিছু কিছু চিত্র দেখাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ দেশভ্রমণ দ্বারা শিক্ষার পথ সুগম করা হয়। আজ কাল প্রত্যেক রেল কোম্পানীই ছাত্রদের ভ্রমণের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, বেঙ্গল নাগপুর এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি বিশেষভাবে অগ্রণী। গ্রামের ছেলেরা ইতিহাস ও ভূগোলে কলিকাতা, গৌড়, হুগলী, চন্দননগরের কথা পড়ে, তাহাদের যদি এই সব স্থানগুলি দেখাইয়া আনা যায়, তাহা হইলে তাহাদের ইতিহাস ও ভূগোল পড়িবার প্রতি আগ্রহ বর্দ্ধিত হইবে। ১৯৩৫ সালে—২,৫০০ জার্ম্মেন বালক বালিকা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া—পৃথিবীর নানাদেশ বেড়াইয়াছে।

ছেলেদের কবিতা ও সঙ্গীত

শিশু-সাহিত্যের এই একটি দিকের প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। তাহাদিগকে স্বাভাবিকভাবে কবিতা, ছড়া ও গানের প্রতি অনুরাগী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের এই অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে জীবিত, প্রবীণ ও তরুণ কবিগণের দান উল্লেখযোগ্য।

শিশুদের মনে দেশপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক পরিবারে শিশুদের কাছে আমাদের দেশের মহিমজ্ঞাপক সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের সোণার বাঙ্গলার শ্যাম মাধুরী, ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সঙ্গীত যদি তাহারা শৈশব হইতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহারা যে দেশে জন্মিয়াছে, যে দেশের মাটিতে তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ একদিন বিচরণ করিয়াছিলেন, যে দেশের জল-বায়ু মাটি তাহাদের শরীর গড়িয়া তুলিয়াছে সেই মাতৃভূমির শতকীর্ত্তি-বিভূষিত সৌন্দর্য্যচিত্র নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া শিখাইবে দেশকে ভালবাসিতে।—এলাহাবাদ যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-বিভাগে স্বদেশ সঙ্গীতও তাঁহাদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূত করিয়াছেন। তারপর Action song, ছোটদের অতি ছোট অভিনয়ের নাটক, ছবি আঁকা, গানের খেলা, কত দিক্ দিয়া যে আমরা আমাদের শিশুদিগকে সাহিত্য রচনা করিবার আনন্দ দান করিতে পারি তাহার অবধি নাই। দৃষ্টান্ত দেওয়ার অবসর এখানে আমার নাই তাহা হইলে প্রত্যেকটি বিষয় আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে পারিতাম।

শিশুদের বইয়ের দোকান

আমি সেদিন Library Journal নামক পত্রিকায় দেখিতে পাইলাম যে ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন যায়গায় শিশুদের বইয়ের দোকান আছে। সে সব দোকানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে যেমন বই ভালবাসে তাহা কিনিয়া আনে। কেহ আনে ভ্রমণ, কেহ বা আনে ইতিহাস, কেহ কেনে ভূগোল। এই সব দোকানে ছেলে-মেয়েদের

বসিবার জন্য যায়গা আছে, তাহারা ইচ্ছানুসারে বই দেখিয়া শুনিয়া কিনিতে পারে। সব ছেলের জ্ঞান ও রুচি, বিদ্যা ও বুদ্ধি ত সমান নয়, অবস্থাও সমান নয়, সে জন্য এক পেনি, দু'পেনি হইতে আট দশ শিলিংএর বইও আছে। আমাদের দেশের শিশুদের বইয়ের দোকান করিতে যদি কেহ অগ্রসর হন, তাহা হইলে দেশের একটি প্রকৃত কল্যাণ হইবে এবং তাহাতে লাভবানও হইবেন। শিশুরা মিলিবার মিশিবার সুযোগ পাইবে।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তব্য

আমাদের দেশের শিশু-সাহিত্য প্রচার-কল্পে শিক্ষাবিভাগ অনেক কিছু করিতে পারেন। শিক্ষার মূল মন্ত্র স্বাধীনতা। সাহিত্যের মূল মন্ত্র স্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে লেখকেরা যদি কোন গ্রন্থ রচনা করিতে না পারেন, তাহা হইলে সাহিত্যের রস বিকাশলাভ করিতে পারে না। এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগ পদে পদে নিয়মের বেড়া রচনা করিয়া আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া দিতেছেন।

এত দিন শিশুসাহিত্যের পুস্তক পরীক্ষার জন্য কোনরূপ ফি দিবার ব্যবস্থা ছিল না, সম্প্রতি বোধ হয় শিশু-সাহিত্যের বা Juvenile Literature-এর প্রতি লেখক ও প্রকাশকগণের উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া শিক্ষা-বিভাগে ৬৲ টাকা করিয়া ফি লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়া শিশু-সাহিত্য প্রচারের অনেকটা পথ বন্ধ করা হইল। এখন হয় ত কোন স্কুলেই শিক্ষা-বিভাগের অননুমোদিত কোন বই কেহ ক্রয় করিতে পারিবেন না। শিক্ষকদের নিজেদের স্কুলের প্রাইজ ও লাইব্রেরী বই কিনিবার মত সুবিধা ও স্বাধীনতাটুকুও অপহৃত হইল—এ সম্বন্ধে আমরা শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি যেন প্রাইজ ও লাইব্রেরী বইয়ের সম্পর্কে পূর্ব্বের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ফি নেওয়ার পথ বন্ধ করেন। এত দিন যে রীতি চলিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে কি তাঁহাদের বলিবার আছে তাহাও জানা আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

শিশু-সাহিত্যের সহিত শিশুদের শিক্ষার কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সে বিষয়ে বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারাই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন ও করিবেন। আমি এখানে শুধু দুই একটি কথার উল্লেখ করিব। প্রথম কথা এই যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হঠাৎ বাঙ্গালা সরকারের মাথায় কেন আসিল? এ দেশ হিন্দুর দেশ, এ দেশ মুসলমানের দেশ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং নানা জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দেশ। সে দেশের পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ে সব ধর্ম্মের ছেলেরাই পড়ে—তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাও আবার জন্মান্তরবাদ! আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। ১৮৮২-৮৩ সালের Education Report-এ ভারত-সরকার শিক্ষার কয়েকটি মূলনীতি নির্দ্দেশ করেন তাহা এইরূপ (১) ধর্ম্ম-শিক্ষা-বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না; (২) ধর্ম্ম-বিষয়ে

শিক্ষাদান হউক বা না হউক, শিক্ষা বিভাগের নিয়মানুসারে পরিচালিত হইলে লৌকিক শিক্ষার জন্য সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ই সাহায্য প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। আশা করি দেশবাসী এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—শিক্ষা বিষয়ে আমরা ছোট ছোট শিশুদিগকে নিয়মিতভাবে নির্য্যাতন করিতেছি। শিক্ষাবিভাগ এ বিষয়ে অগ্রণী। আমরা পাঠশালা ও মক্তবের কোমলমতি শিশুদিগের কাঁধে বহুসংখ্যক পুস্তকের বোঝা চাপাইয়া দিয়া পূতনা রাক্ষসীর মত শিশুবধ যজ্ঞে অগ্রসর হইয়াছি। এখানে একটি ঐতিহাসিক কথা বলিতেছি। পাঠশালা চতুষ্পাঠী বা মক্তবে অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রচলিত শিক্ষার বিষয় বা প্রণালীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মোগল সম্রাট আকবরের কিরূপ দূরদর্শীতা ছিল, তাহা আমরা অনেকেই জানি।

আজ আমরা সম্মুখের দিকে যে নূতন জগৎ দেখিতে পাইতেছি, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী জাতির স্থায়ী আসন গড়িতে হইবে। সেই আসনখানিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদের শিশুদিগকে আশা দ্বারা, উৎসাহের দ্বারা, শক্তির বিকাশ করিতে হইবে। তাহাদের মনন শক্তি, তাহাদের কর্ম্মশক্তি যেন এক আশা ও উৎসাহের সহিত মনুষ্যত্বের সাধনার পথে অগ্রসর হয়। আজ তাহাদের জন্য আমাদিগকে স্থায়ী সাহিত্য গড়িতে হইবে—জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার মুক্ত করিতে হইবে।

শিশুরা আমাদের এই দুঃখময় পৃথিবীতে যে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেই স্বর্গরাজ্য হইতে যাহাতে তাহাদিগকে চ্যুত হইতে না হয়, সেই মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে আমাদের সম্মুখে। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতেছি—

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ
ধরায় উঠেছে ফুটি, শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

সুকুমার শিল্প-শাখার সভাপতির

অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত বন্ধুগণ,—

একজন গ্রীক দার্শনিক, সাইমোনাইদীস্ বলে গেছেন যে,—"কথা ব'লে, পরে তাঁহাকে অনেকবার অনুশোচনা কর্ত্তে হয়েছে,—কিন্তু, জিহ্বাকে শুব্ধ করে, কখনও তাঁকে পরিতাপ কর্ত্তে হয় নাই।" জীবনের যে কোনও বিভাগে, কথা কইলেই তাহার কিছু না কিছু বিপদ আছে,—কিন্তু রূপশিল্পের রাজ্যে কথা বলাটা সকলের চেয়ে বেশী পাপ। কারণ, কথা ব'লে কোনও রীতির রূপ-শিল্পের কোনও পরিচয় দেওয়া যায় না। শিল্পকে শিল্পের ভাষার মধ্যেই বুঝতে হবে, তাহাকে অক্ষরের ভাষায় অনুবাদ কল্লে, শিল্পের নিজস্ব রূপের অস্তিত্বকে অস্বীকার ও অপমান করা হয়। শিল্প, সাহিত্যের রূপ বা ভূমিকা গ্রহণ কল্লে, তাহা আর শিল্প-পদবাচ্য থাকে না। একথা সত্য, যে শিল্পের রূপের পরিচয় ও স্পর্শ লাভ করে, শিল্পের নানা বিচিত্র রূপের আস্বাদ পেয়ে, আনন্দ পেয়ে, মানুষ,—সেই পরিচিতির, সেই আনন্দের স্বরূপের বিশ্লেষণ করে, সাহিত্যের ভাষায় নানা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখে আসছে। শিল্পের প্রতিক্রিয়া, শিল্পের বিচার, বিশ্লেষণ ও তত্ত্বান্বেষণ, 'লিখিৎ-পড়িৎ' বিদ্যার ভাণ্ডারে বিপুল সাহিত্য গড়ে তুলেছে। শিল্পের ইতিহাস ও জীবন-চরিত, শিল্পের বিবরণ ও তত্ত্ব-কথা, সাহিত্যের ভাষায় কথা গেঁথে লিপিবদ্ধ হয়েছে। Aristotle, Pliny থেকে আরম্ভ করে Croce পর্য্যন্ত রূপ-শিল্পের নানা দিক্ দিয়া আলোচনা হয়েছে,—এবং নানা ভাষায়, শিল্পকে আশ্রয় করে, বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যের মন্দির রূপ-শিল্পের নানা ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। অনেকে মনে করেন, যে শিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থ পড়ে, প্রবন্ধ পড়ে, শিল্পকে চিনবার, শিল্পকে জানবার, শিল্পের রস-আস্বাদন কর্ব্বার, অন্ততঃ কিছু না কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্প-বিষয়ক বিপুল সাহিত্যের কথার অরণ্যের মধ্যে শিল্পের রহস্য-উদঘাটনের চাবী-কাঠী কোথাও লুক্কায়িত আছে বলে মনে হয় না। শিল্পের স্বরূপ হ'ল, কতকটা "নিজ-বোধ-রূপম্,"—শিল্পের আপনার রূপের মধ্যেই, তাহার ষোল-কলার অবয়বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই, তাহার সত্তার গুপ্ত-কথা, তাহার রহস্যের কাহিনী নিহিত ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্মস্থানের সন্ধান আছে। শিল্প-রূপের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের দ্বারাই রূপের অনুভূতি প্রসার লাভ করে, অন্যথা নহে।

অভিধানের কথিত বা লিখিত কথার মধ্যে রূপ-শিল্পের রূপ বা সত্তানুসন্ধান করার চেষ্টা নিষ্ফলতার চেষ্টা। অনেক ভীরু মনুষ্য সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান্ না, সিংহের বাসস্থানের অনুসন্ধান করেন। সিংহের বাস-স্থানে সিংহকে অনেক সময় হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু সিংহের বাস-স্থানে অন্য জীবকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা

সন্দেহ। ছাপার পুঁথীর পাতে, বিস্তার ব্যবচ্ছেদ-মন্দিরে, শিল্পের শব-দেহ হয়ত আমরা পাই—কিন্তু শিল্পের শিবরূপ—তাহার জীবন্ত নৃত্য-মূর্ত্তি, তাহার বর্ণ-ছন্দের রস-রূপ আমরা অন্বেষণ করিয়াও পাই না। কথিত ভাষার আশ্রয় রূপ-শিল্পের বাস-স্থান নহে; অভিধানের শব্দময় ভূমিতে, রূপ-শিল্পের দেবতা তাঁহার বাসা বাঁধেন না। রেখাবর্ণের নিরক্ষর ও নিস্তব্ধ দুর্গের মধ্যে তিনি স্ব-প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের প্রতিমাকে বাক্যের কোলাহলে অভিভূত করা যায়, তর্কের তুমুল আন্দোলন তুলে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাকে পরাস্ত ও স্তব্ধ কর্ত্তে পারি। কিন্তু শিল্পের প্রতীক ও প্রতিমা যুগে যুগে মানুষের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার গালিবর্ষণ উপেক্ষা করে, আপনার পদ্ম-পীঠের উপর তাঁহাদের রূপের ঐশ্বর্য্যে দীপ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রূপ-শিল্পের autonomy বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত করা যায় না। রূপ-শিল্পের দেবতাকে কথার আরাধনায় প্রসন্ন করা যায় না। শব্দ না স্তব্ধ হলে রূপ-শিল্পের নির্ব্বাক্-বাণী ও আবেদন আমরা শুনিতে পাই না। আমাদের দেশে একটা কু-প্রথা প্রচলিত হয়েছে—যে কোনও চিত্র বা মূর্ত্তিকে দেখেই, আগে আমরা প্রশ্ন করে বসি—ছবিকে কথা বলতে অবসর দিই না। "আতা উল্লার" "আ" বলিবার আগেই বিনামাবর্ষণ করিয়া, তাহার বাণীর, তাহার বক্তব্যের নীরব সমাধির ব্যবস্থা করি। এই অবিচারের প্রতিবাদের উত্তরে অনেক সময়ে আমরা বলি যে, রূপ-শিল্প, অনেক সময়, (যেমন আধুনিক পদ্ধতির চিত্রে), এমন অপরূপের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়—এমন প্রশ্নের বোঝা নিয়ে দেখা দেয়, হ্যামলেটের পিতার ভূতের মত, এমন "questionable shape," এমন প্রশ্ন-বহুল, প্রষ্টব্য, এমন অস্বীকার্য্য রূপের ভূমিকা, এমন অদ্ভুত ও ভয়াবহ মুখোস প'রে, আমাদের ছলনা কর্ত্তে আসেন—যে প্রথমেই আমাদের প্রশ্ন কর্ত্তে হয়,—যে এই সব বিরূপ ও অপরূপ-মূর্ত্তির রূপের রাজ্যে, সুন্দরের মন্দিরে স্থান কোথায়? রূপ-শিল্পের আইনে কোথায় এদের দাবী নির্দ্দিষ্ট হয়েছে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর,—শিল্প-সৃষ্টির মধ্যেই লুক্কায়িত আছে। ছবিকে প্রশ্ন করিবার অধিকার সম্বন্ধে জার্ম্মাণ দার্শনিক শোপেন হাওয়ার বলেছেন:—"ছবির সামনে আমাদের কথা বলিবার অধিকার নাই। কোনও মহাপুরুষ বা উচ্চ-পদস্থ মানুষের সামনে আমরা যেমন নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই, ছবির সামনে সেইরূপ সন্তর্পণে, নীরবের সম্মান দেখিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি কখন কথা কইবেন এবং কি বলবেন তাহার অপেক্ষায় আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কোন রাজার বা মহাপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের যেমন আগে কথা বলিবার অধিকার নাই, প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই—ছবির সামনেও এই শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিনয়ের নতশির নিয়ে অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। আমরা নিজেই যদি কথা বলতে সুরু করি,—আমরা নিজের কথাই শুনব—শিল্পদেবতার শ্রীমুখ থেকে কোন বাণীই নিঃসারিত হবে না—আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবো। অবশ্য, কবিতার আস্বাদন ও বিচার কর্ব্বার বিপুল মানদণ্ড অলঙ্কার-শাস্ত্র রয়েছে। এবং নূতন নূতন কাব্যরীতি ও সাহিত্য-রূপের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে, নব নব আদর্শের বিচার ও সমালোচনার রীতি-পদ্ধতির সৃষ্টি

হচ্ছে। রূপের নূতন নূতন দাবীর বিচার ও দণ্ড-পুরস্কারের উপযোগী বিশিষ্ট ধারা, পদ্ধতি ও আদর্শ আছে। কবিতার মত শিল্প-বিদ্যারও বিশিষ্ট পদ্ধতির ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্র আছে। এই অলঙ্কার-শাস্ত্র ও ব্যাকরণ-পদ্ধতি রূপ-শিল্পের বিশিষ্ট ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই ভাষার সঙ্গে পরিচয়, রূপ-শিল্পের এই অক্ষর পরিচয়—রূপ-শিল্পের আস্বাদনের প্রথম পথ। প্রত্যেক দেশে, যেমন একটা প্রাদেশিক বিশিষ্ট অক্ষর, শব্দ ও ব্যাকরণের ভাষা আছে, যাহা কঠিন পরিশ্রম করে শিখে নিতে হয়,—তবে সেই ভাষায় লিখিত সাহিত্যের রস গ্রহণ করিবার অধিকার আমরা পাই, রূপের রাজ্যেও এই ভাষাবিভ্রাট আছে। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের একটা স্বকীয় বিশিষ্ট রীতির রূপের ভাষা আছে—এই বিশিষ্ট ভাষা শিক্ষা কর্ত্তে পাল্লে—আমরা রূপ-শিল্পের বক্তব্য ও বাণী বুঝিবার অধিকারী হই। প্রত্যেক রূপ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের অনেক কথা বলিবার 'বক্তব্য' আছে। এই বক্তব্য রূপ-বিদ্যার নিজস্ব ভাষায় কথিত হয়। চীন-ভাষায় একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে "একখানি চিত্র দশসহস্র কথার চেয়ে বেশী বলবার শক্তি রাখে"। এই বক্তব্য, চিত্র তাহার রেখা-বর্ণের নীরব ভাষার সাহায্যে আমাদের বল্‌তে চায়। রূপের ভাষা চখের ভিতর দিয়ে মরমে পশে, কানের ভিতর দিয়ে তার পথ নয়। সুতরাং আমাদের রূপ-গ্রহণের শক্তি (Visual faculty) আমাদের রূপ-দৃষ্টির যন্ত্রটী (Recieving apparatus) যদি সুস্থ অবস্থায়, সুশিক্ষিত শক্তিতে থাকে, তবেই আমরা রূপের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, —চিত্র-জগতের সহিত কথোপকথনের সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারি, রূপ-লোকে আসা-যাওয়ার পথ প্রস্তুত করিতে পারি, একটা আদান প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি।

অনেক সময় দেখা যায়, যে এই রূপ-গ্রহণের স্বাভাবিক শক্তি, রূপ-আস্বাদন করিবার ঈশ্বর-দত্ত সামর্থ্য—অনভ্যাসে, প্রয়োগের সুযোগের অভাবে, শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়,—এবং ক্রমশঃ এই রূপ-দৃষ্টি-শক্তি পঙ্গু হয়ে, একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। রূপের অমরাবতী আমরা হারাই। এই শক্তি শৈশবকালে খুব প্রখর ও শক্তিশালী থাকে। এই শক্তিকে যদি যথাযোগ্য আহার ও প্রয়োগের সুবিধা দেওয়া যায়—এই শক্তি, সুস্থ ও সুশিক্ষিত হয়ে, পরিণত ও সম্মার্জ্জিত হবার সুযোগ পায়।

এই রূপ-দৃষ্টির শক্তি যথাযোগ্য আহার না পেলে যে ক্রমশঃ লোপ পায়—তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চার্লস ডার্ব্বিনের আত্মচরিতে আছে—তিনি বলেছেন :—"ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানা জাতির কবিতা আমাকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। স্কুলের বয়সে সেক্সপীয়রের নাটকে, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে, আমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধুর রস উপভোগ করেছি। পূর্ব্বে আমি ছবি দেখে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি—এবং সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এখন এই কয় বৎসর থেকে, আমি এক ছত্র কবিতাও সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছি না। আমি সেক্সপীয়র পড়তে চেষ্টা করেছি, কিন্তু অত্যন্ত নীরস ও বিস্বাদ ঠেকেছে। আমি ছবি দেখবার ও কোন গান শুনবার রুচি ও প্রবৃত্তি প্রায় হারিয়ে বসেছি। আমার মন নানা তত্ত্বের অসংখ্য তালিকা হইতে নীরস নিয়মাবলী ও ধারা অনুসন্ধানের যন্ত্র-

বিশেষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় আমার মস্তিষ্কের যে সব অঙ্গ দ্বারা রূপ-রস আস্বাদন করিবার শক্তি ও রুচি ছিল—সেই সব অঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লো কেন, আমি তাহার কারণ কি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার জীবন-যাত্রা যদি আবার নূতন রূপে আরম্ভ করিবার সুযোগ পাই—তা'হলে আমার জীবনের নিত্য-কর্ম্মের সূচীতে,—অন্ততঃ সপ্তাহে একবার কিছু কবিতা-পাঠ, কিছু সঙ্গীতের চর্চ্চা, কিছু ছবি দেখবার ব্যবস্থা কর্ব্বো। এইরূপ ব্যবস্থা আগে কর্ত্তে পাল্লে, হয়ত আমার মানসিক শক্তির পঙ্গু অবয়বগুলি কায কর্ব্বার সুযোগ পেয়ে, জাগ্রত ও জীবিত অবস্থায় থাকিতে পারিত। এই সমস্ত রসগ্রহণের রুচি ও শক্তির লোপে—জীবনের শ্রেষ্ঠ আস্বাদন ও আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি—এবং সম্ভবতঃ এই শক্তিক্ষয়ে শুধু আমার মানসিক শক্তি নহে, আমার নীতি-বুদ্ধি ও চরিত্র, আমার ভাব-শক্তির মৃত্যুতে, বিপন্ন হয়ে পড়েছে।"

ডার্ব্বিন, শিল্প-সাধনার একটা বড় শক্তির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন—শিল্প-সাধনা বা শিল্প-চর্চ্চা থেকে স্খলিত হলে, আমাদের চরিত্র-হানির সম্ভাবনা আছে। শিল্প শব্দের এই ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ টাই বোধ হয় সমীচীন। 'শীল'কে চরিত্রকে যাহা রক্ষা করে, তাকেই বলে শিল্প। 'শীলানি পাতি রক্ষতি যৎ তৎ শিল্পম্।' (নিপাতনাৎ সিদ্ধম্)

এই 'শীল' রক্ষা করিবার জন্য, উচ্চ ভাবের সান্নিধ্যে চিত্ত-শুদ্ধির জন্য, রূপ-শিল্প যেমন অত্যাবশ্যকীয়—সুর-শিল্প বা সঙ্গীত-সাধনা তাহার চেয়ে কম মূল্যবান নহে। কথা-শিল্প বা সাহিত্য (Literary Art), রূপ-শিল্প (Plastic Art) এবং সুর-শিল্প (Musical Art) —এই তিন জাতীয় শিল্পের মধ্যে—সুর-শিল্প সর্ব্বাপেক্ষা ভাব-প্রবণ, বা ভাব-মূলক এবং সাহিত্য বা কথা-শিল্প সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তা-মূলক, বা চিন্তা-প্রধান।

মুখ্যতঃ, সাহিত্যের আবেদন চিন্তামূলক, ভাবনামূলক (intellectual), সুরের আবেদন,—ভাব-মূলক (emotional)। কথার conceptএ যে সব মূর্ত্তি গড়ে উঠে'—ভাবে, রসে ও উদ্দীপনায় তাহাদের মূল্য (values) স্বতন্ত্র, সুরের আরাধনায় যে সব মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাহাদের ভাব, রস ও উদ্দীপনা (values) স্বতন্ত্র। একের দ্বারা অন্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কথা-রাজ্যের অধিবাসীদ্বারা সুরের রাজ্যের অধিবাসীদের কার্য্য (function) সিদ্ধ হয় না। যে ভাব কথায় প্রকাশ করিতে পারি না, তাহার প্রকাশের জন্য, সাহিত্যের মন্দির অতিক্রম করিয়া সুরের মন্দিরের দ্বারস্থ হওয়া অপরিহার্য্য। কেবল কথাই যদি মানুষের সাধনার পক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তা যথেষ্ট মনে কর্ত্তেন, তা'হ'লে তিনি মানুষের কণ্ঠে এই সুরের দান, এই রাগমালার অপব্যবহার করিতে যাইতেন না। প্রজাপতি হলেন Supreme Economist। তাঁহার সৃষ্টিতে অতিরিক্ত দানের (redundant gift) কোনও সার্থকতা নাই। বিশ্বের সুরপতির এই মহামূল্য দানের একটা মূল্য মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে যাচাই হয়ে গেছে। অধ্যাত্ম-জগতে, কথা যেখানে পৌঁছছিতে পারে না, সুর অনেকটা দূর আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কথাকে বাহন করে, অধ্যাত্ম-সমূদ্রে আমরা খুব কম দূরই পাড়ী দিতে পারি,—লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে, কথা

পুনঃ পুনঃ ফিরে আসে ("যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে")। সুর পর-পারের তীরের অনেকটা নিকটে আমাদের নিয়ে যায়—অন্ততঃ যতটা নিকটে নিয়ে যায়, সাহিত্যের, কাব্যের, বা দর্শনের নৌকা ততদূর পারে না। 'গান-সরস্বতী যে কৈলাস পর্ব্বতে আমাদের বহন করে নিয়ে যায়, গঙ্গা বা সরস্বতী সে কৈলাসে আমাদের উপস্থিত করিতে পারে না'। যথা নয়তি কৈলাসং নগং গান-সরস্বতী ॥ তথা নয়তি কৈলাসং ন গঙ্গা ন সরস্বতী ॥ (শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি ॥ ১২০ ॥) "গানাৎ পরতরং নহি"। সুর অধ্যাত্ম-জগতের মহাযানী পন্থা। এই সুরের জগৎ একটা বিশিষ্ট জগৎ, একটা স্পৃহনীয় জগৎ,—এই জগৎ আমাদের এই চোখে-দেখার জগৎ, এই মাটীর জগৎ এই গাছ-পালার পাহাড়-পর্ব্বতের জগৎ, এমন কি আমাদের গ্রহতারার জগৎ, হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মাঝে মাঝে এই চোখে-দেখা মাটীর জগৎ ছেড়ে দিয়ে, কানে-শোনা এই সুরের জগতে একটু বিচরণ করে আসা (week-ending) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য বড়ই স্বাস্থ্যকর এবং একান্ত আবশ্যকীয়। সাহিত্যের জগতে, কাব্যের জগতে, বিচরণ করেও, এই চোখে-দেখা মাটী-মাড়ান জগতের বন্ধন থেকে আমরা কিছু কিছু মুক্তি পাই। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি পাই না। কথার আবেদনে (appeal of words) একটা মাটীর জগতের কোলাহলের রেশ, ফল-ফুলের গন্ধ, চোখে-দেখা জগতের ভাবনার প্রতিধ্বনি, ইন্দ্রিয়-জীবনের অভিজ্ঞতার একটা ছোপ (Colour), আমাদের মনে লেগেই থাকে। নিছক সুরের (abstract music) রাজ্যে, এই মাটীর জগতের প্রভাব, এই প্রতিধ্বনি, এই চাক্ষুষ-জগতের স্পর্শ, বর্ণ ও গন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। কাব্যের তুলনায় সুরের এই অপ্রতিহত স্বারাজ্য একটি বিশিষ্ট বস্তু, প্রজাপতির অমূল্য দান। ভাষা হিসাবে সুরের সার্থকতা সাহিত্য ও কাব্য-কলার কিছু উচ্চে, একথা অস্বীকার করা সত্যের অবমাননা।

সাহিত্যের সহিত সুরের তুলনা করিয়া, আমরা সুরের যে বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করি সাহিত্যের সহিত রূপ-শিল্পের (Plastic Art) তুলনা করিলে, আমরা সেই একই সত্যে উপনীত হই। রূপ-শিল্পের শক্তি ও উদ্দেশ্য (function) সুর-শিল্পের অনেকটা অনুরূপ এবং কথা-শিল্প বা সাহিত্য হইতে, রূপ-শিল্পের প্রকৃতিগত ভেদ প্রায় একশ্রেণীর। "লিখিৎপড়িৎ" ভাষা যেখানে হার মেনে পালায়, রূপের ভাষা (Language of Forms), সেখানে আমাদের বিপদের বন্ধু হয়ে উদ্ধার কর্ত্তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। রূপ-শিল্প ও সুর-শিল্পের মধ্যে যে একটা প্রকৃতি-গত সাম্য (affinity) আছে, এ কথাটা অনেক সময়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সুরের রাজ্য এবং রূপের রাজ্য দুটিই, কথার রাজ্যের বাহিরের জগৎ। অনেক ভাব ও রস আছে, যাহা কথার ভাষায় যেমন প্রকাশ কর্ত্তে পারি, রূপের ভাষায় বোধ হয় একই রূপে প্রকাশ কর্ত্তে পারি। আবার এক-শ্রেণীর ভাব ও রস আছে, যেগুলি কথার অতীত, রূপের ভাষাতেই তা'রা ধরা দেয়। যে পরিমাণে কথার অতীত, অনির্ব্বচনীয়, সেই পরিমাণে সুরের ও রূপের মধ্যে একটা সাম্য একটা প্রকৃতিগত মিল আছে। রূপ-শিল্পীরা রেখা ও বর্ণে, ঐক্যতানের (harmony) আদর্শ হইয়া সৃষ্টি করিতে বসেন। একবর্ণ ও

অন্তবর্ণের মধ্যে, অনেক সময় 'বাদী', 'বিবাদীর' সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ফিকে নীলের পাশে, ঐ গাঢ় লালবর্ণটা কেমন খাপ খায় না; কেমন যেন 'বেসুরো' লাগে। অনেক চিত্রের রেখা-ভঙ্গীর 'আরোহণ', অনেকটা সঙ্গীত জগতের স্বর-লহরীর গতি-প্রকৃতির অনুসরণ করে। সুর-শিল্পের অনেক তত্ত্ব রূপ-শিল্পেও খাটে। পক্ষান্তরে, রূপ-শিল্পের রেখার ভাষায়, কথিত-ভাষার সহিত একটা সাদৃশ্য আছে। রেখার একটা গল্প বলিবার শক্তি (narrative function) আছে। এই 'গল্প বলিবার', অর্থাৎ যা দেখেছি তাহারই প্রতিলিপি বা প্রতিচ্ছবি দেবার প্রবৃত্তি একটা বুদ্ধিজীবী (intellectual) প্রবৃত্তি। সাধারণতঃ, এই 'রিপোর্ট' লেখার গরজের মধ্যে, কল্পনা (imagination) বা রস-রাজ্যের ইঙ্গিত দিবার বিশেষ সুবিধা বা অবসর নাই। সাদৃশ্যপ্রধান Realistic Art, আর রস ও ভাব-প্রধান Imaginative Art-এর প্রভেদ এইখানে। রূপ-শিল্পে, ভাবের ও রসের বাহন হ'ল বর্ণ। বর্ণবোধ ও আস্বাদনের মধ্যে কোনও intellectual সুখ ভোগ নাই †। বর্ণ হ'ল নিছক emotional rapture। কোনও রূপের ছাঁচে না ঢাল্‌তে পারলে, বর্ণদ্বারা কোনও কেজো কথাই প্রকাশ করা যায় না। কেবল বর্ণদ্বারা বুদ্ধির রাজ্যের এক 'বর্ণ'ও বোঝাতে পারি না। অথচ, রঙের উপর রঙ চড়িয়ে, ভাবরাজ্যের অনেক 'অব্যক্ত কথাকে' ব্যক্ত কর্ত্তে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রের নিছক সুর (abstract music), চিত্র শাস্ত্রের বর্ণের মত, ভাব-রাজ্যের বাহন। সুর এবং 'রাগ'-রাগিণী মানুষের মনকে রঞ্জিত করে ("রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ") মনে 'রঙ' ধরায়, মনকে রস-সিক্ত করে' বুদ্ধির কবল হ'তে মুক্ত করে; সুরের ভাবিনী আমাদের 'ভাব ধরায়', ("তোরে ভাব ধরালে কোন ভাবিনী না জানি সে কেমন ধনি")। সুতরাং, ভাব-বাদী সাত সুরের সঙ্গে, ভাব-বাদী সাত বর্ণের একটা সহোদরোচিত সৌহার্দ্য আছে। সাহিত্য বা কথা-শিল্প, সুর-শিল্প ও রূপ-শিল্পের 'সতত ভাই', সহোদর ভাই নহে। সুর-শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে, রূপ-শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে, একটা স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য আছে। সুর ও বর্ণ নিছক ভাব-রাজ্যের (emotion) ভাষা। সাহিত্য বা কথা-শিল্প মুখ্যতঃ ভাবনা-রাজ্যের (intellect) ভাষা।

সাহিত্য, সঙ্গীত, ও রূপ-শিল্প—এই তিন বিভিন্ন পথে আত্মপ্রকাশ করিবার সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। কথার মধ্য দিয়া, সুরের মধ্য দিয়া, রূপের মধ্য দিয়া, মানুষ আপনাকে নিরন্তর প্রকাশ কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছে। এই প্রকাশের চেষ্টা বা সাধনার নামই শিল্প। এই হিসাবে প্রত্যেক মানুষ শিল্পীর অধিকার লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা বড় শিল্পী হবার, বড় বড় শিল্প-বস্তুর রস-গ্রহণ ও সমালোচনা করিবার যোগ্যতার বীজ আছে। শিল্পের রসচক্র যাঁরা সৃষ্টি করেন, রূপ-শিল্প যাঁরা রচনা করেন,—সেই রচনা বা সৃষ্টি যাঁরা সম্যক্-রূপে আস্বাদন কর্ত্তে পারেন, তাহার দোষ-গুণের বিচার কর্ত্তে পারেন, রূপ-রচয়িতা শিল্পীদের, তাঁহারা অতি

† সুর বোধ ও আস্বাদনের মধ্যেও কোনও intellectual আনন্দ নাই। পক্ষান্তরে ছন্দরচনা, ছন্দ-বোধ এবং তালবোধ ও তাল-রচনার মধ্যে একটা intellectual satisfaction আছে।

মূল্যবান সহযোগী ও সহকর্ম্মী। যে দেশে, শিল্পীর সৃষ্ট-রসের উপযুক্ত সমঝদার বা রসিকের অভাব—সে দেশে শিল্প-চেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। কারণ, শিল্প-বৃত্তি একটা সামাজিক বৃত্তি। শিল্প-সাধনার ফল অন্যকে বিতরণ না কর্ত্তে পারলে, অন্যের সহিত এর রস-আস্বাদনের আনন্দ ভাগ করে নিতে না পারলে, শিল্পসৃষ্টি সার্থক হয় না। শিল্পের সুধা-রস নানা মানুষের চিত্তে সঞ্চালিত হয়ে, সংক্রমিত হয়ে, বহু মানুষকে একই আনন্দের রজ্জুতে আবদ্ধ করে। অবশ্য এমন অনেক কবি, অনেক সাধক, অনেক শিল্পী আছেন, যাঁহারা কোনও শ্রোতা বা দ্রষ্টার অপেক্ষা না করে, আপনার মনের আনন্দে, ভিতরের তাগীদে, অন্তরের তাড়নায় কবিতা বা রস-চক্র সৃষ্টি করে যান—তাঁদের নিজের মনের আনন্দকেই প্রকাশ করেই তাঁদের অন্তরের প্রেরণা শুদ্ধ হয়। কোনও মনুষ্য-সমাজকে উপলক্ষ করে, কোনও নিন্দা-পারিতোষিকের দিকে লক্ষ্য করে, তাঁহারা সৃষ্টি করেন না। পাখীরা আপন মনে গান গেয়ে যায়—কোনও করতালির আশায় তাকিয়ে থাকে না। এরূপ অনেক কবি, সাধক ও শিল্পী আছেন, যাঁদের প্রকাশ-চেষ্টা আপন আপন সাধন-মন্দিরের সমাধির মধ্যেই আবদ্ধ। অনেকে বলেন যে এই দ্রষ্টা বা শ্রোতার জগৎকে অবজ্ঞা করে, বা অস্বীকার করে, রসের চক্র যাঁরা নির্ম্মাণ করে যান, তাঁরা কতকটা অভিমানের বশে, খণ্ড বৈরাগ্যে—সমাজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেন—কারণ বর্ত্তমান কালে, তাঁদের সম্মুখে বা আশে পাশে, তাঁদের "সহধর্ম্মী", দরদী, মরমী মানুষ খুঁজে পান না। কিন্তু, বর্ত্তমান কালে তাঁদের রচনার আদর করিবার অধিকারী ও উপযোগী সহৃদয় মানুষ খুঁজে না পেলেও, ভবিষ্যতে, দূরবর্ত্তী কোনও কালে কেউ না কেউ "সমান-ধর্ম্মা" মানুষ জন্মাবেন,—যিনি তাঁদের রচনার মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তাঁদের আদর ও প্রশংসার ফুল-চন্দনে অভিষিক্ত কর্ব্বেন—এই আশা অনেক শিল্পীকেই রাখতে হয়। কেন না শিল্পের তালি এক হাতে বাজে না। বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যকালে কোনও রসিক সহৃদয় মানুষকে লক্ষ্য না করে,—কোনও শিল্পী, কোনও "রাধাভেদ" সম্মুখে না রেখে, আকাশে অনির্দ্দেশে তীর নিক্ষেপ কর্ত্তে পারেন না। মানুষের রচনা অন্য মানুষের হৃদয় ও মন স্পর্শ না কর্ত্তে পারলে, তাহার চরম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না।

কোন কোন দার্শনিক বলেন যে রূপ-সাধক কেবল অন্যের মনে আনন্দ জাগাবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার রূপ-রসের যন্ত্র রচনা করেন না। নিজে কোনওরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করে—এই উপভোগের প্রতিক্রিয়ারূপে, মুখ্যতঃ এই আনন্দের প্রকাশের উদ্দেশ্যে,—তাঁহার রস-চক্র গড়ে তোলেন। যথার্থ আনন্দের প্রকাশ যে রস-সৃষ্টি —তাহার অন্যকে আনন্দ দেবার একটা মজ্জাগত শক্তি আছে। আনন্দের ফল অন্যকে আনন্দ দিতে পারে। এই অন্যের মনকে উদ্বোধিত করা, উজ্জ্বল করা, রঞ্জিত করা—আসল শিল্প-বস্তুর প্রধান লক্ষণ। যে ভাবটী উপলক্ষ করে, যে ভাবের স্পর্শে, যে ভাবের প্রভাবে, শিল্পী ঐ শিল্প-বস্তুকে গড়ে তুলেছেন—ঐ শিল্প-বস্তু অন্য ভাবুক মানুষের মনে ঐ একই ভাবের লহর তুলে দিতে পারে। শিল্প-বস্তুর এই অন্যের মনে ভাব ধরাবার শক্তি,—একটা আধ্যাত্মিক শক্তি।

শিল্পীর কৌশলে একটা জড়বস্তু রূপের ও বর্ণের সাজ পরে—এমন একটা শক্তির অধিকারী হয়,—যে এই রূপান্তরিত জড়বস্তু অন্যকে চেতনা দেবার, অন্যের চিৎশক্তিকে জাগাবার শক্তি রাখে। এই জড়ের বিশিষ্ট রূপের আধারে—শিল্পসাধক তাঁর মনের অনেকখানি ঢেলে দিতে পারেন। এই জন্য শিল্পীর মনের জলন্ত ছাপ নিয়ে, শিল্পীর মনের রাগে রঞ্জিত হয়ে—শিল্পীর রস-রচনা অন্য রসিকের মন একই রসে, একই রাগে, রঞ্জিত করিবার শক্তি অর্জ্জন করে এই রঞ্জিত করিবার শক্তি যে শিল্প-বস্তুর যত অধিক পরিমাণে আছে,—সেটা তত উচ্চ-অঙ্গের শিল্প-সৃষ্টি। এই উচ্চ-অঙ্গের রস-রূপ শিল্পসাধক সদাসর্ব্বদা সৃষ্টি কর্ত্তে পারেন না। সাধনার বিশেষ তীব্র মুহূর্ত্তে, বিশেষ উদ্দীপনার মুহূর্ত্তে, তুরীয় অবস্থার অতি উজ্জ্বল শুভক্ষণে, শিল্পীর ভাবনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে,—রূপের রস-চক্র গড়ে ওঠে। এই সাধনা,—এই ছন্দোময়, চেতনাময় রস-মূর্ত্তির রচনার প্রয়াস, একটা খুব বড় সাধনা—আত্মার সংস্কৃতির একটা বড় পথ। এই ছন্দোময় চেতনাময় রূপে শিল্পের সৃষ্টির মধ্যে—সাধক নিজকে, নিজের আত্মাকে সংস্কৃতির পথে উচ্চ করে তুলেন, শ্রেষ্ঠ করে তুলেন।

"আত্ম-সংস্কৃতি-র্বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমানঃ আত্মানং সংস্কুরুতে"।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৬।৫।১)

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার অধোগতি ও অব্যবস্থা

অর্থ-নীতি শাখার সভাপতির অভিভাষণ

দারিদ্র্যের পরিমাপ—বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের এই প্রভেদ যে বিজ্ঞান বহু ও বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করিয়া মূল সূত্র ও সাধারণ নিয়ম বাহির করে এবং তথ্য সমুদায়ের আলোচনার মাপকাঠির সাহায্যে বিশিষ্ট শক্তির বিচার ও গতিনির্দ্ধারণ করে। এ কথা অর্থ-বিজ্ঞানেও খাটে। বরং অর্থ-বিজ্ঞান সমাজবিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া আর্থিক অভাব ও শক্তির আলোচনা মানুষের সুখদুঃখের রংএ বিচিত্র ও আত্মীয় হয়, মানুষের আদর্শের রেখাপাতে গভীর, মর্ম্মস্পর্শী হয়।

ভারতবর্ষ যে অভাবগ্রস্ত তাহা সকলেই জানে বা অনুভব করে। অর্থ-বিজ্ঞানের কাজ হইতেছে এই অভাব বা দুর্দ্দশার পরিমাপ করা, তাহার ফলাফল অন্তরের অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া বাস্তব জগতের মানদণ্ডে পরখ করা, এবং অভাব বা দুর্দ্দশা মোচনের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা।

পরিমাপ করিতে যাইলেই সংখ্যার আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং অর্থ-বিজ্ঞান পদার্থ-বিজ্ঞানের মতই যে দ্বিধা ও সন্দেহ-হীন বস্তুতান্ত্রিক হইতেছে তাহা সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে। এ দিকে অর্থ-বিজ্ঞানের বিষয়ই হইতেছে মানুষের অভাবের সঙ্গে, তাহার সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে অশন বসন প্রভৃতি বা ব্যবহারের যাবতীয় উপকরণের হ্রাস বৃদ্ধি নির্দ্ধারণ।

লোকবাহুল্যের মাপকাঠি—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য সবদেশেই সব কালেই অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষের অভাব অনটনের আলোচনা করিতে গেলেই গত শতাব্দীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিবিস্তারের অনুপাতের আলোচনা গোড়াতেই করিতে হয়। আকবরের মৃত্যুর সময় ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল আন্দাজ দশ কোটী। গত তিন শতাব্দীতে লোকসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৎসর	লোক সংখ্যা কোটী লক্ষ	লোকবৃদ্ধির হার
১৬০০	১০ — ০	
১৭৫০	১৩ — ০	
১৮৫০	১৫ — ০	
১৮৭২	২০ — ৬০	
১৮৮১	২৫ — ৪০	১'৫
১৮৯১	২৮ — ৭০	৯'৬
১৯০১	২৯ — ৪০	১'৪
১৯১১	৩১ — ৫০	৬'৪
১৯২১	৩১ — ৯০	১'২
১৯৩১	৩৫ — ৩০	১০'৬
১৯৩৫	৩৭ — ৭০	৬'৮

জেনেভাতে এক বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে অধ্যাপক ইষ্ট নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভরণপোষণের জন্য অন্ততঃ আড়াই একর জমির প্রয়োজন। প্রাচ্য জগতে উত্তাপ ও সিক্ততা হেতু মানুষের আহার্য্য কম এবং মরসুম বৃষ্টির প্রভাবে জমি অনেক অঞ্চলেই ২।৩ বার পর্য্যন্ত ফসল উৎপাদন করে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের কৃষির আলোচনা করিয়া আমরা একটা সাধারণ মাপকাঠি গ্রহণ করিতে পারি যে প্রত্যেক পরিবারের অন্ততঃ ৫ একর করিয়া জমির প্রয়োজন। চীনদেশেও ৫।৬ একরের কমে কৃষক পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। ভারতবর্ষে গড়পড়তা পরিবারের সংখ্যা ৪'২ এবং চীনে ৫'৪ জন। ইহা হইতে আমরা এই নির্দ্দেশ করিতে পারি যে অন্ততঃ জন পিছু ১ একর চাষের জমির প্রয়োজন এবং চীন ও ভারতবর্ষের লোকবাহুল্যের স্বচক সংখ্যা হইবে, ১ একর জমিতে প্রতি প্রদেশের লোক পিছু আবাদী জমির দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাই।

প্রাচ্য জগতের লোকবাহুল্য।

দেশ	লোক সংখ্যা কোটী	লক্ষ	আবাদী জমি মোট (১০০০,০০০)	জন-প্রতি	লোকবাহুল্যের (ইষ্ট) সূচক সংখ্যা	লোকবাহুল্যের সূচক সংখ্যা (পরিবর্ত্তিত)
জাপান	৬	৬৩	২৩'৯	০'৩৬	৬'৯৪	২'৮
চীন	৪৫	০	২০৮	০'৪৬	৫'১	২'৩
ভারতবর্ষ	৩৭	৫০	২৯৮'১	০'৭৮	২'৮	১'৩
সোভিয়েট রাশিয়া	১৬	৫৭	৭০০'০	৪'২	০'৫৯	০'২৪
আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য	১২	৫০	৪১৩'২	৩'৩	০'৭৭	০'৩০
কানাড়া	১	৩	৫০০'০	২৮'৯	০'০৮	০'০৩

নিয়ন্ত্রণ সংখ্যা—আবাদী জমির ন্যূনতা হইতে লোকবাহুল্যের একটা সোজাসুজি ধারণা হইলেও খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হইতে উহার বিচার আরও সুস্পষ্ট হইবে। ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনের হার তুলনা করিলে দেখা যাইবে, যে দেশে ক্রমশঃ চাষের জমি ও মোট খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও লোকসংখ্যা ও খাদ্য জোগানের নির্ঘণ্টের বিয়োগসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা দেশের খাদ্য জোগানের অবনতিরই সূচনা করে। বিশেষতঃ গত ৪ বৎসর হইতে লোকসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইলেও খাদ্য-শস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ আগেকার বৎসর হইতে ১৯ লক্ষ ও ৭ লক্ষ টন কমিয়াছে। ১৯৩৪ সালেও ৮ লক্ষ টন উৎপাদন কম হইয়াছে। গম উৎপাদন ১৯৩২ সালে কমিয়াছে, কিন্তু এই কয় বৎসর কিছু বাড়িতেছে। বাংলাদেশে সুবৎসরেও আমাদের দেড় লক্ষ টন ধানের পরিমাণ কমতি, তাহা বর্ম্মা হইতে আসে।

এক দিকে যাবতীয় খাদ্যশস্য, দুধ মাছ প্রভৃতি ধরিয়া, খাদ্যশস্যের আমদানি রপ্তানি ধরিয়া এবং বীজশস্য ও অপচয়ের হিসাব করিয়া এবং অপরদিকে জনপ্রতি অবশ্য গ্রহণীয় আহার্য্যের হিসাব করিয়া আমি নিম্নলিখিত তথ্যে উপনীত হইয়াছি।

ক) ১৯৩১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫'৩ কোটী।

(খ) ১৯৩১ সালে খাদ্যের জোগান অনুসারে ভারতবর্ষের লোক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা ২৯'১ কোটী।

(গ) ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব ৪২০০ কোটী ক্যালরী।

(ঘ) ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩৭'৭ কোটী।

(ঙ) ভারতবর্ষের এখনকার খাদ্যাভাব ৪১১০ কোটী ক্যালরী।

(চ) যদি অন্য সকলে যথাযথ আহার্য্য পায় তাহা হইলে খাদ্যবঞ্চিতের সংখ্যা ৪'৮ কোটী।

খুব সম্ভবতঃ ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৪০ কোটী। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যবঞ্চিতের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটীরও অধিক হইবে।

কৃষির অবনতি ও অব্যবস্থা—এ দিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু চাষের জমি এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে ও কৃষকের পরনির্ভরতা এত বাড়িয়াছে যে ফসল পরিমাণের হার বাড়ান সুকঠিন। কেবলমাত্র গম ও ধানের প্রতি একার উৎপাদনের হার (পাউণ্ড হিসাবে) তুলনা করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি :—

	ভারতবর্ষ	চীন	পৃথিবীর উৎপাদনের মান
ধান	৯৮৮	২,৪৩৩	১৪৪০
গম	৮১১	৯৮৯	৮৪০

অথচ এটা ঠিক, যে রকম আমাদের দেশে জনবাহুল্য, জনশিক্ষা ও জমির ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে শিল্পোন্নতি অপেক্ষা চাষের সুব্যবস্থার উপরই আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অধিক নির্ভর

করিতে হইবে। বসুন্ধরা আজ জনভারাক্রান্ত, কিন্তু মৃত্তিকা হইতেই ভারতবর্ষকে লোকপালনের জন্য আহার্য্য, ব্যবহার ও বিলাসের উপকরণ গ্রহণ করিতেই হইবে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌গণের একটী ধারণা ছিল যে শিল্পোন্নতিই আমাদের একমাত্র কল্যাণের পন্থা। পৃথিবীময় আর্থিক সঙ্কট ও শস্যের অল্পমূল্যতার দিনে ভারতবর্ষ আজ বুঝিয়াছে, যে যদি আমাদের কৃষক খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে জমি অনেক পরিমাণে রপ্তানি বা ব্যবসায়ের শস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, কিংবা দেশীয় শিল্পের কাঁচামাল জোগান দিয়া শিল্পপ্রসারের পথ উন্মুক্ত করিতে পারে। ইহাতে কৃষি ব্যবসায়ে যে বিষম লোকবাহুল্য ঘটিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে জাপানে ধান উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি একর পিছু বাংলা দেশ অপেক্ষা প্রায় ৩গুণ ও ইতালীতে ৬গুণ। যদি আমরা ধান চাষের উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়াইতে পারি তাহা হইলে আরও কতক পরিমাণে বাংলায় আখ, সরিষা, তিসি, তিল ও চীনা বাদামের চাষ বাড়ে। ইহাতে এক দিকে যেমন খাদ্যের সঙ্কুলান হয় অপর দিকে কাঁচামালের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে ছোট খাট কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন অর্থাগম ও কৃষির গুরুভার মোচনের উপায় হয়।

বাংলা দেশে চাষের অবনতির কথা আমি অনেক বার উত্থাপন করিয়াছি। নদনদীর গতিহ্রাস ও মৃত্যুহেতু বাংলা দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ এখন ধ্বংসোন্মুখ। এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণে এই কয়টী জেলায় চাষের অধোগতি হইয়াছে।

আবাদীজমির পরিমাণ হ্রাস

(শতকরা)

হুগলী	৪৫
বর্দ্ধমান	৪০
যশোহর	৩১
মুর্শিদাবাদ	১৪
নদীয়া	৭

এইরূপ আরও অন্য জেলায়ও যেমন কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিতেছে তেমনই জঙ্গল বা জলাভূমি ক্ষেত, পথঘাট ও বসবাস পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঘিরিয়া ফেলিতেছে। বাংলা দেশে যেখানে জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ও অসমতল সেখানে আউস ধানের পরিমাণ বেশী। আউস ধান যেখানে বেশী সেখানে লোকসংখ্যাও কম। আউস ধান বাংলার ব' প্রদেশের অধোগতিই সূচনা করে কিন্তু বীরভূম, বর্দ্ধমান ও যশোহর জেলায় এখন এমন হইয়াছে যে, যদিও মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের সব জেলাতেই আউস ধান বাড়িতেছে, কিন্তু এসব জেলায় আউসও খুব বেশী পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, খাদ্যশস্যের এই পরিমাণহ্রাস কৃষকের দুর্গতির পরিচায়ক। বাংলার অনেক জেলাতেই পুষ্করিণী

মজিয়া যাওয়ায় ও বাঁধগুলি রক্ষিত না হওয়ায় রবিশস্য অধিক পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে রবি চাষ এই কয়েকটী জেলায় নিম্নলিখিত ভাবে কমিয়াছে :—

মুর্শিদাবাদ ১৮২,২০০ একর; নদীয়া ১৪,১০০ একর; বর্দ্ধমান ২১,১০০ একর; যশোহর ১৫,৬০০ একর। বাঙ্গালী মানুষ হয় তেলে জলে, কিন্তু কিছুকাল হইতে বাংলাদেশে সরিষা, তিসি প্রভৃতির চাষ বিশেষ কমিয়া যাইতেছে। সরিষার তেল বাঙ্গালীখাদ্যে স্নেহ, মেদের প্রধান উপকরণ, তাহা ছাড়া জলীয় আবহাওয়ায় তেল ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু বাংলাদেশ, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে সরিষা ও অন্যান্য তৈল বীজ আমদানি করিতেছে। ১৯২৪ সালে বাংলা দেশে ১০ লক্ষ একর তৈলবীজ শস্যের চাষ ছিল, ১৯৩৪ সালের পরিমাণ একই রহিয়াছে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তেল শস্যের যে অবনতি হইয়াছে তাহা দেখান হইল :—

মুর্শিদাবাদ ১৯,৪০০ একর; নদীয়া ৩,৭০০ একর; বর্দ্ধমান ৪,৫০০ একর; যশোহর ৫,৫০০ একর।

প্রোটীনবহুল ফসলের পর্য্যায়—বাংলা দেশে যে সব জেলায় এখন পাট চাষ কমান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে সেখানে সরিষা ও রেড়ীর চাষ ও শন ও মাসকলাই বাড়াইলে পাটের অভাব পূরণ হইবে। পাটের জমিতে যে উর্ব্বরতার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী শন ও মাসকলাই উৎপাদনে তাহার অনেকটা ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। বাংলাদেশে পাটের চাষ অনেক অর্থ আনিলেও চাষের রীতি নীতি ও পর্য্যায়কে এমন পরিবর্ত্তিত করিয়াছে যে ইহাতে ঘোর অনিষ্টও ঘটিয়াছে। পাট চাষ কমাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে রবি চাষ অবলম্বন করিলে, বিশেষতঃ যে সব দাল ও শুঁটি বাঙ্গালীর খাদ্যের প্রোটিনের প্রধান পরিপোষক এবং তেলবীজ শস্য যাহা মেদের পরিপোষক তাহা ক্রমশঃ বাড়াইতে পারিলে বাঙ্গালী কৃষকের খাদ্য, শরীরবিজ্ঞানের অনুসারে, কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে।

যে কোন জনবহুল দেশে ফসল উৎপাদনের পর্য্যায় এমন হওয়া চাই যে জমি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রোটিন পাওয়া যাইতে পারে। চীনদেশের অনেক জায়গায় প্রায় ১৬টী ফসল কৃষকেরা উৎপাদন করে। গম, যব, দাল, সরিষা, শুঁটির সঙ্গে ধান, সোয়াবীন, শাঁকালু, ভুট্টা ও নানা প্রকার শাকশব্জী মিলিয়া ১০/১২ বা ১৫টী ফসল তাহারা জমি হইতে গ্রহণ করে। আহার্য্যে চাউলের প্রাচুর্য্য কমাইয়া উত্তর ভারত হইতে সস্তা গম এবং চীবাক আমদানি করা উচিত। চীনে যেমন চাউলের পরিপূরক হিসাবে সোয়াবীন ব্যবহৃত হইতেছে সেইরূপ চাউলের পরিপূরক একটা বাহির হওয়া প্রয়োজন। প্রোটিনধারক মুগ, ছোলা, কলাই, অরহর প্রভৃতি এবং কচু, ওল, মূলা, পেঁয়াজ ও নানা প্রকার শাকের দিকে ঝোঁক দিলে দরিদ্র কৃষকের খাদ্যেও পলীয়ের (প্রটিনের) ভাগ বাড়ে এবং অম্লতাও কমে। যেমন যেমন লোক-সংখ্যা বাড়ে তেমনই জমি হইতে খাদ্যেরও সংস্থান করিয়া লইতে হয়; বাংলা দেশে আমরা বিপরীত পথে চলিতেছি।

১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালে আমাদের লোকবৃদ্ধি হইয়াছে ৩০লক্ষ অথচ বাংলার কর্ষিত জমির পরিমাণ বরং কমিয়াছে, বাড়ে নাই। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সালে গড়পড়তা বাংলার কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ২৩,৫২৭,২০০ একর। ১৯২৮ হইতে ১৯২৯ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছিল ২৩,৫১৪,৪৪০ একর। ১৯৩৫ সালে তাহা আরও কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ২৩,৩৫৭, ১০০ একর। পূর্ব্ববঙ্গে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ এখন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ এত দ্রুত অধোগতির পথে চলিতেছে যে ইহার ফলে সমগ্র বাংলা দেশে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ এ বার বৎসর ধরিয়া কমিতেছে। শুধু কর্ষিত ভূমির হ্রাস প্রতিরোধ করা নয়, যাহাতে কর্ষিত ভূমি হইতে আরও ২/৪টী ফসল পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা না করিলে দেশের খাদ্যসঙ্কট আরও নিদারুণ, ভীষণ হইবে।

নদী সংস্কার ও জলসেচ—বাংলার কৃষির অবনতি এত দ্রুত ও অনিবার্য্য গতিতে চলিয়াছে যে একটা ব্যাপকভাবে জলসরবরাহ ও কৃষিসংস্কার উদ্ভাবন না করিতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই। মোটামুটি জলসরবরাহ ও কৃষি সংস্কারের পন্থাগুলি আমি এখানে ইঙ্গিত করিতেছি। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গের কৃষিরক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে নদীরক্ষা ও সংস্কার। যেখানে যে নদী জীবিত ও প্রবহমান সেখান হইতে খাত কাটিয়া আনিয়া মরা নদীকে বাঁচাইতে হইবে ও কৃষির উপকার ও ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য নিয়ন্ত্রিত জলপ্লাবন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। যেখানে দামোদরের মত বাঁধ দেশকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তৃত অঞ্চলের যথাযথ প্লাবন ও জলনিকাশের অন্তরায় হইয়াছে সেখানে এইরূপ বাঁধে স্লুইস দরজা আটকাইয়া কৃষির উন্নতিকল্পে প্লাবনের শাসন ও পরিচালন করিতে হইবে। বাঙ্গালীকে এই সব অঞ্চলে একটু যাযাবার হইতে শিখিতে হইবে। টিনের ঘর তৈয়ার করিয়া, প্রয়োজন মত যাহাতে কৃষক ভিটামাটীকে আঁকড়াইয়া না থাকিয়া প্লাবনের সময় দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে এরূপ শিক্ষা ও রীতি তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। দামোদর, পদ্মা, তিস্তা বা যমুনা, যে সব নদী বাংলায় বন্যা আনিয়া দেশকে বিধ্বস্ত করে, সেই সেই নদীগুলির স্রোতে কঙ্কালাবশিষ্ট অন্য নদীগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। বিভিন্ন ক্ষয়িষ্ণু জেলার মধ্যে এইরূপে খাল কাটিয়া মরা গাঙ্গে বান ডাকাইতে হইবে। খাত কাটিয়া ভরা বিপুলস্রোত নদী হইতে জল আনিয়া জীর্ণ নদীর পুনরুদ্ধারের কথা বাংলায় একশত বৎসরের পুরাতন কথা। ১৮৩৬ সালে নদীয়া নদীবিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, দেশ রক্ষা হয় যদি ভাগীরথীর সঙ্গে নবগঙ্গার যোগ সাধন করা হয়, শান্তিপুর হইতে মাজরা পর্য্যন্ত একটী খাত খনন করিয়া। তেমনই ১৮৪৪ সালে সৈন্যবিভাগ হইতে পরামর্শ আসিয়াছিল যে পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির রক্ষা অসম্ভব যদি না উপরে রাজমহল হইতে বর্দ্ধমান জেলার কালনা পর্য্যন্ত খাল টানিয়া না আনা যায়। প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ উইলকক্সও এইরূপ নানাপ্রকার পরিকল্পনা দিয়া বাংলার পূর্ত্তবিভাগকে সম্প্রতি চঞ্চল, এমন কি উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ দরিদ্র। তাই উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং

[illegible]। গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা ও তিস্তার অতিরিক্ত জলপ্লাবন যদি কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে নদী ভাঙ্গনেরও প্রতিরোধ হইবে। অপরদিকে যে পরিমাণ পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের নদীগুলির অধোগতি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আরও নূতন কীর্ত্তিনাশা নদী উঠিয়া পূর্ব্ব অঞ্চলকে বিপর্য্যস্ত ও ধ্বংশ করিতে থাকিবে। নদীপ্রবাহের উত্তর পথে বাঁধ বাঁধিয়া বিরাট কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করিয়া সেখান হইতে জলসেচ বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ ও মহীশূর প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাংলাদেশেও তিস্তা, ময়ূরাক্ষী, দামোদর বা দ্বারকেশ্বরে বাঁধ বাঁধিয়া, হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া, খাল কাটিয়া জলসেচের বিপুল আয়োজন করিতে পারা যায়। এই সকল খাতের জলপ্রপাতের সাহায্যে যুক্ত-প্রদেশের মত বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভাবন করিয়া দূরে যে অঞ্চলে খাত পৌঁছাইতে পারে না সেখানে নলকূপ বসাইয়া কৃষির উন্নতি সাধন করা কঠিন নয়। অযোধ্যায় পর্ব্বতের সানুদেশে অসমতলের অপেক্ষা না করিয়া যেভাবে সমতল পথে ধাবিত বিপুল গঙ্গাস্রোতের অবলম্বনে তৈলের ইঞ্জিন বসাইয়া জল তুলিয়া জলসেচের ব্যবস্থা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে, তাহা হইতে বাংলা দেশের ইঞ্জিনিয়ারগণের অনেক শিখিবার আছে।

কায়েমী খাজনা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন—সকলেই প্রশ্ন করিবেন অদূরে যুক্ত-প্রদেশে এত বিরাট নিত্য নূতন জলসেচ প্রণালী ও বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রামে গ্রামে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে, বাংলা দেশে কিছুই হইতেছে না কেন? বাংলার রাজনৈতিকগণ ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না, বরং রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব দেশের কল্যাণকর আর্থিক পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থার প্রধান বিঘ্ন হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে কোটী কোটী টাকা কৃষির উন্নতি ও প্রজার কল্যাণের জন্য ব্যয় তখনই সম্ভব ও সার্থক যখন সমৃদ্ধিশালী কৃষকের দেওয়া জমির খাজনা ও শুল্ক সাধারণ তহবিল আবার পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ আয়োজন তখন লাভজনক হইয়া রাষ্ট্রের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিভাগের খাতে অজস্র অর্থ ঢালিয়া দিতে পারে। বাংলার কায়েমী খাজনা-ব্যবস্থার জন্য ইহা সম্ভবপর একেবারেই নয়, কারণ নদীর সংস্কার, জমির উন্নতি ও কৃষির সুব্যবস্থা রাষ্ট্রের সাহায্যে হইলে তাহার ফলভোগ বেশী করে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিয়া সমাজের মুষ্টিমেয় লোক ধনী, জমিদার শ্রেণী। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে জমির খাজনা আয়শুল্কের দ্বিগুণ, কিন্তু বাংলা দেশে কায়েমী বন্দোবস্ত হেতু উহা তাহার অর্দ্ধেক মাত্র। আরও অন্য কারণ এখানে আলোচনা না করিয়া শুধু বাংলার কৃষি সংস্কারের জন্যই কায়েমী বন্দোবস্তের একটা আমূল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। নদীসংস্কার ও কৃষির উন্নতির জন্য যে বিপুল অর্থব্যয়ের এখন প্রয়োজন তাহা সম্ভব হইবে না যদি সাধারণ রাষ্ট্রের তহবিল তাহার যথাযথ লভ্য হইতে বঞ্চিত হয়। যেমন পল্লীগ্রাম ও কৃষক-সাধারণের অর্থে পালিত ও সমৃদ্ধ হইবে, তেমনই সেই সমৃদ্ধি রাষ্ট্রকেও শক্তিমান করা চাই। যদি এরূপ আদান প্রদান পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে জমিদারশ্রেণী মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঘটিতে না দেয় বরং লভ্যের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে ইহাতে রাষ্ট্রেরও

অকল্যাণ, প্রজারও অনিষ্ট। ভাগীরথী নদী কায়েমী বন্দোবস্তের কাল হইতে বাংলাকে বহু বৎসর ধরিয়া অনেক জলকল্লোল শুনাইয়াছে, তাহাতে মিশিয়াছে কত কৃষকের করুণ আর্ত্তনাদ এবং ধনীর তীব্র শ্লেষ ও ভৎর্সনা। আজ বাংলা দেশে রাজকর বিষয়ে তহবিলের আয়ব্যয়ের নূতন রীতি গ্রহণ করিতে হইবে। রাজস্ব অপেক্ষাকৃত ক্রমবর্দ্ধনশীল না হইলে কোন দেশই প্রজার উন্নতিসাধন করিতে পারে না।

কৃষকের পোষ্য—জমির কায়েমী বন্দোবস্তের সঙ্গে আরও কয়েকটী অনিষ্টকর রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার আশু প্রতিকার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জমিদার ও প্রজার মাঝে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার এবং জোতদার, প্রজার নীচে চুকানিদার, দরচুকানিদার, দরন্দর চুকানিদার, তস্য-চুকানিদার, তেলে-তস্য চুকানিদার, এইরূপে কত প্রকার অদ্ভুত জীব মইয়ের পইঠার মত নীচ হইতে উপরে উঠিয়াছে, আর সর্ব্বোপরি দাঁড়াইয়াছেন জমিদার। ইহার ফলে হইয়াছে, প্রতি কৃষককে শুধু যে আপনার পরিবার বর্গকে পালন করিতে হয় তাহা নয়— বাংলায় পরিবারের সংখ্যা গড়পড়তায় ৫½ জন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও ২/১টী জমিদারজাতীয় জীবকেও পোষণ করিতে হয়। যে যে জেলায় জমিদারশ্রেণীর লোক বেশী তাহা নীচে দেখান হইল :—

	একজন খাজনা আদায়ী প্রতি খাজনা-দাতার সংখ্যা
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১৪
বর্দ্ধমান বিভাগ	১৬
ঢাকা জেলা	২১
বরিশাল জেলা	২৩
ফরিদপুর ,,	২৩
নোয়াখালি জেলা	৩৪
ময়মনসিংহ ,,	৪৮
ত্রিপুরা ,,	৪৮
রাজসাহী বিভাগ	৫৮

আর একটী তালিকার দ্বারা অন্যভাবে দুই শ্রেণীর লোক সংখ্যার তুলনা করা হইল :—

জিলা	কৃষকের সংখ্যা, ১০ জন জমিদার ও তাহাদিগের প্রতিনিধি প্রতি
বাঁকুড়া	৪২
হাওড়া	৭৩
বর্দ্ধমান	৯৩
যশোহর	৯৯
ফরিদপুর	৯৬

চট্টগ্রাম	৮১
২৪পরগণা	১,১৩
হুগলী	১,২১
নদীয়া	১,১১
মুর্শিদাবাদ	১,৫১
ঢাকা	১,৭৫
রংপুর	২,২৭
মেদিনীপুর	২,৬৬

বাঁকুড়া, হাওড়া, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার প্রতি কৃষককে তাহার শ্রম হইতে অন্ততঃ ৭জন লোককে পরিপালন করিতে হয়। বাংলা দেশের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা, সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও ক্ষয়িষ্ণু; তাহারই ভার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

ভূমিহীন শ্রেণীর আধিক্য—বাংলা দেশের চাষী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—

	সংখ্যা
স্বত্ববিশিষ্ট	৫,৩১৭,৯৭৩
প্রজা	৮৭৩,০৯৪
মজুর	২,৮৭৪,৮০৪

১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালে প্রথম দুই শ্রেণীর সংখ্যা ৯২লক্ষ হইতে কমিয়া ৬০লক্ষ হইয়াছে, এক-তৃতীয়াংশের বেশী (শতকরা ৩৫) হ্রাস, অথচ মজুর, মুনিষ, আধিয়ার, বর্গাদার, ভাগচাষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে ১,৮০৫,৫০২ হইতে ২,৭১৮,৯৩৯, অর্দ্ধেকের বেশী বৃদ্ধি। কৃষির দুর্দ্দশার ইহা অপেক্ষা কি শোচনীয় নিদর্শন আর হইতে পারে! দারিদ্র্য-পীড়িত ঋণভারগ্রস্ত বাংলার জোতদার ও চুকনিদার আপনার শেষ সম্বল ক্ষুদ্রায়তন জমিটুকু পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া নিজেরই জমিতে দীন, ভাগীদার, বর্গাদার বা মজুরে রূপান্তরিত হইয়া পরিশ্রম করিতেছে। খাজনা বা মহাজনের সুদ দিবার সামর্থ্য হারাইয়াই সে আজ মজুর শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর দিকে এই সুযোগে জমিতে সহর হইতে আর এক শ্রেণী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে। এই দশ বৎসরে বাংলা দেশে প্রজাস্বত্বভোগী অথচ চাষবিমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংখ্যায় বাড়িয়াছে ৩৯০,৫৬২ হইতে ৬৩৩,৮৩৪, শতকরা ৬০ বৃদ্ধি।

বিশেষ করিয়া আর একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে প্রজাস্বত্বের লেনদেনের অধিকার কৃষির কল্যাণপ্রদ হইতেছে কি না। যদি জমি ক্রমশঃ মহাজন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসিয়া পড়ে, বিশেষতঃ কৃষির এই দুর্দ্দিনের যুগে, তাহা হইলে কৃষির অবনতি ও পল্লীগ্রামের অশান্তি অনিবার্য্য। প্রায় ২৯ লক্ষ ভূমিহীন বা ভূমি হইতে বিতাড়িত মজুর বাংলায় আজ বর্ত্তমান। ইহা কোন দেশের পক্ষেই সমাজের শান্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক নয়। ১৯২৮ সালের সংস্কার আইনের ব্যাপকভাবে পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে কোন হলধারী জমিকে একাধিকক্রমে বার বৎসরের অধিক চাষ করিয়াছে, ভাগহিসাবেই হউক বা দিনমজুর হিসাবেই হউক, তাহাকে জমির উত্তরাধিকার ও প্রজাস্বত্ব না দিতে পারিলে নিঃস্ব মজুরশ্রেণীর বৃদ্ধি ভবিষ্যতে ঘোর অকল্যাণ ঘটাইবে।

কায়েমী জমির বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্বসংস্কার লইয়া যে কয়েকটী মাত্র কথা বলিলাম তাহা সমাজ-তন্ত্রবাদের কথা নয়। পৃথিবীতে সব কৃষিপ্রধান দেশই এই রকম উপায়ে প্রজাকে রক্ষা করিতেছে। বিলাতে, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্লাণ্ডে জমি-সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের সংস্কারও এই রীতিরই ইঙ্গিত করিবে।

গোবংশবৃদ্ধি—বাংলা দেশে লোকবৃদ্ধির কথা আগেই বলিয়াছি। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা এখানে চাষের জমি ভাগবাটোয়ারার জন্য গড়পড়তায় ক্ষুদ্রতম। জোত যে শুধু খণ্ডিত হইয়াছে তাহা নয়, টুকরা টুকরা জমি বসন্ত কালের শুক্‌না পাতার মত মাঠের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। বাংলাদেশে জনপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা সবচেয়ে কম। অপর দিকে বাংলাদেশে আবার গোজাতির সংখ্যা সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। মানুষের খাদ্যের অকুলানে গোপালন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অসমর্থ হইলেও বাংলা গোবংশবৃদ্ধিতে অগ্রণী হইয়াছে।

প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইল লোকসংখ্যা	১০০ একর আবাদী জমিপ্রতি গোসংখ্যা	জন পিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ (একর)	লোক বাহুল্যের নির্দ্দেশ
বাংলা	৬৪৬	১০৮	·৪৭	২·১
বিহার উড়িষ্যা	৪৫৪	৮৯	·৬৩	১·৫৮
যুক্ত-প্রদেশ	৪৫৯	৮৮	·৭৪	১·৩৫
মাদ্রাজ	৩২৮	৬৬	·৭৪	১·৩৫
পাঞ্জাব	২৩৮	৫৪	১·১২	০·৮৯
মধ্য প্রদেশ	১৫৫	৫১	১·৫৮	০·৬৩
বোম্বাই	১৭৭	৩৬	১·৬১	০·৬২

বাংলার গরু ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, হীনবল ও নিকৃষ্ট। অথচ সংখ্যায় তাহারা তিন কোটী চোদ্দ লক্ষ। কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ২ কোটী ৩০ লক্ষ একর। তাহার মধ্যে মাত্র ১লক্ষ একর জমি গরুর খাদ্য-ফসল উৎপাদন করে। যদি বাংলা দেশে সমস্ত খড়ের পরিমাণ ধরা যায় ও মনে করা যায় গরুর খাদ্য ছাড়া খড়ের অপর কোন ব্যবহার নাই, তাহাহইলে প্রত্যেক গরু পিছু মাত্র ২সের করিয়া খড় পাওয়া যাইবে, অথচ ৫সেরের কমে গরুর চলে না। বাংলাদেশে চাষের ক্ষেত লোকবাহুল্যের জন্য শুধু যে পথ ঘাট আক্রমণ করিয়াছে তাহা নয়, জলা ও নদীর শুষ্ক বক্ষে নামিয়া চাষী ধানরোপণ করিতেছে। সুতরাং গরুর খাদ্যাভাব ঘটিবেই। খাদ্যাভাবে গরু যত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণবল হয় চাষী তাহাদের সংখ্যা ততই

বাড়াইতে থাকে; লাঙ্গল ও গাড়ী টানা তাহাদের দ্বারা ত করাইতে হইবেই। কিন্তু যে পরিমাণে গাই বলদ ছোট ও ক্ষীনবল হয় সে পরিমাণে তাহাদের আহার্য্য কমে না। এই উপায়ে শুধু বাংলাদেশের কেন যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাংশ, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের চাষী, যাহাদের মোটে তিন একর হইতে পাঁচ একর পরিমাণ জোতের সম্বল, তাহারা গাই বলদের সংখ্যা অজস্র বাড়াইয়া চলিয়াছে। পাঞ্জাবের মুসলমান বলদ বাঁধিয়া রাখে, অকেজো অথবা অতিবৃদ্ধ গাই বলদ প্রয়োজনমত বিক্রয় করিয়া দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য লোকবহুল প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্ম ও নীতি গরুপালন সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি খেলিতে দেয় না, অথচ শ্রাদ্ধের সময় যখন ষাঁড় উৎসর্গ করিতে হয় তখন সবচেয়ে সস্তা ও নিকৃষ্ট ষাঁড় বাছিয়া লওয়া হয়, ইহার বিপক্ষে তখন হিন্দু ধর্ম্ম ও নীতি নির্ব্বাক্। ফলে ঐ অঞ্চলের গোজাতির দ্রুত অবনতি অনিবার্য্য হয়।

অব্যবহার্য্য, অতিরিক্ত গো-মহিষের সংখ্যা ২ ই কোটি—বাংলা দেশ গরুপালন সম্বন্ধে কি বিপরীত বুদ্ধি ও ব্যবস্থা দেখাইতেছে তাহার সম্বন্ধে আর একটা উদাহরণ দিব। নদীর মৃত্যু ও জল সরবরাহের ব্যাঘাতের জন্য হুগলি, বর্দ্ধমান ও যশোহর জেলায় কৃষির অবনতির চূড়ান্ত দেখা গিয়াছে। গত ৩০ বৎসরে হুগলি জেলায় কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিয়াছে শতকরা ৪৫, বর্দ্ধমানে কমিয়াছে শতকরা ৪০ ও যশোহরে কমিয়াছে শতকরা ৩১। এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক জমি যদি কোন জেলায় পতিত বা জঙ্গলাকীর্ণ থাকে ও ম্যালেরিয়া রোগে যদি লোক অনবরত ভুগে (হুগলীজেলায় জ্বরের প্রকোপের মান ৪৬·৬ ; বর্দ্ধমানের ৫৩·৪ ; ও যশোহরের ৪৮·২) তাহা হইলে ত দারিদ্র্য ও অনশন বাড়িয়াই চলিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ১৯২০ হইতে ১৯৩০ সাল এই দশ বৎসরে হুগলী জেলায় গোমহিষের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৪৭২,২৭৫ হইতে ৫২১,০২৮ ; বর্দ্ধমান জেলায় ৯১৮,১০৬ হইতে ৯৭৯,৮৫২ ; এবং যশোহর জেলায় ৮৪৪,৯৮৫ হইতে ১,০৭৫,৪৬২। কিছু দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কয়েকটী গ্রামে যাইয়া অকেজো ও অতিরিক্ত গরুর সংখ্যা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলাম।

	আলিগ্রাম	আউসগ্রাম
চাষের বলদ	১৪৪	১৫০
অকেজো গরু, ষাঁড়	৩	২
গাই	৪৩	৪০

এতগুলি গরু থাকা সত্ত্বেও গ্রামে দুধের পরিমাণ মাত্র এক মণ ছিল।

বাংলা দেশে ১০০ একর আবাদী জমি প্রতি গোমহিষের সংখ্যা ১০৮, কিন্তু ইজিপ্টে এই হিসাবে গোমহিষের সংখ্যা ২৫ ; চীনের ১৫ এবং জাপানের মাত্র ৬। গোমহিষের সংখ্যা বাংলায় সবপ্রদেশ অপেক্ষা বেশী হইলেও বাঙ্গালী কৃষক খুব কম পরিমাণেই দুধ ঘি খাইতে পায় ও বৎসরের পর বৎসর বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রজননের জন্য বাংলায় ষাঁড় আমদানি করে। নীলনদের তটভূমির কৃষিকে মাপকাঠি ধরিলে বাংলাদেশে তিনভাগের দুই ভাগ গোমহিষ না থাকিলেও কৃষিকার্য্য বেশ সুচারুরূপে চলিতে পারে। ইহাতে বুঝা যায়, ৩ কোটী ১৪ লক্ষ

গোমহিষের মধ্যে অন্ততঃ ২ কোটী গোমহিষ বাংলাদেশে অতিরিক্ত; তাহাদিগের পালন অনর্থক কৃষকের দারিদ্র্য, ঋণভার ও অনশন বাড়াইতেছে।

গোজাতি-অবনতির প্রতিকার—বড় লাটসাহেবের গোজাতির উন্নতিসাধন কিছুই সম্ভবপর হইবে না যদি কৃষকগণ গোজাতির সংখ্যা অযথা ও অনর্থক বৃদ্ধি করিতে থাকে, ভাল ও মন্দ গরুর প্রভেদ না করে এবং দুইয়েরই পক্ষে ভীষণ খাদ্যসঙ্কট প্রতিকার করা দূরে থাক আরও নিদারুণ করিতে থাকে।

পাঞ্জাব প্রদেশে এক বৎসরের মধ্যে (১৯৩২—১৯৩৩) ৪৮২,০০০ পশুর বংশবৃদ্ধি নিবারণ করা হইয়াছিল। বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে আইন করিয়া অকেজো ও নিকৃষ্ট পশু বৃদ্ধি নিবারণ না করিতে পারিলে কৃষকের ঋণভার কমিবে না, গুরুভারাক্রান্ত ভূমি অনুর্ব্বর হইতে থাকিবে এবং কৃষকও দুধ ও ঘি হইতে বঞ্চিত থাকিবে। গরু ও কৃষক দুইয়ে মিলিয়া এখন জমি হইতে যত রস টানিতে পারে তত টানিতেছে, যত ফসল, যত শাক, যত ঘাস, কিন্তু এই অসম নিরর্থক চেষ্টায় কাহারও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না। বাংলায় লোকসংখ্যা এখন প্রায় ৫ কোটী ৫ লক্ষ, তাহার মধ্যে ধরা যাইতে পারে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক শরীরবিজ্ঞানের অনুমোদিত খাদ্যের মাপকাঠি অনুসারে অন্য সকলে উপযুক্ত আহার করিলে ইহারা একেবারে নিরন্ন। যদি মানুষের এত দৈন্য ও ক্লেশ তবে নিরর্থক পশু পালন ও বৃদ্ধি করিয়া পশুর অনশন ও অবনতি, উপযুক্ত চাষ ও সার হিসাবে জমির উর্ব্বরতাহানি এবং পরিমাণ ও গুণ দুইই অনুসারে মানুষের খাদ্যের অভাব বাড়াইয়া বাঙালী কি গোমাতার চরণে সবই বিসর্জ্জন দিবে!

উপার্জ্জনশীলের সংখ্যা-হ্রাস—বাংলার কৃষির দুরবস্থা হইতে যদি আমরা শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলেও আমরা আশার কারণ খুঁজিয়া পাই না। যেমন ভারতবর্ষে তেমনই বাংলায় লোকবৃদ্ধি অনুপাতে শিল্পোন্নতি কিছুই দেখা যাইতেছে না, বরং সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে শিল্পী ব্যবসায়ীর সংখ্যা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় বেশ কমিয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে,—

		১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯১১—১৯৩৩
		কোটি লক্ষ	কোটি লক্ষ	কোটি লক্ষ	শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি
লোকসংখ্যা	ভারতবর্ষ	৩১।৫০	৩১।৯০	৩৫।৩০	+১২'১
	বাংলা	৪।৬৩	৪।৭৫	৫। ১	+১৫'০
উপার্জ্জনশীল কর্ম্মীর সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১৪। ৯	১৪। ৬	১৫। ৪	+ ৪'০
	বাংলা	১।৬২	১।৬৮	১।৪৭	— ৯'০
শিল্পকারখানা প্রভৃতিতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১।৭৫	১।৫৭	১।৫৩	—১২'৬
	বাংলা	।১৭	।১৭	।১৩	—১৪'২
শতকরা হিসাবে কর্ম্মীর সংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১১। ০	১১। ০	১০। ০	— ৯'১
	বাংলা	১০। ৫	১০। ১	৯। ০	—১৪'২
শতকরা হিসাবে মোট লোকসংখ্যা অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	৫। ৫	৪। ৯	৪। ৩	—২১'৮
	বাংলা	৩। ৯	৩। ৭	২। ৫	—৩৫'৮

গত ৩০ বৎসরে বাংলায় শিল্পী, ব্যবসায়ীর সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। এই সংখ্যা হ্রাস ও মোট কর্ম্মী ও লোকসংখ্যার অনুপাতে বাঙ্গালী শ্রমিকসংখ্যার শতকরা অবনতি ভারতবর্ষের অপেক্ষা অধিক বেশী। ইহা হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলার দ্রুততর আর্থিক অবনতি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। ত্রিশ বৎসরে বাংলায় উপার্জ্জনশীল কর্ম্মীর সংখ্যা হ্রাস (শতকরা ৯) বিশেষ আশঙ্কার কথা। অথচ বাংলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১০। যাহারা মুখের গ্রাস চাহে, তাহাদের দুই হাতই যে কাজ করে তাহা নহে। এই বৈপরীত্যই বাংলার অধোগতির প্রধান কারণ।

শ্রমিকের সংখ্যাহ্রাস—কিছুকাল যাবৎ বাংলায় শুধু যে শিল্পের প্রসার হয় নাই তাহা নহে, বরং হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২১ সালে বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যত লোক কাজ করিত ১৯৩১ সালে তাহা অপেক্ষা ৪ লক্ষ কম লোক কাজ করিত। ১৯২১ সালে তন্তুবায়রা সংখ্যায় ছিল ৪½ লক্ষ, ১৯৩১ সালে তাহা ২ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯৩৩ সালে কারখানার সংখ্যা ২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু শ্রমিকসংখ্যা ৫০ হাজারের অধিকও হ্রাস পাইয়াছিল। অবশ্য তাহার পর ১০।১২টী চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার ফলে কয়েক হাজার শ্রমিক বৎসরে কয়েক মাস ধরিয়া কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। শিল্পের অবনতিতে বাংলার কৃষি যাহা আর লোকসংখ্যার গুরুভার বহন করিতে পারিতেছে না আরও বিপর্য্যস্ত হইতেছে। যত লোক এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল তাহাদের সকলের কৃষির দ্বারা জীবনযাত্রা অসম্ভব, অথচ কৃষিনির্ভর লোকের সংখ্যাই দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এদিকে আর্থিক মন্দার কারণে ১৯৩১ সালে বাংলায় উৎপন্ন সকল প্রকার ফসলের মোট মূল্য শতকরা ৬১ হ্রাস পাইয়াছে; অন্য কোন প্রদেশে এই পরিমাণে মূল্যহ্রাস ঘটে নাই, অথচ অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় কৃষিনির্ভরতা অনেক অধিক বাড়িয়াছে। কুটীর-শিল্পগুলিও ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। মান্দ্রাজে যে কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির চেষ্টা চলিয়াছে বাংলায় তাহার কিছুই দেখা যায় না। শুধু তুলা শিল্পই ১০ বৎসরে মান্দ্রাজে ৭০ হাজার বেশী লোককে কাজ দিয়াছে।

কারখানা ও কুটির-শিল্প—বর্ত্তমানে বাংলার কলকারখানাগুলির অধিকাংশই ব্যাণ্ডেল হইতে বজবজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং এই সকল কল কারখানায় প্রধানতঃ অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া কাজ করে। যে সকল অঞ্চলে যেরূপ কাঁচামাল পাওয়া যায়, সেই সকল অঞ্চলে যদি সেই শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়, তবে পড়তা কম হওয়ায় ও বাঙ্গালী মজুর সহজে পাওয়া যাওয়ায় শিল্পেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে এবং বাংলার পল্লীবাসীদেরও ঐ সকল কারখানায় জীবিকার্জ্জনের সুযোগ হইতে পারে। পল্লী অঞ্চলে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হইলে কি উপকার হইতে পারে, কুষ্টিয়া ও ঢাকার কাপড়ের কলগুলি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এই সকল কলকারখানা কৃষিজীবীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে এবং পল্লীবাসীদের জীবিকার মান এত উন্নত করিয়াছে যে, পাটের আবাদ দ্বারা বহু বৎসরেও তাহা সম্ভব হইত না।

বাংলার অনেক কুটীর-শিল্প বহুকাল হইতে ভারতীয় এমন কি বহির্বাণিজ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অনেক কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য এখনও বাংলার বাহিরে রপ্তানি হয়। ঢাকা, মালদাহ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরের কাপড়; দাঁইহাট ও খাগড়ার ধাতব বাসন; নবদ্বীপের সোলার টুপি কিংবা ঢাকার শাঁখা বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন ও বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ঋণগ্রহণ ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্তের অভাব। মাদ্রাজে ও যুক্ত-প্রদেশে কুটীর-শিল্পের রক্ষাসাধন ও বিস্তারের প্রকাণ্ড আয়োজন চলিতেছে। যুক্ত-প্রদেশে ছোট কারখানা ও কুটীর-শিল্পকে যথাযথ ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা দানের জন্য একটি ব্যাঙ্ক ও পণ্যসরবরাহের কোম্পানী গঠিত হইতেছে, বাংলাদেশে ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয়। যেখানে আপাততঃ শিল্পীদের মধ্যে সমবায়প্রথায় কাজ করা সম্ভব নহে, সেখানে কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠান মাল বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিবে এবং কাঁচামাল সরবরাহেরও বন্দোবস্ত করিবে। শিল্পীদের উচ্চমূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করিতে হয়, এদিকে তাহারা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়েরও সুবন্দোবস্ত করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কলিকাতার বঙ্গীয় কুটীর-শিল্প সমিতির সহযোগে মফঃস্বলের প্রত্যেক সহরে এবং পল্লী অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে একযোগে কাজ করিতে পারে। বস্ত্র, আসবাবপত্র, ধাতব বাসন, প্রভৃতি যে সকল শিল্পে কারু, কলা ও নক্সার প্রয়োজন, কলিকাতার আর্ট স্কুলের ঐ সমস্ত শিল্পের জন্য নূতন নূতন মনোজ্ঞ নক্সা প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট ঢাকা ও বিষ্ণুপুরে তন্তুবায়দিগের জন্য একটি ক্যালেণ্ডারিং কল স্থাপন করিতে পারিলে বয়নশিল্পের বিশেষ সুবিধা হয়। বর্দ্ধমানেও তেমনই একটি নিকেল প্লেটিং কল স্থাপিত হইতে পারে। উহাতে ধাতু-শিল্পের বিশেষ সাহায্য হইবে। জার্ম্মনি এবং সুইজারল্যাণ্ডের মত ঘড়ি প্রস্তুত, জার্ম্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও জাপানের মত কাঠ, ধাতু, সেলুলয়েড বা রবারের পুতুল, বেভেরিয়ার মত পেন্সিল প্রস্তুত যদি কুটীর-শিল্প হিসাবে করা যায়, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত বহু যুবকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে। অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে ও রাষ্ট্রের সুবিধাবিধানে এই সমস্ত শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ শিল্পে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং ফলিত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বাংলার শিক্ষিত যুবকের পক্ষে অল্প মূলধনে জার্ম্মানী ও জাপান হইতে অল্প টাকার কল আমদানী করিয়া এই সকল শিল্পের পরিচালনা বিশেষ লাভজনক হইতে পারে।

মাঝারি ও বড় কারখানা হিসাবে বাংলায় কাগজ, গালা, দেশলাই, চামড়া, শণ, তামাক, তৈল ও হাড় প্রভৃতির ব্যবসায়ের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। যত প্রকার শিল্প হইতে পারে, ছোট, মাঝারি, বড় সব রকম শিল্পের বিস্তার না হইলে বাংলার যে কৃষিনির্ভরশীলতা এই ৩০ বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রতিরোধের উপায় নাই; অথচ উহার প্রতিরোধ না করিতে পারিলে অনশন, অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু বাড়িতেই থাকিবে। কয়েকটী সহরে বড় বড় কারখানা স্থাপন অপেক্ষা যদি পল্লী অঞ্চলে আখ, তেল, তামাক, চামড়া প্রভৃতির কারখানা

সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলে জনসংখ্যার ভার কমিয়া কৃষির উন্নতি সাধন হইবে এবং কৃষকও সম্বৎসর সমানভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইবে, এখনকার মত বৎসরে ২।৩ মাস করিয়া আলস্যে অথবা অন্নভ্রমে দিন কাটাইতে হইবে না।

মৎস্যের ব্যবসায়—পূর্ব্ব বঙ্গে কৃষির অবসরে অনেক কৃষক মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা চালায়। বাংলাদেশ বহুকাল ধরিয়া মৎস্যের অপচয় করিতেছে। অনেক জেলায় মাছ মুড়ির দরে বিক্রয় হইতেছে, আবার সেই সময় অন্য জেলায় লোক অনশনে কাটাইতেছে। মাছের পরিমাণ দেশে খুব দ্রুত কমিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে। আইন পাশ করিয়া যে সময়ে মাছ ডিম পাড়ে সেই সময় মাছধরা নিষেধ কিংবা যে সব জাল বা বেতের ফাঁদ অতি ক্ষুদ্র মাছকেও পলাইতে দেয় না তাহার ব্যবহার নিষেধ, কিংবা নদীতে সহরের ময়লা বা কারখানার তেল ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়া মাছের অবনতি সাধন বন্ধ করিতে হইবে। নদীর মোহানায়, সুন্দরবনে বা সমুদ্রতটে মোটর পোতের সাহায্যে মাছ ধরা, তৈল দ্বারা বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংবন্ধন করা, বরফের কারখানা স্থাপন করিয়া মাছ রক্ষা করা এবং সুবন্দোবস্ত করিয়া বরফের আবরণে দূর অঞ্চলে মাছ পাঠান আমাদিগের শিক্ষিত যুবকদিগকে এই প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী মাছের ব্যবসায়ে উদ্ভাবন করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন সমস্ত বাংলাদেশে মাছের দর কমিবে, অপরদিকে অপচয়ও বন্ধ হইবে। জাপানীরা পূর্ব্বসমুদ্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মাছের ব্যবসায় করতলগত করিয়াছে। শিক্ষিত বেকার বাঙ্গালী যুবকের এই ব্যবসায়ে প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার অপকর্ষ—বাংলার অধোগতির যে চিত্র আমি খুব সহজ ও সরল রেখায় টানিলাম তাহা পাছে অতিরঞ্জিত কাহারও মনে হয় এই জন্য মোটামুটি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী যে দুর্গতির পথযাত্রী তাহার তুলনামূলক পরিচয় এইবার দিব।

১। ভারতবর্ষের সকলপ্রদেশ অপেক্ষা বাংলা সর্ব্বাপেক্ষা লোকবহুল এবং জন প্রতি কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা কম ('৪৭ একার)। বিহার ও উড়িষ্যার সংখ্যা হইতেছে '৬৩ একার; যুক্ত-প্রদেশ ও মাদ্রাজের সংখ্যা '৭৭ একার। বাংলার অতিজননসমস্যা সব প্রদেশ অপেক্ষা ভয়াবহ।

২। উপরোক্ত কারণে বাংলা দেশের জোত সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র খণ্ডবিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইহাতে কৃষিকার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অবনতি দৃষ্ট হইয়াছে।

৩। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার গো-মহিষ যেমন সংখ্যায় অধিক, তেমনই সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জীব ও নিকৃষ্ট। প্রজননের ষাঁড়ের জন্য বাংলা অন্য প্রদেশের উপর নির্ভর করে।

৪। বাংলার খাদ্য উত্তর ভারতের অন্যপ্রদেশ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। তাহাতে যেমন চাউলের প্রাচুর্য্য তেমনই পলীয়ের (প্রোটিন) অভাব। পাঞ্জাবের কয়েদখানায় আমাশয়ে মৃত্যু বিরল; বাংলায় উদরাময়, আমাশয়, বেরিবেরি, চোখের রোগ, যক্ষ্মা প্রভৃতিতে মৃত্যু

তাহার খাদ্যের অভাব ও অসামঞ্জস্যের সাক্ষ্য দেয়। শুধু জল বায়ুর জন্য নহে, অপরিপুষ্টির জন্যও বাঙ্গালীর দেহে, উত্তর ভারতবাসী অপেক্ষা শক্তি ও সহনশীলতা কম।

৫। বর্ত্তমান জগদ্‌ব্যাপী মান্দ্যের সময় অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ১৯২৮—২৯ সালের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কমিয়াছে। বাংলায় কমিয়াছে শতকরা ৬১·১; বিহার ও উড়িষ্যায় ৫৮·২; মাদ্রাজে ৪৫ এবং যুক্তপ্রদেশে ৩৫·২। পাট ও চাউলের মূল্যহ্রাস ইহার প্রধান কারণ। ইহাতে বাংলাদেশে যে পরিমাণে এখন জীবনযাত্রার মান কমিয়াছে অন্য প্রদেশে তাহা হয় নাই।

৬। সমগ্র ভারতবর্ষ ধরিলে উপার্জ্জনরত কর্ম্মীর সংখ্যা গত ৩০ বৎসরে শতকরা ৪ বাড়িয়াছে, কিন্তু বাংলায় কমিয়াছে (—·৯০)।

৭। এই ৩০ বৎসরে বাংলায় শিল্প প্রসার দূরে থাক মোট শিল্পী ব্যবসায়ীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী কমিয়াছে (শতকরা—১৪·২); যদি সমগ্র জনসংখ্যা হিসাবে শ্রমিক সংখ্যার অনুপাত ধরা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশে এই হার শতকরা ৩৫·৮ কমিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষে কমিয়াছে শতকরা ২১·৮।

৮। বাংলা দেশের জন্মহার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা দ্রুততর কমিতেছে। বাংলার জন্মহার ১৯২৯—৩৩ সালে গড় পড়তায় (১০০০প্রতি) ২৭·০; বিহার ও উড়িষ্যায় ৩৪·০; যুক্তপ্রদেশে ৩৬·০। এই জন্মহ্রাস আনন্দের বিষয় হইত যদি ইহা মানুষের স্বেচ্ছায় হইত। অর্দ্ধাশন ও অনশনের ফলে খুব সম্ভবতঃ এই প্রকার জন্মহ্রাস দেখা গিয়াছে।

৯। ১৯৩৩—৩৪ সালে বাংলার পল্লী অঞ্চলে শিশুমৃত্যু হাজার প্রতি ১৮৯। ইহা শুধু মাদ্রাজ অপেক্ষা কম, অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী; যুক্তপ্রদেশের সংখ্যা হইতেছে হাজার প্রতি ১৭৫, ও মাদ্রাজের হাজার প্রতি ১৯২।

১০। বাংলা দেশে গড় পড়তায় স্ত্রীলোকের পরমায়ুর হার কমিয়া যাইতেছে, অন্য প্রদেশে তাহা হইতেছে না। ১৮৮১ সালের ২৬·৫১ হইতে কমিয়া ১৯৩১ সালে উহা ২৪·৮০ হইয়াছে; যুক্তপ্রদেশে তাহা ২৪·৯৪ হইতে বাড়িয়া ২৫·০৯ হইয়াছে ও সমগ্র ভারতবর্ষে তাহা ২৫·৫৮ হইতে বাড়িয়া ২৬·৫৬ হইয়াছে।

১১। কিন্তু পুরুষের পরমায়ুর হার বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কম, যথাক্রমে ২৪·৯১ ও ২৪·৫৬; পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যায় ও মাদ্রাজের হইতেছে ২৮, বোম্বাইয়ের ২৭·৮৪ ও সমগ্র ভারতবর্ষের ২৬·৯১।

১২। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বংলাদেশে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জাতিসমুদায় বেশী বংশ বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে যেমন শিশুসংখ্যা অধিক তেমনই আবার মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধের সংখ্যা কম। পাঞ্জাব যুক্তপ্রদেশ ও বিহার অপেক্ষা বাংলাদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে শিশুমৃত্যু যেমন অধিক তেমনই তাহাদিগের বৃদ্ধের সংখ্যার অনুপাতও কম। বাংলার কু-জনন সবপ্রদেশ অপেক্ষা কৃষ্টির অন্তরায়।

১৩। বাংলা দেশে যদিও পাঁচ ও ততোধিক বয়স্ক হাজার করা শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশ অপেক্ষা বেশী (১১'১), কিন্তু এই দশ বৎসরে বাংলায় শিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় সকল প্রদেশ অপেক্ষা কম বাড়িয়াছে (+৯'৭); যুক্তপ্রদেশে বাড়িয়াছে ৩৪'৪ : বোম্বাইয়ে ২০ ; মাদ্রাজে ১৯'১ ; বিহার ও উড়িষ্যায় ৮'৯।

১৪। বাংলায় ম্যালেরিয়া রোগে লোক মরে গড়পড়তায় বৎসরে ৩৫০,০০০। সকল প্রদেশ অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাংলাতেই বেশী, এবং ইহা বাংলার অর্থিক অধোগতি, স্বাস্থ্যহানি ও জন্মহ্রাসের একটী প্রধান কারণ। বাংলার ৮৬,৬১৮ গ্রামের মধ্যে ৬০,০০০ গ্রাম ম্যালেরিয়ার দ্বারা প্রপীড়িত। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে পরিশ্রম কমে, মাঠে, পথে ঘাটে জঙ্গল বাড়ে। মানুষ সহজে অন্য রোগাক্রান্তও হয়। ডাক্তারেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ম্যালেরিয়া মৃত্যুতে গড়পড়তায় মানুষের ভোগ হয় ২০০০দিন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় এই সব লোক মাসে ১০৲ করিয়া উপার্জ্জন করে, তাহাহইলে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া হইতে, মৃত্যুছাড়া, আর্থিক ক্ষতি হয় বৎসর বৎসর প্রায় ২৩ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা।

১৫। সকল প্রদেশ অপেক্ষা মেষ্টন বাটোয়ারায় বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছিল। তাহার ফলে বাংলায় কিছুকাল শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্য কোন দিকের জাতীয় উন্নতি অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। বাটোয়ারাতে বাংলার ৪ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের জন্য নিজস্ব বাক রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়াছিল ১১ কোটী টাকা, কিন্তু বোম্বাইএ ১ কোটী ৯০ লক্ষ লোকের জন্য ধার্য্য করাহইয়া ছিল ১৫ কোটী, এবং পাঞ্জাবের ২ কোটী লোকের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছিল ১১ কোটী টাকা। ইহার ফলে জন প্রতি রাজস্বের ব্যয়ের পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক কম হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যার জন প্রতি রাজস্ব ব্যয় বাংলা অপেক্ষা কম হইয়াছে মাত্র ১।৵০। বাংলায় ব্যয়ের পরিমাণ, ১৯৩১ ৩২ সালে হইয়াছে ১৸৵০, বোম্বাইয়ে হইয়াছিল পক্ষান্তরে ৬৸০ ; পাঞ্জাবে ৪৶০ এবং মাদ্রাজে ৩৶। শিক্ষার জন্য ইহার ফলে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশে কম খরচ হইয়াছে। ১৯৩০ সালে রাজস্বের খরচ হইয়াছে শিক্ষার জন্য, টাকা হিসাবে বাংলায়, '২৮ ; যুক্ত প্রদেশে '৪২ ; মাদ্রাজে '৬ ; পাঞ্জাবে '৮০ ; বোম্বাইএ ১। সেইরূপ জনস্বাস্থ্য ও ডাক্তারী বিভাগের জন্য শুধু যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা বাংলার রাজস্বের ব্যয় সবচেয়ে কম হইয়াছে। টাকা হিসাবে বাংলার খরচ '২১ ; যুক্তপ্রদেশের '১৪ ; পাঞ্জাবের '৩৯ ; মাদ্রাজের '৩৩ ; বোম্বাইয়ের '৪৭।

১৬। রাজস্ব বিভাগে এই অন্যায়ের কোন প্রতিকার নাই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি মন্ত্রিবিভাগে ব্যয়ের পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় মন্ত্রিগণের নিজস্ববিভাগের ব্যয় খুব কম বাড়িতে পারিয়াছে। ১৯২২ সালের মধ্যে বংলার মন্ত্রিবিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা ১৪ ; বোম্বাইএ বাড়িয়াছে শতকরা ২৫ ; যুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩০ ; পাঞ্জাবে শতকরা ৮২, মাদ্রাজে শতকরা ৮৬। অবশ্য পাটশুল্ক হইতে আদায়ের অর্দ্ধেক বাংলার রাজস্বের অন্তর্গত করায়, অন্যায় প্রতিকারের কিছু

চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু পাটের দর এখন কম এবং বিদেশী বাজারও মন্দা, ইহাতে শুল্কের চাপ খানিকটা বাংলার কৃষককে বহন করিতেই হইবে। বাংলার দীন চাষীর দেওয়া ধন বাংলাতেই সবটা ব্যয় হইলে পাট রপ্তানির উপর শুল্কের খানিকটা অনুমোদন করা যায়। কৃষির এই দুর্দ্দিনে শস্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করা বিশেষতঃ যে শস্যের চাষ কমাইতে হইতেছে তাহার খানিকটা কৃষিকার্য্যের উপর এমন কি জীবনযাত্রার উপরও আসিয়া পড়ে।

১৭। তবুও ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করভারাক্রান্ত। বাঙ্গালী ট্যাক্স দেয় ৭৷৷০ টাকা জনপ্রতি। যুক্তপ্রদেশের ট্যাক্সের পরিমাণ ৩৷৷০, মাদ্রাজে ৫৷৷৵০ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ১৸০। বাংলার করপ্রদানের ক্ষমতা বোম্বাইয়ের অপেক্ষা কম; অথচ বহির্বাণিজ্যের শুল্ক, পাট রপ্তানির শুল্ক, ইন্‌কম ট্যাক্স এবং লবন শুল্ক মিলিয়া বাংলা বোম্বাইএর দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে কর দেয়। জমির স্থায়ী বন্দোবস্তের অজুহাতে যে বাঙ্গালীকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা অযৌক্তিক, কারণ দেড় শত বৎসরের পুরাতন অনুষ্ঠান এইটা। যে ধন ইহা কোন পরিবার বা শ্রেণী বিশেষে উদ্বৃত্ত রাখিয়াছিল, তাহা এই শতাব্দীতে বহু হস্তান্তরিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐ ধন বণ্টিত হইয়াছে, তাহার ফলে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি এবং তাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নয়, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টই বেশী লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া জমির কায়েমী বন্দোবস্ত বাঙ্গালী কৃষকের প্রয়োজন মত, এমন কি জমিদারেরও প্রয়োজন মত প্রবর্ত্তিত হয় নাই। উপরন্তু, উহার ফলে বাঙ্গালী কৃষকের ও জমিদারের দেওয়া অর্থে ইংরাজের সমগ্র ভারতবিজয়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বাংলা তখন যে সকল যুদ্ধ চালাইবার জন্য অজস্র অর্থ ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহা ফেরতের সে এখন ন্যায্য দাবী করিতে পারে যদি অন্য প্রদেশ তাহাকে গত যুগের জমির কায়েমী বন্দোবস্তের জন্য সাধারণ করদানের হার আরও বাড়াইতে বলে।

১৮। বাংলাদেশের মত আর কোন প্রদেশের প্রাদেশিক বাজেটে এতবার ঘাট্‌তি দেখা যায় নাই। এই বৎসর ঘাট্‌তির সপ্তম বর্ষ এবং আমরা যদি ১৯২৮ ও ১৯৩০ এই দুই সালের অল্প বাড়তি ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে রাজস্বের ঘাট্‌তির অবস্থা সুরু হইয়াছে ১৯২৬ সাল হইতে। এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী রাজকোষের অনটন বাংলার সব দিককার উন্নতি স্থগিত করিয়াছে। অথচ ঠিক এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও বিশেষতঃ বোম্বাই অনেক দিকে বাংলা অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিকে বাংলা তাই তাল রাখিতে পারে নাই।

অস্তমিত গৌরব—প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ও মানুষের অবহেলায় বাংলার নদী ও জলসরবরাহের অবনতি। ইহার ফলে বাণিজ্যের হ্রাস, স্বাস্থ্যহানি এবং কৃষির অধোগতি। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন বিরাট সপ্তগ্রাম রাজধানী য়ুরোপীয় ও আরব বণিকের সমাগমে, ধনীর বিলাসপ্রমোদে ও বিরাট সৌধের উচ্চ আস্ফালনে আপনার সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিত, তখন কে জানিত তিন শতাব্দীর মধ্যেই এই অঞ্চল শ্রীহীন, স্বাস্থ্যহীন ও অরণ্যাবৃত

হইয়া পড়িবে, ফিরিঙ্গী কথিত "পোর্টো পেকুইনোর" চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে! সপ্তগ্রাম যখন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছিল তাহার প্রায় সওয়া শত বৎসর পরে একজন ফরাসী নৌসেনাপতি (১৭২৫) কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়াকে ভাগীরথীর উপর সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য সহর বলিয়া লিখিয়াছিলেন। অবশ্য টেভারনিঁয়া বিদিত (১৬৬৬ নদীয়া, কাশীমবাজার ও মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধির সহিত তাঁহার পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। কিন্তু ঠিক ঐ সময় হইতেই ভাগীরথীর অবনতি হেতু জাহাজগুলিকে ত্রিবেণীতে নঙ্গর করিতে হইত; সেখান হইতে দেশী নৌকায় পণ্যদ্রব্য কাশীমবাজারে লইয়া যাইতে হইত। ঠিক যেমন এক শতাব্দী পূর্ব্বে ফেডারিকি ১৫৭৮) বর্ণনা করিয়াছিলেন বেতড়ে (হাওড়া সহরের অন্তর্গত বেতাই) জাহাজ নঙ্গর করিয়া নৌকায় পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া সপ্তগ্রাম বন্দরে বিদেশী বণিকদিগকে যাইতে হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশীমবাজার ইংরাজের সুপরিচিত, বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রেশমব্যবসার কেন্দ্র ছিল। তখন কে অনুমান করিতে পারিত যে পশ্চিম বঙ্গের এই বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার শেষ দীপ্তি! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বর্দ্ধমানকে বাংলার উদ্যান বলিয়া ইংরাজেরা বর্ণনা করিত সেই স্বাস্থ্যকর মনোরম দীর্ঘিকা ও আম্রকানন সুশোভিত বহু মন্দির ও চতুষ্পাঠীমণ্ডিত শাস্ত্রাধ্যয়ন-মুখরিত জনপদ যে এত অধঃপাতে যাইবে তখন কে কল্পনা করিয়াছিল! অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ক্লাইভ ভাগীরথীর পথে মুর্শিদাবাদ পৌঁছিয়া নগরীর ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লণ্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিরাট রাজধানীকে বর্ণনা করিয়াছিলেন তখন কে জানিত ৫০ বৎসরের মধ্যেই রাজধানীর অদূরবর্ত্তী রাণী ভবানীর প্রসিদ্ধ বরানগর ম্যালেরিয়ায় একেবারে বিধ্বস্ত হইবে! উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ না হইতেই সেই প্রথম বাংলায় এই মহামারীর আবির্ভাব বরানগরে হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ আজ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জর্জ্জরিত। শৃগাল, কুক্কুর আজ স্বচ্ছন্দে গঙ্গাপার হইয়া যায়, আর রাজধানীর অপর পারে জগৎ শেঠের গুপ্ত রাজকোষের রক্ষী যক্ষের আত্মা সুবর্ণ মুদ্রা গুণিতে গুণিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, কবরে সিরাজউদ্দৌলার খণ্ডবিখণ্ডিত গৌরবহানিতে শিহরিয়া উঠিয়া উত্তপ্ত শোণিতে রক্তিম হয়! উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কাশিম বাজার, জঙ্গীপুর, সৈদাবাদ (ফরাশডাঙ্গা), কুমারখালি ও রাধানগর রেশমের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে আজ নদী-প্রবাহও নাই, বাণিজ্যও নাই, শিল্পও নাই, আছে শুধু বিপনির পরিবর্ত্তে প্রাচীন ভগ্নস্তূপ, শস্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে অরণ্য, গ্রামভিটার পরিবর্ত্তে ফণী মনসার কণ্টকবন, মানুষের পরিবর্ত্তে মশককুল!

আর্থিক পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থা—নদীরক্ষা না হইলে বাংলার তিনভাগের দুইভাগে কৃষির উদ্ধার ও পল্লীর সমৃদ্ধি নাই। বাংলার পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চল যদি এমনই ভাবে আরও অধোগতির দিকে অগ্রসর হয় তবে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই কলিকাতাও সপ্তগ্রাম বা মুর্শিদাবাদের মত ধ্বংশের পথে অগ্রসর হইবে। নদী রক্ষা ও সংস্কার, জলসেচ ও নিয়ন্ত্রিত জলপ্লাবন প্রবর্ত্তনের যে প্রণালী আমি ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে কলিকাতা

বা ঢাকার মত সহরে জলস্রোত ও জলসরবরাহ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার বসাইতে হইবে। গঙ্গা নদী কমিশন বসাইয়া যাহাতে আসাম ও ছোটনাগপুরের অরণ্য ছেদন বাংলার নদীরও জলপথের উত্তরোত্তর অপকর্ষ সাধন ও উপর্য্যপরি বন্যা আনয়ন না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুক্ত-প্রদেশ তাহার সুবিধামত জলসেচের জল গঙ্গা, যমুনা ও সর্দ্দা হইতে অপর্য্যাপ্ত টানিয়া লইতেছে। ইহাও বাংলার নদীর গতিহ্রাসের একটি কারণ। একটি নিখিল ভারতীয় গাঙ্গেয় কমিশন যুক্ত-রাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিভিন্ন গাঙ্গেয় প্রদেশের বিপরীত স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। নদী শাসন ও সংস্কার এবং জলসেচের আয়োজন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। যুক্তপ্রদেশ বা পাঞ্জাবের মত প্রাদেশিক উন্নতিবিধানে ঋণের অসুবিধা বা অর্থের অভাব হইবে না, যদি কায়েমী জমি বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন হয়। মজুর, প্রজা, জমিদার ও বণিক সকলেরই স্বার্থ এখন কৃষির সম্পদ ও পল্লীর স্বাস্থ্যের সহিত জড়িত। একটা বড় রকমের বহুবর্ষব্যাপী নদীশাসন, সংস্কার ও জলসেচের পরিকল্পনা উদ্ভাবন ও কার্য্যকরী না করিতে পারিলে দেশের রক্ষা নাই; ইহাতে যেমন প্রজা ও মজুরের ক্ষতি তেমনই ক্ষতি জমিদারের। জমিদারকে আপনার শ্রেণীগত স্বার্থ ভুলিতে হইবে না, তাহাকে শুধু অর্জ্জন করিতে হইবে সৎসাহস। কি উপায়ে নির্ব্বিবাদে জমির বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা আমি আমার "Land Problems of India" গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। জমিদারকে এখনকার খাজনার হার কিছু বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্র তাহাকে তাহা দিবার দায়িত্ব স্বীকার করিবে। যেমন ঋণ শোধ হয় তেমনই কয়েক বৎসর ধরিয়া সুদ ও কিছু আসল হিসাবে রাষ্ট্র জমিদারের নিকট হইতে স্বত্ব কিনিয়া লইয়া কিস্তি অনুসারে শোধ দিবে এবং জমির নূতন বন্দোবস্ত করিবে প্রত্যেক প্রজার সঙ্গে। খাজনার কত গুণ কিংবা কত কিস্তীতে জমিদার তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিবে এ সম্বন্ধে জমিদারকে, বর্ত্তমান কৃষির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দিয়া প্রজাদিগকে, রাষ্ট্রের জামিন অবলম্বনে, জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

কায়েমী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন হইলে বাংলার শিল্প ও ব্যবসা নূতন বল পাইবে। জমি বাংলার প্রায় অধিকাংশ উদ্বৃত্ত অর্থ টানিয়া লইতেছে, বাঙ্গালী উকিল, ব্যবসায়ী ও মহাজনের অর্থ। তাই আজ বাংলার বড় শিল্প ও কারখানা ব্যবসায়ের মালিক ধনিক ইংরাজ, গুজরাটী ও মাড়োয়ারী। যখন লোক শিল্প ব্যবসায় বা জমিকে সমানভাবে মূলধন রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার ক্ষেত্র মনে করিবে, তখন জমির দিকে ঝোঁক কমিবে। বাণিজ্যের মূলধনের তখন অভাব হইবে না। বাঙ্গালী যেমন যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রপোতবাহী বণিক ছিল তেমনই আবার হইবে। শিল্প, কারখানা ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য যেমন জমির সুবন্দোবস্ত অনুকূল হইবে, তেমনই উহার অনুকূল হইতে পারে যে কয়লার খনি-বহুল সিংভূম, মানভূম প্রদেশ বাংলাভাষাভাষী তাহাকে বাংলার রাষ্ট্রিক সীমানার মধ্যে ফিরাইয়া আনা।

বঙ্গ বিভাগ এখনও রদ হয় নাই, উহার পূর্ণ রদ করিতে পারিলে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সাহায্যে বাংলায় যে এখন কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা অসমতা রহিয়াছে তাহা শীঘ্র সংশোধন হইতে পারে।

এত বিপুল কৃষিপ্রধান লোকবহুল দেশে কৃষি ও শিল্প কার্য্যের একটা যথাসম্ভব সমতা ও আদান প্রদান প্রবর্ত্তিত না করিতে পারিলে আমাদের দুর্গতি ঘুচিবে না। কারখানা ও শিল্পের প্রবর্ত্তন হইলে পল্লী অঞ্চলে একটা নূতন বিজ্ঞান বুদ্ধি ও কৌশল আসিবে। পশ্চিম বঙ্গের অনেক অঞ্চলের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে জমির ফসলেরও কিছু পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। যুক্ত প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলের ন্যায় এখানেও আউস ধান, যব, যাওয়ার, রবিশস্য প্রভৃতি অধিক পরিমাণে চাষ করিতে হইবে। কূপ খনন বহুল পরিমাণে চালাইতে হইবে। দামোদর বা ময়ূরাক্ষীর সান্নিধ্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তুত হইবে তাহা যেমন লোহার ও ইস্পাতের কারখানার বিরাট যন্ত্র গুলিকে উঠাইবে, নামাইবে, তেমনই আবার নলকূপ হইতে জল তুলিয়া দিকে দিকে কৃষকের শস্যক্ষেত্র সিক্ত করিয়া দিবে অথবা তন্তুবায়ের কুটিরে তাঁত এবং লোহা, পিত্তল ও কাঁসার কারীগরের কুটিরে লৌহযন্ত্র চালাইতে থাকিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফসলের পর্য্যায় ও কৃষির প্রণালী না বদলাইলে বাঁকুড়া জেলা যেমন এখন বাংলার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতম সেই ক্ষয় কৃষি, মানুষ ও গোমহিষকে বীরভূম ও মেদিনীপুরেও আক্রমণ করিবে। শিল্পবিস্তার না হইলে কৃষির সম্যক্ উদ্ধার নাই। বাংলাকে এই আসল আর্থিক তত্ত্বটুকুকে আজ আগ্রহে গ্রহণ করিতেই হইবে।

বিজ্ঞান ও সামাজিক বিচার বুদ্ধি—শিল্পের সঙ্গে আসে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সঙ্গে আসে কর্ম্মকুশলতা ও সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি। বাঙ্গালী আজ অভাবগ্রস্থ, অনশনক্লিষ্ট, তবুও সে অভাব ও অনশন বাড়াইতেছে অমিতব্যয়িতার দ্বারা। তাহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্দ্ধশতাব্দীতে মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য সব প্রধান প্রদেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, আর এই লোকবৃদ্ধি হেতু বাংলার শিক্ষা প্রচার, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, সংস্কৃতির বিস্তার শুধু নয় কৃষির উন্নতিও সুদূর-পরাহত হইতেছে। কৃষকের পরিবার বাড়িলে জোত খণ্ড বিখণ্ডিত হয়, চাষের ব্যাঘাত ঘটে। বাঙ্গালী চাষীর অতি ক্ষুদ্র জমি তাহার গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইতে পারে না, অথচ সে পরিবার বৃদ্ধিকে ধর্ম্মের রীতি বলিয়া আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। সহরে সহরে দিনমজুরের সংখ্যা বাড়িয়া চলাতে মজুরীর হার বৃদ্ধি, শ্রমিকের বাসস্থান নির্ম্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যবিধ সামাজিক কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানেরও বিঘ্ন বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি প্রজাস্বত্ব সংস্কার, যাহা না হইলে কৃষকের মিতব্যয়িতা ও জীবনের উচ্চতর মান লাভ অসম্ভব তাহাও অতিরিক্ত, বিক্ষিপ্ত, জমি ও ভিটাবঞ্চিত, কৃষাণশ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সংখ্যা আজ প্রতিরোধ করিতেছে। বহু বৎসর হইতে বাংলার জনসমাজ বংশবৃদ্ধি ব্যাপারে ঘোর অমিতব্যয়ী হইয়াছে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোক অল্প বয়সে ঋতুমতী হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ এবং মুসলমানদিগের মধ্যে বহু বিবাহ ও নিকাপদ্ধতি প্রচলিত। যৌবনজীবনে স্মৃতি ও আচারের বিধি নিষেধ বাংলার পল্লীসমাজ বহুকাল

ভুলিয়া গিয়াছে, অপরদিকে অনাহার ও অস্বাচ্ছন্দ্য মানুষের জীবনের উচ্চ আশা নির্ম্মূল করিয়াছে। অনশনক্লিষ্ট, রুগ্ন ও অবসন্ন দেহে সংযম রক্ষাকরা সুকঠিন। তাই মিতব্যয়িতার আদর্শ দেশে টিকে নাই। বাংলার কৃষকবধূ ১২ কিংবা ১৩ বৎসরেও জননী হয় এবং গৃহস্থালীর কাজ, মাঠ বা গোয়াল ঘরের কাজ যেমন তাহাকে বিশ্রামের অবসর দেয় না তেমনই তাহার সন্তান উৎপাদন দ্রুত চলিতে থাকে। যদি তাহার সন্তান ধারণের ব্যবধান বাড়ে তাহা হইলে হয়ত এত গুলি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, হয়ত ২।১ জনের শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগের সেবা হয়, অবসরসময় সে একটু বিলাস প্রমোদ করিতে পারে, সুজন্মার দিনে হয়ত ২ ১টী রূপার গহণাও সে ন্যায্য দাবী করিতে পারে। একটী সুনিয়ন্ত্রিত, ক্ষুদ্র পরিবারের নূতন আদর্শ কৃষকের কুটীরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ, অস্বাস্থ্য ও মহামারী বাংলার নিত্য সঙ্গী হইবে। আচার ও সংযম, মিতব্যয়িতা ও দূরদর্শিতা হারাইবার ফলে বাঙ্গালী আজ দারিদ্র্যকে ও মহামারীকে অলঙ্ঘ্য বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।. বাংলার আর্থিক অধোগতির পশ্চাতে রহিয়াছে আরও ভীষণতর দারিদ্র্য চিত্তের ও চরিত্রের।

মানুষ ও আবেষ্টন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। দুইএর মধ্যে আদান প্রদানই জীবন। সূর্য্যচন্দ্র, ঋতু পর্য্যায়, নদী সমুদ্র যেমন মানুষের পরিশ্রম, গৃহস্থালী ও তাহার আচার ব্যবহার, বিধি নিষেধের সঙ্গে গাঁথিয়া রহিয়াছে, তেমনই তাহারা অনুপ্রবেশ করিয়াছে মানুষের অন্তর্জ্জীবনে তাহার আশা নিরাশায়, তাহার জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে। এই দেড় শত বৎসরের ভৌগলিক প্রকৃতির বিপর্য্যয় কৃষ্টি ও শিল্পের প্রধান প্রাচীন কেন্দ্রগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে অদৃষ্টবাদী ও জাতীয় তাহার চরিত্রকে আজ হীনবল করিয়াছে। কিন্তু জাতীয় চিত্তের গোপন অন্তঃপুর হইতেই জীবনের প্রথম সাড়া জাগে। এবং ঐ সাড়া জাগিলে মানুষের শ্রম ও চাতুর্য্য, বুদ্ধি ও বিক্রম বিরুদ্ধ ভৌগলিক প্রকৃতিকে পরাস্ত ও বশীভূত করিয়া, কুম্ভকার যেমন বাংলার পলিমাটী লইয়া স্বেচ্ছামত পুতুল তৈয়ার করে তেমনই প্রকৃতিকে তাহার জীবনের প্রয়োজনের অনুযায়ী করিয়া গড়িতে থাকে। বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্তে সেই প্রেরণা আসিয়াছে, যাহার ফলেই তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিশ্রম ও নির্ম্মাণদক্ষতা উচ্চতর জীবনযাত্রার আদর্শে ধ্বংশোন্মুখ আবেষ্টনকে ধনসম্পদে রূপান্তরিত করিবে, বাংলাকে নূতন করিয়া গড়িবে, যেমন যুগ যুগ ধরিয়া বাংলাকে নিত্যনূতন করিয়া গড়িতেছে বাংলার বালার্ককিরণস্নাত, ঈষৎ রক্তাভ পঙ্কিল জলস্রোত।

—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বাংলা বানান সমস্যা আলোচনা-সভার সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন বাঙ্গালীর উপর একটা বড় রকম কলঙ্ক চাপাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী নাকি—

প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়,
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ॥

অর্থাৎ কিনা বাঙ্গালীর কাজে কথায় ঠিক নাই। বাঙ্গালী হইয়া অবশ্য আমরা নিজের মুখে এই কালী মাখিতে রাজি নই, কথাটা সত্যই হউক আর যাহাই হউক। বাঙ্গালী নবীন সেন বলিয়াছিলেন তাই আমরা উচ্চবাচ্য করি নাই, বড়লাট কর্জ্জন ঐ রকম একটা কথা বলায় আমরা কিন্তু বেজায় চটিয়া গিয়াছিলাম। সে যাহা হউক একটা কথা কিন্তু খুব খাঁটি যে বাঙ্গালীর লেখায় আর পড়ায় ঠিক নাই। বাঙ্গালী "আগুন" লিখিয়া জল 'পড়ে না কিম্বা' "চাঁদ" লিখিয়া 'ফাঁদ' দেখে না সত্য, কিন্তু অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমাদের লেখা আর পড়া, বা বলা আর লেখা এক নয়। "অনেক" আর "এক"—এই দুইএর "এ" আমরা এক রকম পড়ি না। বর্ত্তমান "কাল", "কাল" চোখ—এই দুই জায়গায় "কাল"-এর উচ্চারণে অনেক তফাৎ। সে তোমার "মত", তোমার "মত" কি—এখানেও দুই "মতে"র দুই উচ্চারণ।

আমাদের যে স্বরেই শঠতা তাহা নয়, ব্যঞ্জনেও আমাদের গোলযোগ কম নয়। গৃহলক্ষ্মীরা ব্যঞ্জনের দোষের কথা শুনিয়া অবশ্য আমার উপর চটিবেন না—এ ব্যঞ্জন ভাষার ব্যঞ্জন। কানে "শোনা" আর কানের "সোণা"—এখানে "শোনা" আর "সোনা" শুনিতে একই, কিন্তু চেহারায় আলাদা। তিনি "যান", তুমি "জান",—এখানেও আমাদের বলা ও লেখা এক নয়। এই রকম আরও অনেক গরমিল পাওয়া যাইবে।

স্বরাজ্য দল নাকি দো-ইয়ারকি ভাঙ্গিয়া এক-ইয়ারকি করিবেন। বাঙ্গালার বানান রাজ্যে যখন দো-ইয়ারকি দেখা যাইতেছে, তখন যদি কেহ তাহাকে এক-ইয়ারকি করিতে চায় সে কাজটা নিশ্চয়ই সময় মোতাবেক হইবে। পয়লা কথা এই যে, যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত থেকে ধার করিয়া বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লওয়া হয় নাই সেখানে বাঙ্গালার স্বরাজ্য চলিবে। ইহাতে বোধ হয় পুরানী রৌশনীদের কোন অমত হইবে না। এই ধরুন ষত্ব-ণত্বের কথা, ঐ দুইটা সংস্কৃতের জন্যই বাঁধা থাকিবে অর্থাৎ কিনা এই দুইটা হইল সংস্কৃতবিভাগের জন্য রিজার্ভড্। ইহাতে অবশ্য নরম দল কোন আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যখন দেখি নরম দলেরাই জিনিষ, পোষাক, কোরাণ,

গভর্ণমেণ্ট প্রভৃতি—এলাকার বাহিরের বিষয়েও ষত্ব-ণত্বের কড়াকড়ি চালাইতেছেন, তখন মনটা বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারে না।

রূপক অলঙ্কার বাদ দিয়া সোজা কথায় বলিতে গেলে আমরা জানিতে চাই বাঙ্গালা বানান কি সংস্কৃতের হুবহু নকল হইবে, না উচ্চারণ-অনুযায়ী হইবে? যদি বল সংস্কৃত-অনুযায়ী হইবে, তবে প্রশ্ন উঠিবে সংস্কৃত-অনুযায়ী কেন? তুমি হয়ত বলিবে সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষার জননী,—এখানেই কিন্তু এক মহা খট্‌কা। বাঙ্গালা যদি সংস্কৃতের মেয়ে হইল তবে যে সময় সংস্কৃত বাঁচিয়াছিল সেই সময়েই বা ভাষাতত্ত্বের হিসাবে ঠিক তার পরেই বাঙ্গালার জন্মান দরকার ছিল। কিন্তু মহারাজ অশোকের পাথরের লেখা হইতেই প্রমাণ হইবে যে দু হাজার বছরের আগেই গোটা ভারতে সংস্কৃত মরিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা কিছু তত প্রাচীন নয়। বাঙ্গালার বয়স জোর হাজার বছর। এ কথা আমরা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্যাণে জানিয়াছি। বাঙ্গালার আগে অপভ্রংশ, প্রাকৃত, প্রাচীন প্রাকৃত (পালি যাহার একটি বুলি ছিল)। কাজেই সংস্কৃতকে বাঙ্গালার মা না বলিয়া তাহাকে দিদিমার দিদিমা বলা যাইতে পারিত, যদি পালি ইত্যাদি প্রাচীন প্রাকৃত সংস্কৃতের মেয়ে বলিয়া সাব্যস্ত হইত। কিন্তু পালির কোষ্ঠী বিচার করিয়া অটো ফ্রাঙ্কে প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃত পালির মা নয়। পিশেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন খালি তাহাই নয়, সংস্কৃত প্রাকৃতেরও মা নয়। তবুও তর্কের খাতিরে, যদি মানা যায় বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতেই বাহির হইয়াছে, তাহা হইলে বাঙ্গালার বানান যে সংস্কৃতের মতন হইবে তাহার হদিস কি? পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ কোনটাই ত সংস্কৃতের বানান মানে না। বাঙ্গালা মানিতে যাইবে? পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ লিখে 'ভিক্‌খু', আমরা কেন লিখিব 'ভিক্ষা অর্থাৎ ভিক্‌ষা'? পালি, প্রাকৃত লিখে 'দক্‌খিণ' আমরা কেন লিখিব 'দক্ষিণ'? পালি লিখে 'ঞাতি, ঞাণ', প্রাকৃত লিখে 'ণাই, ণাণ'; আমরা কেন লিখিব 'জ্ঞাতি, জ্ঞান'? মাগধী প্রাকৃত লিখে "শে", আমরা কেন লিখিব "সে"? পালি লিখে 'জিব্‌হা', প্রাকৃত লিখে 'জিব্ভা', আমরা কেন লিখিব 'জিহ্বা'? যদি সাবেক নজির মানিতে হয়, তবে বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের শাসনে আনা চলে না।

তবুও না হয় মানিয়া লইলাম যে সকল শব্দ সংস্কৃতেরই মত, অর্থাৎ যাহাকে বৈয়াকরণেরা বলেন "তৎসম" যেমন কোণ, শণ, যদি, সকল, ইত্যাদি—এগুলিকে সংস্কৃতের নিয়মেই লিখা উচিত। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, বরং একটু সূক্ষ্মরূপে বলিতে গেলে যে সকল শব্দ সংস্কৃতেও দেখা যায় আর বাঙ্গালাতেও বিগড়ান অবস্থায় দেখা যায় অর্থাৎ যাহাকে বৈয়াকরণেরা বলেন "তদ্ভব" যেমন কাণ, সোণা, ইত্যাদি,—সে গুলির বানান কেমন হইবে? যাঁহারা "তৎসম" শব্দে সংস্কৃত বানান চালান, "তদ্ভব" শব্দ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিন্তু দুই মত দেখা যায়। একদল বলেন কর্ণে "ণ" আছে কাজেই "কাণে"ও "ণ" থাকিবে, স্বর্ণে "স" ও "ণ" আছে, কাজেই "সোণা"য়ও "স" ও "ণ" থাকিবে, বাঙ্গালায় প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে "স" এবং "ণ" এর "শ" ও "ন" উচ্চারণ হইলেই না কি

হয়! অর্থাৎ সংস্কৃতের বানান চালাও, উচ্চারণ টুচ্চারণ কিছুই দেখিবার দরকার নাই। ইহাদের মত কিন্তু ঠিক বুঝা যায় না। কারণ ইহারাই "যখন", "তখন" ইত্যাদি স্থানেও "ন" লিখেন। অথচ সংস্কৃতের "যৎক্ষণ", "তৎক্ষণ" আর বাঙ্গালার "যখন", "তখন" একই। এইমতে, সে "শোনে"—এখানে "ণ" কেন হইবে না? 'শৃণোতি' আর 'শোনে' একই। ইহারা "রাণী"তে "ণ" লিখেন, অথচ সংস্কৃত 'রাজ্ঞী'তে "ণ" নাই। আর এক দল বলেন সংস্কৃতে ণত্বের কারণ যে "ঋ", "র", "ষ" তাহা যখন বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দে নাই, তখন "এখন", "কান" ইত্যাদিরূপ "ন" যুক্ত বানানই শুদ্ধ। এটা একটা ন্যায়ের ফাঁকি। কারণ ণত্বের কারণ আগের 'ঋ', 'র' বা 'ষ' নয়, বরং সংস্কৃত ভাষায় 'ঋ', 'র' বা 'ষ' এর পর "ন" এর উচ্চারণ বদ্‌লাইয়া ণ হইত, এই জন্য সেই ভাষায় উচ্চারণ অনুযায়ী ণ লেখা হইত। কোণ, গণ ইত্যাদি অন্য জায়গায়ও যেখানে সংস্কৃতের **উচ্চারণ মত** "ণ" হইত, সেখানে আগে 'ঋ' 'র', 'ষ' না থাকিলেও "ণ" লেখা হইত। আমরা যদি বাঙ্গালার খাঁটী **উচ্চারণ** না ধরি, তবে মূল বানান কেন রাখা যাইবে না? আর যদি বাঙ্গালার উচ্চারণ মানিয়া চলি, তবে "সোণা"র "ন"-এ আসিয়া থামিলে চলিবে না, একেবারে "শোনা"য় গিয়া তবে রেহাই পাইবে। যদি বল এ কি হইল, 'স্বর্ণ' আর 'শ্রবণ করা' দুইই যদি "শোনা" হয়, তবে মানে বুঝিব কেমন করিয়া? আমি বলিব যদি গায়ের 'তিলে' আর গাছের 'তিলে' কোন গোল না ঠেকে, যদি গানের 'তালে' আর গাছের 'তালে' ঠোকাঠুকি না ঘটে; তবে স্বর্ণ 'শোনায়' আর শ্রবণ 'শোনা'য়ও কোন হাঙ্গামা হইবে না। আসল কথা, ভাষায় অক্ষরের মত শব্দ কখন দল ছাড়া হইয়া একেলা আসে না। অক্ষর থাকে শব্দের সঙ্গে জড়াইয়া, আর শব্দ থাকে বাক্যের মধ্যে মিশাইয়া। কাজেই মানে যদি আলাদা আলাদা হয়, তবে বানান বা উচ্চারণ এক হইলেও বুঝিবার গোলমাল বড় একটা হয় না।

যে দুই দলের কথা বলিতেছিলাম, ইহাদের উভয়েরই কিন্তু কয়েকটী বে-আইনী কাজে বেশ মিল দেখা যায়। তাহার মধ্যে একটা মস্ত ব্যাপার হইতেছে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' এক করা। সংস্কৃতে এই দুয়ের উচ্চারণে ও কাজে অনেক তফাৎ। বর্গীয় 'ব' এর উচ্চারণের জায়গা ঠোঁঠ আর অন্তঃস্থ 'ব' এর ঠোঁঠ আর দাঁত। বর্গীয় 'ব'এর আগে 'ম্' 'ম্'-ই থাকে, কিন্তু অন্তঃস্থ 'ব'এর আগে 'ম্' 'ং' হয়, যেমন কিংবা। অন্তঃস্থ 'ব' অবস্থাবিশেষ 'উ' হয়, যেমন বাক্, উক্ত; কিন্তু বর্গীয় 'ব' একেবারে নির্বিকার। যদি বল বাঙ্গালায় ত দুয়েরই উচ্চারণ এক। তবে আমি বলিব, বেশ কথা, যদি এই অজুহাতে দুই 'ব' এক কর, তবে জ-য, ণ-ন, শ-ষ-স (স্থান, স্রোত ইত্যাদি শব্দ ছাড়া স) এক কর না কেন, সকল লেঠা চুকিয়া যাইবে।

দুই দলই লিখেন 'চুল,' অথচ ইহা 'চূড়া' হইতে। 'শোওয়া', অথচ ইহা 'স্বপ্' ধাতু হইতে, 'শী' ধাতু হইতে নয়। 'বসা', অথচ ইহা 'উপবিশ্' হইতে, 'বস্' ধাতু হইতে নয়। 'গরু', অথচ ইহা 'গোরূপ' শব্দ হইতে সিদ্ধ। মূল-অনুযায়ী বানান করিতে হইলে লিখিতে হইবে 'চূল', 'সোওয়া,' 'বশা,' 'গোরূ'।

আমরা দেখিলাম পুরানী রৌশনীদের অর্থাৎ সংস্কৃতভক্তদের (আমিও বাদ নই) মতের

ঠিক নাই, বলা ও লেখার মিল নাই, লেখা ও পড়ার ঐক্য নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি বানান জিনিসটা কি? বানান কি অক্ষর দিয়া একটি ভাষার শব্দ প্রকাশ বা পরিচয় করিবার নাম নয়? তাহা হইলে বানান সেই ভাষার উচ্চারণের পরিচয়কারী হওয়া দরকার। এই হইল বানানের আসল উদ্দেশ্য। গোড়ায় বানান এই রকম উচ্চারণ-অনুযায়ীই (phonetic) থাকে। কিন্তু যখন উচ্চারণ কালক্রমে বদলাইয়া যায়, তখন যদি সাবেক বানানই বজায় রাখা হয়, তবে বানান একটা আচারের মত (conventional) হইয়া দাঁড়ায়। তখন বানান শব্দের উচ্চারণকে সাচ্চারূপে না চিনাইয়া বরং তার ব্যুৎপত্তি বা ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া দাঁড়ায়। ইংরাজির বানানও এইরূপ। Know, Knee, Knave প্রভৃতির K এক সময় উচ্চারণ করা হইত। K থাকাতে Know, Knee যে সংস্কৃত 'জ্ঞা' 'জানুর' সঙ্গে এক, এবং Knee, Knave জার্ম্মান ভাষার Knie, Knabe র সহিত এক বুঝিতে পারি। বলা আবশ্যক জার্ম্মান ভাষায় এইরূপ জায়গায় K র উচ্চারণ আছে। সে যাহাই হউক এইরূপ বানানকে আমরা কখনও বর্ত্তমান ইংরাজির প্রকৃত বানান বলিতে পারি না। বাঙ্গালা বানানেরও অবস্থা তাই। ইংল্যাণ্ডে এই বানান দুরস্ত করিবার জন্য সভা সমিতি করিয়া চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু ইংরাজ জাতির গোঁড়ামির জন্য বড় বেশী কাজ হইয়া উঠে নাই। বাঙ্গালা বানানেরও মেরামত হওয়া দরকার। পালি প্রাকৃতের বানান যেমন উচ্চারণ-অনুযায়ী ছিল, বাঙ্গালার বানানও তেমনটি হওয়া চাই। বাস্তবিক আমাদের যে বানান, তাহা এক মুঠা লোকের জন্য; দেশের আপামর সাধারণ তাহা এখন মানে না, আগেও মানিত না। যদি বিশ্বাস না হয়, যে কোন পুরান পুঁথি বা আদালতের নথি কিংবা ডাকঘরের চিঠির বাক্‌শ সার্চ করিয়া দেখ। উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান হইলে যে এখন পাঁচ বছর বাঙ্গালা শিখিয়াও বানান ভুল করিয়া ফেলে, সে দু এক মাসে বানান শিখিতে পারিবে। ইহা আমাদের মত মূর্খের দেশে একটা বড় কম লাভ নয়। উচ্চারণমত বানান সংস্কার করিলে বানান কি রকম হইবে, এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব।

প্রথমে বাঙ্গালা স্বরের কথা ধরা হউক। আগে ছিল বর্ণমালায় ষোলটি স্বর—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণমালা হইতে ৠ, ৡ, একেবারে বাদ দিয়া এবং "ং", "ঃ"কে ব্যঞ্জন বর্ণের ভিতর পুরিয়া স্বরবর্ণকে বারটি করেন। তিনি ঌ কে অনায়াসে বাদ দিতে পারিতেন। কেন দেন নাই জানি না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালায় একট (Monophthong) হ্রস্বস্বর আছে নয়টি এবং জোড় (Diphthong) হ্রস্বস্বর আছে উনিশটী, মোট এই ২৮টি হ্রস্বস্বরের দীর্ঘও আছে আটাইশটী। একুনে বাঙ্গালার স্বর ছাপ্পান্নটি। হ্রস্ব স্বরগুলি নিম্নে লিখিতেছি।

(ক) একট স্বর—

হ্রস্ব	অ	যেমন	অকাল	হ্রস্ব	উ	রুটি
„	আ		আমি	হ্রস্ব	এ	রাখে
„	ই		তুমি	হ্রস্ব	ও	মোটা

বিকৃত হ্রস্ব অ্যা	চা'লের (চাউলের)	ইউ	শিউলী
বিকৃত হ্রস্ব এ	কে'মন	উই	দুই
বিকৃত হ্রস্ব ও	ক'নে (কন্যা),	এই	খেই
	ব'লে (বলিয়া)	এউ	ঢেউ
(খ) জোড় স্বর—		এএ	পেয় (পান করে)
অএ যেমন	পয়সা	এও	পেও (পান কর)
অও	হও	ওই	মই (=মোই)
আই	দাই	ওউ	মউ (=মোউ)
আউ	ঝাউ	ওএ	দোয় (দোহন করে)
আএ	হায়	ওও	দোও (দোহন কর)
আও	প্লাওনা	বিকৃত এএ	দে'য়
ইই	আমিই	বিকৃত এও	দে'ও

একট নয়টি স্বরের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি বর্ত্তমান অক্ষর দ্বারা দেখান যাইতে পারে। বাকীগুলি দেখান যায় না। সংস্কৃতের 'আ, এ, ও' দীর্ঘ। বাঙ্গালায় কিন্তু এইগুলি হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়ই। প্রাকৃতেও হ্রস্ব 'এ', হ্রস্ব 'ও' ছিল। নয়টি একট দীর্ঘস্বরের মধ্যে কেবল পাঁচটি বাঙ্গালা অক্ষরে দেখান যায় যেমন 'আ, ঈ, ঊ, এ, ও'। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে মোট আঠারটি একট স্বরের জন্য আটটি মাত্র হরফ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় 'ঋ', 'ঌ'র খাঁটি উচ্চারণ নাই। পালি প্রাকৃতেও ছিল না। সংস্কৃত বাঙ্গালা হরফে লিখিবার জন্য এই দুইটির দরকার হইতে পারে। সেই রকম 'ৠ, বৈদিক ল, ং' প্রভৃতি অক্ষরের দরকার পড়িতে পারে। তাই বলিয়া এগুলি বাঙ্গালা বর্ণমালায় থাকিতে পারে না। জোড় স্বরের মধ্যে বাঙ্গালা হরফের কেবল 'ঐ, ঔ' আছে। কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ সংস্কৃতের মত 'আই, আউ' 'ওই, ওউ' নয়। বাকীগুলির জন্য কোনও হরফ নাই। এখন যদি আমাদিগকে উচ্চারণ-অনুযায়ী বাঙ্গালায় লিখিতে হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে নয়টি একট হ্রস্বস্বর এবং উনিশটি জোড় হ্রস্বস্বরের জন্য আলাদা আলাদা হরফ চাই। আমাদের পুঁজি কিন্তু একট হ্রস্ব তিনটি হরফ এবং জোড় হ্রস্ব দুটি হরফ। তাহা হইলে তেইশটি হরফ নূতন গড়া দরকার! কিন্তু সে ত এক বিভ্রাট ব্যাপার।

আমরা কৌশল করিয়া অল্প অক্ষর দ্বারা এই সব উচ্চারণ দেখাইতে পারি। এখন প্রায় সকলেই বিকৃত "ও", বিকৃত 'আ'-র জন্য apostrophe দিয়া লিখেন, যেমন ব'লে (বলিয়া), কা'ল (কল্য)। আমরা ইহা মঞ্জুর করিয়া লইতে পারি। তবে বিকৃত "এ"র জন্য 'অ্যা' দেওয়া মোটেই সঙ্গত হয় না। 'অ্যাক' (এক) লিখা কিম্ভূতকিমাকার। তার চেয়ে বিকৃত "আ" ও বিকৃত "ও"র ন্যায় বিকৃত "এ"র জন্য এ' লেখা মন্দ নয়। জার্ম্মান ভাষার ä ö ü র মত বাঙ্গালায় অ' আ' এ' চলিতে আপত্তি কি? 'যত', 'তত' প্রভৃতি শব্দের শেষের হ্রস্ব ওকার দেখাইবার জন্য অক্ষরের নীচে কষি দিলেই চলিতে পারে, যেমন

যত্, তত্, ছোট্ ইত্যাদি। এই প্রস্তাবটি অবশ্য নূতন নয়। কেহ কেহ শেষের উচ্চারিত হ্রস্ব ওকারের জন্য ওকার লিখেন যেমন 'মতো'। কিন্তু আগের হ্রস্ব ওকার দেখাইবার উপায় কি? যদি সেখানেও ওকার লিখি তাহা হইলে 'মত' স্থানে 'মোতো', 'অতি' স্থানে 'ওতি' লিখা দরকার হইবে এবং 'মতি' লিখিতে 'মোতি', 'করি' লিখিতে 'কোরি' লিখিতে হইবে। জোড় হ্রস্ব স্বরের জন্য বাঙ্গালা স্বরবর্ণের 'ঐ, ঔ' বাদ দিয়া সতরটি হরফ দরকার। এই সতরটি হরফ না গড়িয়া বরং আমরা 'ঐ, ঔ'-কে বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে বাদ দিতে পারি। পালি ও প্রাকৃতেও 'ঐ, ঔ' নাই। তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাব অনুসারে হ্রস্ব স্বরগুলি এই হইবে যথা—অ আ ই উ এ ও অ' আ' এ'। ইহার সহিত পালি ও প্রাকৃতের স্বরবর্ণ আমরা তুলনা করিতে পারি,—অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও। দীর্ঘস্বরের জন্য কোন আলাদা হরফের দরকার নাই। তবে দীর্ঘস্বর বুঝাইবার জন্য কোন চিহ্ন হইবে কিনা? যেমন সংস্কৃত ইত্যাদির রোমান অক্ষরের অনুলেখনে (transliteration) স্বরবর্ণের উপর দীর্ঘ চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে, আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালায় তাহার কোন দরকার নাই। বাঙ্গালা উচ্চারণের নিয়মেই হ্রস্ব দীর্ঘ ধরা পড়ে—যেমন হসন্ত বর্ণের আগের স্বর দীর্ঘ হয়। বাস্তবিক যেখানে আমরা সংস্কৃতের অনুকরণে হ্রস্ব-দীর্ঘ লিখি, বাঙ্গালা উচ্চারণ অনেক জায়গায় তাহার বিপরীত, যেমন "সীতা" এবং "মিতা" এখানে "সী" ও "মি" উভয়েরই উচ্চারণ হ্রস্ব। "মীন",—"দিন" এখানে "মী" ও "দি" উভয়েরই উচ্চারণ দীর্ঘ। কাজেই "শিতা" "মিন" লিখিলে বাঙ্গালা উচ্চারণ দস্তুরমত বুঝা যাইবে।

এখন ব্যঞ্জন লইয়া কথা। ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে কতকগুলি বে-দরকারী অক্ষর আছে, যেমন ণ, য, অন্তঃস্থ ব, ষ, স। "স" র খাঁটি উচ্চারণ ঋ, ক, খ, ত, থ, ন, প, ফ, র এর সঙ্গে মিলা অবস্থায় দেখা যায় যেমন, স্তত, স্কন্ধ, সঞ্চালিত, হস্ত, স্থান, স্নান, স্পন্দন, স্ফুট, স্রাব। ঋ র ন এর সহিত "শ" মিলিলেও 'শ' র উচ্চারণ 'স' র মত হয় যেমন শৃগাল, আশ্রিত, প্রশ্ন। কিন্তু সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় 'স' র উচ্চারণ নাই এবং 'শ' র উচ্চারণ আছে। এই জন্য বাঙ্গালা ব্যঞ্জন বর্ণ হইতে 'ণ, য, ষ, স' বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অন্তঃস্থ 'ব' সম্বন্ধে একটু কথা আছে। বিদ্যা, বীণা প্রভৃতি শব্দে যেখানে সংস্কৃতে অন্তঃস্থ 'ব' আছে, বাঙ্গালায় উচ্চারণমত সেখানে বর্গীয় 'ব' লেখা হয় এবং তাহাই উচিত। কিন্তু 'খাওয়া', 'পাওয়া' প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দে অন্তঃস্থ 'ব' এর উচ্চারণ আছে। সে জন্য আসামীর মত অন্তঃস্থ 'ব' বাঙ্গালায় দরকার। পালি ভাষায় 'শ ষ' নাই। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে 'ন, শ, য, ব' নাই, মাগধী প্রাকৃতে 'ন, স য, জ' নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তঃস্থ 'ব'কে বর্গীয় 'ব' র সহিত একাকার করিয়া প্রকারান্তরে এক 'ব' স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আর একটু সাহসী হইলে জ-য, ণ-ন এবং শ-ষ-স এগুলিকেও একাকারে আনিতে পারিতেন। ঙ, ঞ-র উচ্চারণ বাঙ্গালায় আছে, কিন্তু হিন্দীর ন্যায় 'ং' দ্বারা এই দুইয়ের কাজ অনায়াসে চলিতে পারে। অতএব 'ঙ', 'ঞ' বাদ দেওয়া চলে। 'ঃ' এর উচ্চারণ 'হ্' কিম্বা পরের

অক্ষরের দ্বিত্ব দ্বারা চলে। যেমন 'দুঃখ' স্থানে 'দুহ্খ বা দুক্খ'। পালি ও প্রাকৃতেও 'ঃ' নাই। আমাদের প্রস্তাবিত ব্যঞ্জনগুলি এই হইবে।

ক খ গ ঘ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। র ল। শ হ। ং ঁ। ড় ঢ়। য় অন্তঃস্থ ব।

এখন যুক্তাক্ষরের পালা। বাঙ্গালায় য-ফলা ও ব-ফলার কোন সার্থকতা নাই। উভয়ের দ্বারা অক্ষরের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। তবে 'য'-ফলার আগের 'অ' 'ও'রূপে এবং 'আ' বিকৃতরূপে উচ্চারিত হয়। 'জ্ঞ'র উচ্চারণ 'গ'র মত, কখনও গে'র মত, যেমন "জ্ঞান", বাঙ্গালা উচ্চারণে 'গেঁন,' 'বিজ্ঞ' বাঙ্গালা, উচ্চারণে 'বিগ্গঁ'। 'ম'-ফলারও বাঙ্গালায় কোন দরকার নাই। উচ্চারণ-অনুযায়ী লিখিতে গেলে 'শ্মশান' হইবে 'শঁশান,' 'পদ্ম' হইবে 'পদ্দঁ'। 'ক্ষ'র উচ্চারণ সংস্কৃতে 'ক্ষ'; কিন্তু বাঙ্গালায় 'ক্খ', প্রাকৃতেও এইরূপ ছিল এবং এইরূপ লিখা হইত। বাঙ্গালায়ও 'ক্ষ'র বদলে 'ক্খ' চলিবে না কেন? 'হ্র হৃ' বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারিত হয় rha, rhi অর্থাৎ 'র'এর মহাপ্রাণরূপে (aspirate)। এইরূপ 'হ্ল'র উচ্চারণ বাঙ্গলায় lha এবং 'হ্ন হ্ণ' এর উচ্চারণ nha। বাঙ্গালায় তিনটী হরফ এই জন্য না গড়িয়া 'র্‌হ, ল্‌হ, ন্‌হ' দ্বারা কাজ চালান যাইতে পারে। আমি এখন উদাহরণের সহিত যুক্তাক্ষরগুলির সংস্কৃত, পালি, ও প্রাকৃত রূপ দিতেছি।

সংস্কৃত		পালি		প্রাকৃত	
ক্য ইত্যাদি	শক্য,	ক্ক	সক্ক,	ক্ক	সক্ক
ক্ব ইত্যাদি	ক্বথিত	ক, ক্ক	কথিত	ক, ক্ক,	কহিঅ
	পক্ব,		পক্ক,		পক্ক,
গ্ম ইত্যাদি,	ছদ্ম		ছদ্দ		
	যুগ্ম				জুগ্গ
য্য	শয্যা	য্য	সয্যা	জ্জ	সজ্জা
হ্য	সহ্য	য্হ,	সয্হ	জ্ঝ	সজ্ঝ
হ্ব	জিহ্বা	ব্হ	জিব্হা	ব্ভ,	জিব্ভা
হ্ম	জিহ্ম	ম্হ	জিম্হ	ম্হ,	জিম্হ
হ্ন	চিহ্ন	ন্হ	চিন্হ	ণ্হ,	চিণ্হ
হ্ণ	অপরাহ্ণ	ণ্হ	অপরণ্হ	ণ্হ	অবরণ্হ
হ্ল	কহ্লার		কল্লহার	ল্হ,	কল্হার
ক্ষ	ক্ষীর, যক্ষ,	খ, ক্খ	খীর, যক্খ	খ, ক্খ	খীর জক্খ
জ্ঞ	জ্ঞান, যজ্ঞ	ঞ, ঞ্ঞ,	ঞাণ, যঞ্ঞ	ণ, ণ্ণ	ণাণ, জণ্ণ
র্য্য	কার্য্য	য্য,	কয্য	জ্জ	কজ্জ
ক্ষ্ম	লক্ষ্মণ		লক্খণ		লক্খণ
ক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণ		তিখিণ, তিক্খ		তিক্খ, তিণহ

এখন কথা হইতেছে এই উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান চলিবে কি? ইহার সোজা উত্তর দশজনে এই রকম লিখা ধরিলেই ক্রমে চলিবে। ইহার জন্য চাই শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি ও নৈতিক সাহস।

উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের বিপক্ষে কেহ হয় ত বলিবেন যে উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশের সকল জায়গায় এক নয়। কলিকাতার লোকে বলে হাঁশি (হাসি), শ্যাখারি (শাঁখারি) ইত্যাদি; ঢাকা অঞ্চলের লোকে বলে কাপর (কাপড়), পরা (পড়া), বাত (ভাত), Zal (জল), tsal (চল) ইত্যাদি। প্রত্যেক স্থানের উচ্চারণের কিছু না কিছু রকমারি আছে। এখন কোন্ জায়গার উচ্চারণ ধরিয়া বানান করা যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে যেমন প্রত্যেক স্থানের বুলির বেশী বা কম তফাৎ থাকিলেও লেখা-ভাষায় এক সাধারণ-ভাষা (standard language) ব্যবহার করা হয়, তেমনি একটী সাধারণ শিষ্ট উচ্চারণ আছে, যাহা স্কুল কলেজে শিখান হয় এবং পাঁচ জায়গার ভদ্রলোক এক জায়গায় হইলে কথাবার্ত্তায় বা বক্তৃতায় ব্যবহার করা হয়। বানান এই সাধারণ শিষ্ট উচ্চারণ মতই লেখা হইবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন এইরূপ বানানে শব্দের নাড়ীর ঠিক পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি বুঝা যাইবে না। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আনাড়ী না বুঝিতে পারেন, কিন্তু পণ্ডিতের বুঝিতে গোল ঠেকিবে না। যদি ব্যুৎপত্তির উপরই জোর দিতে হয়, তবে বাঙ্গালা ভাষা তিব্বতী ভাষার মত হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিতে হইবে 'মস্তক' পড়িতে হইবে 'মাথা,' লিখিতে হইবে 'উপাধ্যায়' পড়িতে হইবে 'ওঝা', লিখিতে হইবে 'ঘোটক' পড়িতে হইবে 'ঘোড়া'। এরূপ যদি অসহ্য হয়, তবে 'ভিক্ষা (ভিক্‌ষা)' লিখিয়া কেন 'ভিক্‌খা' পড়া হইবে, 'জ্ঞান (জ্‌ঞান)' লিখিয়া কেন 'গেঁন (গ্যাঁন)' পড়া হইবে? অন্য পক্ষে, যদি 'পক্ষী' স্থানে 'পাখী' লেখা অশুদ্ধ না হয়, তবে 'ক্ষেত্র, ক্ষীর' স্থানে 'খেত, খীর' কেন অশুদ্ধ হইবে? যদি 'রাজ্ঞী' স্থানে 'রাণী' অশুদ্ধ না হয়, তবে 'জ্ঞাতি' স্থানে বা 'গেঁতি' কেন অশুদ্ধ হইবে? সংস্কৃত-অনুযায়ী বানানের পক্ষকে আমরা বলিব, পয়লা বাঙ্গালীর জিভকে সংস্কৃত করুন, তারপর বানান সংস্কৃতের মত লিখিবেন। কিন্তু সে কি সম্ভব? অন্ততঃ পক্ষে তদ্ভব ও দেশী শব্দের বানানে ধ্বনিমূলক বানান চালাইতে আপত্তি কি?

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল্,
ডিপ্লো-ফোন্, ডি-লিট্ (Paris)
ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় নাট্যকলা

ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন যুগের সভ্যজাতির মধ্যে কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রীকগণের ও ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যেই নাট্যকলার উদ্ভব হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুচারু নাট্যাভিনয়ের জন্য নানা উন্নত শিল্পের একত্র সমাবেশের প্রযোজন হয়,—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, নৃত্য, সঙ্গীত, বেশ বিন্যাস কৌশল, মাল্যরচনা, অলঙ্কার রচনা, গন্ধোপজীবির সুগন্ধ সৃষ্টি, মনোবিজ্ঞানে নাট্যকারের গভীর অধিকার ও অভিনেতৃগণের অভিনয় দক্ষতা। এই দুই জাতির মধ্যেই এতগুলি শিল্পের একাধারে উন্নতি হইয়াছিল। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায় এই সকল শিল্প প্রাচীন ভারতে উন্নতির কিরূপ উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র কেবল নাট্যকারকে নাট্যরচনার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত নহে, নাট্যাভিনয়ে যতগুলি শিল্পীর সহায়তার প্রয়োজন, ইহাতে তাঁহাদিগের সকলের উপযোগী উপদেশ আছে,—যে স্থপতি রঙ্গগৃহ নির্ম্মাণ করেন, যে সূত্রধর রঙ্গালয়ের আসবাবপত্র প্রস্তুত করেন, যে শিল্পিগণ কুশীলবগণের বেশভূষা, রত্নাভরণ, গন্ধমাল্য রচনা করেন, যে চিত্রকর দৃশ্যপট অঙ্কিত করেন, নৃত্যাচার্য্য, নর্ত্তক নর্ত্তকী, নটনটী সকলেই ভরতের গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইত। এই সকল শিল্পের অনুশীলন এরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদিত হইত, যে প্রয়োগকালে তাহাতে শিক্ষা বা শ্রমের লেশমাত্র দেখা যাইত না। উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে কয়েকটী নর্ত্তকীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে,—নৃত্যারম্ভের সলজ্জ আড়ষ্টতা হইতে নৃত্যাবসানের মত্ততা পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অঙ্কিত আছে। এইসকল মূর্ত্তির হস্ত, পদ, চক্ষু, ভ্রূ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে সে সকল ভরতের অনুশাসন অনুযায়ীই হইয়াছে, কিন্তু এই সকল ভঙ্গী এমনই সহজ সাবলীল যে দেখিলে মনে হয় সেগুলি নৃত্যছন্দে আপনাআপনিই ভাসিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতের নাটকে এমনই একটা সহজ স্বাভাবিকতা মৃদুশালীনতা, সুসঙ্গত সৌষ্ঠব ও মনোরম কাব্যলোকের রশ্মিপাত হইয়াছে যে কোন জাতি সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ না করিলে তাহা সম্ভব বোধ হয় না। ভারতীয় নাট্য দেববন্দনায় আরম্ভ হয় ও স্বস্তিবাচনে পরিসমাপ্ত হয়। এরূপ নৈপুণ্যের সহিত পাত্র প্রবেশ ও পাত্র নির্গম করান হয় যেন দৈনন্দিন জীবনের সহিত নাট্যবর্ণিত জীবনের পার্থক্য নয়নের অন্তরালেই থাকে। প্রয়োগদক্ষ ভারতীয় নাট্যাচার্য্যগণ বুঝিতেন যে প্রয়োগকালে শিক্ষা ও শ্রম প্রচ্ছন্ন রাখাই প্রয়োগবিদের নৈপুণ্য।

প্রাচীন গ্রীকগণ নাট্য রচনায় প্রধানতঃ তিনটি রস ব্যবহার করিতেন,—ট্রাজেডিতে করুণ ও ভয়ানক রস (pity and terror) ও কমেডিতে হাস্যরস। গ্রীকদিগের করুণ রস কিন্তু উপর্য্যুপরি দৈবদুর্ব্বিপাকে মানুষের দুর্দ্দশায় শোক মাত্র, তাহা ভারতের বিপ্রলম্ভ

শৃঙ্গারের অপরিসীম কমনীয়তায় সুষমামণ্ডিত নহে। এই দুই রস পরিবেশনে গ্রীক নাট্যকার কোন কৃপণতা করিতেন না,—তিনি শ্রোতার মনকে এরূপ নিবিড় দুঃখ ও ভয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে তুলিয়া দিতেন, যে তাহা প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিত। ইহার হেতু সহজেই বুঝা যায়। গ্রীক নাটকগুলি অভিনীত হইত আথেন্সের প্রকৃত লোকের সমক্ষে, উন্মুক্ত আকাশতলে; পটপরিবর্ত্তন ছিল না, একই দৃশ্যের মধ্যে নাটকের সমুদয় কার্য্য শেষ করিতে হইত। আর শ্রোতৃবর্গের বিচারের উপর নাট্যকারের পারিতোষিক নির্ভর করিত। প্রাকৃত মন স্বভাবতঃই স্থূল, সূক্ষ্ম ভাবরাশি গ্রহণ করিতে অক্ষম, নাট্যরচনা বা অভিনয়ের সূক্ষ্ম কলা-কৌশল বড় তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। সেজন্য গ্রীক নাট্যকারকে এরূপ গাঢ় রস পরিবেশন করিতে হইত যাহাতে তাহাদিগের রসোপলব্ধি হয়। প্রাচীন ভারতে নাটক অভিনীত হইত মার্জ্জিতরুচি রাজপুরুষ ও বুধমণ্ডলীর সমক্ষে, কিম্বা পূতচরিত নির্ম্মলান্তঃকরণ ভক্তগণের সমক্ষে দেবায়তনে। সেজন্য ভারতীয় নাট্যকারের পরিবেশিত রস শ্রোতৃবর্গের মনকে এরূপ বিপুলবেগে আন্দোলিত করিত না, তাহা হৃদ্যতায়, মাধুর্য্যে অধিক উপাদেয়। কিন্তু গ্রীক কমেডির হাস্যরস ভারতীয় প্রহসনের হাস্যরস অপেক্ষা সমধিক মনোজ্ঞ। ভারতে কেবল শৃঙ্গারানুকারকেই হাস্যরস বলা হইত ও তাহাই ছিল ভারতীয় প্রহসনের উপজীব্য। সাধারণ মানুষের বাক্যে ও কার্য্যে, চেষ্টায় ও সাফল্যে অদ্ভুত অসঙ্গতিই হাস্যরসের প্রধান উপাদান গ্রীক কমেডিপ্রণেতৃগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন। এই অসঙ্গতি সাময়িক ঘটনার অভিনয়ে প্রকট করিয়া তুলিলে অধিক উপভোগ্য হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, সেজন্য অধিকাংশ গ্রীক কমেডিই সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। কিন্তু গ্রীক কমেডিপ্রণেতৃগণ সুখে দুঃখে আনন্দে বেদনায় আতুর চিরন্তন মানবের মনটিকে স্পর্শ করিতে পারিতেন, এইখানেই তাঁহাদের কৃতিত্ব, এই জন্যই আজও গ্রীক কমেডি আমাদিগকে আনন্দ দান করে।

যে রসসম্ভার অবলম্বনে ভারতীয় নাট্যকলা রচিত তাহা গ্রীক অপেক্ষা অনেক সুসমৃদ্ধ। ভারতীয় নাট্যকার করুণ, ভয়ানক ও হাস্যরস প্রয়োগ ত করিতেনই, অধিকন্তু এমন কতকগুলি রস ব্যবহার করিতেন যাহাদের জীবন, বৈচিত্র্য ও উপাদেয়তা এগুলির অপেক্ষা অনেক অধিক।—সকল রসের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গাররস বা আদিরস ভারতীয় নাট্যকারের ব্যবহার-নৈপুণ্যে বহু বিচিত্র আনন্দের উৎস হইয়া আছে। এই রসের বিশ্লেষণ যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ইহা যে মানব মনের কত গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে তাহা ভারতবাসীর মত কোন জাতিই বোঝে নাই। শৃঙ্গাররস ও করুণরসের পরই উপাদেয়তা ও ব্যাপকতায় বীররসের স্থান। বীররসকে ভারতীয় নাট্যকার ও আলঙ্কারিকগণ সাবধানে রৌদ্ররস হইতে পৃথক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও ব্যবহার করিয়াছেন। বীররসের কেন্দ্রস্থ স্থায়িভাব উৎসাহ এবং রৌদ্ররসের স্থায়িভাব ক্রোধ। এই পার্থক্য হইতেই বোঝা যায় কেন বীররস নাটকের প্রধান উপজীব্য রস বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ক্রোধ স্থায়িভাবে রৌদ্ররসের জীবন অতি অল্প। রৌদ্ররসকে অযথা প্রসারিত করিলে উহা অতি সুলভ উপহাসের সামগ্রী হইয়া পড়ে। রৌদ্রের মতই স্বল্পপ্রাণ কিন্তু অতি

মনোহর রস অদ্ভুতরস। ইহার প্রভাবে মানুষের মন অতি অপ্রত্যাশিত আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠে। ভারতীয় নট্যকারগণ এই রস উপযুক্ত মাত্রায় সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। বীভৎসরসে মানুষের মন জুগুপ্সায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, অমেধ্য বস্তুর দর্শনে স্পর্শে শিহরিয়া উঠে। ইহাকেও উপভোগ্য নাটকীয় রসের মধ্যে গণনা করা ভারতীয় নাট্যকারবর্গের অল্প কৃতিত্ব নহে। এই প্রধান আটটি রস ব্যতীত আরও দুইটি মনোহর রস ভারতীয় নাট্যে ব্যবহৃত হয়,—শান্তরস ও বাৎসল্য রস। এই দুইটি মাধুর্য্যে অতীব মনোহর হইলেও ইহাতে বৈচিত্র্য বড় অল্প, সেজন্য এগুলিকে নাটকের প্রধান উপজীব্য রস ভাবে ব্যবহার করিলে নাটক অনেকটা একঘেয়ে বোধ হয়। সেজন্য অতি অল্প সংখ্যক নাটকেই এগুলিকে প্রধান রস হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। নিপুণ কবির হস্তে ইহারাও যে উপভোগ্য হইয়া উঠিতে পারে শান্তরসাত্মক "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটক তাহার দৃষ্টান্ত। এই দুইটি রস এত অল্প ব্যবহৃত হইবার আরও একটি নিগূঢ় কারণ আছে। ভারতীয় নাটকে একটি রস প্রধান হইলেও তাহাকে রীতিমত বিকশিত করিয়া তুলিতে অন্যান্য রস অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। অধিকাংশ স্থলে এই অল্প-ব্যবহৃত গৌণ রসগুলি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের আকারেই থাকিয়া যায়, ক্বচিৎ কখনও সম্পূর্ণরসে পরিণত হয়। ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ কোন রসের সহিত কোন রস ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং কোন রসের সহিত রসের বিরোধ তাহা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শান্ত ও বাৎসল্য রসের অসুবিধা এই যে উহারা মানুষের মনকে এমনই তন্ময় করিয়া দেয়, এমনই সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসে যে ইহাদের সহিত অন্য কোন রসই টিকিয়া থাকিতে পারে না। শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপার কণ্বমুনির শান্তরসাস্পদ তপোবনে সংঘটিত করিয়া কালিদাসকে বড়ই সাবধানে সংযমের সহিত লেখনী চালনা করিতে হইয়াছে। তবুও মনে হয় যেন শান্তরসই প্রধান হইয়া পড়িয়াছে, এই সুন্দর প্রণয়-কাহিনীটি যেন সঙ্গোপনে কাণে কাণে বলা হইয়া গেল; শকুন্তলার স্বামিগৃহে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই কণ্বমুনি, বৃদ্ধা গোতমী, উদ্ধত শার্ঙ্গরব, প্রিয়ংবদা ও সুষমাময়ী অনসূয়া, সহকার বনজোসিনীর সহিত পুনরায় গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া গেল। এই কালিদাসের হাতেরই কীর্ত্তি "বিক্রমোর্ব্বশী"তে পুরুরবার উচ্ছ্বসিত প্রণয়-নিবেদন ও উন্মত্ত বিরহ-ব্যথা স্মরণ করিলেই বোঝা যাইবে শান্তরসের বিন্দুমাত্র স্পর্শে বিপুল আবেগপূর্ণ, প্রাণবন্ত শৃঙ্গার রস বর্ণনাতেও কবিকে কত সংযত হইতে হইয়াছে।

একটি প্রধান রসকে ফুটাইয়া তুলিতে অন্যান্য রসের উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার ভারতীয় নাট্য প্রতিভার একটি চমৎকার বিশেষত্ব। গ্রীক নাট্যকার একথা ভাবিতেও পারিত না। বাঙালীরা যেমন একই ব্যঞ্জনে নানা আস্বাদের নানা ভোজ্যবস্তু ব্যবহার করে ও একই ব্যঞ্জনকে দুই তিন ভাবে দুই তিনবার রন্ধন করে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোক একথা ভাবিতেও পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভারতীয় নাট্যকারের এত যত্নে প্রস্তুত রসে কিন্তু গ্রীক নাট্যকারের পরিবেশিত রসের তীক্ষ্ণ তীব্রতা নাই। গ্রীক্ নাট্যকার যে আনন্দের বন্যা আনয়ন করেন তাহা যেন মুহুর্মুহু বেদনার বেলাভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ভারতীয় নাট্যকার যে আনন্দ দেন তাহাতে মধ্যে মধ্যে ক্রোধ ঘৃণার ঘোররব থাকিলেও, তাহা যেন রবিকরোদ্ভাসিত চঞ্চল তরঙ্গের লীলা। দুই দেশে শ্রোতৃবর্গের বিভিন্নতা ব্যতীত ইহার আর একটি নিগূঢ় কারণ আছে। দুই জাতি মানুষের জীবনকে, মানুষের ভাগ্যকে দুই বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন। গ্রীকগণ মনে করিতেন যে মানুষ কখনও তাহার অদৃষ্টে সন্তুষ্ট নহে, যে অসন্তোষ তাহাকে নিয়তই উন্নতির দিকে, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, তাহা দৈবপ্রেরিত, অপার্থিব। কিন্তু মানুষ কখনও অবিমিশ্র সুখ ভোগ করিতে পারে না, কারণ দেবতারা ঈর্ষ্যাপরায়ণ এবং রহস্যময় অবগুণ্ঠনে আবৃত ভাগ্যদেবীগণ অদৃশ্য মেঘের মত মানুষের জীবনাকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে অতর্কিতে তাহার আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলিকে অন্ধকার করিয়া ফেলেন। ভারতীয় আর্য্যগণও অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের চক্ষে ভাগ্যদেবী কামচারী চপলপ্রকৃতি রহস্যময়ী নহেন। তাঁহাদিগের চক্ষে অদৃষ্ট কেবলমাত্র মানুষের সঞ্চিত কর্ম্মের ফল, তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনার নামরূপে বহির্বিকাশ মাত্র। এই সকল ফল মানুষকে ভোগ করিতে হইবেই, কাহারও সাধ্য নাই যে ইহা অতিক্রম করে। ভারতীয় আর্য্যগণ জীবনকে উন্মত্ত উল্লাস ও গভীর অবসাদের লীলাভূমি বা আকস্মিক অন্ধ ঘটনা পরম্পরার সংঘর্ষের ফল বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তাঁহাদিগের চক্ষে ইহা সুসংবদ্ধ সুনির্দ্দিষ্ট বস্তু, ইহার প্রতি ঘটনাই মানুষের পূর্ব্বকর্ম্মের বা বাসনার ফল, মানুষের মনের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। মানুষ যাহা বাসনা করে, সর্ব্বান্তঃকরণে যাহার সাধনা করে জীবনে তাহাই লাভ করে।

ভারতীয় আর্য্যগণ মানুষ যাহা কিছু চায়, মানুষের যতকিছু কাম্য আছে তাহাকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ও সেগুলির নাম দিয়াছেন চতুর্ব্বর্গ ;—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায়, প্রণালী, ফল আলোচনা করিয়াছেন চারিটি বিভিন্ন শাস্ত্রে—ধর্ম্মশাস্ত্রে, অর্থশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে ও মোক্ষশাস্ত্রে। ইহার অধিকাংশই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বা মহাপুরুষ প্রণীত ও বহুকাল ধরিয়া শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ ইহাদিগের আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগের গভীর চিন্তারাশি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে গেলে ভারতীয় মনীষার অতুলনীয় প্রভাব, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক-সুলভ নিরপেক্ষতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়। কোথাও চপলতা নাই, বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, বৃথা পাণ্ডিত্য-প্রকাশের প্রয়াস নাই, বিষয়বস্তু ধীরে শান্তভাবে উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে ও সিদ্ধান্তগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে।

এ কথাও ভারতীয় আর্য্যগণের দৃষ্টি এড়ায় নাই যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা সঞ্চারের সহিত মানুষের মনের পরিবর্ত্তন হয়। যৌবনে যাহা ভাল লাগিত, প্রৌঢ়ত্বে তাহা আর ভাল লাগে না। বাল্যে যাহা আনন্দ দিত, বার্দ্ধক্যে তাহাতে হাসির উদ্রেক হয় মাত্র।

সেজন্ত তাঁহারা আর্য্যগণের জীবনকেও চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি। প্রতি আশ্রমের উপযোগী জীবনযাত্রার প্রণালীও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জীবনের সমস্ত আনন্দ বিষাদ সফলতা বিফলতার ভিতর আর্য্যগণ জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিতেন।

ভারতীয় আর্যাগণ মানুষের জীবনটাকে যেরূপ ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিতেন ও স্থিরবুদ্ধির সহিত মানবচিত্তের বৃত্তি নিয়া বিশ্লেষণ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতা ও স্বভাবের সমতা সূচিত হয়। এই প্রকৃতি গ্রীকদিগের ছিল না। ভারতীয় আর্য্যদিগের এই গুণ তাঁহাদিগের নাটকেও প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতীয় নাটক এইজন্যই এত সূক্ষ্মভাবরাশির প্রকাশক, সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যে সমৃদ্ধ। অবশ্য ভারতে আর্য্য প্রতিভার অবনতির সময় নাট্য রচনার নানা খুঁটিনাটি বিধি প্রণীত হইতে লাগিল, ও সে সকল অনুসারে রচিত নানা নিকৃষ্ট নাটকও প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু কোন সাহিত্য বিচার করিতে গেলে তাহার যাহা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাহা দিয়াই তাহা বিচার করিতে হয়। আর এ হিসাবে যে প্রতিভা "শকুন্তলা", "মৃচ্ছকটিকের" মত নাটক দিয়াছে তাহা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভার সহিত আসন পাইবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীনতম বঙ্গীয় মুস্‌লিম্‌-সাহিত্য

মুহম্মদ্‌ এনামুল্‌ হক

[মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের সাহায্যে প্রবন্ধটি লিখিত]

এ কথা কাহারও অবিদিত নাই যে, বাঙ্গালার অর্দ্ধাধিক অধিবাসী ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও, জীবনে তাঁহারা সম্পূর্ণ "বাঙ্গালী"। সাধারণতঃ দেখা যায়, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে কোন জাতির জীবন-ধারায় বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। মানুষের জীবন-ধারা-গঠনে ও পরিচালনে দেশের আব্‌-হাওয়ার প্রভাব প্রচুর। প্রধানতঃ এই আব্‌-হাওয়ার প্রভাবেই বাঙ্গালার মাটির সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশে আগত আরবী, ফার্‌সী, তুর্কী, তাজিক, আফ্‌ঘানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি পর্য্যন্ত আজ খাঁটি "বাঙ্গালী" বনিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার সহিত ইস্‌লামের ধর্ম্মীয় ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ (মাসিক মোহাম্মদী, কার্ত্তিক, ১৩৪৩ বাং—"বঙ্গে ইস্‌লাম্‌-বিস্তার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসর হইতে এদেশের সহিত ইহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যে সময় হইতে বাঙ্গালার সহিত ইস্‌লামের রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বকাল হইতেই প্রকৃত "বাঙ্গালী" বৈশিষ্ট্য লইয়া "বাঙ্গালী জাত" গঠিত হইয়া উঠিতে থাকে; ইতঃপূর্ব্বে "বাঙ্গালী" বিরাট্‌ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিভুক্ত জাত ছিল (এই বিষয়ে "নিখিল ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, সভাপতির অভিভাষণ"—ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বলিতে পারা যায়, আধুনিক বাঙ্গালী জাতির গোড়া হইতেই মুসলমানগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

সাহিত্য জাতীয় জীবন-বিকাশের একটি রূপ মাত্র; এই জন্যই জাতীয় জীবন সাহিত্যে রূপায়িত হয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনও জাতীয়তা গঠনপরায়ণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর এদেশীয় সাহিত্যে রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু, বাঙ্গালীর সে সাহিত্যের রূপ মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ-প্রধান। বাঙ্গালা ভাষা তখনও স্বকীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। এই জন্যই প্রাচীনতম বাঙ্গালা সাহিত্যের নিদর্শন "চর্য্যাপদগুলি" বাঙ্গালা হইলেও প্রকৃত বাঙ্গালা নহে। যে বাঙ্গালা ভাষার জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরব বোধ করিয়া থাকি, তাহার পূর্ণ প্রকাশ হয়, বঙ্গে ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং ইহাতে প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষ ইস্‌লামী প্রভাব যে ছিল, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সময়ের খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন নমুনা আজ পর্য্যন্ত আমাদের ন্যায় হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির হস্তগত হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত, খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রাচীনতম সাহিত্য আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা প্রাচীন বাঙ্গালার খ্যাতনামা কবি বড় চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন"। ইহা আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর

শেষার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম কালকে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ করা যায়। বাঙ্গালীরূপে বাঙ্গালী জাতির গোড়াপত্তনের কাল হইতে ইস্‌লাম্ ও মুসলমানের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া, "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" ন্যায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একক বাঙ্গালা সাহিত্যও মুসলমানের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। তবে এ প্রভাব শাব্দিক প্রভাব মাত্র।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষা "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে" স্বকীয় বাঙ্গালা রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিলেও, এই সময়ের কোন মুসলমানকর্ত্তৃক লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্য অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঙ্গালীরূপে বাঙ্গালী জাতির গোড়া পত্তনের কাল হইতে মুসলমানগণ এ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতে থাকিলেও, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত মুসলমানের বাঙ্গালা সাহিত্য নাই কেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। তাহার প্রধান কারণ,—বঙ্গে তখনও মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অনুপাতে মুষ্টিমেয়। যে স্বল্পসংখ্যক বিদেশাগত আরবী, তুর্কী, তাজিক, ফার্‌সী, আফ্‌ঘানী মুসলমান তখন বাঙ্গালী বনিতেছিলেন, তাঁহারা তখনও নবীন ধর্ম্মে. নূতনভাবে, অভিনব সভ্যতা ও সংস্কৃতিব প্রভাবে, এমন এক মানসিক অবস্থা অতিক্রম করিতেছিলেন, যদ্দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। সম্ভবতঃ ইত্যাকার কারণ পরম্পরায় বাঙ্গালা সাহিত্যের এই প্রাচীনতম যুগের মুসলমান-রচিত কোন বাঙ্গালা সাহিত্য পাওয়া যায় না।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতি ঘটে। এই শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষা রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি বহু কাব্যে সম্পদশালিনী। বাঙ্গালী জাতিভুক্ত হিন্দুদের পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিকাশ অপর্য্যাপ্ত না হইলেও খুব অপ্রচুর নহে। কিন্তু বিরাট বাঙ্গালী জাতিভুক্ত মুসলমানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যুগীয় বিকাশে কতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হইলেও, বাঙ্গালার কোন হৃদয়বান মনীষী এযাবৎ তাহার কোন সক্ষম বা অক্ষম আলোচনা বা গবেষণা করেন নাই। বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? চট্টগ্রামে বঙ্গের পূর্ব্বতম প্রত্যন্ত প্রদেশে বসিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনায়, বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের ন্যায় একজন বৃদ্ধ মুস্‌লিম্ পণ্ডিত, হিন্দু-মুসলমানের যে সকল প্রাচীন জাতীয় সাহিত্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্য হইতে আমরা বঙ্গীয় মুসলমানদের যে প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্য সাধনার নিদর্শন লাভ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতেছি এই যুগের বঙ্গীয় মুসলমানগণ কেবল পারস্যের বুল্‌বুল্ ও বসোরার গোলাপ-কুঞ্জের অথবা আরবের খর্জ্জুর ছায়াসিক্ত মরুদ্যানের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন না; তাঁহারা এই 'ছায়া-ঢাকা-পাখী-ডাকা' বাঙ্গালার ষড়ঋতু বিলাসিনী বিশাল-প্রান্তরের তাল-তমাল-কুঞ্জের মাধুর্য্যও প্রসন্ন মনে উপভোগ করিতেন। আজ আমরা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিরাট বাঙ্গালী জাতির

এই অজ্ঞাত দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিব। বলা বাহুল্য ধনীর পক্ষে ভাল-মন্দের বিচার সম্ভবপর; দরিদ্র যে, নিঃস্ব যে, সে যাহা পায়, তাহাই তাহার পক্ষে মূল্যবান, তাহাই তাহার লাভ। জাতীয় সাহিত্য-সম্পদবঞ্চিত বাঙ্গালী আজ যাহা পায়, তাহাই তাহার পক্ষে মূল্যবান ও প্রচুর বলিয়া মনে করি। প্রধানতঃ এই ভরসাতেই এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনার অবতারণা।

আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার মুসলমানগণ প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি ধর্ম্মীয় সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা কাব্য রচিত হইয়াছিল; ঠিক তদ্রূপ ইস্‌লামী ধর্ম্মীয় সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার, মুসলমানগণও এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাঙ্গালী মুসলমানদের যে প্রাচীনতম বাঙ্গালা কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম "য়ুসুফ্-জোলেখা"। শাহ মোহাম্মদ সগীর নামক কোন প্রচীনতম মুসলমান কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রচীনত্ব সম্বন্ধে কোন লৈখিক প্রমাণের অভাব হইলেও, তিনি কাব্যে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট। ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" পরবর্ত্তী এবং ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে মালাধর বসু কর্ত্তৃক বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের" পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষা। এই সম্বন্ধে আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। এ প্রবন্ধ প্রকাশের অপেক্ষায় পরিষদে রক্ষিত আছে। সুতরাং এস্থলে ইহার দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সম্ভবতঃ এই কাব্যখানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল।

কবি শাহ মোহাম্মদ সগীরের "য়ুসুফ্-জোলেখা" একখানি প্রেমমূলক উপাখ্যান কাব্য। ইহার মূল উপাখ্যানভাগ বাইবেলের "যোসেফ্ এণ্ড্ পটিফার্স্ ওয়াইফ", ফার্‌সী কাব্যের "য়ুসুফ-জোলেখা" এবং কোরাণের "য়ুসুফ্"-এর গল্প অবলম্বনে লিখিত। ইহার ভাষা প্রাচীন হইলেও কবির কবিতাপ্রবণ হৃদয়ের মাধুর্য্যে ভরপুর বলিয়া ইহা সুললিত ও সরস। তাঁহার ভাষা ও কবিত্বের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য কাব্যখানির দুই স্থল হইতে এই স্থানে কয়েক ছত্র করিয়া উৎকলিত করিলাম:—

(১)

"তোহ্মা জথ সখি আছে নৌঅলি জৌবন
তাসব পাঠাই দেয় জাউ বৃন্দাবন ॥
ইছুফক বোলহ জাউক নিধুবনে।
তুলিয়া আনৌক পুষ্প তোহ্মার কারনে ॥
আমাত্য কুমারি জথ রূপে কামাতুর।
লাস বেস করি জাউ বৃন্দাবন পুর ॥
জথেক নাগরিপনা কামাকুল রূপে।
ইছুফ ভোলাউ গিয়া যুরতি আলাপে ॥" (পত্রাঙ্ক ৩১)

(২)

শুন শুন সখি,
জার তরে হইলুঁ দুখি,
প্রাণের সখি ল !
প্রথম সপ্নেত দেখি হৃদয় অন্তরে কামহতা।
এ তিন বরিখ ধরি,
রজনি বসিআ ঝুরি,
প্রানের সখি ল !
বিরহ আনলে পুরি কাহাত কহিমু এহি কথা ? ধ্রু ॥
মোর হেন বিপরিত কাজ,
কলঙ্কিণি ভোবন সমাজ,
সে জন ন হএ এহি,
সপ্নেত দেখিলুঁ জেহি,
প্রাণের সখি ল !
মোর তরে গেল কহি, সেই মোর পরমার্থ বানি।
দোসর সপ্নের কথা,
কহিতে মরম বেথা,
প্রাণের সখি ল !
কহিল সে মোক কথা,
য়্যাকুল হইলুঁ তথা, শুনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি ॥
ইত্যাদি

এই "য়ুসুফ্-জোলেখা" একখানি বিরাট্ কাব্য। ২০৫ দুই শত পাঁচ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপিতে ইহা সংরক্ষিত। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্পূর্ণ কাব্যখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার ভাষা সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রাচীন না হইলেও, অধিকাংশ স্থলে প্রাচীন। ইহার যে যে অংশ লিপিকরের কারসাজিতে নূতনরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে অনায়াসেই প্রাচীন অংশের সহিত মিলাইয়া ভাষার সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রকাশ করা যায়। ইহার চমৎকার সাহিত্যিক মূল্যের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষা রক্ষার জন্য ইহার প্রকাশ বাঙ্গালীর পক্ষে একান্তই বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য-পরিষদের তরফ হইতে ইহার প্রকাশের ব্যবস্থা না হইলে, বাঙ্গালী এক প্রাচীন জাতীয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

শাহ মোহাম্মদ সগীরের পরবর্ত্তী এবং এযাবৎ আবিষ্কৃত বাঙ্গালার মুসলমান কবির নাম "শেখ কবীর"। প্রায় দুইশত বৎসরের হস্তলিপিতে ধৃত কেবল একটি পদের আবিষ্কারে বাঙ্গালার এই প্রাচীন মুস্‌লিম্ কবির অস্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। যদিও ক্ষুদ্র একটি মাত্র গান

হইতেই এই প্রাচীন কবির আবিষ্কার, তথাপি সৌভাগ্যের বিষয় এই, গানটির ভণিতা কবির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই জন্যই আমরা এইস্থলে গানটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাগ—ধানসি বেলাবলী

অ কি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল পেখল গজরাজ গমনি ধনি ধনি॥ ধু॥
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন ভালে।
ভ্রমরা ভোলল ভোলল বিমল-কমল-দলে॥
গুমান না কর ধনি,
খিন অতি মাঞ্জাখানি।
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব জৌবনি॥

সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি।
অমিয়া বরিখে বরিখে যৈছে শরদে পূরণ শশী॥
সেক কবিরে ভণে,
অহি গুণ পামরে জানে,
ছুলুতান নাছির সাহা ভুলিছে কমল বনে॥

এই গানটির ভণিতা হইতে দেখা যাইতেছে, সুল্‌তান্ নাসির শাহ যে প্রেমের কমল-বনে ভুলিতেন, ইহার ন্যায় সুলতানের গুণটি 'পামর' শেখ কবীর জানিতেন। কবির সময় নির্ণয়ের পক্ষে সুল্‌তান্ নাসির শাহের প্রতি তাঁহার এই প্রশস্তিটিই লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই প্রেম বা প্রেম-সঙ্গীতানুরাগী সুল্‌তান্ নাসির শাহ কে? তাঁহার সময় নির্ণীত হইলেই, কবি শেখ কবীরের সময় অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে মুস্‌লিম্ রাজত্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এদেশে "নাসিরু-দ্-দীন্" বা "ধর্ম্ম-সহায়" উপাধিধারী মুসলমান সুল্‌তানের সংখ্যা বিস্তর। সুতরাং ইঁহাদের প্রত্যেকেই সংক্ষেপে "নাসিরশাহ" নামে অভিহিত হইতে পারেন। তাহা হইলেও খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এই উপাধিধারী কোন সুল্‌তান্ যে শেখ কবীরের উদ্দিষ্ট সুল্‌তান্ নহেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার পরবর্ত্তী এই উপাধিধারী চারিজন বঙ্গীয় পাঠান সুলতান দেখা যায়; তাঁহাদের নাম ও রাজত্বকাল এইরূপ :—

১। নাসিরু-দ্-দীন্ মহ্‌মুদ্ শাহ—১৪৪২—১৪৫৯—১৭ বৎসর।
২। ঐ —১৪৮৯—১৪৯০—১ বৎসর।
৩। নাসিরু-দ্-দীন্ নস্‌রৎ শাহ—১৫১৯—১৫৩২—১৩ বৎসর।
৪। নাসিরু-দ্-দীন্ হুমায়ুন্ —১৫৩৮ —মাত্র কয়েক মাস।

এই সুল্‌তান্‌ চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি মাত্র এক বৎসর ও চতুর্থ ব্যক্তি মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও শেখ কবীরের উদ্দিষ্ট সুল্‌তান্‌ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কারণ দেখা যায় না। তারপর, প্রথম ও তৃতীয় সুলতানের মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর কল্যাণে ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" গৌড়ীয় যুগ দ্রষ্টব্য) আজ নাসিরু-দ্‌ দীন্‌ নসরৎ শাহ (১৫১৯—১৫৩২) বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। সুতরাং, শেখ কবীরের উদ্দিষ্ট সুল্‌তান্‌ হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ ছিলেন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে ভ্রম হয়। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই, আলোচ্য নসরৎ শাহ প্রেম-সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন বলিয়া এযাবৎ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পক্ষান্তরে দেখা যায়, প্রেম-সঙ্গীত রচয়িতা মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর দুইজন গৌড়ীয় সুলতানের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন: ইঁহাদের একজন "গ্যাসদেব" বা ঘয়াসু-দ্‌-দীন্‌ আযম্‌ শাহ (১৩৮৯—১৩৯৬), এবং অপর ব্যক্তি "নসির শাহ" বা নাসিরু-দ্‌-দীন্‌ মহমূদ শাহ (১৪৪২—১৪৫৯) (নগেন গুপ্তের "বিদ্যাপতি" দ্রষ্টব্য)। এই দুই সুলতানের মধ্যে মাত্র ৫০ বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং বিদ্যাপতি এই দুইজন ব্যতীত এই নামীয় অন্য কাহারও প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে পারেন না। এদিকে স্থির নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে, কবি বিদ্যাপতি ১৪০০ হইতে ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত (vide, Journal of the Department of Letters, Calcutta University, 1927, p. 36)। অতএব তদুদ্দিষ্ট "নসির শাহ" সুলতান নসরৎ শাহ (১৫১৯—১৫৩২) নহেন; কেননা নসরৎ শাহ বিদ্যাপতির প্রায় এক শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক। যে বিদ্যাপতি ঠাকুর ১৪০০ হইতে ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে, তিনি ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন। এই হিসাবে দেখা যায়, প্রেম-সঙ্গীতানুরাগী নাসিরু-দ্‌-দীন্‌ মহমূদ শাহকে লক্ষ্য করিয়াই বিদ্যাপতি লিখিয়াছিলেন,—

> "নসির সাহ জানে,
> মুঝে হানল নয়ন-বাণে,
> চিরজীব রহু পচ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।"

১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরু-দ্‌-দীন্‌ মহ্‌মূদ শাহের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে বিদ্যাপতির বয়স যদি ৮০ অশীতি বর্ষও হয়, ঘয়াসু-দ্‌-দীন্‌ আযম্‌ শাহের (১৩৮৯—১৩৯৬) রাজ্যারম্ভকালে কবির বয়স ২৫ পঞ্চবিংশতি বর্ষ। সুতরাং তিনি এই দুই সুল্‌তান্‌ ব্যতীত নসরৎ শাহ বা অন্য পরবর্ত্তী কাহারও অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না। অতএব বিদ্যাপতির উদ্দিষ্ট প্রেম-সঙ্গীতানুরাগী "নসির শাহ" যে মহ্‌মূদ শাহ্‌ এবং নসরৎ শাহ নহেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমাদের বিশ্বাস, কবি শেখ কবীরের উদ্দিষ্ট "নছির সাহ" বিদ্যাপতির প্রেম-সঙ্গীতানুরাগী মহমূদ্‌ শাহ ব্যতীত আর কেহ নহেন। এই কথা সত্য হইলে, শেখ কবীর মৈথিল কবি বিদ্যাপতির উত্তরজীবী সমসাময়িক ব্যক্তি (younger contemporary) হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে ১৪৪২ হইতে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যায়।

একথা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, শেখ কবীরের পদটি ক্ষুদ্র হইলেও অতি চমৎকার। শব্দবিন্যাসের কৌশল ও ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিমা দেখিলে মনে হয়, কবি একজন শক্তিশালী পদকর্ত্তা ছিলেন। বলিতে কি, কবিতাটি এমনই মধুর যে, ইহার ললিত ঝঙ্কারে আমরা শুধু মুগ্ধ হই না, অধিকন্তু অভিভূত হই। যে গানটির সাহিত্যিক মাধুর্য্য আজ প্রায় ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পরেও আমাদিগকে আনন্দ দান করিতে সমর্থ, তাহার মধ্যে কতখানি সঞ্জীবনী শক্তি কবি দান করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি ও উপভোগ করিবার বিষয়।

পদটিতে একটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই,—কবি শেখ কবীর বিদ্যাপতির সমসাময়িক হইলেও, বিদ্যাপতির ন্যায় ইহাতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করা হয় নাই। ইহার যে কারণ আমাদের মনে হয়, তাহা এই :—শেখ কবীর যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন "রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম" মর্ম্মবাদিতার (mysticism) আমেজে রঙ্গীন হইয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীর প্রিয় হইয়া উঠে নাই। বৈষ্ণব প্রাধান্যকালেই বঙ্গে রাধাকৃষ্ণ প্রেম মর্ম্মমুখ ভাববাদিতায় (mystic idealism) রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই পৌত্তলিকতার ভয়ে মুস্‌লিম্ কবি স্বীয় পদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা আমদানী করেন নাই। তিনি পদটিতে যে রমণী মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে রাধিকার মূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে অতিরিক্ত বৈষ্ণবাসক্তির পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। ইহা একটী সুন্দরী রমণীর (সম্ভবতঃ কবির কাল্পনিক প্রিয়ার) চিত্র বলিয়া আমাদের মনে হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শুধু "কবির" ভণিতাযুক্ত আর একটী পদ দৃষ্ট হয় (দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", পঞ্চম সং, পৃঃ ২৬৮ এবং ব্রজসুন্দর সান্ন্যালের "মুসলমান বৈষ্ণব কবি", চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৮ দ্রষ্টব্য)। এই "কবির" ও আমাদের শেখ "কবীর" এক ব্যক্তি কি না, তাহা কে বলিবে? তবে "কবির" ভণিতাযুক্ত পদটি খাঁটি বৈষ্ণব পদ বলিয়া দুই ব্যক্তিকে একজন বলিয়া মনে হয় না।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শেখ কবীরের পরে আরও একজন মুসলমান কবি বাঙ্গালা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম জৈনুদ্দিন। ইঁহার রচিত কাব্যখানির নাম "রসুল-বিজয়"। কাব্যখানি নিতান্তই খণ্ডিত আকারে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রায় দেড় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন তুলট কাগজে অসম্ভবরূপে জটিল হস্তাক্ষরে ইহা অনুলিখিত হইয়াছিল। শাহ মুহম্মদ খান নামক কোন অধুনা-অখ্যাত পীরের চরণ ধ্যান করিয়া শম্‌স্‌-দ্‌-দীন্ য়ুসুফ শাহের (১৪৭৪—১৪৮২) যৌবরাজ্য অবস্থায় কাব্যখানি কবি জৈনুদ্দিন কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ :—

"শ্রীযুৎ ইছুপ খান, রাজেশ্বর গুণবান,
সুচরিত সুবুদ্ধি সুঠাম।
রছুল বিজএ বাণী, যতি যানন্দিত যুনি,
মনপ্রতি বলিলা সভান॥"

এই "রাজস্বর" অর্থাৎ রাজ্যেশ্বর যুসুফ খান যে গৌড়ের সুলতান শমসু-দ্-দীন্ যুসুফ্ শাহ (১৪৭৪-১৪৮২), সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গৌড়ের সুলতানের আদেশই ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে কুলীন গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কবি মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নাম দিয়া ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনিই মালাধর বসুকে কাব্যরচনার পর "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি বঙ্গ সাহিত্য-প্রীতির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং "রসুল-বিজয়"-প্রণয়নে কবি জৈনুদ্দিনের উৎসাহ-দাতা রাজ্যেশ্বর "যুসুফখান" গৌড়াধিপতি "যুসুফ্ শাহ" ব্যতীত আর কে হইবেন?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" এবং "রসুল-বিজয়" কি একই সময়ে রচিত হইয়াছিল? ফলে তাহা হয় নাই। এই বিষয়ে কবি জৈনুদ্দিনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিলে দেখা যায়, "রসুল-বিজয়" কাব্যখানি "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" রচিত হইবার অন্যূন একযুগ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তিনি বলেন—

"রসুল-বিজএ বানি যুধারস ধার।
যুনি গুনিগন মন য়ানন্দ য়পার॥
যুধির সুন্ধানবন্ত (অতি) সুগায়ক।
যুনিয়ম করি তোস ইছুপ নায়ক॥"

এইখানে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এই—কবি যুসুফ খানকে "নায়ক" বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? এই "নায়ক" শব্দের দ্বারা "যুবরাজ" বুঝানই কবির উদ্দেশ্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে "নায়ক" অর্থে "যুবরাজ" বুঝায়, এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও কোথাও কোথাও দেখা যায় (শ্রীযুত **নায়ক** সে যে নসরত খান। রচাইল পঞ্চালি যে গুণের নিদান॥)। সুতরাং যুসুফখানের উৎসাহে যখন "রসুল-বিজয়" রচিত হইয়াছিল, তখন তিনি নিশ্চয় "যুবরাজ"। আমাদের আরও বিশ্বাস—সুলতান তখন "যুবরাজ" ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামের পশ্চাতে "শাহ" শব্দ যুক্ত না করিয়া তৎস্থলে "খান" শব্দ যোগ করা হইয়াছে এবং সেই জন্যই তাঁহাকে গৌড়েশ্বর না বলিয়া শুধু "রাজ্যেশ্বর" বলা হইয়াছে। "খান" উপাধিধারী পাঠান বা তুর্কীগণ "শাহ" উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। এই প্রথানুসারে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে "যুসুফ খান" শমসু-দ্-দীন্ যুসুফশাহ নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে সমাসীন হইয়াছিলেন। সুতরাং কবি জৈনুদ্দিনের "রসুল-বিজয়" নামক কাব্যখানি খ্রীষ্টীয় ১৪৭৪ অব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা যুবরাজ "যুসুফ খানের" ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রচিত হইয়াছিল। যুসুফ খান ইহার এক এক অংশ শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার সহচরগণও এই কাব্যসুধা পান করিয়া পরিতুষ্ট হইতেন।

জয়কুম নামক কোন প্রবল পরাক্রান্ত অনৈতিহাসিক কাফির রাজার সহিত হযরৎ মুহম্মদের যুদ্ধ বর্ণনাই "রসুল-বিজয়" কাব্যের মূল বর্ণিত বিষয়। এই যুদ্ধে সর্ব্বত্র কাফির-দলের পরাজয় এবং মুসলমানদের বিজয় বর্ণনা করা হইয়াছে। কবির বর্ণনা সর্ব্বত্রই

চমৎকার। তিনি একজন প্রতিভাশালী কবি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বানান শুদ্ধ করিয়া এই স্থলে এইরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হইল :—

"নবীর কিঙ্কর ছিল নামে সে বিল্লাল।
বিবিধ বিধানে অশ্ব সাজায় তৎকাল॥
সুচারু ধবল অশ্ব সুবর্ণ মণ্ডিত।
হীরার লেগাম জিন মুকুতা শোভিত॥
চারিদিকে চামর দোলায় সবে ঘন।
গড়ুরের ভাতি সম অতি বিচক্ষণ॥
দেখি যে সুন্দর অশ্ব অতি মনোহর।
রহিত সুধীর গতি বঞ্চিত দোসর॥
সেই অশ্ব পরে নবী আরোহণ যবে।
রাজছত্র ধরি ছায়া করিলেন্ত তবে॥
সুসজ্জ হৈয়া নবী যুদ্ধযাত্রা কৈলা।
মঙ্গল বিধান সৈন্য বলিতে বলিলা॥"

উদ্ধৃতাংশের ভাষা দেখিয়া, ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা কি না, সে বিষয়ে কাহারও কাহারও সন্দেহ হইতে পারে। বাস্তবিকই উদ্ধৃতাংশের ভাষা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও চলিয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের ভাষা" ইহা হইতে প্রাচীন নহে। বিশেষতঃ ইহার বর্ত্তমান লিপি খুব প্রাচীন না হইলেও, ইহাতে ধৃত ভাষায় অনেক বিষয় "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" হইতেও প্রাচীন। বলা বাহুল্য, এই কাব্যে দুই এক স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্র সর্ব্বনাম পদের প্রাচীন "আহ্মি", "তুহ্মি" প্রভৃতি রূপ রক্ষিত হইয়াছে; এমন কি সম্বন্ধ পদেও "আহ্মার", "তোহ্মার", "তোহর" রূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। দ্বিতীয়ার এক বচনে সর্ব্বত্র আধুনিক "কে"-এর স্থলে নিয়মিতভাবে "ক" (যেমন, "নবিক প্রণামি", "রত্নক সংহারিল" ইত্যাদি) রূপ রক্ষা করা হইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে "শীঘ্র" অর্থ বুঝাইবার জন্য সাধারণতঃ "তুরিত" "তুরমান" কথার বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে" সংস্কৃত "ঝটিতি" শব্দের অপভ্রংশ "ঝাট" শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্র এই অর্থ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় "রসুল-বিজয়ের" সর্ব্বত্র "শীঘ্র" অর্থে ঝাট শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" ও রসুল-বিজয়ে" দুর্ব্বাক্য অর্থে "দুরাক্ষর" শব্দের একবার করিয়া উল্লেখ আছে। "রসুল-বিজয়ে" "স্নেহ" শব্দের পরিবর্ত্তে নেহা শব্দের প্রয়োগও ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য নহে। এইরূপ বহু বিষয় "রসুল-বিজয়ে" রহিয়াছে, যাহার আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার ভাষা, মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে"র ভাষা হইতে আধুনিক নহে।

এ যাবৎ প্রাচীনতম বঙ্গীয় মুসলিম্ সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে যাহা জানিয়াছি, তাহা সংক্ষেপতঃ এই। শাহ মোহাম্মদ সগীর, শেখ কবীর, ও জৈনুদ্দিনের

পূর্ব্ববর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তী আর কোন প্রাচীনতম মুস্‌লিম্ কবির সন্ধান এ যাবৎ লাভ না করিলেও, আমাদের বিশ্বাস,—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নানা মুসলমান কবি বাঙ্গালা সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আমাদের অনুসন্ধান প্রধানতঃ চট্টগ্রাম বিভাগেই সীমাবদ্ধ। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মুস্‌লিম্ পরিবারে অনুসন্ধান করিলে, আরও বহু প্রাচীন বঙ্গীয় মুস্‌লিম্ কবির আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। হতভাগ্য ও জাতীয় গৌরব-বোধ হীন বাঙ্গালী মুসলমান এ সকল বিষয়ে যেরূপ উদাসীন, তাহাতে মনে হয়, আমাদের এ হেন আশা আকাশকুসুম মাত্র।

সে যাহা হউক, যে প্রাচীন মুস্‌লিম্ কবিত্রয় এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের তিনটি দিকে নূতন আলোকপাত করিবেন। শাহ মোহাম্মদ সগীরের বাঙ্গালা সাহিত্য-সাধনা সে যুগে একক। প্রধানতঃ ধর্ম্মীয় আখ্যানের উপর তাঁহার "য়ুসুফ-জোলেখা"র ভিত্তি সংস্থাপিত হইলেও, ইহাকে "রসুল-বিজয়" কি "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের" ন্যায় ধর্ম্মীয় কাব্য বলা চলে না। কবি মূল আখ্যান বস্তুটি ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিলেও, নিছক কাব্যদর্শন লইয়াই তিনি কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মের বালাই নাই, তৎস্থলে আছে কাব্য ও কবিতা। এই জন্যই "য়ুসুফ-জোলেখা"কে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম উপাখ্যানমূলক কাব্য বলা চলিতে পারে। এই হিসাবে, ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একক। শেখ কবীরের মাত্র একটি পদ আবিষ্কৃত হইলেও, তৎ সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে, তিনি সেই প্রাচীন যুগে বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যে মানবীয় প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। এই হিসাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার স্থানও একক। বাঙ্গালার "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়", "গোবিন্দ-বিজয়" প্রভৃতি "বিজয়-কাব্যে" এবং "ধর্ম্মমঙ্গল", "মনসা-মঙ্গল", "চণ্ডীমঙ্গল" প্রভৃতি "মঙ্গল কাব্যে" অর্থাৎ ধর্ম্মগুরু বা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক বাঙ্গালা কাব্যে কবি জৈনুদ্দিনের স্থান প্রাচীনতম। তাঁহার "রসুল-বিজয়কে" বাঙ্গালা সাহিত্যের "বিজয়" ও "মঙ্গল" কাব্যের জনক বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এই হিসাবে "রসুল-বিজয়"ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একক।

বলা বাহুল্য, এইরূপে প্রাচীন বঙ্গের মুস্‌লিম্ কবিত্রয় প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের তিনটি দিকে যে নূতন আলোকপাত করিতেছেন, তাহার গৌরব একা মুসলমান জাতির প্রাপ্য নহে; হিন্দুজাতির অংশও তাহাতে কম নয়। এই মুস্‌লিম্ কবিত্রয়ের মধ্যে কতখানি বাঙ্গালীত্ব ছিল, কতটুকু বাঙ্গালিয়ানায় তাঁহাদের কাব্যগুলি ভরপূর, অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীজাতি তাহা দেখিবে ও উপলব্ধি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং, জাতির নিকট, তাঁহাদের এই জাতীয় কবিত্রয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাংলা-বুলির আপন পুঁজি

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্-এ, বি-এল, ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট্
(প্যারিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা ভাষায় যত সব শব্দ আছে, তাহার ভিতর কতকগুলি তাহার নিজস্ব, কতকগুলি ওয়ারিস সূত্রে পাওয়া, আর কতকগুলি ধার করা। ঢেঁকি, ডাব্বা, নেঁটা, খাঁটি, ডোঙ্গা এই ধরণের শব্দগুলি নিজস্ব। হাত, পা, আমি, তুমি, করে, দেখে—এই ধরণের অনেক শব্দ উত্তরাধিকারী হিসাবে সাবেক আর্য্য ভাষা হইতে পাওয়া। হস্ত, চরণ, টেবিল, চেয়ার, চাবি, কামরা, কমর, বগল, হরতন, কুড়ি, মোটা শব্দগুলি ধার করা। ধার স্বদেশে বিদেশে। স্বদেশে আর্য্য, কোল, দ্রাবিড় ও ভোট বর্ম্মা ভাষা থেকে। বিদেশে পারসী, পারসীর ভিতর দিয়া আরবী ও তুরকী, আফগানী, পর্ত্তুগীয, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজীভাষা থেকে। ধার করা শব্দ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই বাংলা-বুলির আপন পুঁজি।

ধার স্বদেশে হউক বা বিদেশে হউক, কখনই বড়াই করার বিষয় হইতে পারে না। কতক ধার দরকারী আর কতক বে-দরকারী। যেখানে বাংলার নিজের পুঁজি নাই, সেখানে ধার না করিলে চলে না। ধরুন গোলাপ, আতর, কাগজ, কলম, চশমা, কোর্ম্মা, কালিয়া, বন্দুক, পেন্‌সিল, রেল, মটর, রেডিও, চা, তামাক, চিনি—এসব ছাড়া সভ্য বাঙালীর চলে না, বাংলা ভাষারও চলে না। কিন্তু যেখানে খাঁটি বাংলা শব্দ ছিল বা আছে, তাহা ছাড়িয়া ধার করিতে যাওয়া শুধু বে-দরকারীই নয়, বাংলাভাষার ইজ্জত নষ্ট করাও বটে। সংস্কৃত হইতে ধার করা কি আর আর ভাষা হইতে ধার করা, সবই প্রায় এক কথা, ধার ধার-ই। এখানে দু'টী কথা মনে রাখা চাই। যেখানে অন্য ভাষা হইতে ধার করা শব্দ বাংলায় চল্‌তি হইয়া গিয়াছে, সেখানে ধার তামাদি; কাজেই বাংলার নিজস্ব সম্পত্তির ভিতর গণ্‌তি করা যায়। এখানে নূতন করিয়া সংস্কৃত হইতে ধার করা ঠিক নয়। চলিত বাংলায় আঙ্গুরের বদলে দ্রাক্ষা, গরমের বদলে তপ্ত, চাকরের বদলে ভৃত্য, হাজারের বদলে সহস্র, কলমের বদলে লেখনী, উকিলের বদলে ব্যবহারজীবী, বাগানের বদলে উদ্যান, রেলের বদলে লৌহবর্ত্ম, চেয়ারের বদলে কাষ্ঠাসন, ষ্টীমারের বদলে বাষ্পীয় পোত ব্যবহার করা গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে যখন নূতন ধারের দরকার হইবে তখন সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতেই আমরা ধার করিব। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার নাড়ীর সম্পর্ক আছে, কাজেই এ ধারে কোন দোষ নাই। কিন্তু চলিত বাংলায় নাক, কাণ, দুধ, ঘি, ভাই, বোন এই ধরণের শব্দের জায়গায় নাসিকা, কর্ণ, দুগ্ধ, ঘৃত, ভ্রাতা, ভগিনী, বসান বাংলাভাষার উপর বড় রকম জুলুম করা হয়। ইংরেজী ভাষায় nose, ear, milk, butter, brother, sister শব্দগুলির আর কোনও প্রতিশব্দ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইংরেজী গদ্য কি পদ্যের কোন হানি হইয়াছে?

ভদ্র হইবার অন্ধ মোহ আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে, যে হালেই আমরা অনেক খাঁটি বাংলা শব্দের জায়গায় সংস্কৃত শব্দ বসাইতে আরম্ভ করিয়াছি। সংস্কৃতের ভক্তেরা ইহাতে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলার ভক্তেরা ইহাতে খুশী হইতে পারেন না। যেমন দেখুন মিঠে, মউ, ভোগ, নাওয়া, পড়ুয়া, রসুই, পরখ, মিছা, উনই, শির-দাঁড়া, বুলি, ভুঁই, সাথী, পিয়াস, কলিজা, প্রভৃতি শব্দগুলি আজকাল প্রায় শোনা যায় না। স্বদেশী বিদেশী ধার যত বাড়িয়া চলিয়াছে, ততই বাংলা ভাষা আপন পুঁজি হারাইতে বসিয়াছে। এই সকল হারান ধন ফের বাংলায় চালান ঠিক কিনা সে বিচারের ভার বাংলা ভাষার ভক্তদের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমি নীচে নমুনার জন্য কয়েকটী হারান শব্দের ফর্দ্দ দিতেছি। বলা বাহুল্য শব্দগুলি সাবেক আমলের বইয়ে পাওয়া যায়।

আউল—আকুল
আড়—প্রস্থ
আথ—অস্ত।
উনই—উৎস।
উভ—উর্দ্ধ।
উরা—উরু।
ওর—অপর পার।
কাউ—কাক।
কান্দরা—উপত্যকা।
কিরা—শপথ।
খরা—রৌদ্র।
খাঁখার—কলঙ্ক।
খিল—অনুর্ব্বর।
গহরা—গভীরতা।
গাড়—গর্ত্ত।
গুফা—গুহা।
গোড়ায়—পিছে পিছে যায়।
ছাপাকর—মুদ্রাকর।
ছেলি—ছাগল।
জাঙ্—জঙ্ঘা।
জারুয়া—জারজ।
জুঝার—যোদ্ধা
ঝাট—শীঘ্র।

টন
টৌন
ঠাকুরালি }
তিঅজ
তেয়জ } —তৃতীয়
দড়—দৃঢ়।
দারী—বেশ্যা।
দুয়জ
দোঅজ } —দ্বিতীয়।
দেউল—দেবালয়।
ধাড়ি, ধাড়ী—আক্রমণ।
ধুনি—ধ্বনি।
নই—নদী।
নহলী—নূতন।
না—নৌকা।
নিবড়ে—শেষ হয়।
নিয়ড়—নিকট।
পড়িনাতি—প্রপৌত্র।
পড়ুয়া——ছাত্র।
পাট—সিংহাসন;
বউল—বকুল।

বাগ ডোর—বল্গা।
বাহু—বাহু।
বেজ—বৈদ্য।
ভারুই—ভরত পক্ষী।
ভোখ—বুভুক্ষা।
মু—মুখ।
মুজড়ী—সীল আংটি।
মুদা—মুদ্রা, seal।
মো—মমতা।
রাতা—রক্তবর্ণ।
রায়—রাজা।
লুকি—লুক্কায়িত।
শিয়ল—শীতল।
শিরদাঁড়া—মেরুদণ্ড।
শোষ—পিপাসা।
সআল—সকল।
সাঝা—ভাগ।
সানা—সন্নাহ।
সাপুড়া—সম্পুট, কৌটা।
সায়র—সাগর।
সিঞ্চড়া—শিহরণ।
সুরুজ—সূর্য।
সেজা—শয্যা।
সোঁঅরে—স্মরণ করে।
হরিড়া—হরিতকী।
হাইবাস—অভিলাষ।
হাপুত্তি—পুত্রহীনা।
হুনে—হোম করে।

বিদেশীর পাল্লায় কতকগুলি খাঁটি বাংলা শব্দ এখন ভাষা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। নীচে তাহাদের একটা ফর্দ্দ দিতেছি। ইহাদিগকে ফের ঘরে তুলিয়া আনা যায় কিনা, বিচার করা দরকার।

আলবাটী—পিকদান।
আহিড়ি—শিকারী।
কড়িআলি—লাগাম।
কাকতলি—বগল।
কামিনা—কারিগর।
কুকড়া—মোরগ।
কুকড়ী—মুরগী।
কোঞ্চা } —চাবি।
গোহারি—নালিশ।
ঘোড়াশাল—আস্তাবল।
চেয়াড়—তীর।
জোখ—ওজন।
টুটা—কম।
টুটে—কম হয়।
পেড়ি—বাক্স।
বাপুড়া—বেচারা।
বুহিত—জাহাজ।
বেরুণীয়া—মজুর।
মাঝা, মাঝ } কমর
মেলানি—বিদায়।
রঙ্ক—গরীব।
শশারু—খরগোস।
সয়চান, সাচান } —বাজ পাখী।

রাজহংস।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

ভেদিয়া সুনীল নভ দূরে ফেলি শ্যাম শিলাতল
চঞ্চুপুটে মুক্তামালা চক্ষে ধরি স্বপন বিহ্বল
উর্দ্ধে তুলি গ্রীবা

বিথারিয়া পক্ষ দুটি বায়ু-মুখে শুভ্র পাল সম
কোথায় চলেছ তুমি হংসরাজ ? গতি অনুপম
লীলায়িত কিবা !

কভু বা ফিরাতে তোমা ঝঞ্ঝা আসি লোটে পদতল
পার্শ্বে কভু মেঘবালা বিজলিতে ভরি আঁখি জল
ভুরু-ভঙ্গে চায়,

পর্ব্বতে পর্ব্বতে পুন বনদেবী গলে বনমালা
কুটজ-কুসুম-ভারে সাজাইয়া কাননের ডালা
অর্ঘ্য দিতে ধায়।

সবারে করিয়া তুচ্ছ উচ্চ হতে আরো উচ্চতর
কোন্ হিমাদ্রির চূড়ে লয়ে তব শুভ্র কলেবর
পশিবারে চাও ?

কোথা সে মানস-হ্রদ ? কনকিত কোথা পদ্মবন ?
কমল সহস্রদল ? অবিশ্রান্ত ভ্রমর গুঞ্জন ?
দাও বলে দাও।

নগ্ন সৌন্দর্য্যের তুমি মুক্ত আত্মা হে বিহঙ্গবর !
অনন্তের চিরসঙ্গী, শুভ্র স্বচ্ছ মন-সরোবর
তাই লুব্ধ করে ;

সেথাকার শুদ্ধ বায়ু শ্বাসে শ্বাসে কর তুমি পান,
রজত তুষার-গিরি অভ্রভেদী চুম্বিত-বিমান
চিত্ত তব হরে।

হিমানীর হৈম মৃগ লম্ফে লম্ফে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ধায়,
কাননে কস্তুরীগন্ধ, বেণু-বন বাঁশরী বাজায়
মধুর মর্ম্মরি।

তৃপ্তিতে অলস আঁখি মুদে আসে আধ ঘুমঘোরে
সোনার স্বপন রাশি ঝর্ণা সম মর্ম্ম-গুহা ভোরে'
ঝরিছে ঝর্ঝরি।

নিভৃতে নক্ষত্রপুঞ্জ একে একে ভরে নীলাকাশ
মানস-সরসী মাঝে প্রতিবিম্ব পড়ে নিরুচ্ছ্বাস
নিস্তব্ধ মধুপ,

সহস্র কমলে স্বতঃ ঝরে মধু কি অজস্র ধারে
অজ্ঞাত আনন্দ পানে রহ ডুবি রহস্য-পাথারে
নিস্পন্দ নিশ্চুপ।

যামিনীর শেষ যামে না নিভিতে তারার প্রদীপ
সিতাঙ্গিনী শুভ্র ভালে পরি রাঙা অরুণের টীপ
এল কি ঊষসী

কৈলাস-শিখর হতে? শ্বেতভুজা নামিল ভূধরে
সিত বক্ষে হৈম বীণা লীলা-পদ্ম ল'য়ে বাম করে।
চমকি রূপসী

বসিল মানস-হ্রদে সর্ব্ব নিম্ন স্ফটিক-সোপানে;
ঊর্ম্মি-ওষ্ঠ চুম্বে পদ, রহে বালা মগন ধেয়ানে
মহাভাবে ভোর।

ইন্দ্রধনু-বিরঞ্জিত চেলাঞ্চল সলিলে লুটায়
স্বর্ণকোকনদ দোলে গুঞ্জে অলি ঝঙ্কৃত বীণায়
টুটে স্বর-ডোর।

লহরে লহর তুলি গ্রামে গ্রামে বাজে বীণাখানি,
ওগো মুগ্ধ হংসরাজ! পদতলে কখন্ না জানি
হ'লে বিলুণ্ঠিত;

ইষ্ট দেবী বলি তারে সে মুহূর্ত্তে চিনে নিলে তুমি,
সাঙ্গ হ'ল যাত্রা তব, পীঠরূপে পৃষ্ঠ দিলে তুমি
চরণ চুম্বিত!

বঙ্গ ভারতী

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বঙ্গ ভারতী, তোমার আরতি করিছে আজিকে দীনের দল,
লহ গো প্রণতি, শ্রদ্ধা ভকতি লহ গো হর্ষ, অশ্রুজল।
তোমারি পুণ্য দেউল ধন্য, তারি বেদীতলে তুলিয়া তান,
গাহিব, জয়তু ভারতী মহতী, তুমিই দেবতা, তুমিই প্রাণ।
আশা, উল্লাস, প্রীতি উচ্ছ্বাস, বাসনা, বেদনা তোমাতে লীন ;
তুমি গো ধন্য, জানি না অন্য দেবতা আমরা তোমা' বিহীন।
অম্লান তুমি, তব পীঠ ভূমি হোক্ অম্লান সর্ব্বকাল ;
সেবক-চিতে ভকতি-চিতে করুক দেউলে আরো বিশাল।
বঙ্গ ভারতী, লহ গো আরতি শ্রদ্ধা, হর্ষ, অশ্রুজল ;
এসহে বিনত শতেক ভক্ত চরণাসক্ত সেবক দল।

*　　　*　　　*

সেবক পূজিছে, সেবক গাহিছে জয় শুধু তব, তোমারি জয়।
সকলি বিলোপ হউক, কি ক্ষোভ ? তোমারী সেবায় দেহেরি লয়।
হে দেবী, তোমার গড়েছে আগার যারা তারা নহে অর্থবান,
বিভববিহীন দীনতম দীন গড়েছে দেউল সঁপি পরাণ।
জননী ভারতী, তব প্রেম প্রীতি দীন সন্তানে নিয়ত দাও ;
যাহারা রিক্ত তাদেরি চিত্ত সুষমা সুবাসে তুমি পূরাও।
বঙ্গ ভারতী তোমারি আরতি তাইত করিছে দীনের দল।
লহ গো প্রণতি শ্রদ্ধা ভকতি লহ গো হর্ষ অশ্রুজল।

কাব্য বিচারের নিকষপাথর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কোন্ কবিতা সুন্দর আর কোন্ কবিতা অসুন্দর-তা নির্ণয় করবার সহজতম মাপকাঠি হ'চ্ছে পাঠকের ভালো লাগা এবং না-লাগা। গরমজলে হাত লাগা মাত্র যেমন তার উষ্ণতাকে আমরা অনুভব করি, ভালো কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্য্যকেও তেমনি আমরা উপলব্ধি ক'রে থাকি। অনবদ্য কবিতা আমাদের অন্তরে জাগায় এমন একটী আনন্দের অনুভূতি যা অনির্ব্বচনীয়।

পাঠক পাঠিকার চিত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের এই অনুভূতিটীকে জাগানোর জন্য কবিতার মধ্যে থাকা চাই কতকগুলি গুণ। এই গুণগুলি যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে কাব্যের মধ্যে আমাদের চিত্ত পায় অমৃতরসের আস্বাদন।

ভালো কবিতার প্রথম লক্ষণ হ'চ্ছে শব্দ প্রয়োগের অসাধারণ নৈপুণ্য। ভাষার মধ্যে থাকা চাই একটী আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি। কবিতার চরণগুলি কানে বাজার সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে, 'চমৎকার! এমনটী তো আর কখনও শুনিনি জীবনে! মাটির কোলে এ যেন সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল!' ভাষার এই মোহিনী শক্তি মনের মধ্যে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি ক'রেই নিঃশেষ হ'য়ে যাবে না! কারণ শব্দের মাধুর্য্য দিয়ে পাঠকের হৃদয়কে মুগ্ধ করাই কবিতার একমাত্র কাজ নয়। কথার যাদু বল্‌তে ভাষার সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিকেই বোঝায় যার স্পর্শে আমাদের মনে জাগে সুতীব্র চেতনা। যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মন ছিল অচেতন, ভাষার তাড়িতস্পর্শে অকস্মাৎ তারা আমাদের চেতনায় জীবন্ত হ'য়ে দেখা দেয়। শব্দের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কবি আমাদের অনুভূতিকে করেন জড়তা থেকে মুক্ত। যে ছবি কখনো চোখ মেলে আমরা দেখিনি, সে গান আমরা কান পেতে কখনো শুনিনি—বাক্যের মেরুজ্যোতিকে আশ্রয় ক'রে আমাদের চিত্তলোকে তারা অপূর্ব্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। তার পর থেকে যতবার আমরা সেই ছবি দেখি, সেই গান শুনি ততবার আমাদের মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে কবিতার সেই চরণগুলি যারা অনাবিষ্কৃত জগতের দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ক'রে দিয়েছিল।

আমাদের বক্তব্য বিষয়টীকে আরও সুস্পষ্ট করবার জন্য এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। 'বর্ষামঙ্গল' নামক বিখ্যাত কবিতাটির প্রথমেই আছে

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে
শিখীদম্পতি কেকা-কল্লোলে বিহরে।
দিগ্বধূ-চিত-হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মদ বরষা॥

এখানে শব্দের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য আমাদের অন্তরে পুলকের শিহরণ জাগিয়েই আপনার ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে ফেলে নি। নব বর্ষার রূপের একটী বর্ণনা দিয়েই ভাষার শক্তি এখানে লুপ্ত হ'য়ে গেল না। শব্দের সমারোহকে অবলম্বন ক'রে নূতন বর্ষার এমন একটী মূর্ত্তি আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত হ'য়ে রইলো যা কোন কালেই মুছবার নয়।

'বলাকার' এই কয়েকটী চরণ উদ্ধৃত করেও আমাদের বক্তব্য বিষয়টী আরও পরিষ্কার করতে পারি :—

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণনদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
চলেচে মাঠের ধারে—ফসল-ক্ষেতের যেন মিতা—
নদীসাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

এখানে নববর্ষার ছবির পরিবর্ত্তে আর একটী ছবিকে কবি ছন্দের সাহায্যে আমাদের মনের মধ্যে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। আগের কবিতায় মেঘের গুরু গর্জ্জন, নীপমঞ্জরীর শিহরণ, শিখিদম্পতির কেকা-কল্লোল, ভিজামাটির সৌরভ প্রভৃতি নানা উপাদান-সম্ভার নিয়ে নবীনবর্ষার পরিপূর্ণ রূপ আমাদের চিত্তকে অধিকার করেছিল। পরবর্ত্তী কবিতার চরণ-গুলিতে যে ছবি আঁকা হয়েছে সেখানে আছে ফসলের ক্ষেত, জনহীন বালুচর, উড়ন্ত বুনোহাঁস, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরে নিঃসঙ্গ ছায়াবট, বহুবর্ষের পদচিহ্ন আঁকা পথ খানি এবং আধ-জাগা নয়নের মত শীর্ণ ও ক্লান্তস্রোত নদীটী। এই সমস্ত কিছু দৃশ্যকে আশ্রয় ক'রে এমন একটী সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো যা একেবারেই উপেক্ষার বস্তু নয়। প্রকাশের অনিন্দনীয় ভঙ্গিমা পাঠকের মনে আনন্দের হিল্লোল তুলেই আপনার ক্ষমতার পুঁজিকে নিঃশেষ হ'তে দিলো না। বঙ্গদেশের পল্লীঅঞ্চলের যে দৃশ্যটী এখানে ফুটে উঠেছে তাও গোরুর দুটি সিং, একটী লেজ এবং চারিটি পা আছে-র মত একটী বর্ণনা মাত্র নয়। বর্ণনা এখানে মনের উপরে এমন একটী ছাপ রাখে যাকে মুছে ফেলা কঠিন। একদা ফাল্গুনের কোন অপরাহ্ণবেলায় পদ্মার বুকে চলতে চলতে যে ছবিখানি কবির মনের মধ্যে জাগিয়েছিল অপূর্ব্ব একটী অনুভূতিকে—সেই ছবিখানিকে তিনি ছন্দের মধ্যে রেখে দিলেন শাশ্বত ক'রে। কথার এমন যাদু দিয়ে পল্লীর এই নিভৃত রূপটীকে তিনি

রচনা করলেন যে সেই রূপ শুধু একটা বর্ণনা হ'য়েই রইলো না। কবিতার চরণগুলি পাঠ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার তটভূমি তার খেয়াঘাট আর নীল নদীরেখা, শূন্যমাঠ আর চখাচখির কাকলীকল্লোল নিয়ে পাঠকের অনুভূতির মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিলো। সেই তটভূমির বিচিত্রদৃশ্য একদিন যে 'আনন্দ-বেদনায়' কবির জীবনকে উদাস ক'রে তুলেছিল, সেই আনন্দ-বেদনার নিবিড় অনুভূতিতে পাঠকের চিত্তও পূর্ণ হ'য়ে যায়। কবিতার এই বিশিষ্ট লক্ষণটার দিকে দৃষ্টি রেখেই এ্যাবারক্রম্বি (Abercrombie) সাহেব লিখেছেন, Poetry differs from the rest of literature precisely in this : it does not merely tell us what a man experienced, it makes his very experience itself live again in our minds; by means of what I have called the incantation of its words. সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গ থেকে কাব্যের তফাৎ হোলো শুধু এইখানে : মানুষ যা দেখেছে, যা শুনেছে, যা উপলব্ধি ক'রেছে কবিতা তার শুধু বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না। কথার যাদুকে আশ্রয় ক'রে কবির অভিজ্ঞতা আমাদের অনুভূতির মধ্যে নূতন ক'রে বাঁচে।

এই সত্যটাকে আরও স্পষ্ট ক'রে দেখাবার জন্য এখানে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটা কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। 'বধূ' নামক কবিতাটিতে আছে :

কলসী ল'য়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ,
ডাইনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরু-শিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা॥

এই লাইনগুলি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সহরের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হ'য়ে একটা নূতন জগতে প্রবেশ করি। এই নূতন জগতে রাজধানীর পাষাণ কায়ার পরিবর্তে আছে খোলা মাঠ আর পাখীর গান, বনের ছায়া আর দীঘির জল, কবরী ফুল আর চাঁদের আলো। যে অপার আনন্দের অনুভূতি নিয়ে কবি দেখেছিলেন, বাংলা দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশিকে আর তাদের রূপ দিয়েছিলেন কবিতায়, উপরের লাইনগুলি পড়বার সময়ে সেই আনন্দের অনুভূতি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হ'য়ে যায়। বাসের হুঙ্কার আর ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি, ধূমমলিন আকাশ আর ইট-পাথরের অট্টালিকাকে ভুলিয়ে দিয়ে কবি পাঠকের চিত্তকে এমন একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের মধ্যে মুক্তি দিলেন যে আনন্দ আকাশের নীলিমার পানে তাকিয়ে থাকার আনন্দ, অরণ্যের শ্যামশ্রীর মধ্যে চোখ দুটোকে ডুবিয়ে দেওয়ার আনন্দ।

ঠিক এমনি ক'রেই আমাদের চেতনার উপরে অরুণোদয়ের অপরূপ মহিমাটী মনোহর মূর্ত্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় যখন আমরা পাঠ করি :

আকাশ তলে উঠ্‌লো ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক-দিগন্তরে,
ঢেকে গেলো অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।

আবার যখন পাঠ করি—

শোন শোন ওই পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি' রে,
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে॥

তখনো আমাদের চেতনাকে অধিকার ক'রে এসে দাঁড়ায় বর্ষণ-মুখর আষাঢ়ের সেই চিরপরিচিত ছবিটী। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় লণ্ডন সহরের বুকে কোন বাঙালীর ছেলে যদি উপরের লাইনগুলি পাঠ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যাবে বঙ্গদেশের একটী মেঘ-কজ্জল দিবসের স্মৃতি যখন আকাশ থেকে জল ঝ'রে'পড়ছে অনিবার, ঝাপসা হয়ে গেছে ওপারের তরুশ্রেণী, নদীর কূলে কূলে জেগেছে উচ্ছল জলের কলরোদন, বিদায় নিয়েছে খেয়াঘাটের মাঝি আর একাকী পথিক শূন্যঘাটে প্রাণপণে ডাকছে তাকে পার ক'রে দেওয়ার জন্য।

ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে,
তীর ছাপি নদী কল-কল্লোলে
এলো পল্লীর কাছে রে।

এই লাইন কয়টীর মধ্যেও শব্দের এমন একটী যাদু আছে যে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন শুনতে পাই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় পিছনের আম্রকানন ঝিল্লীরবে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে আর পল্লবে পল্লবে বাজ্‌ছে বৃষ্টিপড়ার সুমধুর ধ্বনি।

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে॥

এ কেবল কথা দিয়ে কথার মালা গাঁথা নয়। এখানে শব্দের মোহিনী শক্তির বৈদ্যুতিক স্পর্শে বর্ষার প্রকৃতি জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে। ধ্বনির পর ধ্বনি আমাদের মর্মে যেমন প্রবেশ করতে লাগলো, ছবির পর ছবিও তেমনি মনের মধ্যে আঁকা হ'য়ে গেল। কবিতার রচনাগুলি পড়বার সাথে সাথে আমরা স্পষ্ট যেন দেখতে পাই, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে প'ড়ে আছে দিগন্তব্যাপী শ্যামল প্রান্তর: শূন্য থেকে পৃথিবীতে নামছে বৃষ্টির ধারা আর সেই বৃষ্টিধারা প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে আসছে দূরের গাছপালাগুলিকে অস্পষ্টতায় ঢেকে দিয়ে: সঙ্গে সঙ্গে মাঠে মাঠে সবুজ ধানের নৃত্য হ'য়েছে সুরু; মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তাদের নাচের আর বিরাম নেই। চোখ যখন এই দৃশ্য দেখছে, কান তখন শুনছে শ্রাবণ মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি এবং তার সঙ্গে দাদুরির ডাক।

'পলাতকায়' কালো মেয়ে নন্দরাণীর কুমারী হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন :—

আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের 'পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা ;—
ও যেন যুঁই ফুলের বাগান সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরণাখানি ঝিরঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাত-জাগা এক পাখী,
মৃদুকরুণ কাকুতি তা'র তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘনঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

একটী কালোমেয়ের লাজুক ভীরু অকলঙ্ক মনের ছবি আঁকতে গিয়ে এই যে উপমার পর উপমার ঐশ্বর্য্য—এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নন্দরাণী চিরন্তন হ'য়ে রইলো পাঠকের মনে। রবীন্দ্রনাথের দরদী মনের বিপুল স্নেহের অধিকারিণী নন্দরাণী অসংখ্য পাঠকপাঠিকার চিত্তেও এমন একটী স্থান অধিকার ক'রে বস্‌লো যা কোন কালেই হারাবার নয়। একেই বলে কথার যাদু, একেই বলে শব্দের ইন্দ্রজাল রচনা। উপরের কথাগুলিকে অন্যরকম ক'রে বললে দাঁড়ায় এই :—আমাদের চোখের সামনে বিশ্বের বিপুল-জীবন দিবানিশি তরঙ্গিত হচ্ছে বিচিত্র মূর্ত্তি নিয়ে। এই বিচিত্ররূপ সকলের মনকে সমানভাবে নাড়া দেয় না, কারণ দেখবার ক্ষমতা তো সকলের সমান নয়। কেউ দেখে কেবল বাহিরের চোখ দুটী দিয়ে; তাদের দেখা হলো ভাসা-ভাসা। আবার কেউবা দেখে সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে। যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে দেখতে পারে, তাদেরই দৃষ্টি হোলো কবির দৃষ্টি। তাদেরই অভিজ্ঞতা কথার যাদুকে আশ্রয় ক'রে কবিতায় কুসুমিত হ'য়ে ওঠে। মনের সঙ্গে মনের তফাৎ তো আর কোথাও নয়; সে তফাৎ শুধু দেখবার ক্ষমতার মধ্যে। কবিদের মন এমন

উপাদানে তৈরী যে সেই মন যাকেই দেখুক না কেন, তাকে অবলোকন করে অসীম কৌতূহল নিয়ে। আকাশের তারা থেকে আরম্ভ ক'রে সকলের অনাদৃত 'ছেলেটা' পর্য্যন্ত কেউ সেই মনের কাছে তুচ্ছ নয়। এই প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করতে বলি 'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'ছেলেটা'র ছবি। ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছার মত পরের ঘরে মানুষ সে। কুল পাড়্‌তে গিয়ে হাত ভাঙে, রথ দেখ্‌তে গিয়ে হারিয়ে যায়, মার খায় দমাদম, ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়; বক্সিদের ফলের বাগানে চুরি ক'রে খায় জাম, পাকড়াশিদের কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে আসে না ব'লে ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালী, হেলে সাপ রাখে মাষ্টারের ডেস্কে, কোলা ব্যাঙ আর গুবরে পোকা পোষে সযত্নে, সিধু গয়লানির গোরুর দড়ি দেয় কেটে। চুরি ক'রে হাঁড়ি খেতে গিয়ে পোষা কুকুরটার যখন দেহান্তর ঘটলো তখন অকস্মাৎ আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হোলো এই মাতৃহীন অশান্ত ছেলেটার অন্তরের মাধুর্য্য। কুকুরের শোকে দুদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়ালো মুখে তার অন্নজল রুচলো না। বক্সিদের বাগানে পাকা করমচা চুরি করতেও সে বিন্দুমাত্র উৎসাহ অনুভব করলো না। পাড়াগাঁয়ের একটা মাতৃহীন অশান্ত বালকের সমস্ত দুরন্তপনার মধ্যে যে দৃষ্টি আবিষ্কার করলো তার সারল্য-মণ্ডিত শুভ্রহৃদয়ের গোপন সৌন্দর্য্য—সে দৃষ্টি আছে শুধু কবির চোখে। অন্যের চোখে ওই ছেলেটা একটা অসভ্য বাঁদর ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণের দৃষ্টির সঙ্গে কবির দৃষ্টির এই পার্থক্য হোলো ছেলেটাকে দেখ্‌বার ভঙ্গিমা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বালক একটা দুষ্টু বালকমাত্র নয়, সে একটা মহামূল্য সম্পদের মতই আদরের সামগ্রী। অন্যেও যদি কবির মত ক'রেই তাকে দেখতে পারতো, তবে বালক তাদের কাছেও পেতো অনাদরের পরিবর্ত্তে অযাচিত স্নেহ।

তবে দাঁড়ালো এই। ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণ হ'চ্ছে ভাষার অনুপম যাদু। সে যাদু লেখকের অন্তরের অনুভূতিকে পাঠকের মনের মধ্যে জীবন্ত ক'রে তুল্‌বে। আর ভাষার মধ্যে যাদু নিয়ে আসা তখনই হয় সম্ভব, যখন এই পৃথিবীর সব-কিছুই আমাদের চেতনায় এসে দাঁড়ায় অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হ'য়ে। যে অভিজ্ঞতাই আমরা লাভ করি না কেন, আমাদের চেতনায় তাকে গ্রহণ করতে হবে হৃদয়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে। রূপ-রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ নিয়ে এই বিচিত্র জগৎ ক্ষণে ক্ষণে আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে করছে করাঘাত। যাদের জাগ্রত মন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই আহ্বানে দিতে পারে সাড়া তাদেরই কবিতা আমাদের কল্পনাকে দেয় নাড়া। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি কেবল ভাসা-ভাসা হয়, তার মধ্যে যদি না থাকে অনুভূতির তীব্রতা, তবে আমাদের কবিতা কখনও সক্ষম হবে না পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করতে। পাঠকের চেতনার উপর দিয়ে আমাদের ভাষার প্রবাহ চলে যাবে তেমনি ক'রে, যেমন ক'রে জলধারা চ'লে যায় হাঁসের পাখার উপর দিয়ে। ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসীদের প্রেমসঙ্গীতগুলির মধ্যে আছে একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্যের মূলে রয়েছে প্রেমের নিবিড় অনুভূতি। পাহাড়ের উপত্যকায় ঝরণার ধারে শালের বনে যে মুণ্ডা যুবকটী প্রেমের মধ্যে ডুবে গিয়ে তার প্রণয়িনীর কালো কেশে পরিয়ে

দেয় রক্তপলাশের গুচ্ছ—তার অনুভূতির মধ্যে গভীরতার অভাব নেই। এই জন্যেই তার মিলনের আনন্দ অথবা বিরহের বেদনা যখন সঙ্গীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে সে সঙ্গীত সহজেই আমাদের অন্তরকে দেয় নাড়া। কলিকাতার কলেজে পড়া শিক্ষিত যুবকের প্রেমের কবিতাগুলির অধিকাংশই যে পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে না—তার কারণও অনুভূতির দীনতার মধ্যে। প্রেম আসে শুধু কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে, জীবনের নিবিড়তম অভিজ্ঞতার সঙ্গে নেই তার নাড়ীর যোগ। এই জন্যই সেই প্রেম থেকে আসে না কবিতার মত কবিতা। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা অথবা রোমিও-জুলিয়েটের ভালোবাসার কাহিনী প'ড়ে লেখা হয়েছে যে প্রেমের কবিতা - সে কবিতার মধ্যে মানুষের জীবন্ত অনুভূতির স্পন্দনকে খুঁজে পাবো কোথা থেকে ? ইংরেজীতে যাকে বলে experience—সেই experienceএর মধ্যে থাকা চাই হৃদয়ের সবটুকু দরদ, প্রাণের সমস্তখানি অনুভূতি। তবেই জীবনের অভিজ্ঞতা ভাষার যাদুকে আশ্রয় ক'রে অনুপম কবিতা হ'য়ে প্রকাশ পাবে। নইলে কবিতা হবে শুধু কথার সমষ্টি—তার মধ্যে ঝঙ্কার থাকতে পারে কিন্তু প্রাণ থাকবে না।

অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে মূল-কবিতার সৌন্দর্য্যকে আমরা যে খুঁজে পাই না—তারও কারণ জীবন্ত-অনুভূতির অভাব। অনুবাদ অভিজ্ঞতার বিষয়টাকে শুধু প্রকাশ করতে পারে। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির অন্তরের যে গভীর অনুভূতি জড়িত হ'য়ে আছে—অনুবাদের মধ্যে তা প্রকাশ পাবে কেমন ক'রে ? যে কবি আনন্দকে অথবা বেদনাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রথম অনুভব করেছিল, আপন অনুভূতিকে অপরের মনে জীবন্ত রাখার জন্য কি ভাষা ব্যবহার করতে হবে সে রহস্য কেবল তারই ছিল জানা। আর একজনের অনুবাদের মধ্যে মূল কবিতার সেই ভাষার মোহিনীশক্তিকে দেখবার আশা করা বাতুলতা মাত্র। আলিপুরের চিড়িয়াখানার বাঘের মধ্যে সুন্দরবনের বাঘ দেখবার যে আশা করে, তাকে কি বলবো ? দুটোই বাঘ সন্দেহ নেই—কিন্তু খাঁচার বাঘ বনের বাঘের অনুবাদ মাত্র, যেমন অনুবাদ হলো নরেনদেবের মেঘদূত। কালিদাসের মেঘদূতের অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্যের ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে যায় না। এইবার আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করি। ভালো কবিতা এমনই একটা দুর্লভ সম্পদ যার সৌন্দর্য্যকে বিশ্লেষণ ক'রে বোঝানো যায় না। তার মহিমা শুধু অন্তরের উপলব্ধির বিষয়। তবুও কাব্যকে বিচার করবার জন্য বাহিরের একটা নিকষপাথর থাকা মন্দ নয়। সেই নিকষপাথর সব সময় নির্ভুল না হ'লেও সেখানে যাচাই ক'রে কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করার একটা সার্থকতা আছে। এই প্রবন্ধে এই রকম একটা নিকষপাথরের কথাই বলা হ'য়েছে।

আমি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

প্রতিদিন আকাশের চেয়েছি বারতা,
মাটির আঁধার হ'তে বিষ-বাষ্প দিয়েছে উত্তর।
মোর শান্ত মুহূর্ত্তের অন্তরের সহজ কামনা—
উদার পরিধি আর অনন্ত বিস্তার,
আলোকের প্রসার বিপুল—
উত্তেজিত মুহূর্ত্তের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চক্রব্যূহে
কুণ্ডলিত সর্পসম পাকে পাকে জড়ায়ে জড়ায়ে
ফুঁসিয়াছে জীর্ণ ক্ষুদ্র আপন বিবরে;
বৃহতে করেছে ক্ষুদ্র, সীমাহীনে দিয়াছে সীমানা,
অভ্রচুম্বী চূড়া মোর নিমেষে করেছে ধূলিসাৎ।
কে আমি, কি মোর পরিচয়—
এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে বারম্বার পাসরি পাসরি
ভালমন্দে গড়া আমি মোর বিশ্বে পেয়েছি প্রকাশ।
কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভাল,
কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার—
তাহাদের ঘৃণা আর ভালবাসা, রূপ, রস, রঙ
আমারে করেছে সৃষ্টি, সেই আমি সংসারের জীব;
সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল, হবে না প্রকাশ কোন দিন।

জীবনের দুঃখ শোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—
মহত্তেরে বৃহত্তেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।
দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, ভুল ভ্রান্তি স্খলন, পতন—
আছে লোভ বীভৎস, কুৎসিত;
আছে ক্ষুধা, আছে ক্ষোভ, বেদনার ঝরে অশ্রুজল।
সমস্ত ক্ষুদ্রতা ক্ষোভ অসহ্য যন্ত্রণা দুঃখ মাঝে—
প্রতিদিবসের অতি ব্যর্থ শূন্য নিরর্থক কাজে
মাথার উপরে স্থির স্তব্ধ শূন্য অনন্ত আকাশ,

দীর্ঘ বনস্পতি শিরে নবশ্যাম কচি কিশলয়,
নামহীন পাখীদের গান,
নিভৃত অন্তর মাঝে ক্ষণে ক্ষণে গেয়ে-ওঠা বঞ্চিতের অসম্পূর্ণ গান,
হঠাৎ কাঁপিয়া-জাগা সুর।
হঠাৎ ভাঙিয়া-পড়া বন্ধুত্বের প্রণয়ের উচ্ছ্বাস প্রচুর,
নিজে বেশ ভাল আছি, অকস্মাৎ বুঝিয়া বিস্ময়ে
নিপীড়িত দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসে দুই চক্ষে ছল ছল জল—
যতই ক্ষুদ্রতা থাক, যত আমি ব্যর্থ হই, বৃহতে বিরাটে নমস্কার,
নমঃ শূন্য নীলাকাশ,
নমো নমো নমঃ হিমালয়,
মানুষের ভগবানে প্রণমিয়া মানুষেরে করি নমস্কার।

ঊর্দ্ধে শূন্য নীলাকাশ
বারম্বার তবু ভুল হয়—
ঘরের কপাট রুধি, বাহিরের রুধিয়া বাতাস
আপনার বিষ-বাষ্পে আচম্বিতে হাঁপাইয়া উঠি ;
মর্ম্মভেদী নিঃস্বতায় আত্মীয়েরে করি উৎপীড়ন,
রূঢ় কহি প্রিয় বন্ধুজনে—
বিকৃত বীভৎস রূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ—
আপনি শিহরি উঠি নিজেরে প্রত্যক্ষ করি মনের মুকুরে।

কারে কহি, কারে বা বুঝাই,
মোর মূর্ত্তি সত্য এ তো নহে—
সে তো নহি আমি।
পীড়িতের ব্যথিতের যন্ত্রণায় মধ্যরাত্রে একা জাগি আমি,
একা গাহি গান—
কেহ মোরে দেখিল না, বুঝিল না গান কি যে বলে—
অর্থ তার গুপ্ত রহে সুর আর ছন্দের আঁধারে,
আমি—মোর নামের আড়ালে ;
নাম সে মরিয়া যাবে, উদার নিঃসীম শূন্যে আমি তবু রহিব জাগিয়া।

বন্ধু, শোন তোমাদেরে বলি,
অনন্ত আমার এই চোখে-দেখা খণ্ড ইতিহাস

যতটুকু আমি তার জানি—
আকাশে খসিছে তারা, নদীতটে ভেঙে পড়ে ঢেউ
ছায়া কভু পড়ে না-ক শুভ্র স্বচ্ছ আকাশের নীলে,
দাগ কভু পড়ে নাই টলমল বারিধির বুকে ;
সে বিরাট্ শূন্যতায় আমি পরিচয়হীন তোমাদের কাছে ;
তোমরাও নহ প্রয়োজন।
সেখানে একাকী আমি, সে অসীম একান্ত আমার
ভাষাহীন সে অসীমে চিরমূক ইতিহাস মোর।

শূন্যতায় রৌদ্র করে মায়ার সৃজন
রূপে রঙে তাহার বিকাশ—
মানুষেরে রঙ দেয় রূপ দেয় শুধু ভালবাসা,
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে একমাত্র মায়া-যাদুকর।
আমি ভালবাসার কাঙাল—
আমারে ডাকিয়া কাছে আমারে নির্ম্মাণ করি লও
ক্ষণিকের আলোকসম্পাতে
তোমাদের প্রেমের আলোকে।
দেহহীন মানুষেরা নিরালম্ব ভাসিছে অসীমে
পরস্পর পরিচয়হীন—
যার যত ভালবাসা তার কাছে ততই প্রকাশ।
বিশ্ব তার ভরে ওঠে রূপের গৌরবে,
প্রেমের রহস্যে ঘেরা এ-বিশ্বের পরিধি বিপুল—
আমারে তোমরা দাও প্রেম,
রূপ দাও, দেহ দাও মোরে।

সমস্ত বেদনা-বিষ এ-জীবনে করিয়া মন্থন
মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিনে করিয়াছি পান,
সাধ যায় জনে জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
নিজেরে প্রকাশ করি সকলেরে গড়িয়া তুলিতে ;
মুছে-যাওয়া শূন্যতায় রূপহীন মানুষের আর কোনো নাহি পরিচয়

প্রাচীন বাংলা কাব্যে বাদ্যযন্ত্র

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত বন্ধুগণ :—

আজিকার এই সভায় আমি প্রাচীন বাংলার বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করিব। সাহিত্য-সম্মিলনীর এই সভায় বাদ্যযন্ত্রের আলোচনা অনেকের মতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে ; কিন্তু আমার এই আলোচনাও প্রাচীন কয়েকখানা বাংলা কাব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে বলিয়া ইহা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদিগের একটা দস্তর ছিল, তাহারা কোন বিষয়ের চূড়ান্ত বর্ণনা না দিয়া ছাড়িতেন না। যিনি যে বিষয় বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, অন্ততঃ সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের চরম পরিচয় না দিয়া যেন তাহাদের তৃপ্তি হইত না। সেই জন্য 'পক্ষপাতকৃপণ' কাব্যও ইহাদের জন্য স্থানের কার্পণ্য করিতে পারে নাই। অনেক সময় আবার কোন শ্রেণীর জিনিষের নামের সঙ্গে একটা মোটা সংখ্যা তাঁহারা যোগ করিয়া দিতেন। কতকগুলি জিনিষ বর্ণনায় দেখি অনেক কবিই এইরূপ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জন'। এই পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের উল্লেখ অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায়। অনুরূপ আর একটি বর্ণনা পাই বাদ্যযন্ত্রের ; এবং ইহাদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে "ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে উঠে জয় ধ্বনী," মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে "বাজে ব্যাল্লিশ বাজন", কৃত্তিবাসের রামায়নে "দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা" ; মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে ও কবিকঙ্কনের চণ্ডীতেও এই বিয়াল্লিশ বাজনার উল্লেখ আছে। এই সকল বাদ্য পূজা-পার্ব্বন, বিবাহ ও যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদিতে অপরিহার্য্য উপকরণ ছিল। এখনও পূজাপার্ব্বন বিবাহ ইতাদিতে আমাদের দেশে বাদ্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে ; তবে এখন আর বিয়াল্লিশরূপ বাজনা বাজে না। প্রায় ক্ষেত্রেই ঢাক, ঢোল, কাঁসি, শানাই এবং টিকারা মাত্র বাজিয়া থাকে। কোন গানের বৈঠকে সাধারণতঃ হারমোনিয়াম, এস্রাজ, সেতার, তানপুরা, বেহালা ও তবল ; গ্রাম্য বৈঠকে ঢোল, হারমোনিয়াম, তবল, খঞ্জরী বা খঞ্জনী ও বেহালা ; কোন কীর্ত্তনগানে শুধু খোল করতাল ও মন্দিরা এবং বিবাহবাসরে ঢাক, ঢোল, সানাই কাঁসি ও টিকারা বাজিয়া থাকে। আজকাল আবার আরও দুই একটি যন্ত্রের পশ্চিম জগৎ হইতে আমদানী হইয়াছে—পিয়ানো, অরগ্যান, ব্যাগপাইপ ইত্যাদি। এই সকল বাদ্যযন্ত্র পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না। তবু এই সকলকে নিয়াও আজকাল বিয়াল্লিশ রকম বাদ্যযন্ত্রের কোথাও বড় সমাবেশ হয় না। কাজেই এই সকল পড়িয়া স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে এই বিয়াল্লিশ রূপ বাদ্যযন্ত্র কি ? সত্যই কি বিয়াল্লিশ রূপ বাদ্যযন্ত্র পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল ? এই বিষয়ই বর্ত্তমানে সামান্য আলোচনা করিব।

আমাদের প্রাচীন কাব্যগুলিতে অনেকস্থলে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়; এবং দুই এক স্থানে এমন সকল বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলি বর্ত্তমানে প্রচলিত ত নহেই, এমন কি এগুলি যে বাদ্যযন্ত্রের নাম হইতে পারে তাহা বর্ত্তমান বাংলার সাধারণের ধারণারও অতীত। যেমন 'নিশান'। নিশান নামে একটি বাদ্যযন্ত্র ছিল ইহা সহজে বিশ্বাসই হয় না। আমরা নিশানকে পতাকা অর্থেই বুঝিয়া থাকি, ইহার যে দ্বিতীয় কোন অর্থ আছে তাহা আজ সাধারণের কাহারো জানা আছে কিনা সন্দেহ। এমন কি সকল অভিধানেও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলে ইহার উল্লেখ পাই—সেই উল্লেখও এত সুস্পষ্ট যে ইহাকে বাদ্যযন্ত্র বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেমন:—

"ঝাঝরি নিশান বাজে সাজে কালুবীর।"

"তেঘাই তেওতা বাজে ফুকরে নিশান।"

কিংবা— "ললম্ফে নেউসা নিশান বাজে।"

অথবা— 'কাড়া পাড়া নিশান করতাল কাঁসি বাজে।'

অথবা অন্যত্র—"সাজরে সজারে নিশান ফুকরে
নাগরায় ঘন পড়ে কাটী।"

কাজেই নিশান যে একটি বাদ্যযন্ত্র ছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহই থাকিতে পারে না। এইরূপ আর একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম 'পিনাক'। আমরা পিনাক অর্থে সাধারণতঃ শিবের ধনু বুঝিয়া থাকি—যাহা হইতে মহাদেবের নাম হইয়াছে পিনাকী। কিন্তু ঘনরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ এই পিনাককে বাদ্যযন্ত্ররূপে বাজাইয়াছেন। যেমন:—

'থমক খঞ্জরী বিণা পিনাকের তানে।'—ঘনরাম
পিনাকাদি বাহে কেহ শবদে মধুর।—মাধবাচার্য্য
ঝাঝরি মৃচঙ্গ বাজে মধুর পিনাক।— কৃত্তিবাস
পিনাক-বিলাস রুদ্র কবিলাস (?)
সারঙ্গ বাজয়ে মন্দিরা।—কবিকঙ্কণ

কাজেই নিশান ও পিনাক যে বাদ্যযন্ত্র তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। তবে এইগুলি কিরূপ ছিল; ইহাদের আকৃতি কিরূপ, প্রকৃতিই বা কিরূপ ছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনাও আমরা এই সকল কাব্য হইতে আশা করিতে পারি না। তবে যতদূর মনে হয়, নিশান নামক বাদ্যযন্ত্রটি মুখে বাজাইবার ছিল। কারণ, ইহার বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—'ফুকরে নিশান'। এবং যে সকল যন্ত্র ফু-দিয়া বাজাইতে হয় সেই সকল যন্ত্রের সঙ্গেই 'ফুকরে' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার বেশী জানিবার কোন উপায় আছে কি না তাহা জানি না—তবে আমি এ পর্য্যন্ত পাই নাই।

কবিরা বলিয়াছেন—'বিয়াল্লিশ বাজনা'। কিন্তু নাম সংগ্রহ করিলে এই বিয়াল্লিশ হইতে আরও অধিকসংখ্যক নাম পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায়গুলির সঙ্গেই এখন আর

আমাদের পরিচয় নাই। সেই জন্যই প্রাচীনকালের বাদ্যযন্ত্রের সহিত আপনাদের একটু পরিচয় করাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গলে গোবিন্দ-গুণ-গানের সঙ্গে নিম্নলিখিত-রূপ বাদ্যের বর্ণনা করিয়াছেন :—

নানা পঞ্চ বাদ্য বাজে মুরজাদ্য করে।
মঙ্গল মাদল ঢোল মৃদঙ্গ মন্দিরে॥
দামামাদি দগড়ি দগড় জগঝম্প।
সানি সিঙ্গা করতাল কাসি বড় দম্ফ॥
খমক খঞ্জরী বিণা পিনাকের তানে।
গুণীগণ গদগদ গোবিন্দ গুণ গানে॥

আজ কালকার দিনে গোবিন্দ-গুণ-গানে বা কীর্ত্তনে এত সব বাদ্য বাজে না এবং এই জন্যই ইহাদের সহিত আমাদের পরিচয় শেষ হইয়া গিয়াছে।

কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানে এখনও শঙ্খ বাজিয়া থাকে। প্রতি সন্ধ্যাকালে শঙ্খ বাজাইবার প্রথাও অনেক স্থানেই আছে। শঙ্খধ্বনি ব্যতীত কোন মঙ্গল অনুষ্ঠান বা পূজা-পার্ব্বণাদি আমাদের দেশে হয় না; এবং প্রাচীনকালের এই অনুষ্ঠানটি পূজাপার্ব্বণ অবলম্বন করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে। আমরা মহাভারতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে প্রত্যেক মহারথীকেও শঙ্খধ্বনি করিতে দেখিয়াছি। সেই সকল শঙ্খের আবার অধিকারিভেদে নানারূপ নামও আছে। ঘনরাম প্রভৃতি কবিগণও এই শঙ্খধ্বনির উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু মুরজ, মাদল, দামামা, দগড় ইত্যাদি হরিগুণগানকে অবলম্বন করিয়াও আর বাঁচিয়া নাই। হরিগুণগানে হয়ত বা এই সকল তত সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। আমরাও রুচির নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ইহাদের সঙ্গে পরিচয় হারাইয়াছি। তবু আজকাল এই সকলের অনুশীলনের একটু সার্থকতা থাকা খুবই সম্ভব। কারণ এই সকল হইতে আমাদের দেশে গীতবাদ্যের কিরূপ অনুশীলন হইত তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর জীবন যে সেকালেও শুধু চাকুরী-ব্যবসায়ীর জীবন ছিল না—নানা উৎসাহের ও উৎসবের উপভোগও যে তাহাদের জীবনে ছিল—, নানারূপ স্ফূর্ত্তি-আনন্দের ফোয়ারাও যে তাহাদের জীবনে রস-সঞ্চার করিতে একদিন কার্পণ্য করে নাই—এই নৈরাশ্য-মলিন যুগে সেগুলি বাস্তবিকই অনুশীলন করিবার বিষয় এবং সেই জীবনের সমারোহ যাহাতে বাংলায় পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয় তাহারও প্রয়াস উচিত। এই শস্যশ্যামলা বাংলায় মানুষের হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

আজকাল পাশ্চাত্যসভ্যতার প্রভাবের যুগ। আমরা পাশ্চাত্য জিনিষেরই আদর করিতে অভ্যস্ত। তাই আমাদের গৃহে আজকাল হারমোনিয়াম, অরগ্যান, পিয়ানো ইত্যাদি বাজিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশেই যে কতরূপ বাদ্যযন্ত্র ছিল তাহার সন্ধান খুব কম লোকেই রাখে। 'বাঙ্গালী বড় আত্মবিস্মৃত জাতি', কিন্তু তাহাকে হয় ত অন্ততঃ বাদ্যযন্ত্রের জন্ত পরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না, যদি সে সেকালের বাদ্যযন্ত্রগুলি সযত্নে রক্ষা

করিয়া আসিত। এখন অনেকগুলিরই প্রকৃত বর্ণনা পাওয়া যাইবে না তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে যতগুলির সঙ্গে সম্ভব আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিতে ইচ্ছা আছে।

ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশী ইত্যাদি যে সকল বাদ্যযন্ত্রের এখনও কিঞ্চিৎ প্রচলন পল্লী-গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সহরে শিক্ষিত-আখ্যাধারী অনেক বাবুদের উপহাসের সামগ্রী হইয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বাদ্যযন্ত্রের জন্যও আমাদের সম্পূর্ণভাবে পরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। অচিরেই হয় ত আমরা আমাদের আর একটি নিজস্ব জিনিষ হারাইব, এরূপ আশঙ্কা হয়।

কাঁশী, কাঁসী, কাসর, কাংশ বা কাংস্য ; করতাল, খঞ্জরী বা খঞ্জনী, ঘণ্টা, টিকারা, ঢাক, ঢোল, তম্বুরা বা তানপুরা, তবল, পাখোজ, বীণা, বেণু বা বেণী, বাঁশী, বেহালা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, মুরলী, শঙ্খ, শিঙ্গা, সানাই, টিকারা, সেতার, সারিন্দা ও সারঙ্গ বা সারেঙ্গ প্রভৃতি যে সকল বাদ্যযন্ত্র অদ্যাবধি প্রচলিত আছে তাহাদের উল্লেখ ঘনরাম ও মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শিবায়নে, মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে, কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গলে বা কৃত্তিবাসের রামায়ণে থাকিলেও, এই সকল পুস্তক হইতে উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমার সময়ও অল্প :এবং উদাহরণ দিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটাইতে চাই না। তবে এই সকল পুস্তক হইতে নিম্নে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ইহাদের প্রায়গুলিরই উল্লেখ দেখা যাইবে। যে কতকগুলি বর্ত্তমানে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেই নিম্নে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। যেমন—

(১) কাড়া—একমুখ চর্ম্মাচ্ছাদিত পটহবিশেষ।

শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল ঘোর বাদ্যময়।—ঘনরাম
কাসর ছাপড় আর কাড়া পড়া কাসি।—মাণিক গাঙ্গুলী
ঢাক ঢোল করতালি দামা খোল কাড়া।—'শিবায়ন'
ঢেমনী দগড় কড়া ঘন ঘন পড়ে সাড়া
প্রতি ঘরে ঘরে বাজে বোল।—মাধবাচার্য্য
ভেউরি ঝাঝরি বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া।—কৃত্তিবাস
ঢাক ঢোল কাড়া বাজে শুনিতে শোভন।—বিজয়গুপ্ত

২। খমক—(একপ্রকার ক্ষুদ্র পটহ ;—খঞ্জনী বিশেষ)।

খমক খঞ্জনী বিণা পিনাকের তান।—ঘনরাম
কাড়া পাড়া খমক খঞ্জরি তুরি বাজে।—মাণিক গাঙ্গুলী
খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার।—কৃত্তিবাস
খমক খঞ্জরি ঝাঝরি মোহরি পাখয়াজ তবল বাজেরে।—'কৃষ্ণমঙ্গল'
'খমক চমক ভেরী—' —কবিকঙ্কণ

৩। জগঝম্প—(ডিণ্ডিম বিশেষ)।

জগঝম্প বাজে ডম্ফ মাদল বিশাল।—ঘনরাম

সুমৃদঙ্গ মুখচঙ্গ জগঝম্প পাড়া।—'শিবায়ন'

জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।—কৃত্তিবাস

বাজিছে বাজনা, নাচে কত জনা, জগঝম্প বাজে ঢোল।—'কৃষ্ণমঙ্গল'

জগঝম্প বাজে খুবী।—কবিকঙ্কণ

৪। ডম্ফ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; চাকার মত একখণ্ড কাষ্ঠের একদিকে চামড়ার ছাউনি করিয়া লইলেই এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইল। (সুঃ মিঃ অঃ)

জগঝম্প বাজে ডম্ফ মাদল বিশাল।—ঘনরাম

সহস্র সানাই বাজে ডক্ক কোটি কোটি।—কৃত্তিবাস

ডম্ফ রবাব বাজই।—'কৃষ্ণমঙ্গল'

এই ডম্ফকে বোধ হয় দম্ফও বলা হইত, কারণ, ঘনরাম একস্থানে লিখিয়াছেন—'মুরজ মাদল দম্ফ জগঝম্প ভেরী।

৫। দগড়—(মাটীর ছোট নাগরাবিশেষ)

সিঙ্গা কাড়া কাসর দগড় ঢাক ঢোল।—ঘনরাম

ঢাক ঢোল কাসর দগড় বীণা বেণী।—'শিবায়ন'

গুরু গুরু গভীরে দগড়ে পরে কাঠি।—মাধবাচার্য্য

দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা।—কৃত্তিবাস

শঙ্খ ঘণ্টা দগড় দামা বাজে ঘাঘরী।—বিজয়গুপ্ত

দগড় কাষড় শানী—। —কবিকঙ্কণ

কোথাও কোথাও আমার দগড়ি বা দগড়ারও উল্লেখ আছে, বোধহয় এই দুইটিই এক বা একজাতীয় হইবে। যেমন:—

দামামাদি দগড়ি দগড় জগঝম্প।—ঘনরাম

ঢাক ঢোল কাসর দগড়া দামা ভেরী।—'শিবায়ন'

৬। দুন্দুভি—

সুপাত্ত দুন্দুভি বাদ্য দেববাদ্য যত।—ঘনরাম

দুয়ারে দুন্দুভি বাজে মহা মহোৎসব।—মাণিক গাঙ্গুলী

দুন্দুভি বাজনা বাজে নাচে বীরমণি।—'শিবায়ন'

দুন্দুভি ডম্বুর শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার।—কৃত্তিবাস

আকাশ ভরিয়া দুন্দুভি বাজে অপরূপ শুনি।—বিজয়গুপ্ত

৭। দামামা বা দামা। (বৃহৎ পটহ বিশেষ).

দামামা দড়মশা ধাউসা ধাউসা ধাউসা

ভাউ ভাউ রণশিঙ্গা বাজে।—ঘনরাম

ঢাক ঢোল করতাল দামা খোল কাড়া।—'শিবায়ন'
ঢাক ঢোল কাসর দগড় দামা ভেরী।—মাধবাচার্য্য
ত্রিশ সহস্র দামামায় ঘন পড়ে কাঠি।—কৃত্তিবাস

৮। বিষাণ—

বিষাণের বাদ্য বাজে হরিষে নর্ত্তকী নাচে।—বিজয়গুপ্ত

৯। মাদল—(সাঁওতালী ঢোলক) ইহা মর্দ্দল শব্দের অপভ্রংশ।

মঙ্গল মাদল ঢোল মৃদঙ্গ মন্দিরে।—ঘনরাম
মুরজ মর্দ্দল ভুরঙ্গ ভেরী।—মাণিক গাঙ্গুলী
বীণা বাঁশী মাদল বাজায় তান সুযন্ত্রিত।—কৃত্তিবাস
কেহ কেহ ধায় মাদল বাজায়।—'কৃষ্ণমঙ্গল'

১০। মুচঙ্গ বা মুখচঙ্গ—

মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুচঙ্গ রসান।—মাণিক গাঙ্গুলী
সুমৃদঙ্গ মুখচঙ্গ জগঝম্প পাড়া—'শিবায়ন'
টিকারা টঙ্কার আর চৌতাল মোচঙ্গ।—কৃত্তিবাস
বাজে সপ্তস্বরা ঢোলক মন্দিরা
মুচঙ্গ সারঙ্গ মাঝেরে।—'কৃষ্ণমঙ্গল'

১১। মুহরি বা মোহরি।—

রণভেরী মুহরি বিজয় ঢাক ঢোল।—ঘনরাম
মঙ্গল মুরলী কত মোহন মোহরী।—'শিবায়ন'
শঙ্খ ঝাঝরি বাজে মোহরী মিশাল।—কৃত্তিবাস
দোহরী মহরি বাজে কপিলার সনে।—বিজয়গুপ্ত
খমক খঞ্জরি ঝাঝরি মোহরি।—'কৃষ্ণমঙ্গল'

১২। সানি ও সানিরঙ্ক।—

সানি সিঙ্গা করতাল কাঁসি বড় দম্ফ।—ঘনরাম
বেনিস বাজনা বাজে বীণা সানি শঙ্খ।—মাণিক গাঙ্গুলী
কত ঠাই বাজাইছে যোড়া যোড়া সানি।—কৃত্তিবাস
দগড় কাসর সানি।—কবিকঙ্কণ
রণশৃঙ্গ সানিরঙ্ক রণকালী তুরী।—'শিবায়ন'

১৩। এরঙ্গ—

তুরঙ্গ এরঙ্গ ভেরী তিরানই বাজে।—মাণিক গাঙ্গুলী

১৪। কাহাল বা কাহল—

সহস্র দগড় বাজে সহস্র কাহাল।—কৃত্তিবাস

১৫। ঝাঝরা—

মোহন মন্দিরা বাজে ডিম ডিম ঝাঝরা।—ঘনরাম
ঝাঝরি নিশান বাজে সাজে কালুবীর।—মাণিক গাঙ্গুলী
সপ্তস্বর ঝাঝর বাজায়ে সুমঙ্গল।—মাধবাচার্য্য
তুরী ভেরী ঝাঝরি তা না যায় গণন।—কৃত্তিবাস
বীণা বাঁশী করতাল বাজয়ে ঝাঝরি।—বিজয়গুপ্ত
থমক খঞ্জরী ঝাঝরি মাহরি।—'কৃষ্ণমঙ্গল'

১৬। ডম্বুর—(ডুগডুগি বিশেষ। ইহার আকার ক্ষুদ্র, মধ্যভাগ সংকীর্ণ, ইহার উভয় দিক ক্রমশঃ প্রশস্ত। এই জন্য কোন কোন কবি ইহার সহিত স্ত্রীলোকের কটিদেশের উপমা দিয়া থাকেন।)

ডম্বুরের শব্দ শুনি শঙ্কর ভবানী।—ঘনরাম
ডম্বুর বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে।—কৃত্তিবাস
ডুমু ডুমু বলিয়া ডম্বুর বাজে।—বিজয়গুপ্ত

১৭। তুরঙ্গ—

তুরঙ্গ এরঙ্গ ভেরী তিরানই বাজে।—মাণিক গাঙ্গুলী
তম্বুরা তেয়াই বাজে তেওড়া তুরঙ্গ।— „
সহস্র তুরঙ্গ বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।—কৃত্তিবাস

১৮। তুরি বা তুরী—

কাড়া পাড়া থমক খঞ্জরি তুরি বাজে।—মাণিক গাঙ্গুলী
রণশৃঙ্গ সানিরঙ্ক রণকালী তুরী।—'শিবায়ন'
ভেরী তুরি বাদ্য বাজে অনেক বন্দনে।—মাধবাচার্য্য
তুরী ভেরী ঝাঝরা তা না যায় গণন।—কৃত্তিবাস

১৯। ঘাঘরী বা ঘাঘর—

ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঝুনুঝুনু বাজে।—মাণিক গাঙ্গুলী
শঙ্খ ঘণ্টা দগড় দামা বাজে ঘাঘরী।—বিজয় গুপ্ত

২০। টমক ও টেমাই—

একাকার সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই।—ঘনরাম
টমক টেমাই কাড়া বাজে ঘন ঘন।— „
থমক টমক ভেরী—।—কবিকঙ্কণ

২১। ডাসা—তিনলক্ষ ডাসা বাজে দামামার সনে।—কৃত্তিবাস

২২। দণ্ডী—দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীমা।— „

২৩। পাড়া বা পড়া—

কাড়া পাড়া ঠমক খমক করনাল।—ঘনরাম

কাড়া পাড়া খমক খঞ্জরি তুরি বাজে।—মাণিক গাঙ্গুলী

মৃদঙ্গ মুখচঙ্গ জগঝম্প পাড়া।—'শিবায়ন'

ভেউরি ঝাঝরি বাজে তিনলক্ষ কাড়া।

চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পাড়া॥—কৃত্তিবাস।

এইরূপ উদাহরণ দিয়া আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাই না। সময়ও সঙ্কীর্ণ, তাই অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্রের উদাহরণ বাদ দিতে হইল। এগুলি রণশিঙ্গা, রণভেরী, রণদামামা, রণকালী, কন্নাল বা করনাল, কেউর, করঙ্ক, দড়মুশা, রামকাড়া, ভুরঙ্গ, ভেউর বা ভওরি, রবাব। এই প্রসঙ্গে আলোচিত কবিদের বর্ণনায় ইহাদের যথেষ্ট উল্লেখই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি নামের উল্লেখ কোন কোন কবির লেখায় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস বলিতেছেন "ঢেমচা খেমচা বাজে বাজে করতাল"; মাধবাচার্য্য বলিতেছেন "ঢেমশী দগড় কাড়া, ঘন ঘন পড়ে সাড়া, প্রতি ঘরে বাজে জয়ঢোল।" মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন, "তেঘাই তেওতা বাজে ফুকরে নিশান"। এই সকল বর্ণনায়, অথবা, কৃত্তিবাসের 'কত কোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুযান' কিংবা 'কবিকঙ্কণের জগঝম্প বাজে খুরী' ইত্যাদি বর্ণনায় এই ঢেমচা, খেমচা; ঢেমশী, তেওতা, সিন্ধু, বিন্দুযান, এবং খুরী ঠিক বাদ্যযন্ত্র কিনা বা কিরূপ বাদ্যযন্ত্র তাহা এই অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করিতে পারিলাম না।

আজকের এই সাহিত্য-সম্মিলনীতে এই নীরস প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আমি আপনাদের কাব্য-রসোপভোগের যথেষ্ট সময়ই হয়ত নষ্ট করিয়াছি। তবে ভরসা এই, আপনারা রসপিপাসু, কাব্যানুরাগী—তাই হয়ত এইরূপ প্রাচীন কাব্য আলোচনায় দোষ ধরিবেন না। বিশেষ প্রাচীন কাব্যগুলিতে সেই যুগের বাংলার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও আলোচনা করিবার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের কাব্যরসের উৎস ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গতি কিরূপ ধারা অবলম্বন করিয়া, কিরূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া কোথায় চলিয়াছে তাহা জানিতে হইলে এই সকল প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয়। এই সকল সাহিত্যে তখনকার বাংলার সামাজিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, সাজসজ্জা ও প্রসাধন, খেলাধূলা, গানবাজনা নানারূপ সংস্কার এমন কি রন্ধনচাতুর্য্যের পর্য্যন্ত যে পরিচয় পাওয়া যায় এই সকল একত্রে মিলাইয়া তখনকার যুগের বাঙ্গালীর একটা চিত্রও আমরা পাইয়া থাকি। এই সকল সম্বন্ধে অন্য সময়ে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

অতি আধুনিক উপন্যাস

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় এম এ, পি এইচ্ ডি

অতি আধুনিক উপন্যাস সমালোচকের নিকট অনেকগুলি দুরূহ প্রশ্ন উপস্থাপিত করে। প্রথমতঃ ইহার প্রসার এবং সংখ্যা এত বেশী, যে ইহাকে অনেকটা দুর্ভেদ্য, পথ-রেখাহীন অরণ্যানীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইহার ঘন-বিন্যস্ত ব্যূহ শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টাকে প্রতিহত করে ও দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মায়। দ্বিতীয়তঃ ইহার রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে এখনও পরীক্ষামূলক অনিশ্চয় লক্ষিত হয়; ইহার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে নানা যুক্তিতর্কমূলক আলোচনা ও অবান্তর মন্তব্য সমাবেশের জন্য ইহার পূর্ব্বতন সুষমা ও সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে ও একটা নূতন রূপ এখনও গড়িয়া উঠে নাই। উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ইহার মন সর্ব্বথা দ্বিধাশূন্য নহে—এই অনিশ্চিত উদ্দেশ্যও লেখক ও পাঠক উভয়েরই মনঃস্থির করার পক্ষে ঠিক অনুকূল হয় না। তৃতীয়তঃ ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-সমালোচনার বিশেষত্বটুকুও পূর্ব্বতন উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করে না—ইহার এই মৌলিকতা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং ইহার বিচারে প্রচলিত রুচির বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়া রসগ্রাহিতার পরিচয় দিতে হয়। চতুর্থতঃ ইহার লেখকেরা অনেকেই এখনও স্ব স্ব প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লাভ করেন নাই—ভুল-ভ্রান্তির ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া নিজ নিজ বিশেষ প্রবণতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। ইহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এরূপ ক্ষেত্রে সমালোচকের পথ যে নিতান্ত বিঘ্ন-বহুল তাহা উপলব্ধি করা মোটেই দুরূহ নহে। সুতরাং এই আলোচনা আধুনিক উপন্যাসের কয়েকটি মূল সূত্র ও প্রবণতার বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকিবে—কোনও লেখকের চূড়ান্ত স্থান-নির্ণয় ও সমস্ত প্রচেষ্টার ব্যাপক ও সমগ্র ধারণা ইহার উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা উভয়েরই বহির্ভূত।

এই উপন্যাসের জন্মমুহূর্ত্তে ইহার সূতিকাগারের দ্বারদেশে যে প্রবল কোলাহল উঠিয়াছিল, তাহাকে ঠিক নবজাত শিশুর মঙ্গল-শংসী শুভ-শঙ্খ-ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ইহার দুর্নীতি-পরায়ণতা ও যৌন আকর্ষণের অসঙ্কোচ নির্লজ্জ স্তুতিগান তীব্র বিরোধিতা ও তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই উত্তপ্ত বাদ-প্রতিবাদে সাহিত্য-বিচারের নিরপেক্ষ আদর্শ যে সর্ব্বদা রক্ষিত হইয়াছিল, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। সুখের বিষয়, এই অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনা এখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে, ও সমস্ত প্রশ্নটার ধীর সাহিত্যিক আদর্শানুযায়ী পর্য্যালোচনার সময় আসিয়াছে। যে সমস্ত লেখক এই কুৎসিত, অরুচিকর সাহিত্য-সৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক বা বিরুদ্ধ সমালোচনার অঙ্কুশে বিদ্ধ হইয়াই হউক, এই গ্লানিকর

আতিশয্য বর্জ্জন করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ ও সুস্থ বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যৌন-আকর্ষণ-জনিত চিত্তবিকার এখন তাঁহাদের সৃষ্টি-শক্তির সমস্ত প্রচেষ্টা অধিকার করিয়া নাই। তাঁহাদের সৃষ্টি যতই নূতন প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, নব নব বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে, ততই ইহা পরিষ্কার হইতেছে যে, দুর্নীতিমূলক যৌন প্রেম চিত্রনই আধুনিক উপন্যাসের সম্বন্ধে প্রধান কথা নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তাও ঠিক সেই অনুপাতে হ্রাস পাইতেছে।

তথাপি এ বিষয়ে কতগুলি মূলসূত্রের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম কথা এই যে, সাহিত্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনেকটা বিষয়নিরপেক্ষ। সমাজ-বিগর্হিত প্রেম লইয়া যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইতে পারে, তাহা কেবল গোঁড়া রুচি-বাগীশেরাই অস্বীকার করিবেন। ইহার স্বপক্ষে প্রমাণ ইউরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্য হইতে ভূরি ভূরি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, সমাজের অনুমোদন ও অননুমোদন আমাদের নীতি-বোধের অভ্রান্ত মান-দণ্ড বা পথ-প্রদর্শক নয়। সমাজের বিধি-নিষেধে যে নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা সুবিধাবাদ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নীতি-জ্ঞান বা স্বার্থ-সংরক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এমন অনেক অসাধারণ ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, যাহা সমাজের সাধারণ নীতিবোধ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের দাবী করিয়া থাকে, এবং এই জন্যই সমাজের সহিত তাহার সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে। আমাদের যে নীতি-বোধ সমাজ-বিধির অন্ধ অনুসরণে কুণ্ঠিতাগ্র ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে, তাহা এই ব্যতিক্রমের বিদ্রোহে আবার তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই এই জড়তাগ্রস্ত নীতিবোধকে সচেতন করিবার চেষ্টা। তারপর, উপন্যাস প্রধানতঃ মানুষের হৃদয়াবেগের কাহিনী; এবং হৃদয়াবেগের উচ্ছলিত প্রবাহ যে সকল সময় সমাজ-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, তাহা সমাজবিধির দিক্ দিয়া অসুবিধাজনক হইলেও, অনস্বীকার্য্য সত্য। সুতরাং নিন্দিত প্রেমের বর্ণনা অন্ততঃ দুই দিক্ দিয়া সমর্থনের দাবী করিতে পারে —(১) উচ্চতর নৈতিক আদর্শ; (২) অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ।

কিন্তু ইহা ছাড়া বাস্তবতার দিক্ দিয়া এই যৌন আকর্ষণের চিত্র আরও একটা সমর্থনের দাবী করিতে পারে। এ আকর্ষণের পিছনে যদি উচ্চতর নীতি ও হৃদয়াবেগ নাও থাকে, যদি চোখের নেশা ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ইহার একমাত্র উত্তেজক হেতু হয়, তথাপি জীবনে ইহা ঘটে বলিয়াই উপন্যাসে ইহার অবতারণা সমর্থন-যোগ্য। এই যুক্তির অনুকূলেও ইউরোপীয় নজীরের দোহাই পাড়া চলে। Flaubert এর Madam Bovary ও Zolaর অনেকগুলি উপন্যাস হৃদয়াবেগ একেবারে বর্জ্জন করিয়া খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসার ভাবে নর-নারীর যৌন আকর্ষণ বিষয়ক সমস্ত গ্লানিকর, অথচ অবিসংবাদিত তথ্যগুলি পুঞ্জীভূত করিয়াছে। ইহাদের পিছনে যে মনোবৃত্তি তাহাতে বিদ্রোহের উত্তাপ ও উত্তেজনা নাই, আছে শুষ্ক, আবেগহীন সত্য-স্বীকার, বৈজ্ঞানিকের কঠোর সত্য প্রিয়তা। মানুষের মধ্যে যে পাশবিকতা আছে, তাহাকে কল্পনায় রঙ্গীন ছদ্মবেশ না পরাইয়া, তাহার

নগ্ন স্বরূপকে মানিয়া লওয়াই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে অধিকাংশ এই শ্রেণীর লেখকই আত্মসমর্থনের জন্য এই শেষোক্ত যুক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসিকদের যথাযোগ্য বিচার করিতে হইলে এই সমস্ত যুক্তি তর্কের বিশ্লেষণ ও তাহার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যৌন-সাহিত্যের যে অংশ প্রথম দুইটী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের লইয়াই তীব্র মতভেদ আজকাল আর নাই ; প্রথম পরিচয়ের সন্দেহ ও অবিশ্বাস কাটিয়া গিয়া তাহাদের চিরন্তন সৌন্দর্য্য দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, বিরাজবৌ প্রভৃতি নায়িকা আমাদের শাশ্বত নীতিজ্ঞানের অনুমোদন ও সহানুভূতি পাইয়া উচ্চতর সাহিত্য-রাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে—যেমন 'গৃহদাহে' অচলার—এরূপ নিঃসংশয় নৈতিক অনুমোদনের অভাব—সেখানেও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রাবল্য ও আবেগ-গভীরতা সমাজনীতি উল্লঙ্ঘনের চিত্রকে বরণীয় না করিলেও, ক্ষমনীয় করিয়াছে। দুর্দ্দাম আবেগ ঠিক আদর্শস্থানীয় না হইলেও, আমরা ইহাকে অনেকটা ক্ষমামিশ্রিত সমবেদনার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতায় মানুষের জীবন যে সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপদ আশ্রয় হইতে স্খলিত হইয়া উন্মার্গ-গামী হইতে পারে, তাহা ক্রোধ ও অভিশাপবর্ষণ অপেক্ষা অশ্রুজল-স্নিগ্ধ সহানুভূতিরই অধিক দাবী করিতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপারে সমাজের, বিচারকের রক্ত চক্ষু, বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও শ্রদ্ধা ও সমবেদনায় কোমল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আসল সমস্যা হইতেছে তৃতীয় যুক্তি লইয়া—কেবল বাস্তবানুগামিতা আমাদের দেশে কুৎসিত যৌন-সাহিত্য সৃষ্টিকে সমর্থনযোগ্য করিতে পারে কি না।

এই তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের সমর্থনে ইউরোপীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত ও ফ্রয়েডের যুগান্তরকারী মনস্তত্ত্ব-মূলক আবিষ্কার (psycho-analysis) উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফ্রয়েডের মতে মানুষের প্রায় সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টাই মগ্ন-চৈতন্য-নিরুদ্ধ কাম প্রবৃত্তির অজ্ঞাত প্রেরণাতেই অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং মনুষ্য-জীবনে যৌন আকর্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া বা কামপ্রবৃত্তির দুর্ব্বার সঙ্কেতকে স্ফুটতর করিয়া তোলা বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়। ইহাতে ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই দিয়া যিনি আপত্তি করিবেন, তাঁহার আপত্তি সত্যেরই বিরুদ্ধতাকারী, সত্যের প্রতি অসহিষ্ণুতা। এই যুক্তিতে আমাদের কোনও কোনও লেখকের মধ্যে যে নির্লজ্জ, নিরাবরণ যৌন আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের চিত্র পাওয়া যায়, তাহাকে সমর্থন করা যায় কি না সন্দেহ। ফ্রয়েডের তথাকথিত আবিষ্কার অনেকটা অনুমান-সিদ্ধ ও এখনও পরীক্ষাধীন ; ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বপ্রকৃতির লোকের জীবন-রহস্যের পর্য্যাপ্ত ব্যাখ্যা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। ইহার সর্ব্বজনীন প্রযুজ্যতা মানিয়া লইলেও, ইহা উপন্যাসিকের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও কার্য্যপ্রণালীকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে কিনা তাহাও সন্দেহস্থল। নিরুদ্ধ কাম-প্রবৃত্তি যদি সত্য সত্যই আমাদের সমস্ত মানস প্রচেষ্টার গোপন শক্তির-উৎস হয়, তাহা হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য এই

অদৃশ্য, অলক্ষিত প্রভাবের জন্য কেন ক্ষুণ্ণ হইবে? হৃদয়ের অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহস্য-গুহায় অবতরণ করিয়া মনের গূঢ় মূলগুলিকে টানিয়া বাহির করায় ঔপন্যাসিক রস কিরূপে সমৃদ্ধি লাভ করিবে? যেখান হইতে সূর্য্যালোকের আরম্ভ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও উচ্চ-নীচ প্রবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশ, সেখান পর্য্যন্তই ঔপন্যাসিকের রাজ্যের শেষ সীমা। যে দার্শনিক মতবাদ মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী যাহা ভগবান, নিয়তি বা কোন অন্ধ সহজ প্রবৃত্তি (instinct)—ইহাদের মধ্যে যে কোনটীকে মানবের ভাগ্য-নিয়ামক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহার ছায়াতলে উপন্যাসের প্রফুল্ল পাপড়িগুলি শীর্ণ বিশুষ্ক হইয়া যায়। তথ্যানুসন্ধানের সব কয়টা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অনুমানের অতল সূর্য্যালোকহীন গহ্বর পর্য্যন্ত ঔপন্যাসিককে যে বৈজ্ঞানিকের সহযাত্রী হইতে হইবে, এরূপ কোন বিধান এখনও তাহার পক্ষে অবশ্য-পালনীয় হয় নাই। মানব প্রকৃতির যে মূল অন্ধকারে আত্মগোপন করে, আর যে ফুল আলোকে বাতাসের মধ্যে তাহার সৌন্দর্য্য ও সুরভি মেলিয়া ধরে—ইহাদের কোনটী যে ঔপন্যাসিকের নিকট অধিক প্রার্থনীয়, এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ বিলম্ব হয় না।

এখন ইউরোপীয় সমাজের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ইউরোপীয় সমাজে, আমাদের সহিত তুলনায়, নরনারীর মধ্যে যৌন মিলন সম্বন্ধে যে শিথিলতা ও ও প্রচুরতর অবসর আছে তাহা তথাকার সমাজ ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইউরোপীয় নর-নারীর সম্বন্ধ সামাজিক মিলন ও বন্ধুত্বের মধ্যদিয়া কত শীঘ্র ঘনিষ্টতম আকর্ষণে রূপান্তরিত হয় ও কিছুদিন পরে কিরূপ আবার পূর্ব্বতন ঔদাসীন্যে বিলীন হয়, তাহার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইহা যেন ভাবের তাপ-মানে সামান্য কয়েক ডিগ্রী উত্তাপ উঠা নামার মতই সাধারণ ঘটনা। আমাদের দেশে যুগ-যুগান্তরের সংস্কার, ধর্ম্মবিশ্বাস ও লোকমত দৈহিক মিলনের পথে যেরূপ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধার সৃজন করে, সেখানে সেরূপ কোন প্রবল অন্তরায়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ইউরোপীয় উপন্যাসে যৌন মিলন দেশের সাধারণ মেলা-মেশার সঙ্গে ছন্দের সমতা রাখিয়াই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে যাহারা অসংবরণীয় আবেগের জন্যই হউক বা চিন্তাধারার সাম্যমূলক সহানুভূতির জন্যই হউক, ক্ষণ-স্থায়ী অবৈধ বন্ধনে সংযুক্ত হয়, তাহাদের সমস্যা আমাদের দেশের মত এত জটিল ও সমাধান-হীন নহে। সমাজের উদারতা ও নূতন জীবন-যাত্রার সম্ভাবনীয়তা সকল সময়েই তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথটী খোলা রাখে সুতরাং এই জাতীয় সম্বন্ধ-গ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা আমাদের সহিত তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া, সমাজের চক্ষে এই নৈতিক পদস্খলন খুব একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ার জন্য বহুচারিণী নারীও সমাজে তাহার সম্ভ্রম-মর্য্যাদা হারায় না। সুরুচি ও সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনে, সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতি ও আলোচনার মধ্যে সে তাহার জীবন কাটাইয়া দিতে পারে। কলঙ্ক কালিমা তাহার দেহে ও আত্মায় চিরকালের মত লিপ্ত হইয়া থাকেনা। আরও একটা দিক দিয়া ইউ-রোপীয় সাহিত্যে যৌন মিলনের সুলভতা বিচারণীয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, রোম্যা

রোলাঁর নায়ক জঁ্যা ক্রিষ্টফের ন্যায়—উচ্চাঙ্গের প্রতিভা সম্পন্নও আদর্শবাদ পরায়ণ ব্যক্তিও যেন নিতান্তই অনায়াসে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়াছেন—অনেকটা আমাদের বেদ পুরাণ-বর্ণিত মুনি-ঋষির ন্যায়। ইঁহাদের পক্ষে এই অভিজ্ঞতাটুকু তাঁহাদের শিল্পিজীবনের মধ্যে উষ্ণ ভাব-প্রবাহ, উত্তেজিত রক্তধারা সঞ্চারিত করিয়া তাহার উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয়। তারপর ইঁহাদের জীবনের প্রসার এত অধিক ও বহুমুখী, ইহার গতিবেগ এত প্রবল, যে এক আধটু কলঙ্ক স্পর্শ—এই প্রবল জীবন-প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হইয়া ধুইয়া মুছিয়া যায়। ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার খণ্ডের উপর বায়ু-প্রবাহের ন্যায় অভিজ্ঞতা বৈচিত্রও গভীর আলোড়ন ইঁহাদের সৃষ্টিশক্তিকে দীপ্ততর করিয়া থাকে। যেখানে স্রোত নাই, যেখানে তল দেশের পঙ্ক লইয়া নাড়াচাড়া করিলে জল সমল ও কলুষিত হইয়া উঠে মাত্র—স্রোতোহীন জীবনে পাশবিক প্রবৃত্তির অতি-প্রাধান্য সমস্ত আকাশ বাতাসকে পূতিগন্ধময় করিয়া তোলে।

এই আলোচনা হইতে ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শ আমাদের দেশে কতখানি প্রযুজ্য, তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে। এখানে দীর্ঘদিনের সংস্কারকে ছিন্ন করিতে যে পরিমাণ দুর্দ্দমনীয় আবেগ ও প্রবল আত্ম-বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, ঔপন্যাসিক তাহা নিজ উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিতে বাধ্য। সুতরাং এক শ্রেণীর আধুনিক উপন্যাসে পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে, কর্জ্জন-পার্কে বোটানিক্যাল গার্ডেনে, এমনকি শিক্ষা-মন্দিরের দ্বারদেশে যে নির্লজ্জ ও অহেতুক প্রণয়লীলা পথিপার্শ্বস্থ তৃণগুল্মের জঙ্গলের মতই গজাইয়া উঠিতেছে, তাহা নীতি হিসাবে যাহাই হউক, বাস্তবতা হিসাবেই সমর্থন যোগ্য নহে। তরুণ তরুণীর সাক্ষাৎমাত্রই যে দৈহিক সম্পর্কের জন্য লোলুপতা জাগিয়া উঠিবে, ইহা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও আর্টের দিক্ দিয়া স্বাভাবিকতার দাবী করিতে পারে না। যদি বলা যায় যে, জীবনে এরূপ ঘটিয়া থাকে, তথাপি জীবনে যাহা কেবলমাত্র আকস্মিক বা সহজ প্রবৃত্তি প্রণোদিত, তাহা উচ্চাঙ্গের আর্টের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এরূপ মিলনের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি ফুটাইয়া না তুলিলে, আকর্ষণের সূত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ না করিলে তাহা আর্ট হিসাবে অসার্থক থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়কে আধুনিক উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের অতি-প্রচলনের উৎস-মূল বলা যাইতে পারে। বৌ-দিদির প্রতি প্রেমাকর্ষণ, যাহা আধুনিক ঔপন্যাসিকের অতি মুখরোচক বিষয় এবং যাহার উপর শনিবারের চিঠির তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্র বর্ষিত হইয়াছে, ইহার উপজীব্য বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানব সুলভ সহজ প্রবৃত্তিকেই এই আকর্ষণের একমাত্র হেতু বলিয়া ধরিয়া লন নাই। তিনি অমল ও চারুর সম্পর্কে কিরূপে ধীরে ধীরে অথচ অনিবার্য্যরূপে কলুষিত আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে সবিস্তারে চিত্রিত করিয়াছেন—ভূপতির নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য ও অমল ও চারুর সাহিত্য চর্চ্চার ভিতর দিয়া ক্রম-বর্দ্ধমান নিবিড় মোহ বর্ণনার দ্বারা চিত্রটা স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। আবার আত্মসমর্পণের শেষ পিচ্ছিল সোপানে পদক্ষেপ করিয়া অমলের হঠাৎ বিবেক সঞ্চার ও তাহার অটল কঠোর সংযম মনস্তত্ত্বের দিক্

দিয়া গল্পটির উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা উদাহরণটী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিষয়টীকে গ্রহণযোগ্য করিতে যে পরিমাণ নিপুণতা, সুরুচিজ্ঞান ও কলা সংযমের প্রয়োজন তাহার অনুশীলন করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

অবশ্য ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, কোন বিষয় যে স্বতঃই বর্জ্জনীয় তাহা নহে। অবৈধ প্রেমের মধ্যে যে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রবল আবেগ সঞ্চিত হইয়া উঠে তাহা ঔপন্যাসিকের পরম প্রার্থনীয়। এই সমস্ত বিষয় বিচারে যদি আমরা খুব গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণ নীতিবাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকি, তবে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রসাস্বদন হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিব ও আমাদের রসোপলব্ধির শক্তি শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইবে। জীবনে প্রেম একটা জলন্ত সত্য; সংস্কারগত নীতিবোধের খাতিরে তাহাকে অস্বীকার করিলে জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। জীবনে যাহা উচিত কেবল তাহাই যদি ঘটিত, তবে তাহার বৈচিত্র ও দুর্জ্ঞেয়তা, তাহার অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর বিকাশগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সুখের বিষয়, আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা যৌন আকর্ষণ সম্বন্ধে খুব খোলাখুলি আলোচনার দ্বারা আমাদের সত্যসহিষ্ণুতা ও দুর্ব্বলনীতি সঙ্কোচ অনেকখানি অপসারিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে ধরণের অভিযোগ শোনা যাইত—যথা মন্দিরমধ্যে প্রেমের উদ্ভব অসম্ভব, বা কোন ক্ষেত্রেই পতিব্রতা নারীর পতিগৃহত্যাগ অবিধেয়—তাহা এখন চিরতরে স্তব্ধ হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা নীতিভয়গ্রস্ত শৈশব অতিক্রম করিয়া স্বাধীন চিন্তার যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি এইরূপ দাবী নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইবে না। তবে আমাদের সাবধানে থাকিতে হইবে যেন আমাদের নবার্জ্জিত দৃপ্ত যৌবন অতি শীঘ্র, অক্ষম লোলুপতার ঘৃণাস্পদ, কুৎসিত স্মৃতির রোমন্থনে নিস্তেজ অকাল বার্দ্ধক্যে পর্য্যবসিত না হয়। আগুণ লইয়া খেলা করিতে গিয়া যেন আমরা দেহ-মনকে কেবল ভস্মকালিমালিপ্ত না করিয়া বসি। সামাজিক আবেষ্টন অনুকূল না হইলে নরনারীর মধ্যে স্বাধীন, অবাধ প্রেম জন্মিবার অবসর পায় না—এবং যদিও ধীরে ধীরে সমাজরীতি এই আদর্শের দিকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তথাপি সাহিত্যের উপর এই পরিবর্ত্তনের প্রভাব সংক্রমিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয়। কেবল রীতির অনুবর্ত্তনের জন্য, ইতর রুচির পরিপোষণার্থ, কেবল গতানুগতিক ভাবে এ সাহিত্য সৃষ্ট হইবার নয়; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর ধ্বনিত না হইলে ইহা ইহার প্রধান সমর্থন হইতেই বঞ্চিত হয়। বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার যোগ্যতা সকলের নাই। এই সত্যটী মনে জাগ্রত থাকিলে সাহিত্য ও সমাজ উভয়েরই মঙ্গল।

আধুনিক গল্প-সাহিত্য

(বনফুল)

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগ সম্মিলনের যুগ। সাহিত্যিকগণকেও মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া সপ্রমাণ করিতে হয় যে তাঁহারাও এ যুগের অযোগ্য নহেন। ভাবিতেছি দেশের সমস্ত পাখী কিম্বা নদীনদ যদি যুগধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্মিলিত উৎসাহে নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতে উদ্বোধিত হইত তাহা হইলে কি বিরাট ব্যাপারই না হইত। কিন্তু হায়, তাহা হইবার নহে—কারণ উহারা মনুষ্য নহে। মানুষই দল বাঁধিতে ভালবাসে। যখন ছাপাখানা হয় নাই তখন সাহিত্যিককে আত্মপ্রচার করিবার জন্য দল গঠন করিতে হইত। সাহিত্য জিনিসটা যদিও নির্জ্জনেই বিকশিত হয়, কিন্তু বিকশিত হইবামাত্রই জনতার দিকে তাহার স্বাভাবিক গতি। স্রষ্টা আপন সৃষ্টিকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। লুকাইয়া রাখিতে চায় না। সেইজন্য যখন ছাপাখানার সুবিধা ছিল না তখন কবিকে দল গঠন করিতে হইত, নাট্যকারকে যাত্রার জনতার উপর নির্ভর করিতে হইত, সুবক্তা সুগায়ক সকলেই সাহিত্যিক সহযোগে সানন্দে সম্মিলিত হইতেন।

এখন কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগ। এখন কবি বা সাহিত্যিককে দল বাঁধিয়া সাহিত্য-প্রচার করিতে হয় না। মুদ্রাযন্ত্র সে ভার লইয়াছে। বর্ত্তমানে সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে—মাসিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য নানাবিধ সাময়িক পত্রিকার মারফৎ, এবং এইসব সাময়িক পত্রিকাগুলির ক্ষুধা এত প্রচণ্ড যে ইহাদের উদরপূর্ত্তি করিতেই সাহিত্যিকগণকে অনেক সময় দেউলিয়া হইয়া যাইতে হয়; সম্মিলনে পাঠ করিবার উপযোগী ভাল সাহিত্যিক রচনা সঞ্চয় করিয়া রাখা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যিক সম্মিলনে 'সম্মিলন' জিনিসটাই মুখ্য। এই সম্মিলনে ভাল প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি যেমন আমাদের সম্মানিত করিয়াছেন—তেমনই অসুবিধাতেও ফেলিয়াছেন। প্রথমেই সমস্যায় পড়িলাম—কি লিখি! নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের ওজন করিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হইল।

সাধারণতঃ যেসব প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকে তাহা লেখা আমার সাধ্যাতীত। "গীতার ভাষ্য" বা "মোগল হারামে বৈষ্ণব প্রভাব" অথবা "বালীদ্বীপের উদ্ভিদ্" জাতীয় প্রবন্ধ লেখার মত বিদ্যা আমার নাই।

সামাজিক কোন সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে যাওয়া আরও বিপজ্জনক। কারণ সামাজিক সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত এবং ইহাও আমরা

সকলে জানি যে এদেশে রাজনীতি প্রজানীতি নহে। সুতরাং সাহিত্য-সভায় ওসব সমস্যা না উত্থাপন করাই ভাল।

একবার ভাবিলাম রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কিছু আলোচনা করি। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আলোচনা করাটা একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অজস্র স্তুতিবাদ করিতে করিতে রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে কিছু কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসার সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দেওয়া যত সহজ, আবার বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বিদেশী সাহিত্য-সমালোচকগণের নিকট হইতে ধার-করা বুলি আওড়াইয়া রবীন্দ্রনাথকে নিন্দার নিম্নতম নরকে নামাইয়া দেওয়াও তত সহজ। উপরোক্ত কোন প্রকার কার্য্যের জন্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অন্তত পল্লবগ্রাহিতার যথেষ্ট সুযোগ আছে। হয়তো "রবীন্দ্র-কাব্যে অতীন্দ্রিয়বাদ" কিম্বা "রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা" লইয়াই আমি একটা উচ্ছ্বাস রচনা করিতাম। করিলাম না—কারণ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলা—আধুনিক বাঙলা সাহিত্য যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনার কি আছে! এ সম্বন্ধে যে কোন সময়ে ও যে কোন স্থানেই দুই চারি কথা বলা প্রাসঙ্গিক।

সুতরাং লিখিতে সুরু করিলাম—

"বাঙালীর ক্ষুদ্রপরিসর জীবনের প্রতিচ্ছবিই মুখ্য ও গৌণভাবে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই রূপ-সজ্জার অধিকাংশ উপকরণ আবার বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। শুধু আধুনিক কেন, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যটাই একটা সঙ্কীর্ণ সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যে নাম করিবার মত কয়টা বৃহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হইয়াছে? বৃহৎ উপন্যাস বলিতে বুঝি একটা বৃহৎ শহরের মত সৃষ্টি। তাহাতে যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপথ আছে, আকাশচুম্বী কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদ আছে, প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন মন্দির মিনার আছে, সুসজ্জিত বাগান, সুনির্ম্মল পুষ্করিণী, সুরক্ষিত প্রান্তর, সুবিন্যস্ত পণ্যবিপণি আছে, তেমনই আবার পোড়ো বাড়িও আছে, গলিঘুঁজিও আছে—নর্দ্দমা নালাও আছে। ধনী আছে—ভিখারীও আছে। পুণ্যাত্মাও আছে—পাপীরও অভাব নাই। সত্য, শিব এবং সুন্দরের সহিত অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের নিত্য দ্বন্দ্বে তাহা স্পন্দমান। এইরূপ উপন্যাস কয়টা আছে আমাদের? একটাও নাই। নাই, তাহার কারণ আমাদের জীবনে বৃহৎ শিক্ষা ও বৃহৎ দুঃখ একসঙ্গে এখনও আসে নাই। সুশিক্ষিত মন দুঃখের আবেষ্টনীতে পড়িলে তবে বৃহত্তের দর্শন পায়। আমরা এখনও সুশিক্ষিতও হই নাই এবং চরম দুঃখও এখনও আমাদের জীবনে আসে নাই।

ডষ্টয়েভ্স্কি, চার্লস ডিকেন্স অথবা ম্যাক্সিম গোর্কির আবির্ভাবের জন্য আমাদের এখনও নিদারুণ তপস্যার প্রয়োজন আছে। সৌখীন দারিদ্র্য অভিনয়ে বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না—বৃহৎ উপন্যাস তো নয়ই। আমরা উপন্যাস বলিয়া সাধারণত যাহা পড়িতেছি ও লিখিতেছি তাহা বড় ছোট গল্পমাত্র। উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বৃহত্ত্ব তাহাতে নাই।

সত্যকার ছোটগল্পও আমরা সৃষ্টি করিতে পারিতেছি না। কারণ ছোটগল্প-রসিক পাঠক পাঠিকা আমাদের দেশে কম। এক গাদা পান্তা ভাত খাইয়া যাহার তৃপ্তি হয়, সে একটি আঙুর কিম্বা একটি আপেল খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং এক গাদা পান্তা ভাতের সহিত মিশাইয়া আঙুর বা আপেলের টুকরা চালাইতে হইতেছে। তাহা ছাড়া গল্প-সাহিত্যের আর একটা দুর্দ্দশার কারণ আমার মনে হয় সম্ভবত এই যে, এদেশে গল্প-সাহিত্যের পাঠক অপেক্ষা পাঠিকার সংখ্যাই বেশী। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষাও এখনও খুব উচ্চস্তরে উঠে নাই। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের স্বল্পশিক্ষিতা পাঠিকাগণের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও রসবোধের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক বাঙলা গল্প-সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য, অশিক্ষিত-মন-রোচক ও লঘু হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই মাসিকপত্রের কাটতি দেখিয়া। যে মাসিকপত্র সর্ব্বাপেক্ষা বেশি বিক্রয় হয়, সাহিত্যিক আদর্শ তাহাতে কতটা অনুসৃত হয়?

আরও দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত সমালোচনা বলিয়া কিছু হয় না। একটাও এমন নিরপেক্ষ ভাল সাহিত্যিক পত্রিকা এদেশে নাই যাহার সমালোচনার প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আছে। সমালোচনা করিতে বসিলেই বাঙালীর পরনিন্দাপ্রবণতা বা চক্ষুলজ্জা আসিয়া সমালোচন-সাহিত্যকে একদেশদর্শী করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনায়—"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলাম এমন সময় দেখিলাম, এক জোড়া নির্ম্মম চক্ষু নিষ্পলকভাবে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে চাহনিতে ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটির মালিক অপর কেহ নহে, আমারই বিবেক। বিবেকের কণ্ঠস্বরও ক্রমশ শোনা গেল। শুনিলাম বিবেক বলিতেছে—

"তুমি বিশ্ব-সাহিত্যের কতটুকু খবর রাখ হে বাপু? তোমার বিদ্যা তো আমার অবিদিত নাই। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেই বা তোমার জ্ঞান কতটুকু এবং তাহা লইয়া সমালোচনা করিবার অধিকারই বা তোমাকে কে দিল? আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করা কি কোন আধুনিক লেখকের পক্ষেই শোভন, না, সম্ভব? এইসব আলোচনা করিবার অছিলায় তুমি তো শুধু নিজের ঢাকটাই পিটাইতেছ! ভাল করিয়া ভাবিয়া বল দেখি বাপু, ইহার মূলে তোমার পরশ্রীকাতরতা ও শস্তায় নাম কিনিবার লোভ আছে কি না?"

দমিয়া গেলাম।

আমার বিবেক অপর পক্ষ হইতে ঘুষ খায় নাই তো? কিন্তু ঘুষই খাক আর যাই করুক, বিবেকের উপর কথা বলা চলে না; সুতরাং আমাকে লেখনী সম্বরণ করিতে হইল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে একজন অতি-আধুনিক গল্পরচয়িতা আসিয়া আমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি আসিয়া অতীব আগ্রহে তাঁহার স্বরচিত একটি গল্প আমাকে শুনাইলেন। আজিকার এই সাহিত্যিক মজলিশে আপনাদের সেই গল্পটি শুনাইব। গল্পটি আধুনিকতম কোথাও এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

"এক ছিল রাজা আর তার ছিল এক রাণী।

সেদিন ভোরবেলা উঠেই রাজা ছুটে বাগানে চলে গেল। বাগানে গিয়ে দেখলে, গাছে বেশ সুন্দর লাল লাল জবাফুল ফুটেছে। সে বাগান থেকে একটা টকটকে লাল জবাফুল তুলে নিয়ে এল। ফুলটা নিয়ে এসে রাণীকে বললে—'দেখছ কেমন সুন্দর ফুল এনেছি একটা—'

রাণী বললে—'বেশ সুন্দর—আমাকে দাও।'

রাজা ফুলটা দিতেই রাণী দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে একটা ফুলদানি নিয়ে এল। তারপর ফুলদানিতে ফুলটা রেখে রাজা-রাণী দুজনে উবু হয়ে বসে ফুলটাকে দেখতে লাগল। তারপর রাজা বললে—'চল ফুলটাকে টেবিলে রাখি।' রাণী বললে—'না—এইখানেই থাক—'

দুজনে খুব তর্ক হতে লাগল। ঝগড়া করতে করতে বেলা অনেক বেড়ে গেল।

ঠাকুর এসে বললে—'রান্না হয়ে গেছে।'

দুজনে তখন উঠে স্নান করে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফুলটা মেঝেতেই পড়ে রইল।

ঘুম ভেঙে উঠে রাজা গেল বেড়াতে। মাঠে গিয়ে দেখে একটা শেয়াল। রাজা তাকে ধরবার জন্য ছুটল। রাজাও ছুটছে—শেয়ালও ছুটছে। রাজার সঙ্গে শেয়াল পারবে কেন? রাজা এক ছুটে গিয়ে দৌড়ে শেয়ালটাকে টপ করে ধরে ফেললে, তারপর কান ধরে টান্‌তে টান্‌তে সেটাকে বাড়ী নিয়ে এল। নিয়ে এসে মস্ত একটা খাঁচার ভেতর পুরে তাকে রেখে দিলে।

রাণী এসে বললে—'আহা বেচারি যদি মরে যায়!'

রাজা বললে—'একটু দুধ দাও না ওকে।'

রাণী শেয়ালটাকে একটা মাটির ভাঁড়ে করে দুধ এনে দিলে। শেয়ালটা চুকচুক করে খেতে লাগল। তারপর রাজা-রাণীও খাওয়া-দাওয়া সেরে খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। রাত হয়ে গেল।

তার পরদিন রাজা-রাণী উঠল।

রাণী চা করে দিলে, রাজা খেলে।

তারপর রাজা পাড়ায় বেরুলো। বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক ক্যালেণ্ডারের ছবি রাজা জোগাড় করলে। সুন্দর সুন্দর বড় বড় সব ছবি। ছবিগুলো এনে টেবিলে রেখে রাজা ছুটে বাগানে চলে গেল। গিয়ে অনেক জবাফুল তুলে আনলে। তারপর রাজা-রাণী দুজনে মিলে ছবি আর জবাফুল নিয়ে ঘরের সমস্ত দেওয়াল সাজাতে লেগে গেল। সাজাতে সাজাতে সন্ধ্যে হয়ে এল। সমস্ত দিন খাওয়াই হল না।

সন্ধ্যেবেলা দুজনে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে—আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেছে।

তার পরদিন সকালবেলা উঠেই রাজা বাড়ির পেছন দিকে যে পেয়ারাগাছটা ছিল তাতে গিয়ে উঠল। একটু পরে রাণীও এসে উঠল। দু'জনে মিলে বেশ মজা করে পেয়ারা খেতে লাগল। অনেক পেয়ারা ছিল সে গাছটাতে। দুজনে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, খেয়েই যাচ্ছে। পেয়ারা আর ফুরোয় না। শুধু পেয়ারা নয়, পেয়ারা পাতাও চিবুতে লাগল দুজনে।

রাণীটা এমন দুষ্টু, রাজার হাতে একটা বড় ডাঁশা পেয়ারা দেখে টপ করে সেটা কেড়ে নিলে। রাজাও অমনই রাণীর গালে ঠাস করে এক চড় দিলে। রাণীও রাজার গালে খামচে দিলে। দুজনে আড়ি হয়ে গেল। রাণী সে গাছ থেকে নেবে গিয়ে আর একটা গাছে উঠল।

রাজা একটু পরে রাণীকে ডাকলে—'আয় ভাই, ভাব করি!'

রাণী রাজি হয় না।

রাজা তখন নিজের গাছ থেকে নেবে রাণীর গাছে গিয়ে উঠে রাণীকে আরও অনেক ভাল পেয়ারা দিয়ে ভাব করলে। ভাব হবার পর দুজনে পেয়ারাগাছের ডালে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেক পেয়ারা খেতে খেতে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে লাগল। একটু পরে দুজনে গাছ থেকে নেমে এল—নিয়ে এসে খাঁচার শেয়ালটাকে দিলে। শেয়ালটাও মজা করে পেয়ারা খেতে লাগল।

বিকালবেলা রাজা বন্দুক হাতে করে বেরুলো। একটু পরে অনেক পাখী শিকার করে নিয়ে এল। বড় বড় সব হাঁস। রাণী নিজে হাতে মাংস রান্না করলে। রাজা বললে, চল ছাতে বসে খাওয়া যাক। ছাতে ওঠবার একটা সিঁড়ি ছিল। রাজা সেটা দিয়ে না উঠে এক লাফে ছাতে গিয়ে উঠল। রাণী বাসনকোসন বয়ে সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে লাগল। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে রাজা আবার এক লাফে ছাত থেকে নেমে এল। নেমে এসে মাংসের হাড়গুলো শেয়ালটাকে দিলে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গল্পকার চুপ করলেন।

আমি বলিলাম, "তারপর?"

"তারপর রাজা একদিন একটা বাঘ ধরে আনলে, আর একদিন একটা টিয়াপাখী—"

তাঁহার উৎসাহ আবার সঞ্জীবিত হইতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আচ্ছা, থাক—আজ আর শুনব না—কাল শুনব।"

এই গল্পটি বাস্তব কি অবাস্তব, সুন্দর কি কুৎসিৎ, ভূ-ভারতে এরূপ কোন রাজকীয় দম্পতি থাকা সম্ভবপর কি না সে বিচার আপনারা করুন, বিশ্ব-সাহিত্যে এ গল্পের স্থান হইবে কিনা জানি না, আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে গল্পটি আমি উপভোগ করিয়াছি। ইহার রচয়িতার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর, নাম অসীম মুখোপাধ্যায়, আমার পুত্র। এখনও তাহার হাতেখড়ি হয় নাই, অথচ তাহার কল্পনা রাজা-রাণীর জীবনযাত্রা লইয়া গল্প রচনা করিতেছে, যদিও রাজা-রাণী সে এখনও দেখে নাই।

ইহাই তো আধুনিকতম সাহিত্য। "বনফুল"

ঘুমপাড়ানি গান

শ্রীঅখিলচন্দ্র নিয়োগী

শিশুরা যখন মোয়া-মুড়কীতে আর ভোলে না—তখন তাদের জন্যে লিখতে হয়—শিশু-সাহিত্য। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প, পক্ষীরাজের গল্প, সাত সমুদ্দুর তের নদীর কাহিনী, মায়াপুরী, মায়াদানব আরো কত কী!

কিন্তু এই অধ্যায়ের পূর্ব্বে শিশুদের জন্যে সকলকার আগে যে অধ্যায় আছে—তা হ'চ্ছে শিশুকে লালন-পালনের অধ্যায়। মায়েরা শিশুকে ঘুম পাড়ায়। তার জন্যে প্রয়োজন ঘুম পাড়ানি গান। এই ঘুম পাড়ানি গান—সাহিত্যিকেরা রচনা করেন না—সে তৈরী হয় মায়েদের মুখে মুখে—!

বাঙলা দেশে যেমন বর্গীর ভয় দেখিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো হয়—তেমনি সব দেশেই ঘুম পাড়ানি গানের প্রচলন আছে। সম্প্রতি আমি নানান্ দেশের ঘুম পাড়ানি গান সংগ্রহ করে তা' বাঙলায় অনুবাদ করেছি।

সেই ঘুম পাড়ানি গান সম্পর্কেই আমি একটু আলোচনা করতে চাই।

ইংলণ্ডের ঘুম পাড়ানি গানকে অনেকটা Nonsense Rhyme বলা চলে। আমাদের দেশের যেমন আবোল-তাবোল কবিতা—ঠিক তেম্‌নি। গানটি—

[ইংলণ্ড]

সবুজ দোলায় চেপে খোকা
দোলে দোদুল দুল্!
বাপ-মা তাহার রাজা-রাণী
নয় ত তাহা ভুল!
আংটি সোণার হাতে পরে
কোন্ বালিকা যায়—
জনি যাহার নাম—সে যে গো
রাজার ঢাক বাজায়!

ওয়েল্‌সের মায়েরা ছেলেকে লালন-পালন করাকেই জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা ছেলে বড় হ'লে সেই এসে দেশের সিংহাসনে বস্‌বে। কাজেই ছেলের সব কাজ তাঁরা নিজের হাতে করতে ভালোবাসেন। গানটি এই—

[ওয়েলস্]

আমি তাহার দোল্‌না দোলাই—
নিজ হাতে ঘুম পাড়াই তাকে—
গান গেয়ে তায় আপনি ভোলাই—
বল্ দেখি তায় আর কে রাখে!

কাল সারারাত কান্না কি তার—
আধখানা রাত কাট্‌ল তাতে—
ঠিক জানি হয় জাগতে মাতার—
ঘুম পাড়ালুম আপনা হাতে!
নিজে হাতে পাল্‌ছি তাহার—
সকাল দুপুর সাঁঝে বেলা—
কিসে হঠাৎ কান্না লাগায়
জানি তাহার কখন খেলা।
লালন-পালন এমনি ভাবেই
করলে হ'বে মস্ত ছেলে—
ঠোঁট দুটি তার বল্‌তে পাবেই
রাজ-ভাষা সে শিখতে পেলে!
যখন সে মোর বস্‌বে এসে
এই এ দেশের সিংহাসনে
শিখুক ভাল বাস্‌তে দেশে—
নাই বা আমায় রাখল মনে!

ছেলের জন্যে সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন—আয়র্ল্যাণ্ডের মায়েরা। কিন্তু তারি ভেতর তাঁদের মার্জ্জিত রুচি এবং শিল্প জ্ঞানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মত এদেশের মায়েরাও কাঁথা শেলাই করতে অভ্যস্ত। সে কথা তাদের ঘুম পাড়ানি গানেই ধরা পড়বে—

[আয়র্ল্যাণ্ড]

ঘুম পাড়িয়ে রাখবো আমার সোণার খোকন টুক্—
যেমন তেমন রাখবো নাকো তায়—
অবুঝ মায়ে যেমন করে দেয় ছেলেরে দুখ
ভাবতে আমার পরাণ ফেটে যায়।

হলুদ রঙের কাঁথায় ঢাকিয়া রাখিব চাদর তলে—
সোণার দোলায় শোয়াবো, বাতাস দোলাবে নানান্ ছলে!

রসে ভরা তুলতুলে গাল দুটি তোর
ওরে মোর যাদু বাছা, ওরে শিশু মোর।
ঘুম পাড়িয়ে রাখবো খোকায় আমার প্রাণের বীণ
কেমন করে রাখবো শোনো তাই—

দুই বড়দিন মাঝখানে এক রৌদ্র উজল দিন

এর কারণেই রইল তোলা ভাই!

সোণার দোলায় দোলাবো তাহারে সম জমি রবে নীচে

ছায়া ঢাকা শাখা উপরে রহিবে, বাতাস বহিবে পিছে।

ঘুমাও আমাও প্রাণের দুলাল ঘুমাও খোকন মোর

আপদ বিপদ রৈবে নাকো তায়—

দেখতে যেন পাইগো তোমার ভাঙলে ঘুমের ঘোর

স্বাস্থ্য অতুল হাস্য উথলায়!

ঘুমাও আমার প্রাণের দুলাল, ঘুমাও খোকন মোর

ঘুমাও এবার মধুর স্বপন ছায়

দেখতে যেন পাইগো তোমার ভাঙলে ঘুমের ঘোর

স্বাস্থ্য অতুল হাস্য উথলায়!

তোমার স্বপনে যেন নাহি থাকে দুঃখ ব্যথার লেশ

পুত্র হারায়ে জননী তোমার যেন নাহি পায় ক্লেশ

রসে ভরা তুল্‌তুলে গাল দুটি তোর

ওরে মোর যাদু বাছা, ওরে শিশু মোর!

স্কট্‌ল্যাণ্ডের গরীব মা তার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে এই বলে দুঃখু কচ্ছে যে গরীবের ঘরে তুই এসেছিস—তোর হাতে দিতে পারি এমন আমার কিছুই নেই। পাতার বিছানায় তোকে শুইয়ে রেখেছি—ওখানেই তুই ঘুম আয়! গানটি এই রকম—

[স্কট্‌ল্যাণ্ড]

তোরে নিয়ে মোর প্রাণ বল্‌ কি করে'

কি করিতে এলি এই আঁধার ঘরে।

তোর হাতে দিতে পারি সে ধনত' নাই—

কি করিব তোরে নিয়ে ভাবি যে সদাই।

পাতার বিছানা 'পরে শোয়ায়ে রাখি

আয় সোনা ঘুম আয় দু' চোখ ঢাকি।

গ্রীস দেশের মায়েরা বোধকরি ফুল বিলাসী। তাই ফুল দিয়ে তাঁরা ছেলেকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চান এবং ফুলের লোভ দেখিয়েই তাদের ঘুমুতে বলেন। গ্রীস দেশের ঘুম পাড়ানি গান এই রকম—

[গ্রীস]

ঘুমাও আমার সোনার খোকন মধুর স্বপন ছায়—

মা যে তোমার নদীর ধারে জল আনিতে যায়!

তীর হ'তে তার আস্‌বে নিয়ে ফোটা ফুলের রাশ
সলিল যাহার স্ফটিক সম বইছে বার মাস !

কস্তুরীরই বাস যে তাতে ভুর ভুর ভুর ভুর—
আন্‌বে আরো গোলাপ কুঁড়ি গন্ধ সুমধুর !

ফ্রান্স হচ্ছে বিলাসিতা ও অতি আধুনিকতার লীলাভূমি। কিন্তু এই দেশের গেরস্ত ঘরের মায়েরা বাংলাদেশের মতোই রক্ষণশীল। অন্ততঃ পক্ষে তাঁদের ঘুম পাড়ানি গান তাই-ই বলে।

[ফ্রান্স]

টুল্‌টুলে বোকা-চোখ বুজিয়ে ঘুমো—
ক্যাথারিণ এসে দেবে চোখেতে চুমো !
চুপ্‌চুপি খুকু সোনা ঘুমিয়ে রবে—
যতদিন না বয়েস পনের হ'বে—
খুকী যবে দেবে এসে পনরয় পা—
বিয়ে দিয়ে দেবো তার আর দেরী না !

জার্ম্মানীর মায়েরা বলেন, শীত—শুভ্র তুষার হাতে দোলা দিয়ে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়—সেইজন্য দোল্‌নার আর দড়ির প্রয়োজন হয় না।

[জার্ম্মানী]

ওই ওপরে পাহাড় প'রে শীতের বায়ু বয়—
কোলের ছেলে দোলায় মাতা আপনি বসে রয় !
শুভ্র তুষার হস্তে দোলা দোলায় দোদুল দুল—
চায়না দড়ি—আপনি দোলে, নাই সে দোলার ভুল।
আসে ঘুম এগিয়ে
খোকা পড়ে ঘুমিয়ে !

আমাদের দেশে যেমন বর্গীর গল্প শুনিয়ে ঘুমপাড়াবার প্রথা প্রচলিত আছে—হাঙ্গেরীতে ঠিক তেমনি কপোত আর মশকের গল্প বলে মায়েরা ছেলেদের চোখে ঘুম আনেন। তাদের ঘুমপাড়ানি গান এই রকম—

[হাঙ্গেরী]

গহন বনের মাঝখানে—
কপোত আছে তা কেবা জানে
ঘুম তার চোখে নেই মোটে—
থেকে থেকে তাই কেঁদে ওঠে—

একদিন শোনো হ'ল কি যে—
মশক একটা এসে নিজে
কহিল "কপোত ঘুমাও ভাই"
সেই হ'তে তার কান্না নাই।
ঘুমে বুঁজে গেল নয়ন তার
কেহ নাহি শোনে কান্না আর!
ঘুমে ঢুলে পড়ে খোকাও তাই
তোর চোখে আজ ঘুম কি-নাই?

রাশিয়ার মায়েদের বিশ্বাস, তাঁরা যখন ছেলেমেয়েকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুমপাড়ান—তখন স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে সেই গানে যোগদান করেন। শুধু তাই নয় দেবদূত তাঁর অদৃশ্য পাখায় তাকে ঢেকে রেখে সব আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

[রাশিয়া]

আকাশের নীলে ধোয়া চোখ বুজে শান্তিতে—
ভয় ভেঙে ঘুমো খোকা আজ—
এ বুকের মণি তুই আমি রব পাশে তোর—
দেব দূত রবে ফেলি কাজ!
তাঁহার অদেখা পাখা, তারি তলে মোরা দুয়ে
বেঁধে নিয়ে ছোট এক নীড়—
ঢেকে রেখে দেবো ওরে, দোল্‌নায় দুলে তোরে
দিয়ে এক স্নেহ সুনিবিড়!
আপনার মনে শুধু গাবো আমি ঘুম গান
পাশে বসি তোর বিছানার
মধুসম মিঠা সুরে দেবদূত গলা ছেড়ে
মোর সাথে গাবে অনিবার।

ডেনমার্কের মায়েদের বিশ্বাসও ঠিক রাশিয়ার মতো। তাঁদেরও ধারণা স্বর্গ থেকে শ্রীভগবান ছেলের মাথায় আশীষ বর্ষণ করেন এবং দেবদূতকে পাঠিয়ে দেন তাকে রক্ষা করবার জন্তে।

[ডেনমার্ক]

খোকন আমার ঘুমিয়ে পড় মধুর মুখের ছায়—
চোখের পাতা নামাও নয়ন চোর—
স্বর্গ হ'তে শ্রীভগবান রক্ষা করেন তায়—
আশীষ ধারায় বাঁচবে প্রাণের ডোর।

পাঠিয়ে দেবেন স্বর্গপরী শয্যা কিনারায়
দোল্না তোমার দুল্ছে যেথায় ঠিক—
নয়ন বুজে শান্তিতে তাই ঘুমাও বিছানায়
ঈশের আঁখি জাগ্বে অনিমিখ !

রুমানিয়ার মায়েদের ধারণা যে তাঁদের মুখের ঘুমপাড়ানি গান শিশুকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুল্বে—যেমন নাকি চারাগাছ ধীরে ধীরে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। আর ছেলে বীর হ'বে এও মায়েদের একটা আন্তরিক কামনা। এদের ঘুমপাড়ানি গান—

[রুমানিয়া]

ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও শিশু ছোট যে এই টুক্
মায়ের বুকের রতন মণি ভরবে মায়ের বুক !
দোলায় মাতা আর তোমাতে নয়ন অনিবার
অফুট কুঁড়ি নয়ত চারার মতন তোমার বাড় !
নয়ত তোমায় দেখ্ছে যেন পারিজাতের ফুল—
না হয় তুমি স্বর্গ দূতই হচ্ছে মাতার ভুল !
মাতার বুকে শিশু ঘুমাও আনন্দে
গান গাহে যে জননী তোর, তোর তন্দ্রারি ছন্দে !
মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানি গানের সুরের রেশ—
গড়বে তোমায় তরুণ সবল গাছের মতন বেশ।
গড়বে তোমায় অটুট সোজা, গড়বে তোমার থির—
মোদের রাজার ছেলের মতন যুঝ্বে তুমি বীর !

ইটালীর মায়েরা একটু কবিত্বময়ী আর বিলাসিনী। তাঁরা ছেলেকে নানাভাবে মনের মতো করে সাজিয়ে রাখ্তে ভালো বাসেন। ইটালীর মায়েরা এই গান গেয়ে শিশুদের চোখে ঘুম আনেন—

[ইটালী]

চুপ্ করে তুই ঘুমো দেখি বাছা—
তা হলেই আমি ঘুমিয়ে রবো—
তোর বিছানার চাদর করিব
ভায়োলেট্ ফুলে কত যে কবো !
পাত্লা রেশমে পরিপাটি করে
রাখিব যে তোরে মুড়িয়া খুকু—
ময়ূর পেখমে কি মধুর হ'বে
তোর্ বিছানার ঢাক্না টুকু !

ইউরোপের মায়েদের ঘুমপাড়ানি গানের আলোচনা আজ এইখানেই শেষ করলাম—পরে সুযোগ ও সুবিধা ঘটলে অন্যান্য দেশের ঘুমপাড়ানি গান সম্পর্কে কথা বল্বার ইচ্ছে রইল।

গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত "বিদ্যাসুন্দর"

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ

বাঙ্গালী পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শৈশবে বাঙ্গালা ভাষাকে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। একদিকে ব্রাহ্মণগণ, অন্য দিকে গোঁড়া মুসলমান মৌলবীগণ বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থপ্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ব্রাহ্মণেরা "সর্ব্বনেশে" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশপুরাণ-অনুবাদকগণের জন্য ইহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যে অঙ্গুলে বাঙ্গালা লেখা হইত মুসলমান মৌলবী সাহেব পাপ ভয়ে সেই অঙ্গুল কাটিয়া ফেলিবার ফতোয়া দিয়াছিলেন। এ হেন দুঃসময়ে বঙ্গভাষা ঘটনাচক্রে গৌড়েশ্বরগণের সুনজরে পড়িয়া যায়। বস্তুতঃ গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহদানের ফলেই বঙ্গভাষা শৈশবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণের সভাগৃহে স্থান লাভ করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষা শৈশবেই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌড়ের সুলতানগণের মধ্যে অনেক বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের সাগ্রহ প্রবর্ত্তনায় হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতবর্গ হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র গ্রন্থাদির অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুলতান শমসুদ্দীন ইউসুফ শাহের (রাজ্যকাল ১৪৭৪-১৪৮২ খৃঃ অব্দ) আদেশে জৈনুদ্দিন নামক মুসলমান কবি "রসুল-বিজয়" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন। তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ করিলে সুলতান তাঁহাকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের প্রশংসাদ্যোতক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন বলিয়া পরাগল খাঁর আদেশে রচিত মহাভারতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি বিদ্যাপতিও নসিরা শাহ (সম্ভবতঃ উক্ত নসরত শাহ) এবং গৌড়েশ্বর "প্রভু গয়াস উদ্দীন সুলতানের" প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নসরত শাহ যে প্রেম বিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে। আমার আবিষ্কৃত একটি পদে এই সুলতান নসিরা শাহের সঙ্গীত-প্রিয়তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ধানশী—বেলাবলী।

অ কি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজ গমণী ধনি ধনি ॥ ধ্রু।
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ান ভালে।
ভ্রমোরা ভোলল বিমল কমল দলে ॥

গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাজাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি ॥
সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি
অমিআ বরিখে জৈছে শারদ পুরণ শশী ॥
সেখ কবিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
ছুলতান নাছির সাহা ভুলিছে কমল বনে ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণও এক গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই "গৌড়েশ্বর" কে ছিলেন, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই কিন্তু তিনি উক্ত গৌড়েশ্বরের যে সভা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব-বিশিষ্ট ছিল। তদীয় অমাত্যের "খাঁ" উপাধি হইতেও তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

অতঃপর আমরা বাঙ্গালী পাঠকগণকে একটি অশ্রুতপূর্ব্ব কথা বলিব। সুলতান নসরত শাহের পুত্র সুলতান ফিরোজ শাহও তদীয় পিতামহ ও পিতার মত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

ফিরোজ শাহের আদেশে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ রচিত একখানি "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে বটে কিন্তু দুর্ভাগ্য যে দুইখানিই আদ্যন্ত খণ্ডিত। একখানির ২-৮ ও ২৭ সংখ্যক পত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান। উহা ২১×৮ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজের দুই পিঠে পুথির আকারে লেখা। এই পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন ও কীটদষ্ট। অপর খানির একটি মাত্র পত্র বিদ্যমান। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক কবিই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের রচিত পুথির নাম "কালিকামঙ্গল" দৃষ্ট হয়। আমাদের দ্বিজ শ্রীধরের পুথিরও ঐ নাম ছিল কি না, খণ্ডিত পুথির সাহায্যে তাহা বলিবার উপায় নাই।

পুথির স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক আছে। "মাধব ভাট রূপগুণং বিস্তার্য্য কথঅতি", "কন্যা কথঅতি" ইত্যাদি রূপ সংস্কৃত বাক্য প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং পুথিখানি যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুথিতে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম বিজয়ানগরী রত্নাবতী; বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলা (দেবী), রাজ্যের নাম কাঞ্চী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কবির সময় বাঙ্গালা ভাষা "দেশী ভাষা" বা "প্রাকৃত ভাষা" নামে পরিচিত ছিল।

"সাবধান নরলোক পাত্র জেন মতে।
দেসি ভাসে পদ বন্ধে গাহি পরাকৃতে ॥"

নিম্নে কয়েকটি ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) নৃপতি নসির সাহা তনএ সোন্দর
নাম ছিরি পেরোজ সাহা রসিক সেখর ॥
* * *
দ্বিজ ছিরিধর কবি রচিলেক পুনি ॥

(২) ন্রিপতি নসির সাহা তনএ সোন্দর।
সর্ব্ব কলা নলিনী ভুগিত মধুকর ॥
রাজা শ্‌ পেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবি রাজা পরমাণ ॥

(৩) শ্রীরি পেরোজ সাহা বিদিত জুবরাজ।
কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ ॥

(৪) রাজারাজশ্বর তন এ সোন্দর
কর্ণ সম দাতা বিচক্ষণ।
শ্রী পেরোজ সাহা পঞ্চগুণে অবগাহা
ছিরিধর কবিরাজে ভাণ ॥

(৫) নৃপতি নসির সাহার নন্দনে
ভোগপুরে মেদনি মদনে।
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা জান
ছিরিধর কবিরাজে ভাণ ॥

প্রাগুদ্ধৃত তৃতীয় ভণিতায় পাঠকগণ দেখিতেছেন, ফিরোজ শাহ তখনও যুবরাজ মাত্র—রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। নসরত শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ। আর ফিরোজ শাহের রাজত্ব কাল ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ (কয়েক মাস মাত্র)। সুতরাং পুথিখানি ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নসরত শাহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করিতে হইবে।

দীনেশ বাবুর মতে কঙ্কের রচিত বিদ্যাসুন্দরই বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রচনাকাল হিসাবে শ্রীধরের রচিত গ্রন্থটি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে।

লিপিকরের কল্যাণে এই নষ্টাবশিষ্ট পত্রগুলির উদ্ধারও একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, যেখানেই হাত দেই, সেখানেই নানা প্রমাদ ও অপূর্ণতা দেখিতে পাই। পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই বুঝিতে পারেন। এ অবস্থায় অন্যান্য পুথিগুলির সহিত ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে আমরা অক্ষম।

কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ গৌড়ের রাজসভায় থাকিতেন, আমরা এইমাত্র অনুমান করিতে পারি। তাঁহার বাড়ী ঘর কোথায় ছিল আমরা তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও অক্ষত দেহে থাকিতে পারে নাই ;—ক্ষত বিক্ষত জীর্ণ শীর্ণ কয়েকটি পত্র মাত্র সম্বল করিয়া গৃহস্থের গৃহকোণে অযত্নে পড়িয়া থাকিয়া চিরনির্ব্বাণ লাভের দিন গণনা করিতেছিল। লূতাতন্তু ও ধূলিরাশি ঝাড়িয়া পত্র কয়টি সংগ্রহ পূর্ব্বক তৎসাহায্যে আজ বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট এক মহানুভব নৃপতি ও এক বিস্মৃতনামা কবির কীর্ত্তি কাহিনী বলিতে পারিলাম বলিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি।

দর্শন শাখার প্রবন্ধ

প্রাচীন বেদান্ত

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

(সংক্ষিপ্ত সার)

ব্রহ্মসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ শারীরক-ভাষ্যের প্রণেতা শ্রীশঙ্করাচার্য ভগবৎপাদের পূর্ব্বের ও পরের বেদান্তকে আমরা যথাক্রমে প্রাচীন ও নব্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। শঙ্করের পূর্বে বোধায়ন, উপবর্ষ, ভর্তৃপ্রপঞ্চ, দ্রমিড় (অথবা দ্রবিড়) আচার্য, ব্রহ্মদত্ত, ইত্যাদি অনেকে ব্রহ্মসূত্রের বা উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আজকাল ইঁহাদের অধিকাংশেরই নামমাত্র জানা গেলেও কাহারো কাহারো বেদান্তের কোনো কোনে বিষয়ে অল্প-বিস্তর মত জানা যায়। এগুলি একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে বেশ ভাল হয়। এ বিষয়ে যে, কিছু চেষ্টা না হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে।

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা ছাড়াও শঙ্করের পূর্বে স্বতন্ত্র বেদান্ত গ্রন্থ ছিল এবং এখনো ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও নব্য বেদান্তের আলোচনা যেমন হইয়াছে ও হইতেছে প্রাচীন বেদান্তের তেমন হয় নাই।

প্রাচীন বেদান্তের মধ্যে গৌড়পাদ আচার্যের বিরচিত আগমশাস্ত্রের স্থান অতি অপূর্ব। সাধারণতঃ ইহা মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌরপাদ কারিকা নামে প্রসিদ্ধ। আমার মনে হয় সাধারণতঃ পাঠকের নিকট ইহার গুরুত্ব এখনো তেমন অনুভূত হয় নাই।

সমগ্র আগমশাস্ত্র খানিকে এত দিন নব্য বেদান্ত মতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুত তাহা করিতে পারা যায় কি না ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

ইংরাজী ১৯২২ সালে অখিল ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ পরিষদের (All-India Oriental Conference) দ্বিতীয় অধিবেশন লইয়াছিল কলিকাতায়, আমি তাহাতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, আগমশাস্ত্র, বিশেষ তাহার চতুর্থ প্রকরণ (অনাত শান্তি) বৌদ্ধ চিন্তায় পূর্ণ। ইহাই নহে, চতুর্থ প্রকরণে অনেক বৌদ্ধবাদ রহিয়াছে, এমন কি প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে তাহাতে অনেক বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানির ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য নামে প্রসিদ্ধ। আমার মনে করিবার কারণ আছে ইনি ব্রহ্মসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ শারীরক-ভাষ্যকার হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি এবং ইঁহার অনুগামিগণ আগমশাস্ত্রের সমস্ত প্রকরণেই বিশুদ্ধ বেদান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু

যদিও প্রথম তিন প্রকরণ সম্বন্ধে ইহা সত্য, তথাপি বর্ত্তমান লেখকের মনে করিবার কারণ আছে যে, চতুর্থ প্রকরণ সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। চতুর্থ প্রকরণে যে, বেদান্ত আলোচিত হয় নাই সেই সম্বন্ধে এখানে বেশী কিছু না বলিয়া এইটুকু বলিলেই চলিতে পারে যে, উহাতে ব্রহ্ম ও আত্মা এই দুইটি শব্দের একটিও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বর্তমান লেখকের আরো একটি কথা মনে করিবার কারণ আছে যে, এই চতুর্থ প্রকরণটি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, পূর্ববর্ত্তী তিন প্রকরণের ন্যায় ইহা কোনো পুস্তকের অংশ বিশেষ নহে।

কিন্তু এ সব যাহাই বলা হউক না যতক্ষণ আগমশাস্ত্রখানির সমস্ত কথা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখা না যাইতেছে ততক্ষণ কিছুই স্থির হইতে পারে না। এই জন্য বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ চতুর্থ প্রকরণের কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকটিকে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। এই আলোচনায় দেখা যাইবে গ্রন্থকার বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তাহার পরবর্ত্তী অংশ বৌদ্ধদের অবলম্বিত অজাতি-বাদের মধ্যে বেদান্তীদের যে কোনো বিরোধ নাই তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা হইল গ্রন্থকার বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তিন যে বুদ্ধকে নমস্কার করিয়াছেন তাহার কি কোনো প্রমাণ আছে? মূলে রহিয়াছে "তং বন্দে দ্বিপদং বরম্"—'সেই দ্বিপদ বা দ্বিপদগণের শ্রেষ্ঠকে বন্দনা করি'। 'দ্বিপদ্' অথবা 'দ্বিপদ' শব্দের এইরূপ স্থলে অর্থ 'মনুষ্য', তাই "দ্বিপদাং বরম্" বলিতে আমরা 'মনুষ্য শ্রেষ্ঠ' বুঝি, ইনি কে? ভাষ্যকার বলেন "দ্বিপদাং বরম্" বলিতে পুরুষোত্তম অর্থাৎ নারায়ণ। তাই তাঁহার মতে এখানে নারায়ণকে বন্দনা করা হইয়াছে। এখন বুদ্ধ ও নারায়ণ এই উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে ইহা স্থির করিতে হইলে কারিকাটির সমগ্র অর্থ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কারিকাতে এই কয়টি কথা বলা হইয়াছে—(১) জ্ঞান হইতেছে আকাশের সদৃশ; (২) ধর্ম বা জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় ইহাও আকাশের সদৃশ; (৩) জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই; (৪) এবং এই জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে যিনি অভিন্ন বলিয়া বুঝিয়াছেন সেই দ্বিপদ-শ্রেষ্ঠকে বন্দনা করা বৌদ্ধদের যোগাচার মতের সঙ্গে পরিচয় থাকিলে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে এখানে সেই মতই প্রকাশ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেব যে ঐ মত প্রচার করিয়াছেন তাহা বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে আকাশের সমান কেন বলা হইয়াছে তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞেয় বিষয় সমূহকে আলোচ্য কারিকায় ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাও বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথা। অবৌদ্ধ শাস্ত্রে ধর্ম শব্দের এইরূপ প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল। অপর পক্ষে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ইহা সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুলভ। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ শঙ্করবেদান্তেও পাওয়া যায়, আগমশাস্ত্রেও ইহা বলা হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তথাপি এই এবং অন্যান্য স্থলে বৌদ্ধ চিন্তার আধিক্য ও প্রভাব দেখায় বৌদ্ধ মতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ বুদ্ধদেবকেই বন্দনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, নারায়ণকে নহে। আরো একটি কথা

ভাবিবার আছে। আলোচ্য স্থলে 'দ্বিপদ বর' বলিতে আমরা পুরুষোত্তম ধরিতে পারি কি না একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। নারায়ণকে আমরা পুরুষোত্তম ন্যায়ানুসারেই বলিতে পারি ও বলিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাকে দ্বিপদ্-বর বলা যাইতে পারে কি? আমার মনে হয় পারা যায় না। কারণ দ্বিপদ্ বলিতে মনুষ্য, আমরা নারায়ণকে 'মনুষ্যোত্তম' কখনই বলি না, বলিতে পারি না, যদিও তিনি নিশ্চয়ই 'পুরুষোত্তম'।

তা ছাড়া, নারায়ণ কোথায় জ্ঞান ও বেদের অভেদ জানিয়াছেন অথবা তাহার কথা বলিয়াছেন আমরা জানি না। ইহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

দ্বিতীয় কারিকায় অস্পর্শ যোগের কথা বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রেই ইহার ঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়।

ইহার পরে অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বয়বাদী অর্থাৎ বৌদ্ধদের অজাতিবাদের সঙ্গে গ্রন্থকারের নিজ সম্প্রদায়ের যে কোন বিরোধ নাই তাহা যুক্তি দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন। এই সমস্ত যুক্তির উল্লেখ বৌদ্ধশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আশাবাদ

শ্রীনলিনীমোহন সান্ন্যাল, এম, এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

গত ১১ই কার্ত্তিক শান্তিপুরে বঙ্গীয়পুরাণ-পরিষদের বাৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ। পরদিন এখানে পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন এই প্রবন্ধের অযোগ্য লেখক। দেখিলাম সকল বক্তাই নিবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী। ইহা স্বীকার্য যে মানুষ প্রবৃত্তি-মার্গের অনুসরণ করিয়া সংসারে অনেক অনর্থ ঘটায়। তাহাকে সংযত করিবার জন্য নিবৃত্তি-মার্গের নিত্য আলোচনা আবশ্যক। তাই বলিয়া পৃথিবীতে নিবৃত্তি-মার্গই মানুষের একমাত্র অবলম্বনীয় পথ ইহা স্বীকার করা যায় না। সকলেই যদি জাগতিক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সংসার চলিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে নিবৃত্তি-মার্গের অত্যধিক অনুসরণই ভারতবর্ষের অশেষ দুর্গতির কারণ।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়—আশাবাদী ও নৈরাশ্যবাদী। ভারতবাসীরা প্রায়ই নৈরাশ্যবাদী। তাঁহাদের শাস্ত্রই তাঁহাদিগকে নিরাশবাদী করিয়াছে। অধিকাংশ হিন্দুদের এই ধারণা যে সংসার অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ। কর্মে আসক্তি হেতু মনুষ্যকে বারম্বার জন্ম ধারণ করিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়। আমরা ইন্দ্রিয়-সুখভোগ ও বাসনার দাস হইয়া কর্ম-বন্ধন-পাশে আবদ্ধ হই। বাসনা ও কর্মের ত্যাগ না হইলে এই দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তিরা বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া কর্মত্যাগে যত্নবান্ হন। তাঁহারা এই উপায়ে মোক্ষলাভের প্রয়াসী।

এই মনোবৃত্তিটী ন্যায্য মনোবৃত্তি নয়—ইহা স্বার্থপূর্ণ। কেবল নিজের স্বার্থ দেখিলে চলিবে না। নিজ মোক্ষের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের উদ্ধার-বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াও আমাদের কর্তব্য। কর্ম যদি স্বার্থশূন্য হয়, তবে কর্ম্মকে মন্দ বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেকেই জগতের অংশ—কেহই বিশ্ব-প্রবাহ হইতে পৃথক্ নয়। সকলেরই সেই প্রবাহের অনুকূলে যাওয়া উচিত—প্রতিকূলে নয়। ব্যষ্টি হইতেই সমষ্টির উদ্ভব। বষ্টির সচলতার উপর সমষ্টির সচলতা নির্ভর করে। ব্যষ্টির চেষ্টা ভিন্ন সমষ্টির হিত অসম্ভব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র, তথাপি সমষ্টিগত বিশ্ব-প্রবাহে সাহায্য-দান করিতে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। শরীরের আশ্রয়েই আত্মার স্থিতি। সেই শরীরের পোষণের জন্য ভৌতিক বস্তু আবশ্যক। আমরা কি আত্মার আশ্রয়-ভূত শরীরের পালনের জন্য জগতের সাহায্য লইব, অথচ সেই জগতের কার্যাবলী যাহাতে সম্যক্ নির্বাহ হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য

করিতে পরাঙ্‌মুখ হইব ? এই সংসারে আমাদের সেই সকল কর্মে নিযুক্ত থাকা উচিত, যাহাতে বিশ্বের হিত হয়।

জগতের কল্যাণের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য, প্রতিবাসীর কল্যাণের জন্য, নিজ স্বার্থে বিসর্জন দিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। নৈরাশ্যের বিলোপ সাধন করিতে হইবে। নৈরাশ্যের কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। আমাদিগকে আশাবাদ অবলম্বন করিতে হইবে। এ জগতে একমাত্র দুঃখই আছে, এই মত ঠিক নয়। এখানে সুখও আছে, এবং সেই সুখের পরিমাণ কম নয়। যেমন শ্রম না করিলে বিশ্রামের আস্বাদ পাওয়া যায় না, যেমন অন্ধকারের অনুভূতি না থাকিলে আলোক অনুভবকরা সম্ভব নয়, সেইরূপ দুঃখ বিনা সুখের অনুভূতি হইতে পারে না। কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারাই যোগীরা পরমাত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ হন। কঠিনতার সম্মুখীন হইতে না পারিলে আমাদের শক্তির বৃদ্ধি হয় না—কঠিনতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারাতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব।

জগতে বিপরীত ধর্মাবলম্বী বস্তু বা বিষয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, যেমন আলোক-অন্ধকার, শৈত্য-উষ্ণতা, শুভ্রতা-শ্যামলতা, কোমলতা-কর্কশতা, সুরূপ-কুরূপ, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ, সুস্বাদ-বিস্বাদ, জীবন-মরণ, শত্রু-মিত্র, পাপ-পুণ্য, হিত-অহিত, সফলতা-বিফলতা, শান্তি-অশান্তি ইত্যাদি। জগতে যেমন গো, অশ্ব, কুক্কুর ইত্যাদি মনুষ্যের উপকারী জন্তু আছে, তেমনি ব্যাঘ্র, সর্প, নক্র ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীও বিদ্যমান। যত বস্তু আছে—তাহারা সমধর্মী হউক বা বিরুদ্ধ-ধর্মী হউক—সবই বিশ্ব-রাজ্যের অন্তর্গত। ভেদ-জ্ঞান না থাকিলে একতার উপলব্ধি হয় না। মানুষও যেমন বিশ্ব-রাজ্যের অন্তর্গত, অপরাপর জীব, বস্তুও বিষয়ও তেমনি বিশ্বের অংশ। সমগ্রের সহিত প্রত্যেক বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ। বিশ্বের কার্য-নির্বাহের নিমিত্ত প্রত্যেক বস্তু অপরিহার্য। যে সকল অনুভূতি আমাদের অপ্রিয়, জগতের কার্য-শৃঙ্খলাকে অপ্রতিহত রাখিবার নিমিত্ত—উহার একতানতাকে যথাযথ রক্ষা করিবার নিমিত্ত—সে সব আমাদিগকে সহ্য করিয়া লইতে হইবে। জগতে মনুষ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক বিরুদ্ধাচারী ও অত্যাচারী।

প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সে এখানে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চাহে। ব্যাঘ্র, সর্প, বৃশ্চিক, মশক, উড্ডীশ ইত্যাদিকে মনুষ্য হিংস্র নামে কলঙ্কিত করিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল জীবের যদি চিত্রণের সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য অতি হেয় রূপে চিত্রিত হইত। অতএব জগতে মনুষ্যের অসন্তোষের কোনো কারণ নাই, এবং উহার নিরাশাবাদী হওয়া অনুচিত।

মনুষ্যই অসীম জগতের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। মনুষ্যের দ্বারা ঐশ্বরিক জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়। মনুষ্যের জ্ঞানের সীমা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অপূর্ণ মানুষের মধ্যে পূর্ণের অনুভূতি থাকাতে সে পূর্ণ হইবার আশা করে। অপূর্ণ হইয়াও আমরা আপনাদিগকে পূর্ণের সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পারি। এই বিচিত্র সংসারের যে

প্রত্যক্ষ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই উহা পর্যবসিত নয়—ইহার অতীত আরো কিছু আছে। *

গগনচুম্বী তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ, উত্তাল নর্তনশীল দিগন্ত-প্রসারী সাগর, অসংখ্য উজ্জ্বল হীরক-খচিত নীলাম্বর, প্রচ্ছন্ন বনচারিনী কলনিনাদিনী নির্ঝরিণী, বিচিত্রচ্ছদ কলকূজিত বিহঙ্গমগণ, শিখীর কলাপ-বিস্তারপূর্বক উদ্ধত নৃত্য, বিরাট্ ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণোজ্জ্বল ছবি, পূর্বাকাশে শারদ পূর্ণ-শশধরের উদয়, কুসুমদামের নয়নাভিরাম সুষমা তথা প্রাণোন্মাদক পরিমল ইত্যাদির মাধুর্য্য কাহার মনকে অভিভূত না করে? তখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের একতার ভাব স্বতঃই মনে উদিত হয়। তখন মনে হয় এই শোভাময় বিশ্ব, যাহা কর্তৃক আমরা আমাদের আদর্শকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই, আমাদিগ হইতে পৃথক্ নয়। ইহা যদি পৃথক্ হইত, তাহা হইলে ইহা আমাদিগকে কি প্রকারে চঞ্চল ও মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইত? সৌন্দর্যোপাসনা দ্বারাই মনুষ্য ও জগতের একতার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দর বস্তু তখনই সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয় যখন আমরা উহা হইতে কোনো প্রকারে লাভবান হইতে চেষ্টা না করি। সৌন্দর্যোপাসনা দ্বারা জড়বস্তু সচেতন বস্তুর রূপান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সৌন্দর্য্যের জ্ঞান কুরূপতার জ্ঞান-সাপেক্ষ। জগতে দুইয়েরই অস্তিত্ব আছে, এবং দুই-ই এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। রূপহীন বস্তু অনাদরের সামগ্রী নয়—উহাও সেই সুবিশাল সত্তার্ণবের কণা, যাহা হইতে সুন্দরের উদ্ভব হয়। যখন আমরা সমস্ত সংসারে নিজেকেই প্রতিফলিত দেখিতে পাইব তখন কুরূপও সুরূপ বলিয়া বোধ হইবে।

প্রেমের অর্থ ব্যক্তিত্বের পরিহার। ব্যক্তিত্বের তিরস্কার দ্বারাই ভেদবুদ্ধির অবসান হয়, এবং আমাদের মধ্যে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। আমরা এই ক্ষুদ্র শরীরেই সঙ্কুচিত নহি—আমাদের আদর্শ আমাদিগকে পরিমিততার বাহিরে লইয়া যায়। কেন্দ্রীভূত আত্মার বৃত্তের যতই বিস্তার হইবে ততই আনন্দামৃতের বর্ষণ হইতে থাকিবে, এবং ধরাতলে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। সেবা ভিন্ন প্রেম প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয় না। বিশ্ব-প্রেম ও বিশ্ব-সেবা দ্বারাই ব্যক্তিত্বের বন্ধন ছিন্ন হওয়া সম্ভব।

মনুষ্য অপূর্ণ। ইহা কি তাহার লজ্জা, অপমান ও নৈরাশ্যের বিষয়? তাহার পরিমিততাকে কি দোষের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে? আমাদের অপূর্ণতাই আমাদের বিশেষত্ব—ইহাতেই আমাদের গৌরব ও গর্ব। অপূর্ণতারই পূর্ণ বৃদ্ধি ও উন্নতির আশা আছে। অপূর্ণতাতে অপরিমিত সম্ভাবনা বিদ্যমান—উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে—পূর্ণ হইবার আশা থাকে। এই সম্ভাবনাই অপূর্ণের গৌরব বৃদ্ধি করে। এই গৌরবপূর্ণ অপূর্ণতা পাইয়া আমরা আপনাদিগকে ধন্য বিবেচনা করিতে পারি। যদিও

---

* রহস্যবাদীরা জগতের প্রত্যক্ষ রূপকে স্বীকার করেন না। ইহার অতীত যে জগৎ, তাহাকেই তাঁহারা সত্য বলিয়া ধরেন।

† এ বিষয়ে রহস্যবাদী ও আশাবাদীর মধ্যে মতভেদ নাই।

এই জীবনে সুখ-দুঃখ, সফলতা-বিফলতা, লাভ-ক্ষতি, সংযোগ-বিয়োগ আছে, তথাপি ইহা অভ্যুদয়োন্মুখ বলিয়া সকল জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! আমাদের অপূর্ণতা প্রগতিশীল—ইহাতে নিশ্চলতা দোষ নাই। অপূর্ণ পূর্ণেরই রূপান্তর—পূর্ণেরই গতিশীল রূপ।

কে এমন আছে যে পাপী নয়? তাহা হইলে কে কাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকারী? পাপ করিবার সম্ভাবনা থাকিতেও পুণ্য করিতে পারা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার ব্যঞ্জক। যাঁহারা আপনাদিগকে পাপী জ্ঞান করেন, তাঁহাদের দ্বারাই সমাজের সংস্কারের আশা করা যাইতে পারে। যে কখনো পড়ে নাই, তাহা অপেক্ষা যে পড়িয়া উঠিয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ। যদি আমরা পড়িয়া উঠিতে পারি, সামলাইতে পারি, সুধরাইতে পারি—তবেই আমাদের উন্নতি চিরস্থায়ী হইবে।

ভুল কেবল মানুষেই করিতে পারে—যন্ত্রে বা জন্তুতে নয়। ভুলের দ্বারাই অনিশ্চিত জ্ঞান নিশ্চিততা লাভ করে, এবং মানবজাতির নূতন নূতন সম্ভাবনার সূচনা পাওয়া যায়। ভুলই যথার্থ জ্ঞানের প্রথম সোপান। ভুলকে অল্প জ্ঞান বলা যাইতে পারে। আমাদের ভুল এই টুকুতে যে আমরা অল্প জ্ঞানের আধারে কাজ করিয়া বসি। ক্রিয়ার কুঞ্চিকা দ্বারা জ্ঞানের দুর্ভেদ্য রহস্যের তাল-যন্ত্র উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। যাহারা ভুল করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহারা নিজ হিতের বলিদান করিয়া পর-হিত সাধন করে। যে ভুল করে তাহার জীবন ব্যর্থ যায় না। যে ভ্রমে পতিত হয় তাহার হানির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, তাহার ভুলের দ্বারা জগতের যে ইষ্ট হয়, তৎপ্রতি চাহিয়া দেখ। ভুল করিবার পর আমরা জানিতে পারি যে কোন্ বিষয়ে আমাদের যথার্থ ত্রুটি ছিল—আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের আবশ্যকতার পরিমাণ এত অধিক ছিল যে তাহা জানিবার জন্যই আমাদিগকে ভুল করিতে হইয়াছে। ইহাই উন্নতির মুখ্য সাধন।

কর্মকে ছাড়াই বন্ধনে পড়া। কর্মত্যাগে আমাদের দশা ক্রিয়া-শূন্য ভাসমান তৃণের ন্যায় হয়। যে সকল কর্ম অনৈক্যের ভাব আনয়ন করে, তাহা সংসারে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অসমর্থ। তাহারা ব্যষ্টিকে সমষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া তাহাকে সমষ্টি-জন্য ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। সাগর হইতে পৃথক্ হইয়া জলকণা গতিহীন হইয়া পড়ে—ইহাই পরম বন্ধন। যে সকল কর্মের মূল কেবল স্বার্থ-সাধনে সঙ্কুচিত হইতে পারে না—যে সকল কর্ম সত্তা-সাগরের জলকণা-সমূহে সামঞ্জস্য স্থাপিত করিয়া সংসারের উন্নতি-কল্পে যোগদান করে—তাহারাই মোক্ষপ্রদ। সমষ্টিই ব্যষ্টির যথার্থ আত্মা। কর্মই সমষ্টিকে ব্যষ্টির সহিত মিলিত করে। স্বার্থই বন্ধন, এবং নিঃস্বার্থতা মোক্ষ। নিঃস্বার্থতাই যথার্থ স্বার্থ।

যদি আমরা ঈশ্বরকে ব্যাপকরূপে দেখিতে চাই, তবে তাঁহার সন্তানদের সহিত বিরোধ করিতে পারি না। যদি অন্যেরা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহাদের সম্মুখে জ্ঞানের দীপ স্থাপন করিতে হইবে—নিজ অজ্ঞান-তিমির দ্বারা তাহাদের তিমিরকে বর্ধিত করিব না।

আশাবাদ অকর্ম্মণ্যতা নয়। অসন্তোষই ক্রিয়ার প্রেরক—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রেরণার সহিত আশা ও বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। যদি মনুষ্য-জাতির উচ্চ সম্ভাবনায় আমাদের আস্থা না থাকে, তবে সমস্ত শিক্ষাই বিফল হইয়া যায়। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল।* যে বিশ্বাস ধর্ম্মে অনিবার্য্য, তাহা কার্য-ক্ষেত্রেও আবশ্যক। মনুষ্য-জাতির উচ্চ সম্ভাবনায় আস্থা স্থাপন করিলে আমরা নিজ নিজ কার্য উৎসাহ পূর্ব্বক করিতে পারি। প্রেমের সম্মুখে কোনো প্রতিবন্ধ টিকিতে পারে না।

কিন্তু আশাবাদীর স্বপ্নিল সংসার যতই মধুর হউক, বাস্তব সংসার নিতান্ত কঠোর। উহাতে পদে পদে বিপদ ও বিফলতার সম্মুখীন হইতে হয়। তথাপি আশাবাদ নিছক কল্পনা নয়। আশাবাদের পোষণে সংসারের রূপ সত্য সত্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আশাবাদীর নিকট পরাজয়ই জয় হইয়া পড়ে—বিফলতাতেই সফলতা দৃষ্ট হয়। পরাজয়েই মানব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যদি আমাদের আদর্শ উচ্চ হয়, তবে বিফলতা কেবল ইহাই বলিয়া দেয় যে আমাদের বাতাবরণের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সাম্য স্থাপিত হয় নাই। যত্ন না করা, আলস্যে পড়িয়া থাকা, নিজেদের ত্রুটি দৈবের উপর আরোপ করা অথবা লক্ষ্য ক্ষুদ্র রাখা নিন্দনীয়। যত্ন করিলেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা আমাদের দোষ নহে। বিফলতা আমাদের অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়া দিয়া আমাদিগকে সাফল্যোন্মুখ করে, এবং নূতম মার্গের অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। বিফলতা দ্বারা আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা হয়। কিন্তু বিফল হইয়া নিরুদ্যমে বসিয়া থাকা নিন্দনীয়। পরাজয় ও বিফলতা আমাদের ভাবী উন্নতির সাধক শক্তি।

যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে, সকল বস্তুই তাহার নিকট মধুর ও প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। যে হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাহাতে সৎক্রিয়ার স্রোত নিশিবাসর প্রবাহিত হয়। তাহার মনে সংসার মধুর ফলের দ্বারা সুসজ্জিত রমণীয় উদ্যান বলিয়া অনুমিত হয়। তাহার মনকে চির-বসন্ত অধিকার করিয়াছে। কিন্তু মধুময় বসন্তের শুভাগমনের প্রাক্কালে যেমন পুরাতন পত্রসমূহ ঝরিয়া যায়, তেমনি তাহার হৃদয়োদ্যান হইতে আলস্য, নিরাশা, দুর্ব্বলতা, ভ্রান্তি, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অহঙ্কার, মাৎসর্য, দ্বেষ, দ্রোহ, বৈর ইত্যাদি দোষ সমূহ উড়িয়া যাওয়া আবশ্যক। পত্র-স্রাবই বসন্তাগমের শুভ সূচনা। আমাদের কেবল উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস থাকা আবশ্যক। যদি সকলেই আত্মত্যাগ করিয়া উৎসাহের সহিত কার্য করিতে থাকে, তাহা হইলে বসন্ত স্থায়িরূপে এই সংসারে বিরাজ করিবে।

---

* রহস্যবাদীরা ধর্ম্মকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির অন্যতম সাধন বলেন।

সুখ ও দুঃখ

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

সুখ ও দুঃখের তাৎপর্য্য

সুখ আছে, দুঃখও আছে। সুখদুঃখ বাহিরের অবস্থা নহে, মনের অবস্থা—অনুভবগম্য। দুঃখে অভাববোধ আছে—খুব বেশী, সুখেও অভাববোধ আছে—তবে কম। একদিকে সুখদুঃখের তীব্র অনুভূতি, অন্যদিকে অনুভূতির একান্ত অভাব। কাজেই সুখদুঃখ আছেও বটে, নাইও বটে। আবার সুখদুঃখ যখন থাকে, তখন একটানা থাকে না—জোয়ার ভাঁটা খেলে। সুখদুঃখ কখন হেতভূত, কখন অকারণ—কাল্পনিক ;—আধারভেদে কখন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল, কখন শান্ত সংযত। ইহাই সুখদুঃখের তাৎপর্য্য।

সুখদুঃখের মায়িক রূপ ও ব্যবহারিক মূল্য

সুখের মূল্য আছে, দুঃখেরও মূল্য আছে—মায়ার জগতে। জীবজগতের সকল স্তরেই সুখ আছে, দুঃখও আছে ;—কাজেই সুখদুঃখের মূল্য আছে। সুখ সকলেই চায়, তাই তার মূল্য আছে ; আর দুঃখকে কেহই চায় না, সেইজন্যই তার মূল্য আছে। সুখের মূল্য আদরে, আর দুঃখের মূল্য অনাদরে। যাহাকে উপেক্ষা করা যায়, সে-ই নগণ্য—মূল্যহীন। দুঃখকে উপেক্ষা করা যায় না, তাই নগণ্য নহে—মূল্যবান্। সুখের অভ্যাস আদৌ চেষ্টাসাপেক্ষ নহে, দুঃখের অভ্যাস রীতিমত চেষ্টাসাধ্য ; তাই দুঃখ সুখের চেয়েও মূল্যবান্। আবার দুঃখের মূল্যেই সুখ কিনিতে হয়, তাই দুঃখ অধিক মূল্যবান্।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের মধ্য দিয়া প্রাণীসকল সাধারণতঃ সুখভোগ করিয়া থাকে। পাশব মন ও মানব মনের সুখভোগ একরকম নহে—পার্থক্য আছে। পাশব মন আহার বিহার নিদ্রা ও মৈথুনাদি কর্ম্মের দ্বারা সুখভোগ করিয়া থাকে। মানব মন তাহাই করে, তবে পার্থক্য আছে। পাশবমনের সুখানুভূতি স্থূল, আর মানবমনের সূক্ষ্ম—কখন কখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। মানবমন পাশবধর্ম্ম ছাড়িয়া উচ্চস্তরে উঠিতে পারে, সেইজন্য উপরোক্ত বিষয় ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে সুখভোগ করিয়া থাকে। মন যতই উচ্চ উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকে, ততই উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সূক্ষ্মানুভূতিগম্য বিষয়ে সুখ অনুভব করিতে থাকে। রুচিবৈচিত্র্যে আবার সুখবোধের বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে, বয়সের তারতম্যেও সুখানুভূতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সকল মন সকল বিষয়ে সমান সুখ পায় না। কোন মন কোন সময়ে কোন বিষয়ে সুখ পায়, কোন সময়ে পায় না। সুখের জন্য জীবজগত লালায়িত হইলেও পাশব মন গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া যাইতে পারে না—গণ্ডীর বাহিরে যাইবার তাহার শক্তি নাই ; কিন্তু মানব-মন নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারে—গণ্ডীর পারে যাইবার তাহার সামর্থ্য আছে।

মায়ারাজ্যে সুখের বহুরূপ—বিচিত্রভঙ্গী। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া সুখের স্পর্শ মানুষকে পাগল করিয়া তুলে—শত শত রঙ্গীন চিত্র তাহাকে অতিমাত্রায় মুগ্ধ করে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত—একটা নেশার ঝোঁকে কর্ম্ম করিয়া যায়। পরিণাম কি তাহা কখন ভাবে, কখন ভাবে না—ভাবিতে পারে না, হুঁস থাকে না। মানবমন সুখের কাঙ্গাল বলিয়া সুখভোগের নানা উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সতত ব্যস্ত—সুখলাভের জন্যই তাহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা। এই চেষ্টায় অনেক সময় হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, ন্যায়ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বসে। এই সুখের লালসা একদিকে মানুষকে ভোগৈশ্বর্য্যের চরম শিখরে তুলিয়া দেয়, আবার অন্যদিকে অবনতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করে—দুঃখের কণ্টকক্ষেত্রে পতিত করে। যাদের হুঁস থাকে, তারা সমঝাইয়া পথ চলে, চলিলে কি হয়! শান্তি কোথায়? অনিবার্য্য অশান্তি এড়াইবার উপায় নাই। জৈবধর্ম্মে দুঃখমিশ্রিত সুখভোগ বিধিলিপি। শরীরী সত্বার একটানা সুখভোগ কোথায়? সুখভোগের পরক্ষণেই দুঃখবোধ—অভাববোধ। তারপর নিত্যনৈমিত্তিক দুঃখ আছে—ক্ষুধার কষ্ট, রোগ, শোক ইত্যাদি।

মায়িক সুখের প্রকৃতিই এইরূপ—অতিচঞ্চল ক্ষণস্থায়ী।

আবার মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তিতেও সুখবোধ হয়, যেমন—স্বপ্ন-বিলাসীর সুখ—শক্তুসম্বল ব্রাহ্মণের কাল্পনিক সুখ। বাস্তবজগতে এই সুখের ধরাছোঁয়া নাই—কেবল কল্পনা। এই কাল্পনিক সুখ মানুষকে কর্ম্মবিমুখ করে। কল্পনায় দুঃখেও সুখবোধ হয়। অনশনে প্রাণ যায়, তবু কর্ম্ম করে না। এমনি মোহ।

* * * * * *

সুখের বিপরীত অবস্থা দুঃখ, যেমন আলোর বিপরীত অবস্থা অন্ধকার। এই দুঃখকে সকলেই চেনে, সুখের চেয়েও বেশী চেনে। সুখকে আদর করে, দুঃখকে ভয় করে। সকল প্রাণীই সুখ চায়, তার চেয়েও চায় দুঃখকে এড়াইতে। সুখলাভে তাদের যত যত্ন, তার চেয়েও যত্ন—দুঃখকে এড়াইতে; কারণ সে জানে, দুঃখকে এড়াইতে পারিলে সুখ আপন হইতেই আসিবে। 'সুখের জন্য সকলে পাগল' না বলিয়া যদি বলা যায় 'দুঃখ এড়াইবার জন্য সকলে পাগল', তাহা হইলে উক্তি যেন সঙ্গত হয়।

দুঃখের স্বভাব এই যে, ভয় করিলে বাড়িয়া যায়; কিন্তু সাহস করিয়া সম্মুখীন হইলে লঘুবোধ হয়। আবার কল্পনাপ্রবণ-মন কাল্পনিক দুঃখসৃষ্টি করিয়া কষ্ট পায়; কিন্তু মানসিক বল সঞ্চয় করিয়া প্রকৃত দুঃখকেও যদি ভয় না করা যায় তাহা হইলে দুঃখের তীব্রতা কমিয়া যায়। মায়িক দুঃখের ইহাই প্রকৃতি।

মায়ারাজ্যে দুঃখ ত্রিবিধ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। সকল দুঃখ-কষ্ট এই ত্রিবিধ দুঃখ বা ত্রিতাপের অন্তর্গত। সকলের চেয়ে বড় দুঃখ—ভয়—মৃত্যুভয়। তারপর আছে রোগ, শোক, ধননাশ, বিরহ-বিচ্ছেদ, নৈরাশ্য, অপমান ইত্যাদি। এইগুলি ব্যষ্টির দুঃখ, ইহাদের সহিত মৃত্যুভয় অনিবার্য্যভাবে জড়িত নহে। সমষ্টির দুঃখ—যুদ্ধবিগ্রহ,

মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ; ইহাদের সহিত মৃত্যুভয় অনিবার্য্যভাবে জড়িত। শীতগ্রীষ্মের তীব্রতা সমষ্টির দুঃখ, ইহার সহিত মৃত্যুভয় সাক্ষাৎভাবে জড়িত নহে।

সমগ্র প্রাণিজগতে ঐ ত্রিবিধ দুঃখ খরস্রোতা তটিনীর মত সকল স্তর বহিয়া চলিয়া আসিতেছে আবহমান কাল ধরিয়া। আর সকল দুঃখকষ্টকে নিম্নে ফেলিয়া অতিকায় পর্ব্বতের মত অভ্রংলিহ শীর্ষ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—মৃত্যুভয়, তার বিকট চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, করাল দংষ্ট্রা আস্ফালন করিয়া। জীব মৃত্যুভয়ে কাতর। সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপিয়া এই ভয়ের শাসন—মৃত্যু বিভীষিকার তাণ্ডবনৃত্য! সুখ কোথায়?—কতটুকু? মাঝে মাঝে দেখা দেয়, আবার কোথায় লুকায়—যেন ঐ ভয়ের শাসনে। কিন্তু নিষ্কৃতি কি নাই? আছে, কি নাই—পশুবুদ্ধি তাহা কি স্থির করিবে! মানববুদ্ধি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তারই সন্ধানে ফিরিয়া আসিতেছে।

যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষ বহু চিন্তা, গবেষণা ও অন্বেষণ করিতে করিতে সুখ-দুঃখের উৎপত্তিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, তার সকল সুখ-দুঃখের মূল উৎস—অভিমান। এই অভিমান-উৎস হইতে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ বাসনা-স্রোতস্বতী উদ্ভূত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত হইতেছে। সারা বিশ্ব বাসনা-সলিলে প্লাবিত। সুখ-দুঃখ বাসনা-তরঙ্গ মাত্র। মানুষ ভাসমান তরণীর মত তরঙ্গাঘাতে কখন উঠিতেছে, কখন পড়িতেছে—কখন হাঁসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে।

সুখ-দুঃখের দার্শনিক ভিত্তি, রূপ ও মূল্য

মানুষের এই হাঁসা-কাঁদা বাহিরের কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে না, উহা নিছক অন্তরের বস্তু। কোন বস্তুর এমন কোন শক্তি নাই যে, মানুষকে হাঁসাইতে বা কাঁদাইতে পারে, সে যদি হাঁসিতে বা কাঁদিতে না চায়। মানুষকে সুখী করা বা দুঃখী করা বস্তুর ধর্ম্ম নহে—উহা কামনার ধর্ম্ম। যদি বস্তুর ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে একই বস্তু প্রত্যেকটী মানুষকে সুখী বা দুঃখী করিতে পারিত। মানুষ যে যে বস্তুতে যেমন যেমন কামনার রং ফলাইবে, সেই সেই বস্তু সেই সেই রূপ ধারণ করিবে। বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি-বৈষম্যে একই বস্তু বিষমগুণবিশিষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবার এক সময়ে যে বস্তু অতি সুন্দর বোধ হয়, অন্য সময়ে সেই বস্তুই অতি কুৎসিত মনে হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, সুখ-দুঃখের নির্দ্দিষ্ট কোন আকার বা রূপ নাই—ইহা নিছক মানসিক ব্যাপার।

সুখ-দুঃখের দার্শনিক মূল্য কিছুই নাই। এক বস্তুকে একজন মূল্যবান মনে করে অন্যজন তুচ্ছ জ্ঞান করে। অর্থের জন্য একজন পাগল—শরীর মন ক্ষয় করে, নানা পাতক করে ; আবার অন্যজন অর্থকে কাক-বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করে। এই যে অর্থের, তথা বস্তুর মূল্যজ্ঞান এবং তদ্বিপরীত ভাব, ইহা মানুষের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। মানুষের বুদ্ধি যখন কামনা-মলিন থাকে, তখন তাহার অভাব বোধ তীব্র হয় এবং এই মায়ার জগতের তাবৎ বস্তু মূল্যবান জ্ঞান হয়। বুদ্ধি যতই স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে, ততই অভাব বোধ কমিতে থাকে, সংসার অসৎ—কাল্পনিক জ্ঞান হইতে থাকে।

আর সংসারের বীজ যে অভিমান, তাহাও অসৎ—কাল্পনিক বলিয়া মনে হইতে থাকে। কাল্পনিক বস্তুর মূল্য কি? আর সুখ-দুঃখ যখন অভিমান হইতে উৎপন্ন, তখন সুখ-দুঃখের মূল্য কি? মানুষের যতই অভিমান কমিতে থাকে, অর্থাৎ কামনা বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকে, ততই সুখ-দুঃখবোধ কমিতে থাকে। দেহাভিমান না থাকিলে শীতাতপ, ক্ষুৎপিপাসা, রোগ-শোক কিছুই বোধ থাকে না—কিছুতেই মানুষকে কাতর করিতে পারে না; কাজেই তাহার নিকট সুখ-দুঃখের কোনও মূল্য নাই, অর্থাৎ সুখলাভের জন্য তাহার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই, আর দুঃখ-নিবৃত্তিরও কোন চেষ্টা নাই।

সুখ-দুঃখের নৈতিক মূল্য

দুঃখের একটা নৈতিক মূল্য আছে, সুখেরও আছে—তবে খুব কম। দুঃখ কতকগুলি মানুষকে চরিত্রহীন করে, সুখ কিন্তু অধিকতর মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করিয়া তোলে। দুঃখের কঠোর কশাঘাতে অস্থির মানুষ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে বটে, কিন্তু ভোগলালসার অবৈধ তৃপ্তির কল্পনাই মনে আনিতে পারে না—তার অবসরই বা কোথায়? সুখের কোমল ক্রোড়ে লালিত পালিত লক্ষ্মীর দুলালের পক্ষে অবৈধ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রলোভন দুর্ব্বার হইয়া উঠে। দুঃখ মানুষ হওয়ার মাল-মসলা যত জোগাইতে পারে, সুখ তার শতাংশের একাংশও পারে না। অবশ্য উপযুক্ত শিক্ষা সুখের গতিবেগকে নিয়ন্ত্রিত করিলে সুফল ফলিতে পারে, তখন সুখ উৎকর্ষের পথে বাধা না হইয়া বরং সহায় হইয়া দাঁড়ায়। সত্য বটে, দুঃখ সুন্দর বলিষ্ঠ তনুকে ধ্বংস করে, অসাধারণ প্রতিভাকে বিকশিত হইতে দেয় না, কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করিয়া দেয়;—কিন্তু ইহাও সত্য যে, দুঃখ মানুষকে কষ্টসহিষ্ণু ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তোলে, সহৃদয় ও উদারবুদ্ধি করিয়া তোলে, এমন কি, জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। অনন্য-সহায় হইয়া এই মহৎ ব্রত সাধন করিবার সামর্থ্য দুঃখের আছে, কিন্তু সুখের নাই। উপযুক্ত শিক্ষার শাসনে না থাকিলে সুখ মানুষকে প্রায়ই মহৎ করিতে পারে না, দুঃখ কিন্তু পারে; কারণ দুঃখ নিজেই শিক্ষক। কাজেই দুঃখের একটা রীতিমত নৈতিক মূল্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আবার সকল কর্ম্মের সহিত দুঃখ জড়িত, এই দুঃখকে স্বীকার না করিলে কর্ম্ম করাই চলে না। দুঃখকে এড়াইতে চেষ্টা করিলে আরাম-প্রিয়তা বিরাট বাধার মত সিদ্ধির পথ রোধ করিবে। সুখ যেখানে বিশ্বাসঘাতক, দুঃখ সেখানে হিতকারী বন্ধু;—সুখ যেখানে ব্যর্থ, দুঃখ সেখানে সার্থক।

সুখ মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, জাগ্রত চৈতন্যকে নিদ্রিত করিয়া দেয়। দুঃখ মানুষকে প্রায়শঃই সজাগ রাখে, জাগ্রত চৈতন্যকে নিদ্রিত হইতে দেয় না; আবার নিদ্রিত চৈতন্যকেও জাগাইয়া দেয়। সুখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকতা করে, দুঃখ কিন্তু মানুষকে কখনও বিড়ম্বিত করে না।

সুখ-দুঃখের আধ্যাত্মিক মূল্য

দুঃখের আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, সুখের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দুঃখ মানুষকে আধ্যাত্মিক করিয়া তোলে। ত্রিতাপ-দগ্ধ মানুষ যখন জ্বালার শান্তি খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন

তাহার মন আধ্যাত্মিক পথে উঠিতে থাকে। ভূয়োদর্শনের ফলে সে বুঝিতে পারে, ইহ-সংসারের কোন কিছুতেই জ্বালার শান্তি নাই, বরং আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলে জ্বালা আরও বাড়িয়া যায়। যতই 'আমি' 'আমার' বলিয়া জগতকে ধরিতে যায়, জগৎ ততই পিছাইয়া যায়। জ্বালা বাড়ে, তবুও ধরিতে চায়। কিন্তু মজা এম্‌নি—সে কিছুই ধরার মত ধরিতেও পারে না, আবার ছাড়ার মত ছাড়িতেও পারে না। এই মোহের ঘোরে ক্ষণিক সুখের জন্য তাহাকে বৃহত্তর দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহার লক্ষ্য থাকে দুঃখ-কষ্টের চির-নির্ব্বাণের দিকে। কখন এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কখন স্থির থাকে। এইরূপে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সে দুঃখেরই কল্যাণে সজাগ হইয়া উঠে;—তার জাগ্রত চেতনা আর যখন সুপ্ত হয় না, তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই দুঃখ-নিবৃত্তি তাহার সাধ্যাতীত। সে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে—প্রাণের জ্বালায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। ক্লিষ্ট-ব্যথিত প্রাণে সে 'ত্রাহি মধুসূদন' বলিয়া ফেলে। এতক্ষণে তাহার অটল বিশ্বাস হয়—'মধুসূদনই' ত্রাণকর্ত্তা—ভব-পারাবারের একমাত্র কাণ্ডারী। তখন সে আত্মসমর্পণ করে,—মন্ত্র জপে—'ত্বং হি ত্বং হি নাহং নাহং, শরণাগতোঽহং'। তবে শান্তি। তখন দুঃখকে আর দুঃখবোধ হয় না। সবই সহ্য হইয়া যায়—লঘু মনে হয়। শরণাগত মানুষ সবখানি দিয়া ফেলিলে প্রতিদানে পায় 'প্রেমস্বরূপকে', সেই বিশ্বগ্রাসী প্রেমের আকর্ষণে সে হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারে; তীব্র হলাহল পান করিতে পারে, সকল রকম নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারে—এক কথায়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এই জীবন উৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। মর্ম্মচ্ছেদী দুঃখ তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়।

সুখ-দুঃখের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিচার এবং পরিণতি

দেখা যাইতেছে, দার্শনিক বা জ্ঞানী সূক্ষ্ম বিচার সহায়ে তাবৎ ভোগ্যবস্তু হইতে মনকে বিযুক্ত করিয়া সুখদুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন; আর ভক্ত ভক্তি-বিশ্বাস সহায়ে সুখ-দুঃখকে অগ্রাহ্য করিতেছেন। দার্শনিক প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে মনকে সুখ-দুঃখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন। বিশ্বাসী ভক্ত তাহা পারেন না বলিয়াই 'শরণাগত'। দার্শনিক বিচার সহায়ে বুঝিয়াছেন—'অহং'-তা ও 'মম'-তা অর্থাৎ অভিমান হইতেই যত কিছু অনর্থের উৎপত্তি; ভক্ত ঐ উপায়ে ঐ তত্ত্বে উপনীত হইতে না পারিলেও, নিদারুণ অভিজ্ঞতায় ঐ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। পথ বিভিন্ন হইলেও, উভয়ের জীবনের পরিণতি একই—সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব-বুদ্ধি শূন্যতা, অভিমানশূন্যতা, কামনা বাসনার উচ্ছেদ ইত্যাদি। পরিণতি এক, আরম্ভও এক—দুঃখই উভয়ের জয়যাত্রার প্রবর্ত্তক। দুঃখ দার্শনিককে যেমন বিচার সহায়ে সুখ-দুঃখের পারে যাইতে উদ্বুদ্ধ করে, ভক্তকেও তেমন ভক্তিবিশ্বাস সহায়ে উহাদের পারে যাইতে উদ্বুদ্ধ করে।

অতএব প্রাথমিক অবস্থায় দুঃখের যেমন দার্শনিক মূল্য আছে, আধ্যাত্মিক মূল্যও তেমনি আছে। শেষের দিকে কোন মূল্যই থাকে না—সুখদুঃখ সমান হইয়া যায়—অস্তিত্ব বোধই থাকে না। দার্শনিক বিচারের এবং আধ্যাত্মিক সাধনার প্রবর্ত্তক হিসাবেই দুঃখের

মূল্য, নচেৎ দুঃখের কোন মূল্যই নাই। উক্ত দুই ক্ষেত্রে কোন দিক দিয়াই সুখের কোন মূল্য নাই।

উপসংহার

সুখের মায়িক রূপ মানুষ চায়; কিন্তু দুঃখের মায়িকরূপ চায় না—শুধু মায়িক কেন, কোনরূপই চায় না। মানুষের অন্তরাত্মা চায় দুঃখের আধ্যাত্মিক রূপ, সুখের মায়িক রূপ চায় না। তাহার নিকট দুঃখের আধ্যাত্মিক রূপ বিভীষিকাময় নহে। শাশ্বত কল্যাণের জন্য প্রবুদ্ধ মানবাত্মা সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ দুঃখকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে চাহে; কারণ সে জানে দুঃখের মধ্য দিয়াই চিরকল্যাণের পথ। দুঃখ চিরদরদী বন্ধু হইয়া দাঁড়ায়।

ইতিহাস শাখার প্রবন্ধ

ইতিহাসের ধারা

ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আজিকালি কোন দেশের ইতিহাস জানিতে গেলে ইতিহাসের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে আকুল হইয়া উঠিতে হয়,—রাজনৈতিক ইতিহাস, বিদেশের সহিত আদান প্রদানের ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, শাসন প্রণালীর ইতিহাস, অর্থ নৈতিক ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের ইতিহাস, ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠে এই সকলগুলি জানিলেই কি জাতির ইতিহাস জানা যাইবে। মানুষের জীবন অল্প, এই বিশাল ইতিহাস-সমুদ্র পার হইবার সাহস বা সামর্থ্য সকলের নাই। আরও সন্দেহ হয়, হয়ত শেষে দেখা যাইবে যে এতগুলি বিভিন্ন ইতিহাস পাঠের পরও জাতির ইতিহাস কিছুই জানা হয় নাই। মনুষ্য-শরীরের প্রতি জীব-কোষের, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জীবনী জানিলেই ত মানুষটির জীবনী জানা হইল না। কোন চিত্রের ফ্রেমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, যে বস্ত্রখণ্ডের উপর চিত্রটি অঙ্কিত তাহার বর্ণনা, যে সকল বিভিন্ন বর্ণ সাহায্যে চিত্রটি অঙ্কিত তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, চিত্রে যে সমস্ত মূর্ত্তি বা দ্রব্যজাত অঙ্কিত সেগুলির মাপ-জোক দিলেইত চিত্রটির কিছু বোঝা হইল না। চিত্রকর যে ভাবটি চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলেই তিনি কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা বুঝা যায়। তেমনই মানুষ পিতৃপুরুষগণের নিকট হইতে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক কোন কোন সম্পদ লইয়া ভূমিষ্ট হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সেই সম্পদ কিরূপভাবে পরিপুষ্ট হয়, মানুষ জীবনে কোন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হয় ও সেই আদর্শ কতদূর বাস্তবে পরিণত করিতে সক্ষম হয়, তাহাই মানুষের প্রকৃত জীবনী, তাহার সফলতার নিস্ফলতার ইতিহাস।

মানুষের যেমন একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে, এবং এই জীবন কেবলমাত্র তাহার শরীরস্থ জীবকোষের জীবনের সমষ্টি মাত্র নহে, তেমনই একটি জাতিরও একটি স্বতন্ত্রজীবন আছে। মানুষের মানসিক জীবনই মানুষের বহির্জীবনকে গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে। জাতির মানসিক জীবনও তেমনই জাতির বহির্জীবনকে গঠিত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সফলতার নন্দনে লইয়া যাইতেছে বা নিস্ফলতার মহামরুতে নিক্ষেপ করিতেছে। প্রাচীন জাতির মধ্যে যাহারা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, উচ্চভাবে ভাবিত, তাহারাই জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। বটবীজের মধ্যে যেমন বিরাট মহীরুহ লুক্কায়িত থাকে, অরণির মধ্যে যেমন বৈশ্বানর প্রচ্ছন্ন থাকে, কলকণ্ঠ বিহগের সঙ্গীত যেমন তাহার অণ্ডের মধ্যে সুপ্ত থাকে, তেমনই জাতির মনোমধ্যস্থ ভাবরাশির ভিতর, তাহার

অশরীরী আদর্শের মধ্যে, তাহার বিরাট কীর্ত্তির অঙ্কুর লুক্কায়িত থাকে। উপযুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে, অনুকূল জলবায়ু উত্তাপ আর্দ্রতার সাহায্যে তাহা প্রকাশ পায়; রাষ্ট্রব্যাপারে, বাণিজ্যে, জ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে জাতীয় প্রতিভা প্রকাশিত হয়, বিকশিত হয়, ফুলেফলে সুসমৃদ্ধ সুন্দর হইয়া উঠে। কোন জাতির ইতিহাসে জাতিটা কি কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছে তাহাই সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে,—কোন ভাবরাশি তাহার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছিল, কোন মন্ত্র তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, কোন আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহাই তাহার ইতিহাসের মর্ম্মবাণী, প্রকৃত ইতিহাস।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, একই আবেষ্টনের মধ্যে বাস, একই ভাষা বা একজাতীয় ভাষা ব্যবহার, একই প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম ও বিজয় লাভের ফলে একটি জাতির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ভাবের, কতকগুলি সাধারণ ধারণার উদয় হয়। এই সকল অনিয়ত ধারণাকে সুসংযত ও প্রণালীবদ্ধ করিয়া আদর্শে পরিণত করে জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, দার্শনিকগণ, আদর্শবাদীগণ। মূক অমূর্ত্ত ভাবরাশি কল্পনা-ব্যবসায়ী লেখকগণের হাতে শরীর গ্রহণ করে, কমনীয় হইয়া উঠে; ও জাতির কবিগণ, চারণগণ তাহাদিগকে ভাষা দেন, মুখর করিয়া তুলেন। ক্রমে এই সকল ভাব জাতির মনোরাজ্য এরূপ অধিকার করিয়া বসে যে তাহার অন্য কিছুই ভাল লাগে না, যে অবস্থায় সে এতদিন বাঁচিয়া ছিল তাহা অসহ্য বোধ হয়; যে রাষ্ট্রযন্ত্র, যে সমাজ, যে শিল্প, সাহিত্য, কারু, কলা এতদিন তাহাকে আনন্দ দান করিত তাহা অসার, নীরস ও বিস্বাদ বোধ হয়; নূতন ভাবরাশিকে নূতন আদর্শকে বাস্তব-জীবনে পরিণত করিতে না পারিলে জীবন দুর্ব্বিসহ বোধ হয়; ও এই নূতন রাষ্ট্র, নূতন সমাজ, নূতন শিল্প সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে যত কিছু দুঃখ কষ্ট, অভাব দৈন্য বরণ করিয়া লওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ মনে হয়। তখন জাতির জীবনে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ফরাসীজাতির জীবনে এইরূপ একটি অধ্যায়। ফিউড্যাল রাষ্ট্র-প্রণালীতেই ফরাসীজাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, একীভূত হইয়াছিল, শিল্পে, সাহিত্যে, সম্পদে, যুদ্ধ বিগ্রহে, সভ্যতায় ইউরোপে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এই গৌরবে সাধারণ ফরাসী প্রজার কোন স্থানই ছিল না; ইহা অভিজাতশ্রেণীর, ফ্রান্সের রাজার গৌরব। সাধারণ ফরাসী প্রজারা রাজকর দিতে সর্ব্বস্বান্ত, অশনহীন, বসনহীন, অভিজাত প্রভুর অত্যাচারে উৎপীড়িত। এই দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে আশার বাণী শুনাইলেন অষ্টাদশ শতকের ফরাসী মনীষীগণ, দার্শনিকগণ, বিশ্বকোষপ্রণেতৃগণ। রুশো বুঝাইলেন যে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতার উৎস জনসাধারণ, সেই ক্ষমতা সাধারণের হিতার্থ প্রয়োগ করিবার জন্য রাজা জনসাধারণের প্রতিনিধিমাত্র। মন্তেস্কু বুঝাইলেন দেশের আইন-কানুন সাধারণের মঙ্গলের জন্য জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছার লিখিত প্রতিরূপ মাত্র। ভোল্‌তেয়ার্‌ ও বিশ্বকোষ প্রণেতৃগণ সমাজ, শাসনযন্ত্র, ধর্ম্ম, নীতি, সকল বস্তুকেই প্রজ্ঞার তীব্রালোকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিয়া গেলেন। বিদেশের সাহিত্য, বিদেশের চিন্তার ধারা এই সময়

ফরাসী দেশে প্রবেশ করিয়া, স্বাধীন উন্মুক্ত, উদার বহির্জ্জগতের বাণী আনিল। ফরাসী আর পুরাতন শাসনযন্ত্রের, পুরাতন ভেদ অত্যাচারের মধ্যে থাকিতে চাহিল না। নবলব্ধ জ্ঞান, চিন্তা, ভাবকে রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে, শিল্পে, সাহিত্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। বিপ্লব-স্রোতে পুরাতন সকল কিছুই ভাসিয়া গেল,—ভালও গেল, মন্দও গেল,—রাজা গেল, অভিজাতবর্গ গেল, পুরোহিত সম্প্রদায় গেল, প্রাচীন ধর্ম্ম গেল, উন্মাদনার মুখে মাস দিন বৎসরের নাম হিসাব ভাসিয়া গেল। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কোন ইতিহাসে যদি কেবল ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র পাওয়া যায়, যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্তর্বিপ্লবের বিবরণ মাত্র থাকে, তাহা হইলে সে ইতিহাস হইতে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কিছুই বোঝা যাইবে না। যে সকল ভাবকে, আদর্শকে ফরাসী জাতি বাস্তব-জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী মনীষীগণের যে সকল চিন্তায় ফরাসী জাতির মানসিক গগন সমাচ্ছন্ন ছিল, সেইগুলি জানিতে পারিলেই ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের মর্ম্মকথা জানা যায়।

তেমনই গত ইউরোপীয় মহাসমরের ইতিহাসকে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতির ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ইতিহাসরূপে দেখিলে তাহার কোন অর্থই হয় না। উনবিংশ শতকের শেষ হইতে বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত নীট্‌শে প্রমুখ জার্ম্মাণ দার্শনিকগণ যে অতিমানুষবাদ, হিরণ্যকুন্তল নর্ডিকজাতির বিশ্ববাসরে অধিকারবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন গত মহাসমর তাহার বাস্তব-জগতে প্রকাশ মাত্র।

তেমনই রুষ-রাষ্ট্রবিপ্লব Owen, Fourier, Karl Marx প্রভৃতি সাম্যবাদ প্রচারক-গণের চিন্তার বাস্তবজগতে বিকাশ মাত্র। রুষ-রাষ্ট্রবিপ্লবে নির্ম্মম কঠোরতা ও ভাবপ্রবণ স্নেহকোমলতার অদ্ভুত সমাবেশের হেতু অনুসন্ধান করিতে গেলে পাওয়া যাইবে রুষ কৃষকের গভীর দুর্দ্দশা, বিরাট অজ্ঞতা ও রাষ্ট্রচালনে সমগ্র জাতির অনভিজ্ঞতা।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বত্রই ঐতিহাসিক ঘটনার অঙ্কুর জাতির মানসিক জগতে পাওয়া যাইবে; তাহার চিন্তার ধারায়, তাহার ভাবৈশ্বর্য্যের বিশেষত্বেই এই সকল ঘটনার রূপ ও বেশের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক মনে করেন যে কোন জাতির ইতিহাসের সূত্র পাওয়া যায় সেই দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনে, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জাতি লালিত হয় তাহাতে। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। জাতির জীবনে আবেষ্টনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না; জাতির চিন্তা কোন আকারে ফুটিয়া উঠিবে, জাতির প্রাণশক্তি কোন পথে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই আবেষ্টনের দ্বারা নির্ণীত হয়। কিন্তু জাতির মানসিক সম্পদ, ভাবৈশ্বর্য্যই তাহার ঐতিহাসিক ভাগ্যের প্রধান নিয়ামক। যতদূর বিবরণ পাওয়া যায় গ্রীসের প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু, উত্তাপ, আর্দ্রতা, সুপ্রাচীন যুগ হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রায় একই রহিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীকদিগের আগমনের পূর্ব্বে গ্রীসের আদিম অধিবাসিগণ সেই প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে লালিত হইয়া, স্মরণীয় কোন কীর্ত্তিই রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আর প্রাচীন গ্রীকদিগের তিরোধানের পর সেই দেশে বসবাস করিয়া,

সেই জলহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া রোমান বিজেতৃগণ, বা তুর্কীগণ, বা মিশ্রজাতি আধুনিক গ্রীকগণও কোন কীর্ত্তিই রাখিতে পারেন নাই। প্রাচীন গ্রীকদিগের কীর্ত্তিকলাপের উৎস অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহাদিগের মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, গ্রীসের জাতীয় প্রতিভা বুঝিতে হইবে। গ্রীক মন ছিল সুকুমার, চঞ্চল, আনন্দময়, নমনীয়, সুন্দরের পুজারী, সুসঙ্গতি ও সৌষ্টবজ্ঞানে অতুলনীয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগ্রাহী। এই গ্রীক মন নির্ম্মল নীল আকাশের তলে, নীলসাগরের বুকে, ছোট ছোট নীল পাহাড়ের মধ্যে ছোট ছোট উপত্যকায় নীল বনানীর ছায়ায় নির্ঝরের কলতানে—পূর্ণতার, সৌন্দর্য্যের, সর্ব্বাঙ্গীন সুষমার অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সেই স্বপ্ন গ্রীকজাতি অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার স্থাপত্যে, নাট্যে, কাব্যে, দর্শনে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। এই গ্রীকমন কিন্তু তাহার কীর্ত্তি কলাপ বিস্তার করিতে পারিয়াছিল কেবল মাত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মাঝে; কোন বন্ধনের মধ্যে, পরাধীনতার পাশে পড়িলেই গ্রীক প্রতিভা নীরব হইয়া যাইত, তাহার নবনবোন্মেষশালিনী শক্তি তিরোহিত হইত। এসিয়া-মাইনরের গ্রীকগণ হোমর হেরোদোতস্‌কে জন্ম দিয়াছিল, গ্রীক জগতে সকল প্রকার শিল্প ও বিলাসিতার সৃষ্টি ও প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু পারস্য সম্রাটের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইবার পর তাহাদের জাতীয় প্রতিভা একেবারেই ম্লান হইয়া গেল, আর কিছুই সৃষ্টি করিবার শক্তি রহিল না। অথচ পারস্য সম্রাটের অধীনতা আদৌ অত্যাচার-কলঙ্কিত ছিল না বলিলেই চলে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে প্রাকৃতিক আবেষ্টন কোন জাতির প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করে নিশ্চয়, কিন্তু তাহাতেই জাতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মূলসূত্র অনুসন্ধান করা সমীচীন নহে। তাহার মূলসূত্র পাওয়া যাইবে জাতির মনে, জাতির প্রতিভায়।

কোন জাতির ইতিহাসকে এই ভাবে তাহার মানসিক জীবনের বহির্জগতে অভিব্যক্তি ধরিলে দেখা যাইবে যে এই অভিব্যক্তির পথ প্রায়ই চক্রাকারে বিবর্ত্তিত হয় (moving in cycles)। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কিছুকাল ধরিয়া একই আবেষ্টনের মধ্যে একই প্রকার জীবন যাপনের ফলে একটি জাতির (people) মনে রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সামাজিক আদান প্রদান, নীতি, ন্যায়-বিচার, শাস্তি, পবিত্রতার বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ ভাব জাগিয়া উঠে, একটা আদর্শ গড়িয়া উঠে। এই ভাবরাশি, এই আদর্শ, ক্রমে জাতির মনোজগৎ এরূপ অধিকার করিয়া বসে যে রাষ্ট্রীয় শাসন-প্রণালীতে, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের চিত্রে সেগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে সমগ্র জাতি ব্যগ্র হয়। এই ভাবরাশি, এই অমূর্ত্ত আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া জাতির জীবন-ধারা কিছুদিন আবর্ত্তিত হইতে থাকে ও সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে, কার্য্যে কল্পনায় ইহারাই প্রাণসঞ্চার করে। কালক্রমে জাতির মনের উপর এই সকল ভাবের, আদর্শের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসে, এ সকলের প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষিত হইয়া আসিতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, বিধি ব্যবস্থা, শিল্প, সাহিত্য এগুলির চতুর্দ্দিকে বিকশিত

হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের কান্তিও ম্লান হইয়া আসে; ক্রমে শিথিলমূল হইয়া সেগুলি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তখন মনে হয় জাতির জীবন-স্পন্দন মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিতেছে, বুঝি বা কখন অতর্কিতে থামিয়া যায়। এইরূপ অবসাদের সময় বাহিরের সামান্য আঘাতেই, বিদেশীর আক্রমণেই হউক, ধর্ম্ম-বিপ্লবেই হউক, জাতির যে কীর্ত্তি-কলাপ বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে সকল নিমেষেই ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়া যায়। জাতির সংস্কৃতি যখন পূর্ণ প্রাণবন্ত থাকে, তখন এরূপ কত আঘাতই হেলায় সহ্য করে, কিন্তু অবসাদের দিনে সামান্য আঘাত সহ্য করিবার শক্তিও থাকে না;—মনে হয় এ জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু কালক্রমে আবার কতকগুলি নূতন ভাব, নূতন চিন্তা জাতির হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, নূতন আদর্শ গঠিত হয় ও সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য আবার নূতন রাষ্ট্র-প্রণালী, নূতন সামাজিক ব্যবস্থা, নূতন রীতি নীতি, নূতন শিল্প-সাহিত্য জন্ম গ্রহণ করে, সৌন্দর্য্যে সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। আমরা বলি জাতির নব-জীবন-সঞ্চার (Renaissance) হইয়াছে। জাতি একই বা প্রায় একই আছে, কেবল তাহার মনোজীবনে একটা ক্রমবিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। এই জন্যই বলা হয়, যে জাতীয় সংস্কৃতি চক্রাকারে উন্নতির দিকে বিবর্ত্তিত হয় (cultural evolution proceeds in spirals)। মনে হয় অবনতির দিকে পিছাইয়া গিয়া আবার উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতের ইতিহাসে এইরূপ কয়েকটি বিভিন্ন যুগ লক্ষিত হয়। সর্ব্বাগ্রে প্রবল বৈদিক যুগ। এই যুগের ইতিহাস নাই। ভারতের প্রধান কলঙ্ক যে তাহার ইতিহাস নাই, ভারতবাসী ইতিহাস লেখে নাই, ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য। কিন্তু ভারতবাসী চিরকালই যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ ও ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতকে প্রকৃত ইতিহাসের আলেখ্যের ফ্রেমমাত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। এই ফ্রেমের মধ্যের ভারতবাসীর জীবন-যাত্রার আলেখ্যখানি তাঁহারা চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বৈদিক যুগের এই ফ্রেমখানি প্রায় নাই বলিলেই চলে। দুই চারিটি ঘটনা, দুই চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু ফ্রেমের এই ভগ্ন খণ্ডগুলি বৈদিক যুগের বিরাট চিত্রের কোন খানে বসান উচিত তাহা নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য। এই অপরিসর, অসম্বদ্ধ, আড়ম্বরহীন ফ্রেমের মধ্যে বৈদিক আর্য্যগণ তাঁহাদিগের জীবনের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, সেরূপ উজ্জ্বল চিত্র বোধ হয় আর কোন দেশেই নাই। আর্য্যগণের ভারতে প্রবেশ, বিজয় ও অভ্যুদয়ের সমস্ত ঘটনাই প্রায় গাঢ় তিমিরে আবৃত। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ কিরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, কোন কোন চারুশিল্প ও কারুশিল্পের চর্চা করিতেন, কোন কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, কিরূপ সমাজ-বন্ধনের মধ্যে বাস করিতেন, কোন কোন দেবতার উপাসনা করিতেন, ইহজীবনে কোন বস্তু তাঁহাদের কাম্য ছিল ও পরকালে তাঁহারা কি আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাঁহাদিগের অন্তরের আশা, কল্পনা, স্বপ্ন আমরা যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানি, এরূপ বোধ হয়, বর্ত্তমান কালের কোন দেশের কোন জাতির সম্বন্ধেও জানি না। অতএব বলিতে

হইবে প্রাচীন ভারতবাসীর ইতিহাসের আদর্শ আধুনিক ইতিহাসের অপেক্ষা বিভিন্ন, বোধ হয় উন্নততর ছিল। এই দিক দিয়া দেখিলে মনে হইবে প্রাচীন ভারতবাসী তাহার ইতিহাসের যেরূপ প্রচুর, বিচিত্র ও সর্ব্বাঙ্গীন উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন, সেরূপ আর কোন দেশে নাই।

বৈদিক যুগের অবসানে ভারতে একটি অবসাদের কাল আসিল। পুরাতন সমাজ-বন্ধন, রাষ্ট্রযন্ত্র, পুরাতন ধর্ম্ম, নীতি, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই শিথিলমূল মরণোন্মুখ হইয়া উঠিল। বৈদিক ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিলেন ভগবান বুদ্ধদেব। বৌদ্ধমতকে কেন্দ্র করিয়া আবার নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র, নূতন বিধি ব্যবস্থা, নূতন শিল্প সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। বৈদিক যুগের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপের তলে তলে ভারতবাসীর মনোরাজ্যে যে নূতন ভাবরাশি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, জাতির অবচেতনের মধ্যে যে নূতন সৃষ্টি চলিতেছিল, তাহা প্রকাশিত হইল বৌদ্ধ যুগের কীর্ত্তিকলাপে। বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিন্তা ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে মিশর ও গ্রীক জগতের উপকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল ও পূর্ব্বে চীন ও জাপানকে পরিপ্লাবিত করিয়া দিল। যে ভূখণ্ডের উপর দিয়া এই সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হইল, ইহা সে সকল দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, প্রাচীন ধর্ম্ম সমাজ বিধি বিধানের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ছিল সে সমুদয় আত্মসাৎ করিয়া লইল, অবশিষ্ট কোথায় ভাসিয়া গেল।

কালক্রমে এই ভূখণ্ডের অধিকাংশ স্থল হইতেই এই প্লাবনের স্রোত অপসৃত হইয়া গেল। কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র পল্বলে একটুকু আবদ্ধ হইয়া রহিল। Central Asian Excavationsএ ইহারই কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইতেছে।

কালক্রমে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা আবার শিথিল হইয়া আসিল, নানারূপ অনাচারে বৌদ্ধ আদর্শ ম্লান হইয়া আসিল, সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। এই দুর্দ্দিনে হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থান—Renaissance। বৈদিক ধর্ম্মের সহিত এই হিন্দুধর্ম্মের নাড়ীর সংযোগ থাকিলেও, তাহা হইতে ইহা নানাভাবে বিভিন্ন। ইহা আড়ম্বর পূর্ণ, প্রাকৃত মনের উপযোগী নানা দেবদেবীর উপাখ্যানে, কবিত্বপূর্ণ পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও তীর্থযাত্রার উৎসবে সমৃদ্ধ, নানা রত্নালঙ্কারভূষিত প্রতিমার আবাসস্থল কারুকার্য্যখচিত বিপুল বিচিত্র মন্দির দেবালয়ে, বাদ্যধ্বনিমুখর পূজারতিতে মনোরম। এই নবোত্থিত হিন্দুধর্ম্ম যেমন একদিকে প্রাকৃত মনকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম, তেমনই অদ্ভুত প্রতিভাশালী মহামনীষীগণের অতুলনীয় চিন্তাসম্ভারে গরীয়ান। ইহার মধ্যে অনেক কিছু আছে যাহার উৎপত্তি এখনও নিঃসংশয়ে বোঝা যায় না। মনে হয় যেন নির্ম্মল আর্য্য রক্তের সঙ্গে অনেকখানি অনার্য্য রক্ত মিশিয়া গিয়াছে, ইতিহাসের প্রায়ান্ধকারে অনেক অনার্য্য দেবদেবী, আচার নিষেধ আর্য্য দেবায়তনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ও তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম যেমন সকল স্তরের লোকের উপযোগী সুসমৃদ্ধ হইয়াছে, তেমনই তাহার বিশুদ্ধতার কিছু হানি

হইয়াছে। এই নূতন যুগে ভারতীয় আর্য্য প্রতিভার এমন একটি সর্ব্বতোমুখী বিকাশ দেখা যায় যাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে একমাত্র পেরিক্লিসের যুগের এথেন্সে মিলিলেও মিলিতে পারে। এই বিপুল সংস্কৃতির প্লাবন বহুদিন যাবৎ ভারতবর্ষে চলিয়াছিল। একাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে ইহা মন্দীভূত হইয়া আসিল। কত দিক দিয়া মানুষের জীবনকে এই যুগ পূর্ণতর, সমৃদ্ধতর করিয়া গিয়াছে তাহা এখনও আমরা ভালরূপ বুঝিতে পারি না, কারণ আমরাও ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহি।

যে মানসিক তেজ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আর্য্য ধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, দৃপ্তবক্ষে বিপক্ষের সমক্ষে যুগযুগান্ত সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আবার ক্রমে নিভিয়া আসিল, হিন্দু আদর্শ ম্লান হইয়া আসিল, গৃহবিচ্ছেদে ও কলহে আর্য্য মনের বিশুদ্ধি নষ্ট হইল। এমন সময় মুসলমানের ভারতে প্রবেশ। তাহাদিগের আঘাতে প্রাচীন রাষ্ট্র, প্রাচীন সমাজ অতি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। দ্বাদশ শতক হইতে উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি মূর্চ্ছিত ছিল বলিলেই হয়। বাঙ্গালার নব্য ন্যায়ের অভ্যুত্থান ব্যতীত এই সময় ভারতীয় প্রতিভা স্মরণীয় বিশেষ কিছুই করে নাই। বিধর্ম্মীর অত্যাচারে পাছে সমস্ত জাতি ভাসিয়া যায় সেজন্য তাহাকে সর্ব্বদাই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকিতে হইত, কোনরূপে টিকিয়া থাকিবার জন্য সমাজের চারিদিকে ক্রমাগত বেড়া উঠিতেছিল, প্রাচীর উঠিতেছিল। যে সকল অনুশাসন বিধিনিষেধ মনের বিশুদ্ধি, জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহাই শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়া সারা জীবনটাকে পাশবদ্ধ করিয়া ফেলিল। স্মার্ত্তদিগের এই সকল বিধি ব্যবস্থা আধুনিক শিক্ষিতদিগের উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কি বিপদের দিনে আত্মরক্ষার জন্য সেগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ভাবিলে উপহাস শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। এরূপ পঙ্গু জীবন কেবল বাঁচিয়া থাকা মাত্র। হয়ত আর কিছুকাল কাটিলে আর্য্য সংস্কৃতি প্রাচীন মিশরের সংস্কৃতির মতই বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

ভারতের আর্য্যপ্রতিভা যে এতদিন সুপ্তমাত্র ছিল, মরে নাই, তাহা বর্ত্তমানে ভারতের জাগরণ লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে। জ্ঞান গম্ভীর ইউরোপের আহ্বানে সে সুপ্তির ঘোর কাটিয়া যাইতেছে। ভারতবাসী কীটদষ্ট, ধূলিধুসরিত প্রাচীন পুঁথি ঝাড়িয়া লইয়া জ্ঞানের সাধনায় বসিয়াছে। বিশ্বসভায় জ্ঞান-বৃদ্ধ ভারতের বাণী, রামকৃষ্ণের বাণী, বিবেকানন্দের বাণী, রবীন্দ্রনাথের বাণী আবার শোনা যাইতেছে। বিলাসলিপ্ত ইউরোপের মোহ কাটিয়া যাইতেছে, আর্য্যপ্রতিভা আবার পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক-পূত পথে সত্যের সন্ধানে অমৃতের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এখনও আমরা পরানুকরণই করিতেছি, কিন্তু এই অনুকরণের অপরিসীম গ্লানি আমাদিগকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, শিল্পে, সাহিত্যে, শিক্ষাব্যবস্থায় যে নবজীবনের বোধন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহা তীক্ষ্ণদর্শন বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আমরা নবজীবনের উষাকালে দাঁড়াইয়া আছি, সে জন্যই বোধ হয় ইহার প্রথম কিরণ

সম্পাত ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। পিতৃগণের আশীর্ব্বাদ আমাদিগের অনন্ত-শিরে বর্ষিত হইতেছে; আবার ভারতের জীবন সৌন্দর্য্যে, পবিত্রতায়, সত্যে, জ্ঞানে, শৌর্য্যে মহনীয় হইয়া উঠিবে। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন একটি অমৃতত্বের বীজ আছে যাহা তাহাকে বহু শতাব্দীব্যাপী দাসত্ব, অত্যাচার, বিদেশী শিক্ষার মধ্যে সকল দুঃখ দুর্দ্দিনে অম্লান সুন্দর রাখিয়াছে।

ভারতের ইতিহাস এই সংস্কৃতির ইতিহাস, আর্য্যপ্রতিভার সকল ক্ষেত্রে ক্রম-বিকাশের ইতিহাস। ভারতবাসী জানে যে দৃশ্যমান বহির্জ্জগত কেবল অন্তরজগতের নামরূপে বিকাশ মাত্র। ভারতের ইতিহাস বুঝিতে গেলে আমাদিগকে ভারতের অন্তর জগতে প্রবেশ করিতে হইবে, বুঝিতে হইবে ভারত কোন মন্ত্রে দীক্ষিত, যুগযুগান্তর ধরিয়া কোন আদর্শের সাধনা করিয়া আসিতেছে ও সকল দিক দিয়া, রাষ্ট্রনীতিতে, সমাজনীতিতে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে কিরূপ ভাবে তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। কেবল রাজবংশের বিবরণ ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসই ভারতের ইতিহাস নহে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই রাজবংশ ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ সঙ্কলনেই আধুনিক গবেষকগণ সকলে ব্যাপৃত। এই রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠন এরূপ বিপুল উৎসাহে চলিতেছে যে ভারতের ইতিহাসের কোন প্রান্তই বোধ হয় আর অন্ধকার থাকিবে না। এই কার্য্যে তাম্রশাসন ও শিলালিপির পাঠোদ্ধার, মুদ্রা-পরিচয়, বিদেশী পর্য্যটকদিগের বিবরণ, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত সাহিত্য, চীন ও তিব্বতের ভাষায় যে সকল ভারতীয় গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল সেগুলির উদ্ধার,—সকল প্রকার বিদ্যারই সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে, উপাদান সংগৃহীত হইতেছে, আলোচিত হইতেছে, ব্যাখ্যাত হইতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের গুরু ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী। তাঁহাদিগের অনেকেই ভারতীয় জীবনের কিছুই জানেন না, ভারতের আদর্শের উপর কোন শ্রদ্ধা নাই, বরং একটা অহেতুক অবজ্ঞা আছে,—আর আমরাও অনেকে তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের উপরও একটা বিপুল অবজ্ঞা পোষণ করিতেছি। ফলে উপাদানের ভারে আমাদিগের গবেষকগণ ভারাক্রান্ত, কিন্তু শ্রদ্ধার অভাবে তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিতেছেন না। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। তাই কৌটিল্য অধ্যয়নকালে আমরা মেকিয়াভেল্লির অনুসন্ধান করি, কালিদাসের রস-সম্ভোগ করিতে সেক্সপীয়রের তুলনা মনে পড়ে। আমাদিগকে এই মানসিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে হইবে; স্বাধীনভাবে মূল গ্রন্থ, মূল অনুশাসনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় করিতে হইবে, ও তাহার অন্তর্নিহিত বাণী শুনিতে হইবে।

ভারতেতিহাসের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বা তাঁহাদিগের ভারতীয় শিষ্যগণের কার্য্যের নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। তাঁহারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জাতির ইতিহাসের প্রয়োজনীয় অংশ বটে, কিন্তু খুব বড় অংশ নহে; এবং ইহার পুনর্গঠনে ইঁহারা

এক একখানি করিয়া ইষ্টক বা প্রস্তর সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র। ইতিহাস-সরস্বতীর মন্দির গঠনে ইঁহারা সাধারণ শ্রমিক মাত্র, মিস্ত্রীও নহেন, ইঞ্জিনিয়ারও নহেন। ইহাদিগকে স্থপতি বলিলে মহা ভ্রম হইবে। ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিকের প্রতিভা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

প্রকৃত ঐতিহাসিক ভারতীয় চিন্তার ধারা বাহিয়া প্রাচীন আর্য্যগণের বিলুপ্তস্মৃতি দুর্গম আদিম জন্মভূমিতে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন, মন্ত্রদ্রষ্টা যজ্ঞরত আর্য্যঋষিগণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম চিন্তার সহিত পরিচয় করাইবেন, তাহাদিগের জীবনধারা অনুসরণ করিয়া অতীত হইতে বর্ত্তমানের অভিমুখে আমাদিগকে লইয়া আসিবেন; তিনি দেখাইবেন এই ধারা কোন্ পথ বাহিয়া, কোন ভীষণ গিরিকন্দরের মধ্য দিয়া, কোন সূর্য্যালোকিত হরিৎ ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া, কোন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির শাখা স্রোতে পুষ্ট হইয়া, দুই ধারে কীর্ত্তিকলাপ পরিবেশন করিতে করিতে আধুনিক জীবনের উন্মুক্ত স্রোতে পরিণত হইয়াছে। এই কার্য্যে যেরূপ বিপুল ও বিচিত্র জ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহৃদয়তার প্রয়োজন তাহা হয়ত অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক যে কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন, তাহা মানব-জাতির চিরকালের জ্ঞান ও আনন্দের উৎস হইয়া থাকিবে, মহাকালের বিচারে অমরত্ব লাভ করিবে।

ক্ষৌণী নায়ক ভীম

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

একাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর তৃতীয় বিগ্রহপাল মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল নামক পুত্রত্রয় রাখিয়া পরলোকগমন করিলে পর মহীপাল পালসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সত্য ও নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতঃ রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হন এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করেন। তাঁহার এইরূপ আচরণের ফলে এদেশে আর একবার প্রজাশক্তির প্রশংসনীয় বিকাশ সাধিত হয়। ইহার বিস্তৃত ইতিহাস আবিষ্কারের পূর্ব্বে কমৌলি তাম্রশাসন হইতে জানা যায়—

> তস্যোর্জ্জস্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
> পুত্রঃ পালকুলাব্ধিশীতকিরণঃ সাম্রাজ্যবিখ্যাতিভাক্।
> তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্ যথাবদ্যশঃ
> ক্ষৌণী-নায়ক-ভীম-রাবণ-বধাদ্যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ ॥

"নৃপতি বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল যুদ্ধরূপ সাগর লঙ্ঘন করিয়া ভীমরূপ রাবণকে বধ করিয়া জনকভূ বরেন্দ্রীরূপা সীতার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।" ইহাতে যে ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে পালরাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহা জনসাধারণের গোচরীভূত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। 'রামচরিত' ও সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে—রাজকীয় অনীতিক আচরণের ফলে বরেন্দ্রীর 'অনন্ত সামন্ত চক্র' সম্মুখ যুদ্ধে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপালকে বধ করিয়া গৌড় রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী বীরশ্রেষ্ঠ দিব্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে দিব্য রাজদণ্ড গ্রহণ করেন বটে কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির পর তিনি বেশী দিন বাঁচেন নাই। "তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হইলেন এবং জেঠার মহৎ কাজ সম্পূর্ণ করিলেন। এই ভীম যেমন বীর তেমনি বুদ্ধিমান্, আর খাঁটি কাজের লোক।" (১) ইতঃপূর্ব্বে দিব্যের সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রজাশক্তির উন্মেষ দেখিয়া নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রত্যাশী রামপাল শূরপালসহ জন্মভূমি পরিত্যাগ করতঃ মাতুলালয়ে রাষ্ট্রকূট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন (রামচরিত ১।৪০)।

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই ভীমের কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে সিরাজগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র দুর্গ প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টনী গঠন করতঃ বগুড়া, মহাস্থানগড়, বিরাট, কুড়িগ্রাম হইয়া ধুবড়ী পর্য্যন্ত এবং নওগাঁর নিকটস্থ 'ভীমসাগর' হইতে আরম্ভ করিয়া মালদহ পর্য্যন্ত প্রসারিত 'ভীমজাঙ্গাল' নামক সুবৃহৎ রথ্যা দুইটী বিশেষ

---

(১) দ্বিতীয় বার্ষিক দিব্য-স্মৃতি উৎসবে সভাপতি স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ।

উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে পুরাতন মন্দিরে প্রস্তরময়ী হরগৌরী ও জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি এবং শিবলিঙ্গকে স্থানীয় লোকে ভীমের প্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া অর্চ্চনা করে। 'ভীমপুর' 'ভীমের গোয়াল' নামক প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানসমূহ নীরবে তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। 'জাঙ্গাল'সমূহের কেন্দ্রভূমি অনুসরণ করিলে মহাস্থানগড়ের দিকে আসিতে হয়। মহাস্থান পালরাজগণের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর বর্ত্তমান পরিণতি। বরেন্দ্রী ভীমের হস্তগত হওয়ায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাজধানীর পার্শ্ব দিয়া তিনি এই সকল 'জাঙ্গাল' নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। 'জাঙ্গালের' পার্শ্বে মহাস্থান হইতে ২০ মাইল উত্তরে কতিপয় দীঘি, প্রাচীন ইষ্টক, দগ্ধ মৃত্তিকায় সমাচ্ছন্ন শালদহ নামক গ্রামকে লোকে ভীমের আদি বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—Sureswara the author of a Sanskrit Dictionary of Medical Botany, (২) who served under a king named Bhimpal, the ruler of Padi, perhaps the same Bhim, who wrested northern Bengal from the Pals for a time.—"বৈদ্যক শাস্ত্রের একখানা অভিধান সুরেশ্বর কর্ত্তৃক লিখিত হয়। ইনি পদীর রাজা ভীমপালের সভায় ছিলেন। সম্ভবতঃ এই ভীম পালদিগের হস্ত হইতে উত্তরবঙ্গ কিছুদিনের জন্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।" এই অনুমান সত্য হইলে শালদহ পদীরাজ্য কিনা তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। ভীম যে বিদ্বান্ ও গুণগ্রাহী ছিলেন তাহা ভীম প্রশস্তি হইতে পরে দেখাইব।

পলায়িত রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধার বিষয়ে একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষে পুত্র, সহচর ও মাতুলাদির পরামর্শে রাজ্যোদ্ধারের উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। ভীমের পিতৃব্য দিব্য অনন্ত সামন্ত চক্র-নির্ব্বাচিত নরপতি; ভীমও প্রথিতযশাঃ রাজা; সুতরাং তাঁহাকে পরাজিত করা রামপালের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। কাজেই তিনি মাতুল মহন ও মাতুল পুত্র শিবরাজ সহ ভূমের্বিপুলস্য ধনস্য চ দানতত্যাগাৎ অনুকূলিতঃ (রামচরিত ১।৪৫ টীকা)—ভূমি ও বিপুল অর্থ উৎকোচ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন। (৩) যখন এইরূপে সৈন্য সংগৃহীত হইতেছিল তখন বরেন্দ্র ভূমির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণার্থ সেনানী শিবরাজ প্রেরিত হন। তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের সম্পত্তির কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না এইরূপ আশ্বাস দিয়া স্থানে স্থানে ভীমের রক্ষা (জাঙ্গাল) ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন (১।৪৮,৪৯)। বৌদ্ধ রাজা মহীপাল কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রমী হিন্দুর উপর হয়ত কিছু অত্যাচার সংঘটিত হওয়ায় রামপাল কর্ত্তৃক তাহার সংশোধন চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ মধ্যে ভেদনীতির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারই মহিমায় এই হতভাগ্য দেশ নিরয়গামী হইয়াছে। স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন—তখন বোধ হয় ভীম নিজে উত্তরে ছিলেন।......যেই

---

(২) সুরেশ্বর 'শব্দ-প্রদীপ' নামক নামক অভিধান প্রনয়ণ করেন। J. S. B. 1907 page 206.

(৩) ১।২৫ শ্লোকের টীকারও উৎকোচের আভাষ আছে—"বুধান্ পণ্ডিতান্ অযূতৈরযাচিতৈর্দানৈর্দধতি"—পণ্ডিতদিগকে অযাচিত দানে বশীভূত করিয়া—" বিশেষ উদ্দেশ্যে অযাচিত দান উৎকোচের নামান্তর।

বরেন্দ্রী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল অমনি শিবরাজ গঙ্গা পারে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। (দিব্য-স্মৃতি উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ)।

অবশেষে পর্ব্বত অরণ্যানি পরিবেষ্টিত মগধ, পীঠে, দণ্ডভুক্তি, অপার মন্দার, কুজটী, কযঙ্গলী ইত্যাদি প্রধান প্রধান রাজ্যের চতুর্দ্দশজন মহামাণ্ডলিক ও মণ্ডলাধিপতির পশ্চাতে (৪) অপরেচ সামন্তাঃ—আরও বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতি রামপালের আহ্বানে বিপুল সৈন্য সম্ভার লইয়া বাঙ্গালার নবঘোষিত গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করিতে অগ্রসর হন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই অভিযান সম্পর্কে বলিয়াছেন—রাজগণ স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইয়া রামপালের সাহায্য করেন নাই, বালি বধের পর রাজ্য লাভের বিনিময়ে যেমন সুগ্রীব রামের সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারাও সেইরূপ অর্থ ও ভূসম্পত্তির বিনিময়ে রামপালকে সাহায্য করিতে সম্মত হন। (৫)

এই সময় বরেন্দ্রীমণ্ডলে কোটীবর্ষ বিষয়, গোকলিকামণ্ডল প্রভৃতি রাজ্য ও বিলাসপুর, শোণিতপুর বাণপুর প্রমুখ রাজনগরী বিদ্যমান থাকিলেও ভীমের বিরুদ্ধে সজ্জিত রাজন্যমণ্ডলী মধ্যে এই সকল রাজ্যের রাজার নাম নাই। রামপালের পক্ষভুক্ত রাজগণের মধ্যে কেহই যে বরেন্দ্রীর সামন্ত নরপতি ছিলেন না তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতেও প্রমাণিত হয়—

তস্য ম(মা)হাবাহিন্যাং গুপ্তায়াং তরণিসম্ভবেনাভূৎ।
দ্বিষমভিষেণয়তো মুখরিতদিক্কোলাহলঃ সমুত্তারঃ॥ ২।১০

"রামপাল শত্রুসেনাভিমুখে যাত্রা করিতে করিতে নৌকামেলকে গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া মহাবাহিনী লইয়া অপরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেন্যগণের সমুত্তার ব্যাপারে দিক্ কোলাহলময় হইয়াছিল।" স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলিয়াছেন—সামন্তগণ গঙ্গার অপর পার হইতে বরেন্দ্র ভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কেহই বরেন্দ্র ভূমির লোক হইতে পারেন না। (৬) এইস্থানে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভীমের রাজ্যে কোথাও বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই, এরূপ ঘটিলে মহাবাহিনী লইয়া রামপাল যখন বরেন্দ্রাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন তখন তিনি বিদ্রোহী সামন্তগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেন এবং এই সকল ঘটনা শত্রুপক্ষীয় কবি অসঙ্কোচে সাড়ম্বরে বর্ণনা করিতেন। পরে বর্ণিত ২।২১ শ্লোক হইতে বরং দেখা যায় যে সামন্ত রাজগণ ভীমের পক্ষভুক্ত ছিলেন।

রামচরিত বা অন্য কোথাও এই যুদ্ধে ভীমের বলাবল বর্ণিত হয় নাই। তবে প্রতিপক্ষের আয়োজনের এই বিপুলতা হইতে বরেন্দ্রীর তৎকালীন প্রজাশক্তির গুরুত্ব অনুভূত হয়। যাহা হউক ভীম স্বীয় রাজ্য মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অবাঙালী কর্ত্তৃক

---

(৪) পূর্ব্বে দ্বাদশজন রাজার রাজ্য পরিমাণকে মণ্ডল ও তাহার অধিপতিকে মণ্ডলাধিপতি এবং বহু সামন্তের অধীশ্বরকে মহামাণ্ডলিক বলা হইত।

(৫) ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত সিনেট হলের বক্তৃতা।

(৬) সিনেট হলের বক্তৃতা।

বাঙালীর এই সর্ব্বনাশের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকে রামপাল কর্তৃক ভীমের 'আবার'—সুরক্ষিত দুর্গস্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ভীম বাহিনীর অপূর্ব্ব সাহসিকতাও বীরত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত শ্লোকে কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে।

সহ(হা)সাবিঘটনয়া জীবগ্রাহগ্রাহিতাহিতপ্রবরম্
স্থুরদসমধামসম্পত্তিমীয়মানবলসংবাধম্॥ ২।১৭

টীকানুযায়ী ব্যাখ্যা—বিধি বিড়ম্বনাবশতঃ সেই শত্রুশ্রেষ্ঠ ভীম জীবিতাবস্থাতেই বলপূর্ব্বক রামপাল কর্তৃক ধৃত হইলেন। ভীমের সৈন্যগণ প্রতিপক্ষ সেনা কর্তৃক হন্যমান হইয়াও কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিল না।

বরেন্দ্রীর বীরসেনা সেদিন প্রজাশক্তির মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে যেভাবে রণক্ষেত্রে জীবনাহুতি দিয়াছে এবং রাজকবির ভাষায় উহা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা গঙ্গারাঢ়ীয়-গণের বীরত্ব বর্ণনায় মহাকবি ভার্জ্জিল ও প্রতিশোধকামী গৌড়পতির অনুচরবর্গের বীরত্ব বর্ণনায় কাশ্মীর কবি কহ্লনের ভাষা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভীমের পরাজয়ে তথা জন্মভূমির গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধে কবির হৃদ্গত ব্যাথারাশি রাজসভার আবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকে ভীমের বীরত্ব ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া তিনি বলিয়াছেন—

সম্যগনুগতরসাশেনা প্রথমসহোদরেণ রামেণ
ভীমঃ স সিন্ধুরগতোরণং রচয়তা কিলাবদ্ধি॥ ২।২০

টীকানুযায়ী ব্যাখ্যা—যুদ্ধরচনা দ্বারা পৃথিবী প্রাপ্তির আশাধারী রাজা রামপাল কর্তৃক ভূপতি ভীম যাহাতে খ্যাতির কোন হানি না হয় এই ভাবে হস্তিপৃষ্ঠে অবতিষ্ঠমান অবস্থাতে যেন দাবা খেলিবার কোঠে বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন।

তেনাবলম্বি পরো বিতীর্ণরত্ননিধিনা ধরিত্রীভৃৎ।
স স্ববলোহপগতায়া জনকভুবো বার্ত্তয়োৎসবং দধতা॥ ২:২৮

"বন্দীভূত ভীমনৃপতিরূপ শত্রু রামপাল কর্তৃক গজযূথ মধ্য হইতে অবতারিত হইয়াছিলেন। রামপাল শুভক্ষণে বরেন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন এই মঙ্গলময় বার্ত্তা প্রচার করিয়া প্রজাবর্গকে উৎসব করিতে আদেশ দিলেন।" কিন্তু সে দিন গণতন্ত্রের শেষ মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য উৎসর্গিত প্রাণ বরেন্দ্রীর বীর প্রজাবৃন্দ উৎসব করিল ভীমের সুহৃদ হরি নামক একজন সেনানায়কের নেতৃত্বে রণভূমে অবতীর্ণ হইয়া! তাঁহারা রামপালকে রাজা বলিয়া স্বীকারই করিল না। কবি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩০ হইতে ৩৫, ৩৮ হইতে ৪২ শ্লোকে হরি কর্তৃক রাজ্য এবং সৈন্যমধ্যে শৃঙ্খলা সম্পাদন চেষ্টা ও রামপালের সহিত যুদ্ধ এবং ৪৩ শ্লোকে হরির পরাভব বর্ণন করিয়াছেন। বন্দীভূত ভীম রামপাল কর্তৃক বিত্তপালসুহৃহস্তে সমর্পিত হন। (২।৩৬)

স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন বন্দীকৃত ভীম বরেন্দ্রের জনসাধারণের প্রিয়পাত্র। সুতরাং তাঁহাকে নিহত করিলে বিষম অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে আবার তাঁহাকে বরেন্দ্র ভূমিতে রাখিলেও বিপদের সম্ভাবনা থাকিত; হয়ত এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া রাজনীতিকুশল রামপাল ভীমকে সুদূরবর্ত্তী কোন প্রদেশে বন্দী করিয়া রাখেন। (৭) ২।৩৭ শ্লোক হইতে জানা যায় ভীম তাঁহার রক্ষকের সৌজন্যে শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার সুযোগে পলায়ন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে বহুসংখ্যক লোককে নিহত করতঃ যমরাজের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ২।৪৫ হইতে ৪৮ শ্লোকে হরির পরাজয়ে উল্লসিত রামপালের সহিত ভীমের পুনর্ব্বার প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং ৪৯ শ্লোকে রামপাল কর্ত্তৃক ভীমের শোকাবহ নিধন বর্ণিত হইয়াছে। ভীমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু জনসাধারণের বীর্য্য গরিমা চিরতরে অস্তমিত ও কলিঙ্গের মহাশ্মশানে অশোকের জয়পতাকার ন্যায় বীর বাঙ্গালীর চূর্ণীকৃত অস্থিপঞ্জরের উপর অবাঙ্গালী দ্বারা রামপালের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়।

এত কঠোর নিষ্পেষণেও বরেন্দ্রীর প্রজাগণ রামপালের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে নাই দেখিয়া তাঁহাকে অন্যবিধ উপায়াবলম্বন করিতে হইয়াছিল। নিম্নলিখিত শ্লোকে একটি উপায় বর্ণিত হইয়াছে—

ক্রূরকরাপীড়িতাসাবিতি ভর্ত্তুর্মৃদুকরগ্রহাৎ কৃপয়া
কৃষ্টোপচিতাং সপদি স্খলিতপ্রতিপক্ষমারদহনশুচম্॥ ৩।২৭

"রামপাল প্রজার মনোরঞ্জন ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য রাজস্ব হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন।"

"রামপালের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের জয় পরাজয় নহে। ইহা একটি মহাব্রতের অবসান কাহিনী। দিব্য কর্ত্তৃক এই মহাব্রত আরব্ধ হইয়াছিল; সেই ব্রত উদ্‌যাপিত হওয়ার পূর্ব্বেই রামপালের ক্রীতদাস সামন্ত রাজগণ তাহার ধ্বংস সাধন করিলেন,—কবির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এইরাজ্য সহজে রামপালের করায়ত্ত হয় নাই। প্রাচ্য দেশে সাধারণতঃ রাজা বা সেনাপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের অবসান হইত। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ভীমের পরাজয়ের পরও রামপাল বরেন্দ্রী অধিকার করিতে পারেন নাই। ভীমের সুহৃদ হরির নেতৃত্বে বরেন্দ্রের প্রজাগণ প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছিল, হরির পরাজয়েও এই যুদ্ধের মীমাংসা হয় নাই। ভীম পুনরায় ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া রামপালের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের প্রজাগণ যতদূর সাধ্য প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াও অঙ্গমগধাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে বরেন্দ্রের ক্ষুদ্রশক্তি জয়লাভ করিতে পারে নাই। ভাড়া করা সৈন্যের সাহায্যে রামপাল প্রজাশক্তি উন্মূলিত করিয়া পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু তিনি যাহা হারাইয়াছিলেন তাহা আর

(৭) সিনেট হলের বক্তৃতা।

ফিরাইয়া পাইলেন না। যে প্রজাশক্তি পালসাম্রাজ্যের সঞ্জীবনী শক্তির আধার ছিল অর্থবলে ক্রীত বিপুল সৈন্যের শাণিত তরবারির আঘাতে চিরদিনের নিমিত্ত তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। যে প্রজাশক্তির সাহায্যে আসমুদ্র হিমালয় পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহের উপর দিয়া শকট চালাইয়া রামপাল পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসেন," (৮) বাঙ্গালীর গণতন্ত্রের সহিত অবাঙ্গালীর রাজতন্ত্রের এই বিরাট সঙ্ঘর্ষের পর হইতে "মাৎস্যন্যায় নিবারণের অথবা অনীতিকারম্ভের প্রতীকারের অধিকার বিস্মৃত হইয়া গৌড়জন কালস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন" (৯) বলিয়া বঙ্গে বিদেশীয় সেন বংশের অভ্যুদয়।

রামচরিতে রামপাল অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র; বরেন্দ্রভূমি সীতা, শিবরাজ হনুমান, দিব্য ও ভীম রাবণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভীম সুহৃদ হরি কখন রাম (২।৩৮) কখন কুম্ভকর্ণ (২।৪৩) হইয়াছেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন, ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন প্রভৃতির সহিত রামচরিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে রামপালকে রামের সহিত তুলনা করা তৎকালীন প্রথারূপে দাঁড়াইয়াছিল। (১০) ব্যাস বা বাল্মীকির মন দুর্য্যোধন বা রাবণের দিকে ছিল না কিন্তু সন্ধ্যাকরের মন ভীমের দিকে ছিল। ১১

ভীমরাজের রাজ্য সীমা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া দিব্যস্মৃতি উৎসবের সভাপতিরূপে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্ব্বে করতোয়া ও প্রাচীন তিস্তা এর মধ্যকার দেশ। ভীম জাঙ্গাল সমূহের অবস্থান লক্ষ্য করিলে আমাদেরও অনুমান হয় বর্ত্তমানের সমুদায় উত্তর বঙ্গ ভীমের রাজ্য ছিল।

ক্ষৌণী নায়ক ভীমের প্রশস্তি রচনা করা কবির উদ্দেশ্য ছিল না। তথাপি পূর্ব্বের উদ্ধৃত কয়েকটী শ্লোকে তিনি ভীম চরিত্রের যে আভাষ দিয়াছেন ২।২১ হইতে ২৭ শ্লোকে তাহা পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন—

ভীম পক্ষীয় ভূপালগণ রক্ষাযোগ্য ব্যক্তিমাত্রেরই রক্ষক সেই ভীমকে আশ্রয় করিয়া রামপালরূপ শত্রুকে জয়শীল দেখিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২।২১

ভীম সমীপে বিপক্ষ নরপতিগণের দুর্ব্বার সর্ব্বপ্রকার বাহিনী সহস্র ভগ্ন বা বিফল হইয়া যাইত। ২।২২

---

(৮) ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত সিনেট হলে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বক্তৃতা।

(৯) রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদচন্দ্র প্রণীত 'গৌড়রাজমালা'—৬৭ পৃঃ।

(১০) শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিত 'মহীপাল প্রসঙ্গ'—প্রবাসী মাঘ, ১৩২১।

(১১) দিব্যের সহিত রাবণের তুলনা প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—রামপাল বংশের খোসামুদে কবি নিজ কাব্যে দিব্যকে রাবণ বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা মানিব কেন? দুজনার কাজ দেখিয়া মহীপালকে রাবণ এবং দিব্যকে দৈত্য নাশকারী অবতার বলিলে সত্য কথা হইত। দিব্য স্মৃতি উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

বহুতর রত্নরাজির আশ্রয়ে সরস্বতী বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীরূপে তাঁহাতে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। সেই সঙ্গে পরাজিত শত্রুলব্ধ অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন হইয়াছিল। ২।২৩

রাজা ভীমকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করিয়াছিল, সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিল, পৃথিবী কল্যাণ লাভ করিয়াছিল। ২।২৪

তিনি এই সমস্ত জগৎ পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কল্পতরু সদৃশ প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার সেবক ও অবিরল যাচকগণ অস্খলিতপদে আহোরণ করিয়া অবস্থিত হইতেন। ২।২৫

তিনি সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম হইতে মুক্ত ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে চন্দ্রকলা-শোভিত ভুজঙ্গম-ভূষিত দেব দেব মহেশ্বর ভবানীসহ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন। ২।২৬

তিনি বিপুল যশদ্বারা দিগ্‌ভিত্তি শোভিত করিয়াছিলেন। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না। ধর্ম্মবর্ত্ম অনুসরণ দ্বারা মহাশয়তা লাভ করিয়াছিলেন। ২।২৭

ইহা উত্তরাধিকারী, সামন্ত বা স্বরচিত প্রশস্তি নহে; সুতরাং ইহাতে অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই বরং সত্যপ্রকাশের কৃপণতা অনুমান করা যাইতে পারে। রাজ্য শাসনের সাফল্য সম্বন্ধে শত্রুপক্ষীয়ের নিকট এইরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ জগতে অতি অল্প সংখ্যক ভূপতির ভাগ্যে ঘটিয়াছে। প্রজাবর্গের হৃদয় রাজ্যে ভীমের রত্ন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে অরাতি কণ্ঠ হইতে কখন এরূপ প্রশংসাগীতি উচ্চারিত হইত না। এইরূপ সর্ব্ব-গুণান্বিত ভূপতি সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের অলঙ্কার স্বরূপ।

স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় দিব্যস্মৃতি উৎসবের সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন—ভীম অনেক বৎসর ধরিয়া বরেন্দ্র দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন—কিন্তু কত বৎসর তাহা রামচরিত বা অন্য কোথাও নাই। যাহা হউক দিব্য বা ভীম যত অল্প বা অধিক দিন রাজত্ব করুন না কেন তাঁহারা যে তাঁহাদের জন্মভূমির অতিশয় দুর্দ্দশার দিনে অতুলনীয় স্বদেশপ্রীতি প্রণোদিত অপূর্ব্ব বীরত্ব ও মঙ্গলময় ঐক্যে 'অরবিন্দেন্দীবরময় সলিল সুরভি-শীতল' 'পুণ্যভূ' বরেন্দ্রীর সুমতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, সেই ইতিবৃত্ত আজিকার বাঙ্গালীকে সুপথ প্রদর্শন করিবে।

টিপু সুলতানের লাইব্রেরী

শ্রীনক্ষত্রলাল সেন

গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। জগতের ইতিহাসে অতি প্রাচীন কালেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার প্রত্যূষে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন এশিরিয়া, বেবিলন ও মিশরে রাজকীয় গ্রন্থাগার বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। এশিরিয়ার রাজা আসুর-বাণি-পালের সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারটী এক্ষণে বৃটিশ মিউজিয়মের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র (এবং হয়তঃ সর্ব্বাপেক্ষা আদি কেন্দ্র) ভারতবর্ষও বহু যুগ ধরিয়া জ্ঞানানুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। এদেশেও বহুকাল যাবৎ গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নৃপতিগণ অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই বিষয়ে তাহাদের চেষ্টা ও উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেযুগে যখন মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই তখন ভূর্জ্জপত্রে, তালপত্রে এবং পরে তুলট কাগজে পুঁথি লিখিত হইত। হিন্দুযুগে মঠ, মন্দির ও রাজপ্রাসাদে হস্ত লিখিত পুঁথি সমূহ সাদরে রক্ষিত হইত। মুসলমান যুগেও কোন কোন নবাব-বাদশাহের আনুকূল্যে ও উৎসাহে পুঁথি লিখিত ও সংগৃহীত হইত এবং গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করিত। মুঘল সম্রাটদের নাম এ বিষয়ে বিশেষ স্মরণীয়। হতভাগ্য নরপতি হুমায়ুন ত নিজের গ্রন্থাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া প্রাণই হারাইলেন। বৃটিশযুগের প্রথম ভাগে এদেশের স্বাধীন নৃপতিদের স্থাপিত লাইব্রেরীর মধ্যে মহীশূরের শেষ স্বাধীন নরপতি টিপু সুলতানের মূল্যবান্ গ্রন্থাগারটি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

টিপু সুলতানের উপর অধিকাংশই ইংরেজ ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার করেন নাই। তাঁহারা টিপুর চরিত্র মসী-কলঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে টিপুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই। কিন্তু মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, টিপুর চরিত্রে নূতন করিয়া আলোকপাত করিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, তিনি পরানুগ্রহপেক্ষী ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না। ইংরাজের আশ্রয়ছায়ায় রাজ্য-ভোগ করা অপেক্ষা তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কেবল তিনিই ফরাসী দেশের নরপতি, তুরস্কের সুলতান, মস্কটের ইমাম, পেগুর রাজা প্রভৃতি বৈদেশিক নৃপতিদের সহিত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজ্য শাসনেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। রাজকার্য্যের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতেন এবং স্বহস্তে কর্ম্মচারীদের আদেশ লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি যে সর্ব্বদা পরধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন তাহাও ঠিক নহে। মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠে প্রাপ্ত সেই মঠের অধ্যক্ষ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যকে লিখিত টিপুর কতকগুলি চিঠিপত্র

হইতে জানা যায় যে, মারাঠা সৈন্য কর্ত্তৃক মঠ লুণ্ঠিত ও অপবিত্র হইলে তিনি সেই মঠে পুনঃ বিগ্রহ স্থাপনের ও পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার রাজ্যের মঙ্গলের জন্য পূজা দিতে শঙ্করাচার্য্যকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি কতগুলি প্রাচ্যভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং ফার্সী, উর্দ্দু ও কানাড়ী ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং অনেক আরবী ও ফার্সী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবসরের অধিকাংশ সময় নিজের লাইব্রেরীতে কাটিত। তাঁহার লিখিত চিঠিপত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি যখন রাজধানী হইতে অন্যত্র গমন করিতেন তখনও তাঁহার গ্রন্থাগার হইতে নিজের জন্য পুস্তক পাঠাইবার আদেশ করিতেন।

টিপু সুলতান ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন এবং মহীশূরের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়। টিপুর অন্যান্য জিনিষপত্রের সঙ্গে তাঁহার লাইব্রেরী ও চিঠিপত্র ইংরাজদের হস্তগত হয়। ইংরাজ শাসকবর্গ এই লাইব্রেরীটী রক্ষা করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উপহার দিতে মনস্থ করেন। বঙ্গদেশে সুপরিচিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এই সময়ে (১৮০০ খৃঃ) স্থাপিত হয়। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল ওয়েলেস্লীর আদেশে উক্ত লাইব্রেরী ফোর্টউইলিয়াম কলেজে স্থানান্তরিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট নামক জনৈক ইংরাজ উক্ত কলেজে ফার্সীভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যানুরাগী এই অধ্যাপকের দৃষ্টি এই জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি নিজকার্য্যের অবকাশে এই লাইব্রেরীর পুঁথি সমূহ পরীক্ষা করিতে মনস্থ করেন। কলেজ কাউন্সিলও এই কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করেন। গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করিতে স্বীকৃত হন এবং ষ্টুয়ার্টের সাহায্যের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চারিজন মৌলবী নিযুক্ত হয়। কিন্তু এই সময় বিলাত হইতে কতগুলি নূতন ছাত্র আসিয়া উক্ত কলেজে যোগদান করাতে মৌলবীদের পুনঃ শিক্ষকতায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ফলে ষ্টুয়ার্ট তাহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন। হুসেন আলী নামক জনৈক মৌলবীর সাহায্যে তিনি টিপু সুলতানের গ্রন্থ-সংগ্রহ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং সমগ্র লাইব্রেরীর তালিকা প্রনয়ণ করেন।

সমগ্র গ্রন্থাগারে প্রায় দুই সহস্র আরবী, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল। মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা বিভাগের সদ্‌গ্রন্থে এই গ্রন্থাগার পূর্ণ ছিল। ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতি-শাস্ত্র, কাব্য ও কবিতা, উপাখ্যান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, ভাষতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ের পুঁথি ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল। পুঁথিগুলি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত ছিল। নস্তালিক, নব্‌শখ প্রভৃতি নানা ছাঁদে অতি যত্নের সহিত পুঁথিগুলি লিখিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পুঁথি সুচারুরূপে অলঙ্কৃত ছিল। এইখানে ইহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মধ্যযুগে সুন্দর হস্তলিপি লিখন (ক্যালিগ্রাফী) একটী উচ্চাঙ্গের বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতবর্ষে মুসলমান যুগে

ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পাটনার খুদাবক্শ্ লাইব্রেরীতে ইহার নিদর্শন সম্বলিত অনেক পুঁথি সংরক্ষিত হইয়াছে।

টিপু সুলতানের লাইব্রেরীর অনেক গ্রন্থ হায়দর আলী ও টিপু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, কর্ণাট প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক গ্রন্থ আনীত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পাতা নষ্ট হওয়াতে গ্রন্থকারের নাম জানিতে পারা যায় না। অনেকগুলি পুঁথি শ্রীরঙ্গপত্তনে আনয়নের পর পুনঃ বাঁধান হইয়াছিল। এই সকল পুঁথির মলাটের মধ্যভাগে একটী পদকের মধ্যে ঈশ্বর, মহম্মদ, মহম্মদের কন্যা ফতিমা এবং ফতিমার পুত্র হাসান হোসেনের নাম অঙ্কিত ছিল। মলাটের চারিকোণে ছিল—প্রথম চারি খলিফা আবুবক্র্, ওমর, ওসমান্ ও আলীর নাম। মলাটের শীর্ষদেশে "সরকার-ই-খোদাদাদ" (ঈশ্বরের প্রদত্ত রাজ্য) ও নিম্নভাগে "আল্লা কাফী (ঈশ্বরই যথেষ্ঠ) এই কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল। কোন কোন গ্রন্থ টিপু সুলতানের নামের স্বকীয় মোহরাঙ্কিত ছিল। এই পুঁথিগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—সাধারণতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব অথবা সুফী ধর্ম্ম। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থই টিপু সুলতানের প্রিয় ছিল। তাঁহার নিজেরও গ্রন্থ প্রনয়ণের আকাঙ্ক্ষা ছিল; কিন্তু তৎরচিত কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার নিজের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে নানা বিষয়ের প্রায় পঞ্চাশখানা গ্রন্থ রচিত ও অন্য ভাষা হইতে অনূদিত হইয়াছিল।

টিপু সুলতানের এই গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পারস্য ভাষার উন্নতি সম্বন্ধে পরিচয় জন্মিবে। ইউরোপ যখন অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এশিয়া তখন সাহিত্য ও বিজ্ঞানে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এই গ্রন্থাগার তাহারও নিদর্শন স্বরূপ। তদুপরি ইহা হইতে টিপুর সমসাময়িক কালে এদেশে বিদ্যাচর্চ্চার আভাস পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পুঁথিই ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হইয়াছে; সামান্য কিছু কিছু এশিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে আছে। নিম্নে এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্পদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল।

এই গ্রন্থাগারে ইতিহাস ও জীবনী সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান লেখকগণ ইতিহাসচর্চ্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন। এশিয়া, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য ও অন্যান্য দেশের নানা ইতিহাসে টিপুর গ্রন্থাগার পূর্ণ ছিল।

ইহাদের মধ্যে 'রৌজৎ-উল-সফা' নামক গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা প্রাচ্য সাহিত্যের একখানা মূল্যবান্ গ্রন্থ। আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের মধ্যে এই গ্রন্থ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই গ্রন্থ প্রাচ্য দেশে সাতিশয় সমাদৃত। এই গ্রন্থের রচয়িতা মহম্মদ্ বিন্ খাওয়ন্দ সাহ্রিন মহম্মদ। তিনি সাধারণতঃ মীরখন্দ্ নামে পরিচিত। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ভাগ্যবিপর্য্যয়বশতঃ তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বল্থ্ নগরীতে বাস করিতে

থাকেন। প্রথম জীবনে তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরবর্ত্তী কালে ইতিহাস চর্চ্চা আরম্ভ করেন। আলী শের নামক জনৈক মন্ত্রী তাঁহাকে সাহিত্য চর্চ্চায় উৎসাহিত করেন। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ রুগ্নশয্যায় রচিত হইয়াছিল। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার গ্রন্থ সাতটী ভাগে বিভক্ত; তদুপরি ইহার সহিত একটী উপক্রমণিকা ও একটী পরিশিষ্ট সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের মুখবন্ধে ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ও শাসকবর্গের নিকট ইহার উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম ভাগ পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস, আলেকজাণ্ডারের জীবনী, মহম্মদ, প্রথম চারি খলিফা ও দ্বাদশ ইমামের জীবনী; ওমায়েদ, আব্বাস ও সেলজুক্ বংশ, গজনী ও ঘোরের রাজবংশের ইতিবৃত্ত, চৈঙ্গিস ও তৈমুরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে হিরাট নগরী ও খোরাসানের অন্যান্য স্থানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বনে আরও বহু এই জাতীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

ইহার পরেই আর একখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'খুলাসাত্ উল-আখ্বার' এই গ্রন্থের রচয়িতা খন্দেমীর। ইহার পুরা নাম গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ বিন্ হুমামউদ্দীন। গ্রন্থকার হিরাট নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া মুঘল সম্রাট্ বাবর ও হুমায়ুন কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহার গ্রন্থও এশিয়ার একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস। ইহা পূর্ব্বোক্ত মীরখন্দ্ রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা, দশটী ভাগ ও পরিশিষ্ট ছিল। পুস্তকের বর্ণিত বিষয় মীরখন্দের গ্রন্থের অনুরূপ।

খন্দেমীর আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "হাবিব-অল্-সিয়ার" নামক গ্রন্থও এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছিল। অতঃপর এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত তারিখ্-ই-তবরী নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা প্রাচীন আরবের এক মূল্যবান্ ইতিহাস।

এতদ্ব্যতীত এশিয়ার ইতিহাস সম্পর্কিত অন্যান্য যে সব গ্রন্থ ছিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) রৌজৎ-উল তাহিরিন; (খ) তারিখ-ই-মুসবী—মুইন উদ্দীন রচিত য়িহুদীদের ইতিহাস; (গ) দারাব নাম:—ইহাতে দরায়ুস, ফিলিপ, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; (ঘ) জাফর নামা:—সরফুদ্দীন্ আলী ইয়েজদী বিরচিত তৈমুর সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এই গ্রন্থ ফরাসী গ্রন্থকার La Croix কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; (ঙ) তৈমুর ও তাঁহার রাজসভাস্থ বিদ্বজ্জন ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির কাহিনী সম্বলিত আর একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস; (চ) তারিখ্-ই-অফী:—মুঘল সম্রাট্ আক্বরের আদেশে এক বিদ্বজ্জনগোষ্ঠী কর্ত্তৃক মুসলমান জগতের এই ইতিহাস রচিত হয়; (ছ) মীন্হাজ-ই-সিরাজ বিরচিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস তব্কাৎ-ই-নাসিরী। এই গ্রন্থ

দাসবংশের নরপতি নাসির উদ্দীনের সময় রচিত হয় এবং তাঁহার নামে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হয়। ইহাতে আরব, পারস্য ও ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমূহ এশিয়ার সাধারণ ইতিহাস। এক্ষণে টিপুর গ্রন্থাগারে কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় যে সব গ্রন্থ ছিল তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। ভারত ইতিহাসের বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান :—

(ক) তবকাৎ-ই-আক্‌বরী :—নিজামুদ্দীন আহম্মদ বিরচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

(খ) ফিরিস্তার স্বনামখ্যাত ইতিহাস :—মহম্মদ কাশিম ফিরিস্তা এই গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন।

(গ) মুন্তাখাব্-উল-লুবাব :—খাফি খাঁ বিরচিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

(ঘ) ইকবল্‌নামা-ই-জাহাঙ্গীরী :—জাহাঙ্গীরের ইতিহাস।

(ঙ) শাহ্‌জাহান নামা :—সম্রাট শাহ্‌জাহানের ইতিহাস।

(চ) আলমগীর নামা :—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব কাহিনী।

(ছ) ময়াশীর-ই-রহিমী :—আব্দুর রহিম খাঁন খানানের কাহিনী পূর্ণ গ্রন্থ।

(জ) ময়াশীর-ই-আলমগীরী :—ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস।

(ঝ) লতায়েফ-উল-আখ্‌বার :—দারার কান্দাহার অভিযানের কাহিনী।

(ঞ) কানাড়ী ভাষায় রচিত মহীশূরের রাজবংশের কাহিনীর পারস্য ভাষায় অনুবাদ। টিপুর আদেশে ইহা অনূদিত হয়।

ইহা ব্যতীত বাহ্‌মনী রাজ্যের ইতিহাস, সের শাহ, বাহাদুর শাহ, ফেরক্‌শিয়ার, খাঁজাহান লোদী প্রভৃতির ইতিবৃত্ত মূলক গ্রন্থ ও রক্ষিত হইয়াছিল।

কাব্য ও কবিতা :—

প্রাচীন পারস্য বহু কবির জন্মভূমি। পারস্য ভাষায় রচিত কাব্য ও কবিতা এখনও জগতের সর্ব্বত্র কাব্যামোদীদিগের নিকট বিশেষ সমাদৃত। টিপুর গ্রন্থাগারে ফার্সী কবিতার বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছিল। নিম্নে কেবল প্রসিদ্ধ কয়েকখানার নামোল্লেখ করা হইতেছে :—

(১) জমি বিরচিত ইউসুফ-ও-জুলেখা।

(১) দেওয়ান-ই-আনওয়ারী :—আনৃওয়ারীর নানা বিষয়ের কতকগুলি উত্তম কবিতার সংগ্রহ।

(৩) জালাল উদ্দীন রুমীর মসনবী :—রুমী বিরচিত কবিতার গ্রন্থ।

(৪) কুল্লিয়াৎ-ই-সাদী :—সাদীর বিখ্যাত কাব্য সমূহের সংগ্রহ।

(৫) দেওয়ান-ই-সাদী :—সাদীর কবিতা সংগ্রহ।

(৬) বোঁস্তা :—সাদীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(৭) আমীর খসরুর কয়েকটী কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ।

(৮) শিরী-ফরহাদ; (৯) হাফিজের দেওয়ান; (১০) ফৈজী কর্ত্তৃক "নল-দময়ন্তী"র অনুবাদ; (১১) শাহ্‌নামা।

উপাখ্যান :—

(১) আন্‌ওয়ার-ই-সুহেলী :—সদুপদেশ পূর্ণ ভারতীয় উপাখ্যানের অনুবাদ।

(২) হিন্দী হইতে অনূদিত উপদেশ মূলক কতকগুলি গল্প।

(৩) সোলোমনের গল্প।

বিজ্ঞান :—

(১) জামি-উল-উলুম্ :—সমগ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। ইহাতে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কৃষিতত্ত্ব, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

(২) জবাহির নামা :—বহুমূল্য প্রস্তর ও খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে রচিত পুস্তক।

(৩) আরবী হইতে অনূদিত প্রাণী বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানা বহি।

(৪) উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও প্রকৃতি বিজ্ঞান মূলক সচিত্র গ্রন্থ :—টিপুর আদেশে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা হইতে এই গ্রন্থ অনূদিত হয়।

(৫) ভারতীয় গণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে দুইখানা গ্রন্থ।

(৬) তাহ্‌রির্-ই-উক্লিদাস্ :—গ্রীক্ হইতে ইউক্লিডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ।

(৭) অভিসেন্না প্রণীত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কানুন-ফিল টিব্ব্"। ইহার পুরা নাম ছিল আবু আলী অল-হুসেন্ ইব্‌ন্ সিনা। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নামেই তিনি সুপরিচিত। ইনি মধ্যযুগে তাঁহার বিদ্যাবত্তার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল এবং তিনি নানা বিষয়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার গ্রন্থ ইউরোপের কোন কোন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত শারীরতত্ত্ব, গোচিকিৎসা ও গ্রহনক্ষত্র বিষয়ক বহুগ্রন্থ এই গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল।

দর্শন :—

(১) অভিসেন্না প্রণীত প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ "শিফা"। ইহাতে দর্শন, তর্কবিজ্ঞান, অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

(২) আরিষ্টটলের দর্শনের আরবী অনুবাদ।

(৩) যোগবাশিষ্ঠের ফার্সী অনুবাদ।

(৪) দারা কর্ত্তৃক পারস্য ভাষায় অনূদিত উপনিষদ।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ব্যতীত এই গ্রন্থাগারের জন্য অভিধান, ব্যাকরণ, ব্যবহারশাস্ত্র, হদীশ্, সুফীধর্ম্মও নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। নানা স্থানের মূল্যবান্ অনেক চিঠিপত্রও এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছিল। চিঠি লিখিবার রীতি সম্বন্ধেও কয়েকখানা বহি ছিল।

একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমগ্র গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। গ্রন্থাগারস্থ কয়েকখানা প্রধান প্রধান গ্রন্থের নামোল্লেখ করিলাম মাত্র। আশাকরি ইহা হইতে সকলের টিপু সুলতানের মূল্যবান গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সম্ভার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা জন্মিবে।

বিজ্ঞান-শাখার প্রবন্ধ

জড় বিজ্ঞান ও নিসর্গ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি-এস-সি

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশ মাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে জড় বিজ্ঞানের দুইটী মূল সূত্র—রিলেটিভেটী (Relativity) ও কুয়াণ্টাম্ (Quantum) তত্ব—অভিনব প্রভায় প্রভাম্বিত হইয়া উঠিয়াছে। চিন্তাধারার এই নূতন বন্যার আঘাতে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে নিসর্গের এক নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষুদ্র মানবশিশু যখন ধরাপৃষ্ঠে আগমন করে, তখন থাকে তাহার চেতনাশক্তি, অনুভবোপযোগী মন ও চিন্তাশক্তি। প্রথমে, বহির্জগৎ বিষয়ে কোন জ্ঞানই তাহার থাকে না। ক্রমে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত বাহ্য জগৎ যে তাহা হইতে একটা স্বতন্ত্র সত্তা, তাহাই সে অনুভব করিতে শিখে। তাহার শিশু জীবনের যাহা কিছু অনুভূতি তাহা এই বাহ্য জগতের প্রতিঘাতেই সমুৎপন্ন; সেই জন্যই সে ইহার অধ্যয়নে নিয়ত হয়। অভিজ্ঞতা হইতেই সে নানা প্রাকৃতিক রীতিনীতি ধারণা করিতে সক্ষম হয় ও প্রকৃতির একটা রূপ সে দেয়। সেই রূপ তাহারই অভিজ্ঞতাপ্রসূত, উহা প্রকৃতির প্রকৃত রূপ হইতে পারে না। কিন্তু তাহার কল্পিত রূপই সত্য রূপ কিনা তাহার বিচার করিবার সাধ্য তাহার নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইবে যে, বাহ্য জগৎ একটা আছে; আর তাহার কল্পনার সাহায্যে বাহ্য জগতের এমন একটা রূপ যদি সে দিতে পারে যাহা আরও দশ জনের কল্পিত রূপের তুল্য হয়, তবেই হইবে সে বৈজ্ঞানিক।

মানুষের প্রদত্ত নিসর্গের রূপ, সে তাহার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান প্রভাবে দিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানই একই প্রক্রিয়ায় গৃহীত। দেহ যন্ত্রের নার্ভ ও মস্তিষ্কের কার্য সমবায়েই আমরা বাহিরের জ্ঞান আয়ত্ত করি। কিন্তু বাহিরের যে অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছায় তাহা অনেকটা টেলিগ্রাফের কোডের ভাষায়। সেই কোডের ব্যঞ্জনা দেয় মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে। মানুষের এই অবস্থা অনেকাংশে নির্জন কারার অধিবাসীর তুল্য। সেই কারাবাসী বাহিরের যে সংবাদ পাইবে তাহাতেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বাহিরে গিয়া সত্যাসত্য নির্ধারণের সাধ্য তাহার নাই। এ যেন অন্ধের পক্ষে পরের মুখে শুনিয়া সূর্য্যাস্ত-শোভা উপভোগ করা বা বধিরের সঙ্গীত-রস উপলব্ধি করা। অথচ বহির্জগতের কোন জ্ঞানবান্ মহামানব তাহার কারাকক্ষে উপনীত হইয়াও তাহাকে বাহিরের সংবাদ জ্ঞাপন করিতে পারিবে না। কারণ সেই ভাষা সে বুঝে না। কারাবাসী মানব বুঝে তাহার ইন্দ্রিয়ের ভাষা। তাহার ইন্দ্রিয় সাহায্যে বাহিরের যে সামান্য আভাস সে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেই সে কল্পনা করে বহির্জগতের একটা রূপ। আর এই প্রকারে বহির্জগতের কোন ন্যায়ানুমুদিত রূপ প্রতিষ্ঠা করাই বিজ্ঞানের কার্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের নিকট জড় জগৎ ছিল নানা পদার্থের সংহতি, যাহা দেশে নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু কালসহকারে পরিবর্তিত হইত। তাহার নিকট জড় জগৎ দর্শক হইতে স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা রূপে ব্যবস্থিত ছিল। সে দূরে বসিয়া উহা পর্য্যবেক্ষণ করিত। দূরবীক্ষণ সহযোগে আকাশের গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করার মত সেও নির্লিপ্ত ভাবে জড় জগতের নানা অভিব্যক্তির আলোচনা করিত। তাহার নিকট বাহ্য জগৎ স্বয়ং সিদ্ধরূপে অবস্থিত ছিল। ধরাপৃষ্ঠে মানবের উদ্ভবের পূর্বেও তাহা ছিল আর সৃষ্টি হইতে মানবের লোপ হইয়া গেলেও তাহা থাকিবে। এই ভাবে সে ক্রমে ধারণা করিতে শিখিল যে দৃষ্টে ও সত্যে কোনও পার্থক্য নাই। নিসর্গের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহাই উহার সত্য রূপ। দার্শনিক চিরকালই বলেন "Things are not what they seem"—কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহা মানিতেন না। তাহা হইলেও এই দার্শনিক তত্ত্বের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। আর বৈজ্ঞানিকও কখনও তাহার জ্ঞান বিশ্বাসের যাথার্থ্য নিরূপণে প্রয়াসী হন নাই। কারণ তিনি দেখিলেন তাহার কল্পিত বাহ্যজগতের রূপ-সাহায্যে জড়বিজ্ঞানের তত্ত্ব সমূহের মোটামুটি সমাধানে কোন অসুবিধা হয় না। কখনও অসুবিধা উপস্থিত হইলে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে—এই প্রকার মনোভাব লইয়া বৈজ্ঞানিক নিশ্চেষ্ট রহিলেন।

সেই অসুবিধা কিন্তু আসিল—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে; আর তাহার ফলেই বিংশ শতাব্দির জন্য অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। এখন আর বৈজ্ঞানিক নিসর্গকে পৃথক সত্তা বলিয়া মনে করেন না। এখন তাহার এই বিশ্বাস যে, তাহার নিসর্গ তাহারই মনগড়া জিনিষ। তিনি যে রূপ দিবেন নিসর্গও তাহার নিকট সেই রূপেই প্রতিভাত হইবে। কুয়াণ্টাম তত্ত্বের নূতন অবদানে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নিসর্গকে বুঝিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যে প্রথা অবলম্বন করেন, তাহাতে নিসর্গের সত্য রূপ অস্পষ্ট ও নষ্ট হইয়া যায়। কোনও বনানীর অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যে প্রবেশ ও তন্ন তন্ন অনুসন্ধান প্রয়োজন; কিন্তু তাহাতে বনানী বহু প্রকারে বিপর্যস্ত হইবে, তাহার পূর্ব্বের শ্রী আর থাকিবে না। সুতরাং পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে জ্ঞান পাওয়া গেল তাহা সেই বনানীর সত্য রূপের জ্ঞান নহে। কোনও মরুভূমিতে সঞ্চরণ করিয়া তাহার নানা দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে বায়ুতে ধূলিকনা উত্থিত হইয়া মরুভূমির আর এক অভিনব মূর্তি প্রতিভাত করিবে। মরুভূমি বা বনানীর রূপ, ব্যোমযান আরোহন করিয়া শূন্যমার্গ হইতেও অবলোকন করা যায়। আর তাহা হইলে পরীক্ষা জনিত রূপ পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ থাকিবে না। কিন্তু এখানে আবার আর এক বিপদ। এইভাবে ঠিক পর্য্যবেক্ষণ ত হইল না। দূর হইতে গৃহীত এই জ্ঞান,—ইহাও ত সত্য রূপের আভাষ প্রদান করিল না। এই জ্ঞান অনেকাংশে পরোক্ষ জ্ঞান। ইহাতে সত্য মূর্ত্তি প্রতিভাত হয় না।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। প্রাচীন হিব্রুজাতি মনে করিত আকাশের রামধনু একটী বাস্তব সত্য—ভগবান ও মানবের প্রীতিবন্ধনের প্রতীক রূপে

আকাশে সংস্থাপিত হয়। কিন্তু সকলেই জানে যে রামধনুর উক্ত প্রকার জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। সূর্য্যালোক বৃষ্টির বারিকণার উপর পতিত হইলে নিজ স্বভাবে নানা বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সেই সকল রশ্মিজাল কোন লোকের চক্ষে পতিত হইলেই, সে রামধনু দেখে। যেহেতু একই রশ্মি যুগপৎ দুই জন লোকের চক্ষে পতিত হইতে পারে না, সুতরাং দুই জন লোক দুই স্থানে দাঁড়াইয়া ঠিক একই রামধনু দেখিতে পায় না। প্রত্যেকের দৃষ্ট রামধনু তাহারই চক্ষে সৃষ্ট। রামধনু কোনও বাস্তব পদার্থ নহে। যদিও বৃষ্টিকনা বা সূর্য্য বাস্তব বটে। রামধনু সেই বাস্তব পদার্থ গুলির আত্মগত মনোনয়নে সমুৎপন্ন।

রামধনু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অপসরণ করে; সেইরূপ নিসর্গও আমাদের অনুসরণ করে। আমরা যে গতিতে ধাবমান, নিসর্গও ঠিক একই গতিতে ধাবমান হয়; সেই জন্য আমাদের স্থির বা গতিশীল কোন অবস্থাতেই নৈসর্গিক নিয়মের কোনও প্রকার ব্যত্যয় দেখা যায় না। কিন্তু এই সকল উপমা সর্ব্বাংশে তুল্য নহে। এই আলোচনা হইতে একটী সত্য এই পাওয়া যায় যে এতকাল বিজ্ঞান যে সকল বিষয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিল এখন দেখিতেছে যে, তাহাদিগকে গ্রহণ না করিলে জড় জগৎ সম্যক বোধগম্য হয় না।

সুতরাং এই দাঁড়াইল যে আমাদের বাহ্য জগৎ এক মন গড়া জিনিষ মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া নিসর্গের কোনও বাস্তব সত্তা নাই বলিলে চলিবে না। আছে বৈ কি। তবে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানে সে সত্তা ধারণার অতীত। তাহাকে বুঝিবার জন্য যে সকল পরীক্ষা প্রয়োগ করি, তাহাতে তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রামধনু আমাদের আত্মগত মনোনয়নে সংজাত বটে কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে আলোর কারণ স্বরূপ সূর্য্যের বাস্তবতা। বাহ্য জগতের প্রকৃত রূপ ধরিতে হইলে "আমি"টাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। "আমি"টাকে বাদ দিয়া নিসর্গের রূপ ব্যক্ত করাই বিংশ শতাব্দীর জড় বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা।

সংখ্যাবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীশুভেন্দু শেখর বসু

ইংরাজীতে Statistics কথা এসেছে জার্ম্মানী "Staaten Kunde" কথা থেকে। তবে এই শব্দটীর মূল খুজলে আমরা যেয়ে পৌছই গ্রীকসভ্যতার এরিষ্টটলের যুগে। এরিষ্টটল তাঁর লেখা Politeiai বইএ ১৫৮টী বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে এর অনেকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু এথেন্স সম্বন্ধে যে বিবরণ আজও বর্ত্তমান, তাতে এথেন্সের শাসন পদ্ধতি, বিচার প্রণালী, ধর্ম্মাচরণ, আচার ব্যবহার, বহিঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে এথেন্সের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইতালী, ফ্রান্স এবং হলাণ্ডে দেশের বিভিন্ন বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সবার চেয়ে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনায় জার্ম্মান পণ্ডিতরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ষষ্ঠদশ শতকের মাঝামাঝি সিবাষ্টিয়ান ও মুনষ্টার জার্ম্মান দেশের এক ভৌগলিক বিবরণ প্রকাশ করেন; এতে অঙ্ক ও গণিতের সাহায্যে অখণ্ড বর্ণনা সূক্ষ্মভাবে বিবৃত হয়েছে। সেকেণ্ডরফ্ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মান রাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতি ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ লিখেছেন এবং এই গ্রন্থকে আশ্রয় করেই এক সম্প্রদায় জার্ম্মান অধ্যাপক হারমান কনরিঙের নেতৃত্বে "Staaten Kunde" প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ধারা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে নানা দিকে প্রধাবিত হতে লাগল। কনরিঙের শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য একেনওয়ালের (১৭১৯-৭২) নাম। ইনিই প্রথম Statistics শব্দ ব্যবহার করেন এবং কোন রাষ্ট্রের ব্যাপক বিবরণকে Statistics আখ্যা দেন।

আমাদের দেশে এই ধরণের Statistics অতি প্রাচীন কাল থেকেই বর্ত্তমান ছিল। খৃষ্টজন্মের তিন শতাব্দী আগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচিত হয়। অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রশাসনের অতি বিস্তারিত বর্ণনা দেখা যায়। বর্ত্তমান রাষ্ট্রের অতি জটিল ব্যাপারও এতে আলোচিত হয়েছে।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য লিখেছেন—রাষ্ট্রের গ্রামগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়—যে গ্রাম কোন রাজস্ব দেয় না, তাদের নাম পরিহারক; যে গ্রাম সৈন্য সরবহার করে, তাদের নাম আয়ুধ্য; যে গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা রাজস্ব দেয় তার নাম হিরণ্য, আর যে কাঁচা মাল দেয় তার নাম কুপ্য। রাজাকে বিনা পারিশ্রমিকে সেবা করে তারা বিষ্টি এবং যারা দুগ্ধ জাত দ্রব্য দেয়, তারা করপ্রতিকার।

গ্রামের হিসাব রক্ষক গোপ—তার কাজ গ্রামের সীমানা নির্দ্দেশ করা; সমস্ত জমিকে কর্ষণযোগ্য বা কর্ষণের অযোগ্য ভাগে বিভাগ করা; আবাদী জমি ফলের বাগান, ফুলের বাগান, বন জঙ্গল, মন্দির এবং দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে পরিমাপ করা; গ্রামের

জলসেচের ব্যবস্থা, পানীয় জলের সুবিধা, গোচারণের মাঠ, জনসাধারণের পথ যথাযথ স্থির করা।

সমস্ত গ্রামে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের জনসংখ্যা নির্দ্দেশ করতে হবে। কৃষক, বণিক, শিল্পী, ক্রীতদাস এবং কেজো লোক হিসাব ভাগ করিয়া গণনা করতে হবে এবং গ্রামে দ্বিপদ ও চতুষ্পদজন্তর সংখ্যা নির্ণয় কোরতে হবে। প্রতি পরিবার হতে কি পরিমাণ স্বর্ণ ও বিনাব্যয়ে কার্য্য পাওয়া যেতে পারে, তাহারও একটা হিসাব দিতে হবে।

এই নিয়মানুসারে গ্রামের হিসাব রক্ষক তার কাগজপত্র তৈয়ারী করিত। ফলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য প্রতিগ্রামে সংগৃহীত হইত এবং বর্ত্তমানের Statistical abstract না থাকলেও রাজপুরুষরা সমস্ত কার্য্যে রাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করত।

মুসলমান রাজত্বকালে Statistics এর প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সম্রাট আকবর শাহের আমলে মন্ত্রী ছিলেন আবুলফজল—আইনী আকরবী তাঁরই রচনা। এই গ্রন্থের মধ্যে বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের নানাবিধ তথ্য অতি বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাজত্বের বিস্তার, জনসংখ্যা, শিল্প, অর্থ সম্পদ, খনিজ বস্তু সমস্ত সরকারী ভাবে সংগ্রহ করে একত্র প্রকাশিত হয়েছে।

এই সমস্ত আলোচনা করলে আমরা Statistics শব্দের মূলগত অর্থ অনুভব করি। "Stato" একটী ইতালিয়ান শব্দ; এই ভাষায় Statistica অর্থে একজন মানুষ, যার কাজ রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করা। সুতরাং Statistics এর সহজ অর্থ—এমন সমস্ত তথ্যের প্রণয়ন, যা রাষ্ট্রনায়কের প্রয়োজনে লাগতে পারে। প্রাচীন কালে বহুব্যাপার শুধু বর্ণনায় প্রকাশিত হত, সংখ্যাদ্বারা তাদের মাপ সম্ভব হত না। বর্ত্তমান যুগের সুক্ষ্ম পরিমাপ আসতে বহু বিলম্ব হয়েছে।

Statistics এর একটা দিক যেমন রাষ্ট্রের সুক্ষ্ম বর্ণনা, এর আর একটা দিক তেমনি নিছক গণিত। তবে এই গণিতের একটা গভীর বিশেষত্ব আছে। বিজ্ঞানের এক অংশ ব্যষ্টির নিয়ম অনুসন্ধান করেছে; বস্তু বিশেষের গতিনির্দ্দেশ, শক্তির প্রয়োগে বস্তুর ব্যবহার এই শাস্ত্রের বিষয়ীভূত, বিজ্ঞানের আর এক অংশ ব্যষ্টিকে অতিক্রম করে সমষ্টির ধর্ম্ম আলোচনা করা। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বাতাসের ধর্ম্ম উল্লেখ করতে পারি।

এক পাত্রের মধ্যে অবরুদ্ধ বাতাস বহুসংখ্যক অনুর সমষ্টি, এই ক্ষুদ্র অনুগুলি অনুক্ষণ সঞ্চরণ করছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই পরস্পর সংঘাতের ফলে গতি পরিবর্ত্তন করে নূতন গতি সৃষ্টি করছে। অবরোধকারী পাত্রের উপর এই ক্ষুদ্র কণাগুলি দলে দলে সবলে সংহত হচ্ছে। এই ধাবমান ব্যষ্টির সমষ্টি কিন্তু স্থির হয়ে আছে। তার তাপমান, তার চাপ একেবারে স্থির। ব্যষ্টি যেখানে চির চঞ্চল, সমষ্টি সেখানে স্থির হয়ে থাকতে পারে এবং সেই জন্যে ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে আমরা সমষ্টির গুণাগুণ আলোচনা করতে পারি। পদার্থ

বিজ্ঞানে সমষ্টিবিচার একটা অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই নিয়ম অবলম্বন করে বর্ত্তমান যুগে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু পদার্থকণার মধ্যে নয়, আলোককণার রাজ্যেও এই সমষ্টি বিজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয় নিয়ম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সমষ্টিবিজ্ঞান আলোচনা করতে গেলে এক নূতন গণিতিকতত্ত্বের সন্ধান করতে হয়, যার নাম দেওয়া যেতে পারে—সম্ভাবনাতত্ত্ব বা Theory of Probability। সম্ভাবনা কথা আমাদের চলতি কথার অন্তর্গত, আমরা সর্ব্বদাই বলে থাকি, শীতকালে বৃষ্টিপড়ার সম্ভাবনা কম, বা যারা পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী, জগতে উন্নতি করার সম্ভাবনা তাদের খুবই বেশী। একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারি, একথা বলার পিছনে আছে আমাদের অভিজ্ঞতা। আমরা দেখেছি, শীতকালে বৃষ্টি খুব কমই হয়ে থাকে, সুতরাং ভবিষ্যতের এক শীতকালে বৃষ্টি কম হবে এই হল আমাদের যুক্তি। যদি শীতকালে কোনদিনই বৃষ্টি হয়েছে বলে কারও কোন অভিজ্ঞতা না থাকত, তাহলে আমরা সম্ভাবনার মাপকাঠির শেষ প্রান্তে যেয়ে বলতুম, শীতকালে বৃষ্টি হওয়া অসম্ভব অর্থাৎ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই শূন্য।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—আমরা জানি আমাদের সরকারী হিসাবের খাতা থেকে, গত……আমাদের বাংলা দেশে……হাজার ছেলে এবং…… হাজার মেয়ে ভুমিষ্ট হয়েছে। সুতরাং আমরা এর থেকে অনুমান করতে পারি, কোন শিশুজন্মের সময় পুত্রসন্তান হবার সম্ভাবনাই কিছু বেশী।

বেশী কম বলতে গেলেই মাপের কথা আসে। আমরা বলেছি, সম্ভাবনা বেশী বা কম; এই সম্ভাবনাকে এক মাপকাটী দিতে পারলে, আমাদের তুলনা আরও সূক্ষ্ম হবে। এই প্রশ্ন নিয়েই কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য বা আয়তনের মাপ করা হয়ে থাকে। সম্ভাবনার মাপ দৈর্ঘ্য বা ওজনের মাপ নয়, এর মাপকাঠি একবারে ভিন্ন রকমের।

একটা পয়সা যখন শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, সেটা মাটিতে পড়তে পারে দুভাবে। যদি তার দুই পিঠই একরকম হয়, রাজার মুখ উপরে পড়বার সম্ভাবনা যতখানি, নীচে পড়বার সম্ভাবনাও ঠিক ততখানি। সুতরাং ১০০ বার একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলে, ৫০ বার রাজার মুখ থাকবে উপরে, ৫০ বার থাকবে নীচে। পয়সা না ছুঁড়েই আমরা এ কথা বলছি; কারণ পয়সার দুপিঠ যদি সমান হয়, রাজার মুখ ৫০ বারের বেশী বা ৫০ বারের কম কোনটাই হতে পারে না (এটা আমাদের সমান বলার মধ্যেই রয়েছে) সুতরাং তা কি ৫০ বারই হতে হবে। সম্ভাবনার মাপকাঠিকে আমরা একশ'র হিসাবে বলতে পারি, রাজার মুখ পড়বার সম্ভবনা শতকরা ৫০ বার আর না পড়বে শতকরা পঞ্চাশ। দুয়ে মিলে একশ; কারণ এই দুটী অবস্থা, তার কোন তৃতীয় অবস্থা নেই। তেমনি আমরা বলতে পারি, শিশুজন্মের সময়, পুত্রসন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা শতকরা……এবং কন্যাসন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা শতকরা……। এ গেল দুটি সম্ভাবনার কথা। তেমনি অনেকগুলি ব্যাপারের পৃথকভাবে বা একত্র সম্ভাবনার কথাও আমরা সহজে কল্পনা করতে পারি। ৫২ খানা তাসের মধ্যে

যে কোন একটা বিশেষ রংএর তাস বার করার সম্ভাবনা আমরা সহজেই বার করতে পারি। আবার যে কোন দুটি বা ততোধিক বিশিষ্ট তাস একত্র পাবার সম্ভাবনাও একই নিয়মে নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এই—আমরা বলেছি একটী পয়সার রাজার মুখ পড়ার সম্ভাবনা শতকরা ৫০, আর রাজার না পড়ার সম্ভাবনা শতকরা ৫০। এখন যদি কেউ কষ্ট করে, একশবার একটা পয়সা ছুঁড়ে লিখে রাখে, কতবার রাজার মুখ উঠেছে, সেটা কি ঠিক পঞ্চাশ হবে?

একশবার ছোঁড়ায় একশ এক রকম ফল সর্ব্বশুদ্ধ হওয়া সম্ভব। যেমন, সবগুলিই রাজার মুখ, অর্থাৎ ১০০ বারই রাজার মুখ, ৯৯ বার……শেষ পর্য্যন্ত একবারও নয়। এই ১০১টী ঘটনার যে কোনটীর একটা ১০০ বার পয়সা ছোঁড়া পরীক্ষায় ঘটবেই ঘটবে। গণিতের সাহায্যে দেখান যায়, এই একশ একটা ঘটনার প্রত্যেকটী ঘটবার একটা সম্ভাবনা আছে। তবে সেই সম্ভাবনাগুলি মোটেই সমান নয়। এ কথা সহজেই বোঝা যায়, ১০০ বার পয়সা ছুঁড়লে একশ বারই রাজার মুখ পড়ার সম্ভাবনা অতি অল্প আবার তেমনি ১০০ বারই রাজার মুখ নীচে পড়ার সম্ভাবনা তেমনিই অল্প। পয়সার দুপিঠ যদি সমান হয়, ৫০।৫০ পড়বার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশী; তবে ৪৯।৫১ বা ৪৮।৫২ ইত্যাদি পড়বার সম্ভবনাও যথেষ্ট। যতই ৫০ থেকে দূরে যাবে ততই সে ঘটনার সম্ভাবনা ক্রমেই কমতে থাকে এবং সবার চেয়ে কম হবে, ১০০ রাজার মুখ বা ০ রাজার মুখ।

এই বিষয়টী Stalisticsএ বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য; সংক্ষেপে আমরা উপপাদ্য বিষয়টী আর একভাবে বলতে পারি। একটী ধাতুখণ্ডের ওজন স্থির করতে গেলে কোন পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাবরেটারীতে আমরা ৫০ বার বা ১০০ বার মানদণ্ডে সেই বস্তুটীর ওজনের পরিমাণ করি। পরিমাণগুলি সব এক হয় না—পরীক্ষার ফলে কিছু কম বেশী দেখা যায়, তখন নিয়ম এই, সব পরিমাণগুলির গড় পড়তা নির্দ্ধারণ করে এই মধ্যমানকেই বস্তুর ওজনের শ্রেষ্ঠ পরিমাপ ধরা হয়। সেই একই বস্তু আর একজন ছাত্রের হাতে কিছু ভিন্ন মধ্যমানে পরিণত হতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে, বস্তুর ওজন কোনটী? এর উত্তর বস্তুর একটা চরম ওজন আছে যা কেউ জানে না। আমরা ভিন্ন প্রক্রিয়ায় শুধু এই চরম ওজনের একটা পরিমাপ করি মাত্র। প্রত্যেক পরীক্ষার ফলই এক একটী পরিমাপ, কেউই সেই চরম পরিমাপ নয়। ফলে পরিমাপগুলি সেই চরম পরিমাপের উপরে এবং নীচে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। পরীক্ষার সংখ্যা আমরা যত বৃদ্ধি করতে থাকব, ততই আমাদের পরিমাপ চরম পরিমাপের নিকটবর্ত্তী হতে থাকবে।

মনে করা যাক, আমরা বাজারে কমলা লেবু কিনতে গেছি এক বিশেষ ভোজের ব্যাপারে। আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই, টক লেবু কিনব না। বাজারে নানা লোক লেবু বিক্রয় করছে—তাদের লেবুতে কারও হয়ত শতকরা ৫টা টক লেবু আছে, কারও শতকরা ১০টা এমনি নানা সংখ্যায় টক লেবু ভিন্ন টুকরীতে রয়েছে। যদি আমি নিশ্চিন্ত হতে

চাই যে, সব লেবুর স্বাদ জেনে তবে লেবু কিনব, তা হলে সব লেবুগুলিকে আমাদের খেয়ে দেখতে হয় কিন্তু তা হলে নিমন্ত্রিতদের আর দেবার থাকবে না; যদিও লেবুর স্বাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে। এটা নিশ্চয়ই কাজের কথা নয়। তা হলে কি, পরীক্ষা না করে শুধু চোখ বুজে যে ব্যাপারীকে সামনে পাই তার লেবু কিনে নেব? পাকা লোক মাত্রেই বলবেন, ৫।৭টা লেবু চেকে দেখলেই হয়। Statistics ও সেই কথাই বলে। এই নিয়মানুসারে আমাদের উচিত সমস্ত ঝুড়ি থেকে না বেছে একেবারে আন্দাজে ৫টা লেবু তুলে নিয়ে পরীক্ষা করা—যদি পাঁচটার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ টক লেবু পাওয়া যায়, সেখান থেকে অবিলম্বে বিদায় নিতে হবে। সাধারণ জ্ঞানে এই খানেই আমরা শেষ করি। সংখ্যা শাস্ত্রে আর এক ধাপ এগিয়ে যাই। সংখ্যাশাস্ত্র বলে, সমস্ত লেবুর ঝুড়িতে কতকগুলি আছে মিষ্টি লেবু, কতকগুলি টক। এর সঠিক পরিমাণ করতে গেলে আমাদের সব লেবুগুলি পরীক্ষা করা দরকার। তা না করে, আমরা সমস্ত লেবু থেকে একটা নমুনা নিয়েছি এবং সেই নমুনা পরীক্ষা করে বলতে চাই, যে লেবু পরীক্ষা করি নি, তার সম্বন্ধে একটা তথ্য। কোন বস্তুর অংশ বিশেষকে পরীক্ষা ক'রে তার সমগ্র রূপের বর্ণনা করায় বিপদ আছে ভুল হবার, এটা হল inductive Logicএর সহজ উপপাদ্য। সুতরাং সংখ্যাশাস্ত্র সে দিকে না যেয়ে বিষয়টাকে অন্যদিকে আলোচনা করেছে। এর মতে, নমুনা থেকে আমরা টক লেবুর যে অনুপাত পেয়েছি, তার সূক্ষ্মতা (বা ভুল) কতখানি তাই স্থির করা দরকার। সেই সূক্ষ্মতা জানলেই আমাদের পরিমাপ কতখানি নির্ভরযোগ্য তা সহজেই ঠিক করতে পারব। একটী উদাহরণ দিই ধরা যাক, আমি এক হাজার মিষ্টি লেবু চাই কিন্তু বাজারের সেরা লেবু পরীক্ষা করেও দেখেছি ১০টীতে ২টী টক লেবু বেরিয়েছে। এই লেবু আমি কতগুলি কিনলে, আমায় সবার সামনে লজ্জিত হতে হবে না?

পাটীগণিতের হিসাবে যদি ১০টীতে ২টী বাদ যায়, ১০০ পেতে হলে আমায় সাড়ে বারশ লেবু কিনতে হবে। এখন প্রশ্ন এই আমি একটী নমুনা থেকে ১০এর মধ্যে ২টী টক লেবুর সন্ধান পেয়েছি। এই অনুপাত হিসাবের একটা ভুল ত হতে পারে সুতরাং এর উপর নির্ভর আমি করতে পারি না। সংখ্যাশাস্ত্রের মতে ১।১০ অনুপাতের ভুল প্রায় ৯।১০০। যদি প্রায় নিরাপদ হতে হয়, তবে সাড়ে বারশ না কিনে আমাদের কিনতে হবে অন্ততঃ ১৬০০। যে ভুল অপরিহার্য্য, তাকে উপেক্ষা না করে তার একটা পরিমাণ করে কাজে লাগানই Statisticsএর অতি আধুনিক বিশেষত্ব। আমাদের প্রতি পরিমাপেই ভুল হচ্ছে, তার কারণ যন্ত্রের দোষ, আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধতা, এমনি ছোট খাট অনেক কিছু যা কোন রকমেই অতিক্রম করা যায় না। সুতরাং এই ভুলকে স্বীকার করে নিয়ে, আমরা তার পরিমাণ করব এবং আমাদের সমস্ত বিচারকে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়কে যাচাই করে নেব।

সংখ্যাশাস্ত্রের এই নিয়মটী বহু প্রয়োজনে লেগেছে। পদার্থ বিজ্ঞানের দুইটী বিভিন্ন পরিমাপের তুলনামূলক বিচার করতে এই নিয়মটীর অতি প্রয়োজন। অতি বিখ্যাত

একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আইনষ্টাইন তার আপেক্ষিক তত্ত্বে প্রমাণ করেছিলেন, আলোকরশ্মি কোন বস্তু পিণ্ডের সান্নিধ্যে তার সরল রেখাপথ ত্যাগ করে বক্রপথে ধাবিত হয় কিন্তু আলোকরশ্মির বেগ এত বেশী যে বক্রগতির পরিমাণ অতি অল্প। এই অদ্ভুত তথ্য প্রমাণের জন্য দুটী পরীক্ষা করা হয়েছিল, একটী সোব্রালে আর একটী প্রিন্সাইপে।

পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, সোব্রালে রশ্মিপথের যে ব্যতিক্রম হয়েছে, তার পরিমাণ কোণের মাপে ১'৯৮ সেকেণ্ড। এক সমকোণের নব্বই ভাগের এক ভাগ এক ডিগ্রি, তার ৬০ ভাগের এক ভাগ এক মিনিট, তার ৬০ ভাগের এক ভাগ এক সেকেণ্ড। এই সেকেণ্ডের মাপে মাত্র দুই সেকেণ্ড ব্যতিক্রম। এখন প্রশ্ন এই, এই দুই সেকেণ্ড যন্ত্র, পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির ভুল হতে আসতে পারে কি না। সমস্ত বিষয় থেকে দেখা গেল, ভুলের পরিমাণ '১২ সেকেণ্ড। সুতরাং যেখানে ভুলের পরিমাণ '১২ সেকেণ্ড, সেখানে কেবল ভুলের জন্য ১'৯৮ সেকেণ্ড পরীক্ষার ফল হওয়ার সম্ভাবনা এক লক্ষে একের চেয়ে কম। সুতরাং যেদিন পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন, এই যে আলোরশ্মির ব্যতিক্রম আলোকচিত্রে ধরা পড়েছে, ইহা সত্যকার বস্তু, পরীক্ষার ভুল নয়। এমনি অতি সূক্ষ্ম ব্যাপারে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় ভুলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা; তাছাড়া সত্য সিদ্ধান্তে আসার আর কোন উপায়ই মানুষের নেই।

কৃষিবিজ্ঞানের এক অতি প্রয়োজনীয় কাজ দুই বা ততোধিক বিভিন্ন ধান বা গমের উৎপাদন শক্তি তুলনা করা। এই ব্যাপারটী নির্ভুলভাবে করবার জন্য নানাপ্রকার সংখ্যাশাস্ত্রানুমোদিত নিয়ম আছে। মনোবিজ্ঞানের, এবং শিল্পাদি ব্যাবসায়ের আছে অনেক তথ্যের যথাযথ অর্থবোধ করতে সংখ্যাশাস্ত্রের প্রয়োজন। দিন দিন তাই এর পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে এর চর্চ্চা অতি অল্পই ছিল কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় এখানে সংখ্যা-শাস্ত্রের চর্চ্চা এখন কিছু ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয়েছে। শোনা যায়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, সংখ্যাশাস্ত্রের আলোচনা বৃদ্ধি পেলে আমাদের নিজেদের অবস্থা এবং তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে চিন্তাকরার উপযুক্ত ব্যবস্থা হতে পারবে।

চিকিৎসা-শাখার প্রবন্ধ

আয়ুর্ব্বেদের খাদ্য বিজ্ঞান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

কয়েকদিন পূর্ব্বে খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতেছিলাম। দেশবরেণ্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার অন্যতম রচয়িতা। বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম যে ইহাতে নব্য খাদ্য-তত্ত্বের যাবতীয় বিষয় সুচারুরূপে আলোচিত হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া মনে হইল যে পাশ্চাত্য খাদ্য-বিজ্ঞানের গবেষণা এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে যে আজ ইহা একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে —এই প্রাচীন ভারতবর্ষে—কি খাদ্য-বিজ্ঞান বলিয়া কিছুই ছিল না? ভারতের তেত্রিশ কোটী লোকের খাদ্য-সমস্যার বিধান কি প্রাচীন ঋষিরা কিছুই দেন নাই? ভারতের দর্শন-শাস্ত্র জগদ্বিখ্যাত, ইহা সমগ্র বিশ্বের মনিষীদের দ্বারা সমাদৃত। ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান পৃথিবীর আদি চিকিৎসাশাস্ত্র। ব্রহ্মা-প্রসূত এই শাশ্বত আয়ুর্ব্বেদ স্বস্থাতুর পরায়ণ। আতুরের রোগোপশমন করা যেমন আয়ুর্ব্বেদের ধর্ম্ম। স্বস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও ঠিক সেইরূপ। জাতির স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে সেই দেশের খাদ্য-বিচার করা একান্ত আবশ্যক। তাই আয়ুর্ব্বেদের মধ্যেই আমরা বিস্তৃতভাবে খাদ্য-বিচারের কথা দেখিতে পাই। আজ আমি আপনাদিগকে এই প্রাচ্য খাদ্য-বিজ্ঞানের সামান্য একটু আভাষ দিব।

উপযুক্ত আহার যে স্বাস্থ্য রক্ষার মূল কারণ তাহা আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও খাদ্য-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ ঘোষণা করিতেছেন। সেই ঘোষণার ফলে বড় বড় রাজপুরুষেরাও আজ দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষিগণ এই বাণীই প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন,— "বলায়ুষী হি আহারায়ত্তে"—বল ও আয়ুঃ উভয়ই আহারের অধীন। সুশ্রুত তাঁহার গ্রন্থারম্ভেই বলিলেন, "আহার প্রাণিদিগের বল, বর্ণ ও ওজঃ ধাতুর মূল"। "আহার হইতেই শরীরের বৃদ্ধি ও আরোগ্য এবং ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতা; আবার সেই আহারের বৈষম্যেই অস্বাস্থ্য।" কিন্তু খাদ্যদ্রব্য ইষ্ট গন্ধ-বর্ণ-রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট এবং বিধিবিহিত হওয়া চাই। তবেই উহা জীবগণের প্রাণস্বরূপ হইবে। দুই হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে মহর্ষি আত্রেয় তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—'হিতাহারোপযোগ এক এব পুরুষস্যাভিবৃদ্ধি করো ভবতি। অহিতাহারোপযোগঃ পুনর্ব্যাধিনিমিত্তমিতি।" অর্থাৎ একমাত্র হিতকর আহারই পুরুষের অভিবৃদ্ধির কারণ এবং অহিতাহার সেবনই ব্যাধির কারণ। ঠিক যেন এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আজ পাশ্চাত্য খাদ্যতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্‌ক্যারিসন বলিতেছেন যে অনুবীক্ষণ

যন্ত্রের সাহায্যে কেবল পোকা মাকড় অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে একমাত্র উপযুক্ত ও হিতকর খাদ্যই স্বাস্থ্যোন্নতির সর্ব্বপ্রধান কারণ এবং অনুপযুক্ত ও অসাত্ম্য আহারই রোগোৎপাদনের প্রধানতম হেতু ;—"The right kind of food is the most important single ("এক এব") factor in the promotion of health and the wrong kind of food the most single factor in the promotion of disease."

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ বলেন, আহার ছয়টি রসের আয়ত্ত। সেই ছয়টি রস বিভিন্ন আহার-দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দ্রব্যে যে ছয়টি মাত্র রস আছে, ইহা একদিনে মীমাংসিত হয় নাই। বহু গবেষণা ও তর্ক বিতর্কের ফলে তবে এই মীমাংসা হইয়াছিল। এইরূপ এক মীমাংসা-সভার উল্লেখ আমরা চরক-সংহিতায় দেখিতে পাই। রসের দ্বারা আহার বিষয় নিশ্চয় করিবার জন্য একদা আত্রেয়, ভদ্রকাপ্য, হিরণাক্ষ্য, ভরদ্বাজ, রাজা বার্য্যোবিদ, বৈদ্যশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ মহর্ষিগণ রমণীয় চৈত্ররথ বনে মিলিত হইয়াছিলেন। (যেমন আজ আপনারা সাহিত্যালোচনা করিবার জন্য পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে সমবেত হইয়াছেন।) সেই সভায় সকলেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করিলেন। ভদ্রকাপ্য বলিলেন, রস এক প্রকার। উহা পঞ্চেন্দ্রিয়েরঅন্যতম জিহ্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, উহা অপ্ হইতে ভিন্ন নহে। কেহ বলিলেন, রস দুই প্রকার, কেহ বলিলেন চরি প্রকার, কেহ বলিলেন ৭ প্রকার বা ৮ প্রকার, কেহ আবার বলিলেন রস অসংখ্য। তখন ভগবান আত্রেয় পুনর্ব্বসু সমস্ত সংশয় দূর করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে রস ছয় প্রকার, যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। জলই এই ছয় প্রকার রসের উৎপত্তির কারণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত রসের আশ্রয় স্থান।

ষড়রসের গুণ ও কর্ম্মের কথা বলিয়া চরক বলিতেছেন যে, ছয়টী রস মাত্রানুযায়ী ও সম্যক্ প্রকারে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইলে মানুষের হিতকারী হয় ; কিন্তু অযথাভাবে প্রযুক্ত হইলে শরীরের নানা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য আয়ুর্ব্বেদে কেবল মাত্র একটী রস অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিতে বার বার নিষেধ করা হইয়াছে। চরক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বলকারক উপায়ের মধ্যে ষড়রস সেবন করা এবং দৌর্ব্বল্যকারক উপায়ের মধ্যে এক রস অভ্যাস করা প্রধান। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে যাহাতে ছয়টি রসেরই সামঞ্জস্য থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এবং শরীরেরও যথাযথ পুষ্টি হইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, মাত্রানুযায়ী আহার কাহাকে বলিব, আর খাদ্যে কোন্ রসের কি পরিমাণ থাকিলে ছয়টী রসের সামঞ্জস্য হইবে, তাহাই বা জানিব কিরূপে ? এখন যেরূপ নিক্তির ওজনে খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন সেরূপ ছিল না। চরক উপদেশ দিলেন,—"মাত্রাশী স্যাৎ"—মিতাহারী হইবে। এবং মাত্রার নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন যে উহা অগ্নিবল সাপেক্ষ। যাহার যে পরিমাণ আহার করিলে প্রকৃতির বাধা জন্মে না এবং আহার্য্য দ্রব্য যথাকালে বিনাক্লেশে জীর্ণ হয়, সেইরূপ আহারই তাহার পক্ষে পরিমিত

জানিবে। আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন ছয়টী রসের দিক দিয়া। আজকাল শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে অন্য প্রকারে। নব্য খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ খাদ্যদ্রব্যকে কার্ব্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, স্নেহ, লবণ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। আমাদের খাদ্যে এইগুলির প্রত্যেকের কত কত অংশ থাকা উচিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার্থে খাদ্যে ছয়টী রসের কোন্‌টীর কত অংশ থাকা উচিত তাহার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে নাই। হয়ত এরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিবার প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করেন নাই। তবে চেষ্টা করিলে ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা পাইতে পারি।

চরক-সংহিতায় উল্লেখ আছে যে পঞ্চভূতাত্মক শরীরের অস্থি, দন্ত, নখ, মাংস, চর্ম্ম, পুরীষ, কেশ, লোম ও কণ্ডরাদি পার্থিব পদার্থ; অর্থাৎ এইগুলি পৃথিবী গুণবহুল। শরীরের গন্ধ, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব। রস, রক্ত, বসা, কফ, পিত্ত, মূত্র ও স্বেদাদি পদার্থ আপ্য। শরীরের রস ও রসনেন্দ্রিয় আপ্য। শরীরের উষ্মা ও প্রভা এবং রূপ ও দর্শনেন্দ্রিয় তৈজস। উচ্ছ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি এবং স্পর্শ ও স্পর্শেন্দ্রিয় বায়বীয়। শরীরের ছিদ্র সকল, ক্ষুদ্র ও মহৎ স্রোতঃসমূহ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় আন্তরীক্ষ। অতএব দেখা যাইতেছে যে শরীর পোষণের জন্য খাদ্যে পার্থিব ও আপ্য গুণ কিছু বেশী থাকা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, মধুর রসে এই দুইটী গুণেরই আধিক্য আছে। অম্ল, লবণ ও কষায় রসে এই দুইটীর একটীর আধিক্য আছে। কটু ও তিক্ত রসে ইহাদের একটীর আধিক্য নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের খাদ্যে ছয়টী রসের পরিমাণ মোটামুটী ঠিক করা যাইতে পারে। খাদ্যে মধুর রসের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে, ইহা নিশ্চিত; অম্ল, লবণ ও কষায় রস অপেক্ষাকৃত কম এবং কটু ও তিক্ত রসের পরিমাণ অত্যল্প রাখিতে হইবে।

মধুর রস বলিতে যে কেবল চিনি বা গুড় বুঝায় তাহা নহে। চাউল, গম, যব, ডাউল প্রভৃতি আমাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলি এবং দুগ্ধ ও বেশীর ভাগ ফলমূল, মৎস্য-মাংস প্রভৃতি সমস্তই মধুর রস বিশিষ্ট। সুতরাং মধুর খাদ্যদ্রব্যই যে আমাদের বেশী খাওয়া হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে শরীরোপযোগী ষড়্‌রসের সঠিক মাত্রা ধার্য্য করা পরীক্ষা সাপেক্ষ। আজকাল জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া খাদ্যতত্ত্বের নানা বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে। খাদ্যান্তর্গত ছয়টী রস সম্বন্ধেও অনুরূপ পরীক্ষা হইলে অনেক বিষয় সপ্রমাণিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আয়ুর্ব্বেদোক্ত খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ গবেষণা হইলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কোন উৎসাহী বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে যত্নবান হইতে পারেন।

পরিশেষে একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাচ্য খাদ্য-বিজ্ঞানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রকৃতি ও ঋতুভেদে খাদ্যের ব্যবস্থা। প্রত্যেক মানুষ সমান প্রকৃতির নহে। তাই বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য আয়ুর্ব্বেদে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ খাদ্য-বিচার এক আয়ুর্ব্বেদেই আছে। আজও পর্য্যন্ত নব্য খাদ্য-বিজ্ঞানে এই বিচার আরম্ভ হয় নাই।

পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত, আবার কতকগুলির কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। এই শেষোক্তগুলি কি করিয়া যে আমাদের দেশবাসীর উপর তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কোনও ঠিকানা করা যায় না। অতি পুরাকালে প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ পুস্তক সমূহে প্রোক্ত পথ্য প্রণালী হইতে যে ইহাদের উৎপত্তি সে সম্বন্ধেও কোনও প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র প্রচলিত প্রথা হিসাবে বহুক্ষেত্রে পথ্যের ব্যবস্থা হয়, তাহার মূলে কোনও প্রকার চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সূত্র পরিদৃশ্যমান নহে।

কয়দিন জ্বরে ভুগিয়া একটি রোগী নিরাময় হইয়া উঠিল, দু'টি সরু চালের অন্নের প্রত্যাশায় চিকিৎসকের কাছে সে তাহার করুণ আবেদন জানাইল। কিন্তু আরোগ্যলাভের পর একেবারে অন্নপথ্য কি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এইজন্য ব্যবস্থা হইল যে প্রথমে দুই এক দিন সুজী বা আটার রুটি তাহাকে খাইতে হইবে তাহার পর সে ভাত খাইবে। আমাদের মনে হয় এই ব্যবস্থা কোনওরূপ শাস্ত্রসম্মত নীতি অনুসারে করা হইল না, শুধু প্রচলিত একটা রীতি অনুসারে করা হইল। অন্ন অপেক্ষা রুটি যে লঘু খাদ্য এ কথা কে প্রমাণ করিবে? এই রোগীর চিকিৎসকের ধারণা হয় ত অন্যরূপ ছিল। রোগীর ন্যায্য আবেদন তিনি মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহার নিকটাত্মীয়গণের জোর প্রতিবাদের মুখে তিনি হইলেন অপ্রস্তুত। তাঁহারা বলিলেন, "রোগীর কথা শুনবেন না মশাই! একেবারে ভাত খেলেই জ্বর বেরিয়ে পড়্‌বে, তখন দোষের ভাগী আপনি হবেন। এখন দু'দিন ও রুটি খাক্।" বিচার বিবেচনা চলে, কিন্তু এরূপ স্থলে "জ্বর আসিবে না" এই ভবিষ্যদ্বাণী করাও ত সহজ নহে। সুতরাং চিকিৎসক যদি মনে মনে ভাবেন "Discretion is the better part of valour" তবে তিনি মহাজনের বাক্যই মানিয়া গেলেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে সাধারণের এইরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত এ কথা বুঝাইয়া দেওয়ার ভার চিকিৎসকগণের উপরে। তাঁহারা যদি এই ভাবে শির নত করিয়া চলিয়া যান তাহা হইলে সত্য কথাটা কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে? মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে দেখিয়াছি যে তাঁহারা ভাত আগে খাইয়া থাকেন তাহার পর সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিলে তবে ফুল্‌কা বা রুটির ব্যবস্থা হয়।

আর একটি গোলযোগের উৎপত্তি হয় অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশীতে পানভোজনের নিয়ম লইয়া। সাধারণের মধ্যে ধারণা ঐ কয়টি তিথিতে ভাত না খাইয়া লুচি, রুটি প্রভৃতি আহার করাই বিধি। ভাত খাওয়াতে শরীরের রস বৃদ্ধি করে সুতরাং উহার পরিবর্ত্তে লুচি খাওয়া অনেকে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। ঐ সকল দিনে একেবারে উপবাস লঙ্ঘন দেওয়ার

অথবা স্বল্পাহার কিম্বা একবেলা আহারের উপকারিতা বুঝিতে পারি কিন্তু পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক লুচি তরকারি দিয়া উদর পরিপূর্ণ করার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। এক সময়ে আমিও ঐরূপ ব্রতপালনে উপদিষ্ট হইয়া প্রতি একাদশী ও অমাবস্যা পূর্ণিমার দিন লুচি, রাবড়ী, সন্দেশ প্রভৃতি আহার করিয়া কাটাইতে লাগিলাম কিন্তু তাহাতে আমার শরীরের রস ত কিছুই কমিল না; পরন্তু আমার আর্থিক রস হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল কারণ আমার তৎকালীন বৃহৎ পরিবারের মধ্যে প্রায় সকলেই ঐরূপে ব্রত পালনের জন্য একান্তচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ইহার ফলাফল চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম, এবং উহা হইতে নিজে বিরত হইলাম, এবং অপর সকলকেও নিরস্ত করিলাম। অন্নাহারে যে শরীর রসস্থ হয় ইহার প্রমাণ স্বরূপ অনেকে বলেন, "দেখেন নি ভাতের একটা নেশা আছে, খাওয়ার পরই শরীরের একটা শৈথিল্য আসে ঘুম পায়, ইত্যাদি"। আমি বলি সে সমস্ত হয় আমরা অত্যধিক ভাবে উদর পূর্ণ করিয়া রাশিকৃত ভাত খাই বলিয়া স্বল্প পরিমাণে আহার্য্য খাইলে তদ্রূপ কিছু হইতে পারে না; খাদ্যের পরিমাণ হেতু উদর অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠিলে তাহার গহ্বর মধ্যে রক্তের আধিক্য ঘটে এবং সেই পরিমাণে মস্তিষ্কের দিকে উহার পরিমাণ কমিয়া আসে। ইহা হইতেই অলস ভাবের উৎপত্তি। সুশ্রুত সংহিতায় কথিত আছে যে বুদ্ধিমান বৈদ্য রোগ, সাত্ম্য, দেশ, কাল, দেহ, ক্ষুধা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা দিবেন।

রোগং সাত্ম্যঞ্চ দেশঞ্চ কালং দেহঞ্চ বুদ্ধিমান্।
অবেক্ষ্যাগ্ন্যাদিকান্ ভাবান্ রোগবৃত্তেঃ প্রযোজয়েৎ॥

রোগীর রুচি সম্মত পথ্য দিবারও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা উচিত। অনেক সময়ে রুচির বিপরীত খাদ্য অনবরত ব্যবস্থা করার জন্য তাহার অজীর্ণ ও উদরাময় সারিতে চাহে না। পথ্যে রুচি আসিলে তবে তাহা দ্বারা যথাযথভাবে মুখের লালা নিঃসৃত হয়। খাদ্য জীর্ণ হওয়ায় উহা প্রভূত সহায়তা করে। সাধারণে যে ব্যক্তি যে খাদ্যে অভ্যস্ত তাহাই তাহার পক্ষে সাত্ম্য। দেশ হিসাবে বিভিন্ন রূপ পথ্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এক দেশের পথ্য প্রণালী অন্য দেশবাসীর উপর সকল অবস্থা বিবেচনা না করিয়া প্রয়োগ করিতে গেলে অনেক সময় বিপত্তির কারণ হইয়া উঠে।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা। একজন ইংরাজ ডাক্তার কলিকাতার কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে এক বিধবার চিকিৎসার জন্য আহূত হন। সেকালে মেডিক্যাল কলেজে বহুরোগীকে Beef Tea দেওয়া হইত। সাহেব এই রোগিণীকে দেখিয়া ঔষধের অতীব সুব্যবস্থা করিলেন। পরে পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই বিধবার পিতাকে অম্লান বদনে বাংলা ভাষায় বলিলেন, "ষাঁড়ের চায় দিবেন।" ইহা হইল এক দিকের চিত্র। অপর দিকের আর একটি চিত্রের কথা বলিব। আরও একজন ইংরাজ চিকিৎসককে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "রোগী অন্ন পথ্য করিবে কি কি খাইয়া?" তিনি কলিকাতা সহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। কি কি দ্রব্য দিয়া যে বাঙ্গালীর অন্ন পথ্যের ব্যবস্থা দিতে

হয়—পটল এবং কাঁচকলা যে মাছের ঝোলের ভাল তরকারি—সে-টা তাঁহার ভালরূপই জানা ছিল। তিনি বলিলেন, "Well, he can have fish jhol—I will give him singhee fish with কাঁচ্‌কেলা and কাঁচ্‌ পোটোল।" কাঁচ পোটোল কথাটি সাহেবের মুখ হইতে সেদিন শুনিয়া আমার কাণে বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। সে সময়ে পটোল ছিল একেবারে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ধনী সন্তান রোগী, সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার্য্য যাহাতে তাহার জন্য সংগ্রহ হয় সেজন্য অর্থে সামর্থ্যেই কোনখানেই ক্রটি থাকিতে পারে না। সুতরাং পটোল অবশ্য আট টাকা সেরের—তাহাই যোগাড় করিয়া ঝোলের তরকারি করা হইল। তবে সে পটোল কয়টিতে শাঁস বলিয়া কিছুই ছিল না—মাত্র খোসাখানি এবং বীজ কয়টি ছিল। গামলায় রক্ষিত পূতজলে, ২।৩ সপ্তাহকাল সদাসর্ব্বদা স্নান করাইয়া কোনও ক্রমে তাহাদের জাতি বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল। এই পটোলে রোগীর কতদূর উপকার বা অপকার হইয়াছিল তাহা এখন মনে নাই। সে আজ পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা। তবুও একটা কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। রোগীর পিতা ছিলেন অতি তীক্ষ্নবুদ্ধি এবং সংলাপে চতুর। পর দিবস তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন ডাক্তার বাবু! জিনিষটা পাওয়া যায় কিনা, তাহার মূল্যই বা কি প্রকার এবং পাওয়া গেলেও তাহা কি অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে এ গুলোর খোঁজ খবর পথ্য-ব্যবস্থার সময় আপনাদের রাখা উচিত। ইনি না হয় সাহেব ডাক্তার, ওঁর কাছে আমাদের পথ্যাপথ্যের খবর কত আর থাক্‌বে; কিন্তু আপনার ফি থেকে যদি ঐ এক পোয়া পটলের দাম আমি কেটে রাখতাম তা'হলে আপনার রাগ করা চল্‌ত না ”

তালের মিছ্‌রি অনেক সময় রোগীর জন্য ব্যবস্থা করা হয়। পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে হয় ত প্রকৃত জিনিষটা পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু কলিকাতা সহরে ঐ বস্তু একেবারে দুষ্প্রাপ্য। অন্য মিছরির পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহারে রোগ চিকিৎসায় কতদূর সুবিধা হয় জানি না, তবে এটুকু জানা আছে যে তাল মিছরি বলিয়া যে বস্তু সহরে সচরাচর পাওয়া যায় উহা তাল মিছরি নয়—জাল মিছরি-ভাল মিছরি না হইয়া সাধারণ মিছরিরই ক্লেদ কর্দ্দমময় মূর্ত্তি। আমার বন্ধু স্বর্গগত ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র—যিনি বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন—তিনি একদিন গল্প করিতে করিতে আমায় বলেন যে সহরের কয়টি মিছরির কারখানা পরিদর্শন করিতে গিয়া তাল মিছরির যথার্থরূপ তিনি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। পরিষ্কার মিছরি প্রস্তুত হওয়ার পর যে অংশ ভাল দানা না বাঁধিয়া ময়লা রং এবং অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহারই অনেকটা বাজারে তাল মিছরির জালরূপ ধরিয়া বেশী দামে খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে। একথা একটি কারখানার স্বত্বাধিকারী নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বোতলে ভরা নামপত্র আঁটা তাল মিছরিও দেখিয়াছি আবার চীনাপাড়া হইতে ভাল চীনা তাল মিছরি ক্রয় করিয়া আনিতেও দেখিয়াছি। আশা করি উৎকৃষ্ট তাল মিছ্‌রিই আহৃত হইয়াছিল, খরিদ্দারের অর্থ অপহৃত হয় নাই এবং জিনিষ ব্যবহৃত হইয়া সু-ফল দান করিয়াছিল।

এইবার ভিটামিন অর্থাৎ খাদ্যপ্রাণের কথা কিছু বলিব। এক সময়ে বিশ্ববিশ্রুত Mac Carrison যিনি খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ভাবিত করিয়াছেন—তিনি ভারতবর্ষীয় শিখজাতি এবং হিমালয় সন্নিহিত কতকগুলি স্থানের অধিবাসীদিগের গঠন ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া তাহাদের খাদ্যের প্রকার সম্বন্ধে গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহাদের খাদ্য বেশ ভাল। তাহার তালিকা মধ্যে আছে মোটা লাল আটা, দাল, দুধ, ঘি, কাঁচা সবুজ শাক ও অন্য পাতা সবজী, আলু, ছোলা, মটর ইত্যাদি। মাংসের অংশ অল্প—তাহাও তাহারা প্রত্যহ নিয়ম করিয়া আহার করে না।

বহুস্থানে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রভৃতিতে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে প্রতিদিনের খাদ্য কি প্রকার হইলে স্বাস্থ্যের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে, খাদ্যপ্রাণ কাহাকে বলে, তাহাদের উপকারিতা কি এবং কোন্ কোন্ পদার্থে উহারা বিদ্যমান। টোমাটোতে সি-ভিটামিন আছে ও Scurvy রোগ প্রতিষেধক উপকারিতা আছে; উহা ১½ আউন্স প্রতিদিন ব্যবহার করিলেই পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে চলে। কিন্তু টোমাটো উপকারী বলিয়া কি এক ঝুড়ি করিয়া টোমাটো খাইতে হইবে এমন কোনও কথা আছে? সম্প্রতি একটি নয় বৎসরের মেয়ের চিকিৎসা করিতে গিয়া তাহার জননীর কাছে অবগত হইলাম যে ভিটামিন পূর্ণ টোমাটোর রস প্রত্যহ দুইবেলা একটী মাঝারি গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া তিনি তাঁহার কন্যাকে সযত্নে খাওয়াইতেছেন। আমার কাছে তিনি জানিতে চাহিলেন যে এত করিয়াও মেয়েটি মোটাসোটা হইতেছে না কেন? আর তাহার অজীর্ণ রোগ কিছুতেই সারিতে চাহে না কেন? আমি ভাবিলাম "সত্যই ত গুণে গুণে খাওয়ানো বিলাতী বেগুনের গুণে মেয়েটি ঐ বেগুনের মতই দেখিতে না হইলে মার প্রাণ বুঝিবে কেন? একেই তিনি মনে করিতেছেন যে ও বেগুনগুলো বে-গুণ?" যাহা হউক ঐ এক গ্লাস করিয়া রস খাওয়ানোটা কিছুদিন বন্ধ করিয়া দিতেই বালিকাটির অজীর্ণাদি সারিয়া গেল। তাহার পর পুনরায় অল্প পরিমাণে টোমাটো এখন দেওয়া চলিতেছে।

আমার এক বিদ্বান্ সাহিত্যিক বন্ধু সেদিন বলিতেছিলেন যে টোমাটো ভক্ষণে প্রভূত ভিটামিন সেবন ঘটিবে বলিয়া উহা একটু বেশী পরিমাণে প্রত্যহ তিনি খাইতে আরম্ভ দিলেন, এবং পালং ও নোটে শাকও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চালাইতেছিলেন। এহেন সময়ে একদিন তাঁহার বহু পুরাণ বিস্মৃতপ্রায় পাথুরীর ব্যথা পুনরায় উপস্থিত হইল। তাঁহার চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, "কাজটা অন্যায় হ'য়ে গেছে মশাই! আপনার Oxaleriaত ছিলই, তার উপর যে সব জিনিষ নতুন ক'রে ধ'রেছেন, আর তাও একটু বেশী পরিমাণেই ও সব গুলোই oxalates-এ ভর্ত্তি। দু'দিক বাঁচিয়ে তবে ত চল্‌তে হবে।" সেই অবধি তিনি ঐ টোমাটোরূপিণী সি-ভিটামিনীর ছোঁয়াচ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া চলেন।

কোন্ ভিটামিনের কোন্ ক্ষেত্রে আবশ্যক এবং কোথা হইতে তাঁহার সংগ্রহ হইতে পারে সে সকল প্রসঙ্গ যেন নিতান্তই অনাবশ্যক—ভিটামিন হইলেই ত হইল। তাই যেখানে হয়ত "এ" কিম্বা "ডি"র প্রয়োজন সেখানে সস্তা টোমাটোর রস

গেলাসের পর গেলাস ভর্ত্তি করিয়া সেবন চলিতেছে। এ সকল স্থলে ফল যাহা হইবার তাহাই হইবে।

"এ" এবং "ডি" ভিটামিনের অভাব পূরণ করিবার জন্ম লোকে কড্‌লিভার অয়েল খাইয়া থাকে বা নূতন ব্যবস্থা মত হ্যালিবাট লিভার অয়েল কিম্বা বহুবিধ ভিটামিন নির্য্যাস ব্যবহার করে। আজকাল লোকে এই সকল ভিটামিন নিজেদের ইচ্ছামত সময়ে সময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা হইতে মধ্যে মধ্যে কুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে (Hypervitaminosis)। ঠিক এই প্রকারে Ultraviolet Raysএর ব্যবহার ও নানাপ্রকারে দূষিত হইতেছে। কোথাও বা যথার্থ কারণ অবিদ্যমানে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় দেওয়া হয়। সাধারণের মধ্যে যেমন বিশ্বাস যে তাঁহারা ভিটামিন সম্বন্ধে কোন্ কথাটা না জানেন তেমনি Ultraviolet Rayর সম্বন্ধেও তাঁহাদের কতকগুলা কথা জানা হইয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে তাঁহারা নিজেরাই চিকিৎসককে বলিয়া বসেন, "ডাক্তার মশাই, রোগটা সারতে যদি দেরী হবে বলে মনে হয় তা'হলে আলট্রাভাইওলেটের ব্যবস্থা কর্‌লে হয় না?" চিকিৎসক যদি তাহাতে না মত করেন তাহা হইলে অপর হস্তে রোগীর ভার গ্রস্ত করিবার চেষ্টা করা হয়।

উদরাময়ে চিপীটক আহার ভাল এইরূপ একটা বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে আছে। উহাকে ভিজাইয়া খাইলে নাকি বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, আমি এবমপ্রকার কোনও সুবিধা ইহা দ্বারা হইতে দেখি নাই। চিড়ার মণ্ড ঠিকমত প্রস্তুত করিয়া অল্প-মাত্রায় খাওয়াতে ভাল ফল হইতে পারে কিন্তু অন্ন অপেক্ষা পৃথুল অর্থাৎ চিঁড়া কি প্রকারে অধিকতর সুপাক্য হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। খইকে সারক বলিয়া সাধারণে উল্লেখ করিয়া থাকেন্। বস্তুতঃ খই আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহা নহে। S XLVI 460 "লাজাশ্ছর্দ্দ্যতিসারঘ্না দীপনাঃ কফনাশনাঃ" "বল্যাঃ কষায়মধুরা লঘবস্তৃণ্মলাপহাঃ" লাজ অর্থাৎ খই বমি ও অতিসার নষ্ট করে; ইহা অগ্নিসন্দীপন, কফনাশক এবং বলকারক, কষায়, মধুর, লঘু, তৃষ্ণানাশক এবং মলনাশক।

বার্লি পথ্য দিতে হইলে সাধারণের ধারণা উহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া জলে সিদ্ধ করা আবশ্যক। অনেকে বলিয়া থাকেন পার্ল বার্লি ২ ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ হইলে তবে সে সুপথ্য হয়। কিন্তু প্রকৃত পদ্ধতি এই, যে অতিশয় লঘু পেয় রূপে উহা যখন ব্যবহৃত হয় তখন ২০ মিনিট সিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট হইল। বেশীক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া এবং অপেক্ষাকৃত গাঢ় অবস্থায় আনিয়া সেবন করিলে তাহা সুসিদ্ধ অন্ন অপেক্ষা লঘু হয় না। ছয় মাসের ন্যূনবয়স্ক শিশুকে বার্লি দেওয়া উচিত নয় কারণ তখনও পর্য্যন্ত তাহার শরীর-যন্ত্রে উহা জীর্ণ করিবার শক্তি উপবিত হয় নাই।

রোগীর পথ্য হিসাবে কই, সিঙ্গি, মাগুর—মাছের মধ্যে শ্রেয়ঃ বলিয়া সাধারণের কাছে পরিগণিত। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতে কৃষ্ণমৎস্য অপেক্ষা ছোট রোহিত মৎস্য ভাল।

বিল্বফল সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এই যে পাকা বেল কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং সকল রকমেই উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু পাকা বেল উদরের মধ্যে যে ভার বোধ হয় ইহা সকলেই জানেন। সুশ্রুত সংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে :—

কফানিলহরং তীক্ষ্ণং স্নিগ্ধং সংগ্রাহি দীপনম্।
কটুতিক্তকষায়োষ্ণং বালং বিল্বমুদাহৃতম্॥
তদেব বিদ্যাৎ সমপক্বং মধুরাম্লরসং গুরু।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং দোষকৃৎ পূতিমারুতম্॥

কচিবেল কফবায়ুহর, শীঘ্রক্রিয়াকারী, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী দীপন, কটুতিক্ত, কষায় এবং উষ্ণ। তাহাই আবার পক্ক হইলে মধুরাম্লরস, গুরু, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, দোষকারক এবং অধোবায়ুর দুর্গন্ধ কারক। দাড়িম্ব সম্বন্ধেও অনেকের ধারণা যে উহার কোনও গুণ নাই, যাহা আছে তাহা ঐ বেদানাতে। এ কথাটাও ঠিক সত্য নহে। উভয়ের মধ্যেই যথেষ্ট সুপথ্যগুণ বিদ্যমান। যদি বেদানা এবং কান্দাহারী দাড়িমকে মধুর দাড়িম বলা যায় এবং সাধারণ দাড়িমকে অম্ল দাড়িম বলা যায় তাহা হইলে প্রথমোক্ত বস্তু দ্বিতীয় অপেক্ষা অধিক গুণশালী। যথা :—

দ্বিবিধং তৎ তু বিজ্ঞেয়ং মধুরঞ্চাম্লমেব চ।
ত্রিদোষঘ্নং চ মধুরমম্লং বাতকফাপহম্॥

বেদানা এবং কান্দাহারী দাড়িম উভয়েই মধুর দাড়িম। আমাদের বাল্যকালে খর্জ্জুরের (কলসীর খেজুর, পিণ্ডি খেজুর নহে) রোগীর পথ্য হিসাবে বহুব্যবহার ছিল। হৃদ্য বলিয়া সাধারণ জ্বরে. ক্ষয়ে এবং রক্ত পিত্ত প্রভৃতিতে উহা প্রযুক্ত হইত।

প্রারম্ভেই বলিয়াছিলাম যে পথ্য সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত রীতি শাস্ত্রসম্মত। এই সম্পর্কে ঘোল বা তক্রের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা যাইতে পারে। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে মহামতি শ্রীমন্ মিশ্রভাব বলিয়াছেন :—দেবগণের সুখের জন্য যেমন অমৃত, পৃথিবীতে মানবগণের জন্য তেমনই তক্র। "যথা সুরানাং অমৃতং সুখায়, তথা নরানাং ভুবি তক্রমাহুঃ।" তক্রের বহু প্রকারভেদ আছে ছচ্ছিকা তাহার মধ্যে একটি, এবং সরবতের জন্য প্রচুরবারি সহযোগে যেরূপ ঘোল প্রস্তুত করা যায় তাহাকেই ছচ্ছিকা বলা হয়।

"ঘোলস্তু শর্করাযুক্তং গুণৈর্জ্ঞেয়ং রসালবৎ"
অর্থাৎ চিনি মিশ্রিত ঘোল রসালের ন্যায় গুণকারী

এইখানে তবে আমার বক্তব্য শেষ করাই সঙ্গত মনে হইতেছে। কটুতিক্ত কষায় অনেক কিছু আজ আমার হাতে পড়িয়া আপনাদের সেবন করিতে হইল। অবশেষে ঘোলে আসিয়া পরিবেশন সমাপন করিলাম। তবে এ ঘোল আমি শর্করাযুক্ত করিতে পারি নাই। ইহার পরে অপর কোনও সুধী বক্তা চিনি মিশ্রিত করিয়া দিলে আশা করি তখন ইহা কিঞ্চিৎ গুণকারী হইতে পারিবে।

সুকুমার শাখার প্রবন্ধ

একটী দগ্ধমৃণ্ময়পট্টে অঙ্কিত রামায়ণের একটী ঘটনা

শ্রীচারুচন্দ্র দাসগুপ্ত

যুক্তপ্রদেশে গণ্ডজেলার অন্তর্গত সাহেট-মাহেট নামক স্থানে খনন করিবার সময় ডাঃ ফোগেল একটি দগ্ধ মৃণ্ময় পট্ট আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ইহাতে একটী ঘটনা অঙ্কিত রহিয়াছে।(১) [চিত্র] ইহাতে দেখা যাইতেছে যে একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ও একজন নারী তাঁহার সম্মুখে নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কিছু প্রার্থনা করিতেছেন। এই ঘটনাটী কি তাহা স্থির করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে "In No. 288 we may perhaps recognise the meeting between Lakshmaṇa and the Rākshasī, Sūrpaṇakhā, who with bent knees and folded hands implores him to grant her his love. (Pl. XXVII)" (২) এই প্রবন্ধে দেখান হইবে যে এই দৃশ্যটী অন্যরূপেও স্থির করা যাইতে পারে।
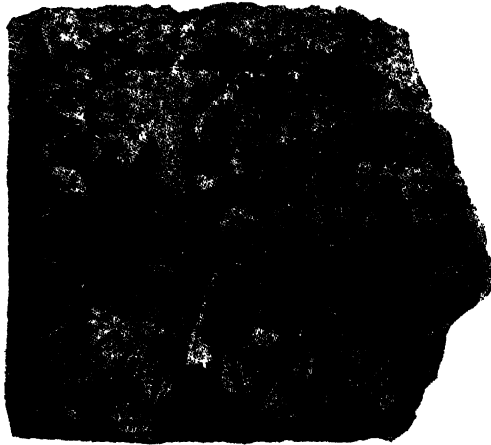
রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ সর্গে এই ঘটনাটী বর্ণিত আছে। এই সর্গ দুইটী দীর্ঘ এবং এই সর্গ দুইটীতে যে সকল শ্লোক আছে তাহা সমস্তগুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নহে; সুতরাং যে সকল শ্লোক আমাদের প্রয়োজন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

---

(১) Archaeological Survey of India—Annual Report for 1907-08, pl XXVII—the left upper photo in the lower plate, 1911.

(২) ঐ, পৃঃ ১১

রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, সপ্তদশ সর্গ

কৃতাভিষেকো রামস্তু সীতা সৌমিত্রিরেব চ।
তস্মাদ্গোদাবরীতীরাত্ততো জগ্মুঃ স্বমাশ্রমম্ ॥১
আশ্রমং তমুপাগম্য রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকং কর্ম পর্ণশালামুপাগমৎ ॥২
তথাসীনস্য রামস্য কথাসংসক্তচেতসঃ।
তং দেশং রাক্ষসী কাচিদাজগাম যদৃচ্ছয়া ॥৫
সা তু শূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
ভগিনী রামমাসাদ্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্ ॥৬
রামমিন্দীবরশ্যামং কংদর্পসদৃশপ্রভম্।
বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা ॥৯
সুমুখং দুর্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী।
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্ধজা ॥১০
ন্যায়বৃত্তং সুদুর্বৃত্তা প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা।
শরীরজসমাবিষ্টা রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥১২
জটী তাপসরূপেণ সভার্যঃ শরচাপধৃক্।
আগতস্ত্বমিমং দেশং কথং রাক্ষসসেবিতম্ ॥১৩
কিমাগমনকৃত্যং তে তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি।
এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা শূর্পণখ্যা পরংতপঃ ॥১৪
ঋজুবুদ্ধিতয়া সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।
অনৃতং ন হি রামস্য কদাচিদপি সংমতম্ ॥১৫
বিশেষেণাশ্রমস্থস্য সমীপে স্ত্রীজনস্য চ।
আসীদ্দশরথো নাম রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ ॥১৬
তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
ভ্রাতায়ং লক্ষ্মণো নাম যবীয়ান্ মামনুব্রতঃ ॥১৭
ইয়ং ভার্যা চ বৈদেহী মম সীতেতি বিশ্রুতা।
নিয়োগাত্তু নরেন্দ্রস্য পিতুর্মাতুশ্চ যন্ত্রিতঃ ॥১৮
ধর্মার্থং ধর্মকাঙ্ক্ষী চ বনং বস্তুমিহাগতঃ।
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছামি কথ্যতাং কাসি কস্য বা ॥১৯
সাব্রবীদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী মদনার্দিতা।
শ্রূয়তাং রাম বক্ষ্যামি তত্ত্বার্থং বচনং মম ॥২১

অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।
অরণ্যং বিচরামীদমেকা সর্বভয়ংকরা ॥২২

চিরায় ভব মে ভর্তা সীতয়া কিং করিষ্যসি ।
বিকৃতা চ বিরূপা চ ন চেয়ং সদৃশী তব ॥২৭

রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, অষ্টাদশ সর্গ

ততঃ শূর্পণখাং রামঃ কামপাশাবপাসিতাম্ ।
স্বচ্ছয়া শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্বমথাব্রবীৎ ॥১

কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্যেয়ং দয়িতা মম ।
ত্বদ্বিধানাং তু নারীণাং সুদুঃখা সসপত্নতা ॥২

অনুজস্ত্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ ।
শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্ ॥৩

অপূর্বীভার্যয়া চার্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ ।
অনুরূপশ্চ তে ভর্তা রূপস্যাস্য ভবিষ্যতি ॥৪

এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্তারং ভ্রাতরং মম ।
অসপত্না বরারোহে মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥৫

ইতি রামেণ সা প্রোক্তা রাক্ষসী কামমোহিতা ।
বিসৃজ্য রামং সহসা ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥৬

অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্যাহং বরবর্ণিনী ।
ময়া সহ সুখং সর্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি ॥৭

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাক্ষস্যা বাক্যকোবিদঃ ।
ততঃ শূর্পণখ্যাং স্মিত্বা লক্ষ্মণো যুক্তমব্রবীৎ ॥ ৮

কথং দাসস্য মে দাসী ভার্য্যা ভবিতুমিচ্ছসি ।
সোঽহমার্যেণ পরবান্ ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনি ॥ ৯

সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থা মুদিতা বরবর্ণিনী ।
আর্য্যস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্যা ভব যবীয়সী ॥ ১০

এনাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্ ।
ভার্যাং বৃদ্ধাং পরিত্যজ্য ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি ॥ ১১

কো হি রূপমিদং শ্রেষ্ঠং সংত্যজ্য বরবর্ণিনি ।
মানুষীষু বরারোহে কুর্য্যাদ্ভাবং বিচক্ষণঃ ॥ ১২

ইতি সা লক্ষ্মণেনোক্তা করালা নির্ণতোদরী।
মন্যতে তদ্বচস্তথ্যং পরিহাসাবিচক্ষণা ॥ ১৩
সা রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং পরংতপম্।
সীতয়া সহ দুর্ধর্ষমব্রবীৎ কামমোহিতা ॥ ১৪
এনাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
বৃদ্ধাং ভার্য্যামবষ্টভ্য মাং ন ত্বং বহু মন্যসে ॥ ১৫
অদ্যেমাং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তব মানুষীম্।
ত্বয়া সহ চরিষ্যামি নিঃসপত্না যথাসুখম্ ॥ ১৬ (৩)

উপরে উল্লেখিত শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শূর্পণখা প্রথমে রামকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বামী হইবার জন্য রামকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। (চিরায় ভব মে ভর্ত্তা সীতয়া কিং করিষ্যসি। বিকৃতা চ বিরূপা চ ন চেয়ং সদৃশী তব ॥) রাম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তিনি তৎপরে লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার স্বামী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি স্বয়ং রামের দাস এবং তাঁহার পক্ষে একজন দাসের পত্নী হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে রামের নিকট পুনরায় যাইয়া তাঁহার প্রেমভিক্ষা করিতে বলিলেন। তখন শূর্পণখা পুনরায় রামের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার স্বামী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই ঘটনাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শূর্পণখা রামের নিকট দুইবার এবং লক্ষ্মণের নিকট একবার গিয়াছিলেন। ডাঃ ফোগেল বলিয়াছেন যে এই দৃশ্যটীতে লক্ষ্মণ এবং শূর্পণখার সাক্ষাৎ দেখান হইয়াছে; কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে এই দৃশ্যটী রাম এবং শূর্পণখার অথবা লক্ষ্মণ এবং শূর্পণখার সাক্ষাৎ দেখান হইয়াছে বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে।

(৩) শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী আয়ার কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীমদ্বাল্মীকিরামায়ণম্, পৃঃ ৩২৫-২৭।

রূপসৃষ্টি ও আত্মবিকাশ

শ্রীবসন্তকুমার আঢ্য

মাঘের শেষে গোধূলির আকাশে ঘনকৃষ্ণ বর্ষামেঘের সমারোহ। মেঘের পটভূমিকায় মৃদুবায়ুস্পর্শে শিহরিত, নারিকেলের দীর্ঘ সবুজ পত্রশীর্ষ কোন্ যাদুর স্পর্শে রূপোলী হয়ে উঠেছে। শীতবায়ে রুক্ষ বৃক্ষপত্র, ধরণীর তৃণাস্তরণ সরসতার আভাষ পেয়ে উন্মুখ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বর্ষণোন্মুখ মেঘের পানে, যেমন করে অন্ধকার রাতে পথহারা পথিক আলোর আশায় চায় পূর্ব্বাকাশের পানে। প্রকৃতির একদিকে বিকাশ, অন্যদিকে উন্মুখতা। বিশ্বস্রষ্টার এমন বিচিত্র, মহান্ প্রকাশের মাঝে প্রাণ যেমন আপনাকে খুঁজে পায়, আপনাকে মেলে ধরে, অন্যদিকে তেমনি রূপপিপাসু অন্তর তীব্রতর আকাঙ্খায়, নিজেকে পূর্ণতর ভাবে খুঁজে পাবার আবেগে উতল হয়ে ওঠে। এই যে রূপের স্পর্শে রূপতৃষ্ণার তীব্রতা, বিকাশের পর নিজেকে পূর্ণতর ভাবে বিকশিত করবার আবেগ, এই দ্বন্দ্বজাত বেদনার সুরে আকাশ, বাতাস ভরে ওঠে। এই বেদনার চাঞ্চল্যে মানুষ করে রূপসৃষ্টি। এই পরমকাম্য বেদনাকে আশ্রয় করে মানুষের সমাজ নবতর কর্ম্মলোক, সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করে চলেছে। এই সৃষ্টির সঙ্গে আত্মবিকাশেচ্ছার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

এই যে বেদনার তীব্রদাহের মাঝখানে সান্ত্বনা, শান্তির সন্ধান, কোন যুগে কোন দেশে ব্যর্থ হয়নি। তাই দেশে দেশে যুগযুগের সঞ্চিত বিচিত্র, মহান সৌন্দর্য্যসায়রের শীতলতা আমাদের উদ্বেল, দৈনন্দিনতার আবর্ত্তজাত পঙ্কিলতা কলুষিত মনের ওপর সান্ত্বনা, শান্তির শুভ্রস্পর্শ দিয়ে যায়। তাই বেদনার পথ বেয়ে, মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করে আমরা অমৃতত্বের স্বর্ণ-তোরণের সন্মুখীন হই। বেদনার পথে, মৃত্যুর পথে এ যাত্রা, তবু এর পরিণতি পরিপূর্ণ আনন্দের, অমৃতত্বের মাঝে। যুগে যুগে দেশে দেশে যে সব রূপপিপাসু, আত্মবিকাশোন্মুখ, বেদনাভয়হীন, উর্দ্ধমুখী, মৃত্যুঞ্জয়ী স্রষ্টার আবির্ভাব হয়, তাঁরা নিজেদের রিক্ত করে জগতকে দিয়ে যান অমরতার সন্ধান।

সৃষ্টির পথে যে বাধা, তা এঁদের দেয় সৃষ্টির নবতর তীব্র আবেগ, দুঃখ এঁদের কাছে আনে আনন্দের বাণী, বেদনা এঁদের কাছে আসে পরমকাম্য মোহনীয় রূপে। তাই পৃথিবীর সব ব্যথা এঁদের আপনার, তাই তো এঁদের বেদনায় জগতের বেদনা রূপে, রসে, বর্ণে আত্মপ্রকাশ করে জগতের বেদনা দূর করে, তাইতো জগতের অশ্রুসায়রকে আপনাদের মধ্যে সঞ্চিত করে এঁরা জগতকে দেখান আনন্দের পথ, তাইতো জগতের ব্যর্থতা এঁদের মাঝে সার্থক হয়ে ওঠে। এঁদেরই তপের জ্যোতির আলোয় উজ্জ্বল এঁদের সাধনার পথে মানুষ মৃত্যুহীন সৌন্দর্য্যলোকের যাত্রা সুরু করেছে।

যে জাতির জীবনে যে পরিমাণে এই রূপ, কল্পনাকে বিকশিত করবার, জাতীয় জীবনে এই রূপকে ফুটিয়ে তোলবার প্রচেষ্টা জাগে, সে জাতির জীবন হয়ে ওঠে বৃহত্তর, মহত্তর, পবিত্র, সুন্দর। প্রাচীন গ্রীস, ভারত প্রভৃতি জাতির জীবনে এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে হয়েছিল বলেই আজও ভারতের অজন্তা, ইলোরা, খাজুরাহো, আবুর গিরি কন্দরস্থ রূপের ভাণ্ডার, গ্রীসের অপূর্ব্ব তক্ষণশিল্প জগতের কলারসিকদের আকর্ষণের বস্তু। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের আত্মবিকাশের দুর্ব্বার আবেগ। তথাগতের প্রতি-ভক্তির আবেগে ভক্তদের প্রাণ যখন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, যখন তাঁদের ভক্তিভারানত হৃদয় নিজেকে উজাড় করে দেবার প্রেরণায় আকুল হয়ে উঠেছিল, আত্মবিকাশের আনন্দ-ব্যথাতুর দ্বন্দ্বে যখন তাঁদের হৃদয় বারম্বার শতরেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে ফলবতী হবার উন্মুখতায় কর্ষিত ক্ষেত্রের মত হয়ে উঠেছিল, তখনই সেখানে উপ্ত হয়েছিল সৃষ্টির বীজ। এই দুর্গম পথে আত্মবিকাশের যাত্রা বলেই এই বিকাশেচ্ছা দুর্ভেদ্য বাধার ভেতর দিয়ে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে, তাই মানুষের চেষ্টা ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায় না।

যে বিরাট সত্ত্বার অগণন অংশ আমরা, এই আত্মবিকাশের চেষ্টার মূলে রয়েছে তাঁর অসীম রূপের কণামাত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা, সেই বিরাট সত্ত্বাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। তাই মানুষের এই চেষ্টা আনে জগতে মঙ্গল, কারণ মাঙ্গল্যের বিধাতাকে পাবার জন্যে মানুষের যে উদ্বেলতা, আন্তরিক চেষ্টা, আর যে চেষ্টা রূপপরিগ্রহ করে আত্মবিকাশেচ্ছার মধ্যে—সে চেষ্টা মঙ্গল ব্যতীত কিছু আনে না; তিনি সৌন্দর্য্যের মূলীভূত কারণ, তাই প্রচেষ্টা আনে জীবনে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি; তাঁর সৌন্দর্য্যময়তার মূলে পবিত্রতা, তাই এই সৌন্দর্য্যবোধ জাতীয় জীবনে আনে পবিত্রতা।

এই সৌন্দর্য্যবোধ জীবনে আনে নবতর আশা, এই সৌন্দর্য্যবোধের স্পর্শে দৈনন্দিন জীবন থেকে কুশ্রীতা, সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মত, অদৃশ্য হয়; এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি নিরানন্দকর দারিদ্রের মাঝে নিয়ে আসে আনন্দের বাণী, সুষ্ঠু পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা। এই বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শে মন ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, ঈর্ষার গ্লানিমুক্ত হয়ে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মহান দুঃখে ভরে ওঠে। মানব মনের চিরন্তন এই উচ্ছ্বাসগুলির প্রেরণা ব্যতীত কোন যুগে কোন মহান শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর হয়নি। তাই সৌন্দর্য্যবোধ অন্তরে জাগ্রত [illegible] শুভ-মুহূর্ত্ত থেকে অন্তর এই মহান ভাবসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই মহান ভাবরাজি যখন মানুষের মনে আপনার আসন পাতে তখনই আমাদের পার্থিব জীবন সূর্য্যের [illegible], বসন্তকুসুমের প্রভা, স্বর্গীয় সুষমায় ভরে ওঠে; তখন আমাদের প্রাণ আকাশের অবারিত নীলিমাময় [illegible], [illegible] লাভ করে, আমাদের আত্মা বিকাশের পথ ধরে পরম [illegible] দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বিকাশোন্মুখ আত্মার প্রেরণায় সৃষ্ট এই রূপরাজ্য না থাকলে জগত চিরতপ্ত বালুকাময়, জলচ্ছায়াবিহীন, দিকভ্রান্তকারী সাহারার মত বিশাল মরুর প্রাণহীনতায় ঊষর হয়ে উঠতো।